মুসলিম শাসন
ও
ভারতবর্ষ

(৭১২ খ্রীঃ – ১৯৪৭ খ্রীঃ)

নিত্যরঞ্জন দাস

এই বই সম্বন্ধে 'সাপ্তাহিক বর্তমান' ঃ

এমন প্রায়শই ঘটে যে, ইতিহাসের কিছু বিচ্ছিন্ন অংশকে বিক্ষিপ্ত ভাবে সাজিয়ে উপস্থাপিত করা হয় বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে। নিত্যরঞ্জন দাসের 'মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ' বইটির ক্ষেত্রে সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাই ঘটেছে। অবশ্য তাই বলে এই নয় যে, তাতে কোন ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। আসলে ইতিহাস লিখতে গেলে যে নিরপেক্ষতা দরকার সেটা অনুসরণ করেননি লেখক। এর ফলে বেশ কিছু অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা টেনে আনতে হয়েছে, যার সঙ্গে বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। যেমন এই গ্রন্থে 'ইসলামের ধর্মতত্ত্ব', 'হজরত মহম্মদ', 'পবিত্র কোরান' এবং 'ইসলাম রাষ্ট্র ও মুসলিম' শিরোনামের আলোচনাগুলি অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। আবার 'মুসলমানের ভারত বিজয়', 'মুসলিম শাসনে হিন্দু ও হিন্দু মন্দির', 'মুসলিম শাসনে আক্রমণ ও রাজনীতির বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক রচনাগুলি যথেষ্ট সমৃদ্ধ। উল্লেখ্য, আলোচ্য পুস্তকে ৭১২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাসকেই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। পরিশেষে জুড়ে দেওয়া গ্রন্থসূত্র ইতিহাসে উৎসাহী পাঠকদের খুব কাজে লাগবে। পরিশিষ্টে 'হলকস্ট' আলোচনাটি রীতিমতো আকর্ষণীয়। —মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ (প্রথম সংস্করণ)।। নিত্যরঞ্জন দাস।। গ্রন্থরশ্মি।। দাম ৭৫ টাকা।।

—শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়,
সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৬শে মে, ২০০১

মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ

(৭১২ খ্রীঃ— ১৯৪৭ খ্রীঃ)

নিত্যরঞ্জন দাস

তুহিনা প্রকাশনী

প্রকাশিকা ঃ
শ্রীমতী গীতিকা মাইতি
তুহিনা প্রকাশনী
৩০/৬/২, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

MUSLIM SASHAN O BHARATBARSHA
(Revised and enlarged Third Edition)
Glimpses of Muslim Conquest, Rule and Politics from 712 A. D. to 1947 A. D.
Written By **NITYA RANJAN DAS**
Rs. 250.00

প্রথম প্রকাশ ঃ আগষ্ট, ২০০০ (জন্মাষ্টমী, ১৪০৭)
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ অক্টোবর ২, ২০০৪ (আশ্বিন ১৫, ১৪১১)
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ঃ এপ্রিল, ২০১০ (নববর্ষ, ১৪১৭)
চতুর্থ সংস্করণ ঃ ২০১১ (বঙ্গাব্দ ১৪১৮)
ISBN-13 978-81-922464-3-7
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মুদ্রণ ঃ
মহামায়া প্রেস এণ্ড বাইণ্ডিং
৩০, মদন মিত্র লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

বর্ণসংস্থাপন ঃ
মহামায়া প্রেস এণ্ড বাইণ্ডিং
৩০, মদন মিত্র লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম বিশ্বাস / নির্মলকুমার প্রামাণিক

প্রাপ্তিস্থান ঃ
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

মূল্য ঃ দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

পরমারাধ্য পিতা-মাতার স্মৃতির
উদ্দেশ্যে নিবেদিত

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

Nothing should more deeply shame the modern student than the recency and inadequacy of his acquitance with India. বলেছেন Will Durant. এরপর আমি ইতিহাসের ছাত্র বা অনুরাগী একথা বলতেও সঙ্কোচ বোধ হয়।

ইতিহাস হল একটি দেশ, জাতি ও তার সভ্যতার অতীত কাহিনি; তার জয়-পরাজয়, উত্থান-পতনের বিবরণ। অতীতের শিক্ষাই হবে বর্তমানের পাথেয়---ভবিষ্যতের দিশারী। অতীত সম্বন্ধে বিস্মৃতি ও অজ্ঞতার পরিণাম হতে পারে বিপর্যয়কর। V. P. Menon যথার্থই বলেছেন, যে জাতি তার ইতিহাস ও ভূগোল ভুলে যায় তার বিনাশ আসন্ন—A nation that forgets it's geography and history, does so at it's own peril. কিন্তু ভুলতে না চাইলেও যেন ভুলিয়ে রাখার একটা সুপরিকল্পিত প্রয়াস চলছে। অতীত সম্বন্ধে এক রহস্যময় নীরবতা---তার যবনিকা উত্তোলনে অনীহা সেই প্রচেষ্টায় প্রতিফলিত।

Facts বা ঘটনাই হল ইতিহাস; ইতিহাসের দেহ-মন-আত্মা। পরবর্তীকালে ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ হতে পারে—কিন্তু তাতে ঘটনার চরিত্র বা প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। ইতিহাসে সেই সকল ঘটনার প্রাধান্য থাকা উচিত, দেশ ও জাতির জীবনে যার প্রভাব ছিল সুগভীর। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাস সংকলনে মুখ্য ঘটনাকে সযত্নে পরিহার করে গৌণ ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়। অতঃপর তাতে কল্পনার রং মিশিয়ে পরিবেশন করা হয় অভিনব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। অথচ এমন নয় যে, যথেষ্ট তথ্য নেই বা তা দুষ্প্রাপ্য। বিভিন্ন গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম, ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও দিল্লির জাতীয় মহাফেজখানায় (National Archives) এই সময়ের বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি বা দলিল সুরক্ষিত আছে। মুসলিম সম্রাটদের লেখা আত্মজীবনী, ইওরোপীয়ান, মুসলিম ও প্রথিতযশা ভারতীয় ঐতিহাসিকদের রচনায় রয়েছে তার বিস্তৃত ও বর্ণাঢ্য বিবরণ। বিশেষতঃ মুসলিম ঐতিহাসিকগণ সবিস্তারে সে ইতিহাস বর্ণনা করেছেন—কোথাও নেই সামান্যতম কার্পণ্য।

ইতিহাসের আকর গ্রন্থসমূহ হতে তথ্য নিয়েই আমার এই সংকলন গ্রন্থ। প্রধানত ইংরেজি বই থেকেই ঐতিহাসিক তথ্য নেওয়া হয়েছে। ইংরেজির সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ অথবা সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডে, অষ্টম শতাব্দী

থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলেছে মুসলিম শাসন; তারপর এসেছে ইংরেজ। এই সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনের ইতিহাস থেকে সাধারণ পাঠকের নিকটও এ সত্য স্পষ্ট হবে যে, মুসলিম বিজেতা, মুসলিম শাসক ও পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসনে মুসলিম রাজনীতির মধ্যে ছিল এক মৌলিক ঐক্য। ইসলাম ধর্মই সকল মুসলমানকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বেঁধেছিল। ইসলাম ধর্মই সকল মুসলমানের অনুপ্রেরণার মূল উৎস। মুসলিম শাসনকে তাই প্রকতপক্ষে বলা যায় ইসলামের শাসন। ইসলামের ইতিহাস হল মুসলিম ইতিহাস। এই জন্যই ৭১২ খ্রিঃ হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত মুসলিম ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম আলোচনা এই গন্থে করা হয়েছে; ধারা বিবরণী নয়, আভাস (a glimpse) মাত্র।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁরা অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য শ্রীতপন ঘোষ। আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী তপনদা তাঁর শত কাজের মধ্যেও সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পড়েছেন। দিয়েছেন অনেক মূল্যবান উপদেশ; গ্রন্থ প্রকাশেও নিয়েছেন মূখ্য ভূমিকা। অন্যান্যদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, আমার পরম সুহৃদ ও সহকর্মী অমল বসু, অগ্রজ প্রতিম গোপাল সরকার, অধ্যাপক গৌরীশংকর দে, অধ্যাপক কৃষ্ণ সরকার, সুভাষ দাশগুপ্ত, জহর সরকার, অনিল বিশ্বাস, রমেন সেন, সুবোধ ভট্টাচার্য, বিমান বিহারী রায়, সন্তোষ সরকার ও নারায়ণ দে আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাঁদের অমূল্য উপদেশ গ্রন্থের উৎকর্ষ ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। সহকর্মী বন্ধু শিবু ব্যানার্জি, অজয় ভট্টাচার্য, কাশীনাথ ব্যানার্জি এবং অন্য সকলের কাছ থেকে পেয়েছি সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা। ঝর্ণা—আমার সহধর্মিণী। ঝর্ণার সহস্র ধারার ন্যায় আমার সকল কাজে তার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, সহযোগিতা ও উৎসাহ আমাকে অনুপ্রাণিত করে। সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ আমি গ্রন্থরশ্মির কর্ণধার শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট। Proof Reading-এর কঠিন দায়িত্ব তিনিই পালন করেছেন। তাঁর উৎসাহ ও ঐকান্তিক আগ্রহেই এ গ্রন্থ প্রকাশের আলো দেখতে পেয়েছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনীয়।

কাঁকপুল, হাবড়া
২৪ পরগনা (উঃ)

নিত্যরঞ্জন দাস

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

কাব্য-নাটক-উপন্যাস রচিত হয়। কিন্তু ইতিহাস? ইতিহাস কে রচনা করে? ইতিহাসের এক নাম পুরাবৃত্ত; অতীতের বৃত্তান্ত বা কাহিনী। ইতিহাস স্বয়ম্ভু। আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে। সৃষ্টির সে উপাদান ছড়িয়ে থাকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে। পরবর্তীকালে পণ্ডিত ব্যক্তিরা সেই সকল উপাদান সংকলন করে ঐতিহাসিক নামে খ্যাত হন; এবং সেই সংকলিত সুসংবদ্ধ কাহিনীই ইতিহাস নামে হয় পরিচিত।

Dianysius ইতিহাসের সংজ্ঞায় বলেছেন, History is philosophy teachings by examples. ইতিহাসের উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব এই একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত বাক্যে বিধৃত। অতীতের শিক্ষাই হবে ভবিষ্যতের দিশারি। অসত্য নয়---যা সত্য, তা থেকেই আমরা শিক্ষা নিতে পারি। সুতরাং ইতিহাস হবে অতীত ঘটনাবলীর সত্য বা যথার্থ চিত্রায়ণ। ১৯৩৭ সাল। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি) ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস প্রণয়নের জন্য স্যার যদুনাথ সরকারকে অনুরোধ করেন। স্যার যদুনাথ ১৯ নভেম্বর ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে লিখিত পত্রে জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন ঃ National History like every other history, worthy of the name and deserving to endure, must be true as regards the facts and reasonable in the interpretation of them. It will be national not in the sense that it will try to suppress or white-wash everything in country's past that is disgraceful, but because it will admit them and at the same time point out that there were other and nobler aspects in the stages of our nation's evolution which offset the former...in this task the historian must be a judge.[1] স্যার যদুনাথের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত হয়ে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ২২ নভেম্বরের পত্রে লিখেছেন ঃ I entirely agree with you that no history is worth the name which suppresses or distorts facts. A historian who purposely does so under

1 R.C. Majumder—The History and Culture of the Indian People (The Mughul Empire) Preface—XIII.

the impression that he thereby does good to his native country really harms it in the end. Much more so in the case of a country like ours which has suffered much on account of its national defects, and which must know and understand them to be able to remedy them.[1] স্যার যদুনাথ ইতিহাস প্রণয়নের সর্ববাদী সম্মত দু'টি ধ্রুপদি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক হবে সত্যানুরাগী, সত্যাশ্রয়ী ও সত্যান্বেষী। তিনি ঘটনাকে যথাযথ ও অবিকৃতভাবে বর্ণনা করবেন; তাঁর ব্যাখ্যা হবে যুক্তিপূর্ণ। অতীতের কোনো কাহিনি গোপন বা বিকৃত করা যে দেশ ও জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়, সে সাবধান বাণী স্বয়ং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাস প্রণয়নে এই স্বীকৃত মানদণ্ডকে যথেচ্ছভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে উপেক্ষিত হয়েছে স্যার জে. এন. সরকার ও ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সুচিন্তিত অভিমত।

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজের পরাজয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের অবসান হয়; প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ সাম্রাজ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাংশ মুসলমানের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যথার্থ ইতিহাস লিখিত হলে মুসলমান ক্ষুব্ধ হতে পারে এই আশঙ্কা করে কল্পনায় আঁকা হয় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির চিত্র। লিখিত হয় নতুন ইতিহাস। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এই দলের উদ্যোগে প্রণীত ইতিহাসে মুসলিম অত্যাচারের ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে দাবি করা হয়—প্রজাহিতৈষী মুসলিম শাসকগণ কোন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেননি। তাঁদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়।...প্রচার শুরু হল ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব বিদেশি শাসন ছিল না। (A history written under the auspices of the Indian National Congress sought to repudiate the charge that the Muslim rulers broke Hindu temples, and asserted that they were the most tolerant in matters of religion...that the Muslim rule in India was not a foreign rule.)[2] স্বাধীনতার পর এই প্রচার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আরও শক্তিশালী হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ডঃ তারাচাঁদ (কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের সেক্রেটারি) প্রণীত 'ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে' লেখা হল, ভারতবর্ষের পরাধীনতা মাত্র দুইশত বৎসরের। অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বেই এদেশ পরাধীন ছিল—মুসলিম শাসনে নয়।

যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজনৈতিক প্রয়োজনেই এই অভিনব ইতিহাস লেখা

1. Ibid Preface—XIV
2. Ibid Preface—XII-III

হত—তবে ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই এই অসত্য প্রচারের সমাপ্তি ঘটত। কিন্তু বিস্ময় ও উদ্বেগের কারণ হল এই তোষণ-মনোভাব বৃদ্ধির প্রবণতা। পূর্বে যা ছিল ব্যতিক্রম—এখন তাই হয়েছে নিয়ম। সত্যের প্রতি সামান্যতম আনুগত্য নেই; মুসলিম শাসকদের অকপট প্রকাশ্য ঘোষণা, সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিকদের অকাট্য অভ্রান্ত সাক্ষ্যকে নিঃসঙ্কোচে বর্জন করাই বর্তমানে রীতি। একটি মাত্র দৃষ্টান্তে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের স্ব-ধর্মে নিষ্ঠা ও পরধর্ম বিদ্বেষ সর্বজন-স্বীকৃত—প্রশ্নাতীত। ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে অসহায় হিন্দুরা গুরু তেগবাহাদুরের শরণাপন্ন হন। রুষ্ট হন সম্রাট। তেগবাহাদুরকে তলব করেন দিল্লীর দরবারে। পাঁচ শিষ্য সহ তেগবাহাদুর দরবারে উপস্থিত হলে, সম্রাটের আদেশে তিন শিষ্য ও তেগবাহাদুরকে নৃশংশভাবে হত্যা করা হয়। এ কাহিনী সর্বজনবিদিত। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতে জনৈক ঐতিহাসিক ঘটনার এইরূপ বিবরণ দিয়েছেন : তেগবাহাদুর আসাম থেকে পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করে শুরু করেন অত্যাচার ও লুণ্ঠন। রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত হয়। অতঃপর ক্রুদ্ধ সম্রাটের আদেশে তাঁর শাস্তি হয় প্রাণদণ্ড। এ শুধু সত্যের অপলাপ নয়, অসত্যকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস। স্বাধীন ভারতের যোগ্যতম স্বরাষ্ট্রসচিব ও সর্দার প্যাটেলের বিশ্বস্ত সহকারী V. P. Menon বলেছিলেন : A nation that forgets its geography and history, does so at its own peril. তাঁর আশঙ্কা অমূলক নয়। গত অর্ধ শতাব্দী ধরে সরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত ইতিহাসের লক্ষ্যই হল মিথ্যা মোহজাল সৃষ্টি করে জনমানস থেকে অতীতকে বিস্মৃত করা। উদ্দেশ্য গভীরতর।

১৯১৫ সালে বাংলায় অনুষ্ঠিত ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে স্যার যদুনাথ সরকারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : সত্য—মনোরম অথবা রূঢ়, প্রচলিত মতামতের বিরোধী অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা আমার বিচার্য নয়।...আমি সত্যান্বেষী, সত্য বুঝি এবং সত্যকে গ্রহণ করি। ঐতিহাসিকের এই হওয়া উচিত স্থিরসংকল্প। (I would not care whether truth is pleasant or unpleasant and in consonance with or opposed to current views...But I still shall seek truth, understand truth and accept truth. This should be the firm resolve of a historian.)[1]

ইতিহাস সত্যানুন্ধ্যানী, ঘটনার যথার্থ বিবরণ ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্য উদ্‌ঘাটন তার একমাত্র লক্ষ্য। ইতিহাস যুক্তিবাদী, ভক্তিবাদী নয়। নয় সে কোন ব্যক্তি, জাতি বা সম্প্রদায়ের পূজারী। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ দেশবাসীকে সতর্ক করে বলেছিলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অতীতের বিকৃতি, সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণার প্রচার দেশের পক্ষে কল্যাণকর হয় না। আমরা সতর্ক হইনি, ১৯৪৭ সালে জাতিকে তার জন্য

1 Ibid Preface—XII

চরমমূল্য দিতে হয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধে অজ্ঞতা দেশ বিভাগের অন্যতম কারণ।

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করছে প্রায় হাজার বৎসর। অথচ হিন্দুরা মুসলমানের ইতিহাস ও ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা কোরান পড়ে না—জানে না মহানবী হজরত মহম্মদের জীবনী। আরব থেকে বহু দূরে অবস্থিত হয়েও ইউরোপবাসীগণ ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচিত।* ইসলাম ও মহম্মদের জীবনী নিয়ে প্রামাণ্য সকল গ্রন্থ ইউরোপীয়ানদের রচনা। অজ্ঞতা আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা মুসলমানের ভারত বিজয়ে সহায়ক হয়, যার পরিণতিতে ভারত বিভাগ। মুসলমানের সমগ্র জীবন, সমাজ ও রাজনীতি ইসলাম ধর্মের কঠোর অনুশাসন দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত; ধর্মের উদ্দেশ্যে সাধনে উৎসর্গীকৃত। ইসলাম ও মুসলিম ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইসলাম সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের স্বরূপ অনুধাবন সম্ভব নয়। এই জন্যই কোরান, ইসলামের ধর্মতত্ত্ব ও মহম্মদের জীবনীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম সংস্করণ ৬ মাসের মধ্যে নিঃশেষ হয়। আমার সময়াভাবের জন্যই সহৃদয় পাঠক ও প্রকাশকের তাগিদ সত্ত্বেও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে এই বিলম্ব। এই সংকলনে নতুন ৭টি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। যাঁদের উৎসাহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী, তপন ঘোষ, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, অধ্যাপক গৌরীশংকর দে, অমল বসু, অনিল বিশ্বাস, রমেন সেন, জহর সরকার, কৌশিক ভট্টাচার্য, চিত্ত চক্রবর্তী, বিমান বিহারী রায় ও সুবোধ ভট্টাচার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

* পাশ্চাত্যে ইসলামের ভাবমূর্তি কিন্তু উজ্জ্বল নয়। ইসলামি পণ্ডিত ও প্রাক্তন কংগ্রেস এম. পি. রফিক জ্যাকারিয়া তাই আক্ষেপ করে লিখেছেন ঃ অন্যান্য 'বিদেশী' ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি পশ্চিমী জগৎ উদাসীন; কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে তার মনোভাবে দেখা যায় বদ্ধমূল উগ্র বিরূপতা। এই বিরাগ-বিরূপতা শুধু (বুদ্ধিজীবীদের) চিন্তার জগতে নয়—(সাধারণের) আবেগ-অনুভূতিতেও সংক্রামিত। (The Western attitude is not one of indifferent dislike as in the case of other 'foreign' religions and cultures; it is one of deep-rooted and almost fanatical aversion; and it is not only intellectual but bears an intensely emotional tint.)[1] এই বিরূপ ধারণা দূর করতেই জ্যাকারিয়ার লেখনী ধারণ। তিনি লিখেছেন ঃ মুসলমান হিসেবে এ আমার কর্তব্য—আমার ধর্ম সম্বন্ধে যারা সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থ এবং সম্যক বিদিত নয়; তাদের কাছে ইসলামের সার তত্ত্ব উপস্থাপিত করা। (...as a Muslim, I felt it my duty to present the essence of my religion to all those who have not either properly understood it or have failed to apprerciate it.)[2]

---

1. Rafiq Zakaria—Muhammad And the Quran– Preface–XII
2. Ibid Preface–XII

অগ্রজ প্রতিম শ্রীগোপাল সরকার মূল্যবান সময় ব্যয় করে পাণ্ডুলিপি পড়েছেন, দিয়েছেন প্রয়োজনীয় উপদেশ। ন্যাশনাল লাইব্রেরির শ্রীসুভাষ দাশগুপ্ত এবং অন্যান্যরা সর্বপ্রকারে আমাকে সাহায্য করেছেন। সহকর্মী-বন্ধুদের আন্তরিক সহযোগিতায় আমি অভিভূত। বলার অপেক্ষা রাখে না, পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি আমার সহধর্মিনী ঝর্ণার কাছ থেকে—যে আমার সকল প্রেরণার উৎস। সর্বশেষ, মাননীয় শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার—গ্রন্থরশ্মির প্রাণপুরুষ, সুলেখক, বিদ্যোৎসাহী। তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে পাণ্ডুলিপি পড়ে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন। বহন করেছেন Proof Reading-এর গুরু দায়িত্ব। সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

কাঁকপুল, হাবড়া
উঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ

নিত্যরঞ্জন দাস

এ-গ্রন্থ্ সম্পর্কে

'মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ' নামাঙ্কিত গ্রন্থখানি সত্যিকারের একটি সদ্‌গ্রন্থের দাবি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমাদের উৎসাহিত করে স্বল্প পরিসরে বৃহৎ একটা কালের পরদায় অজস্র গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীর সুচারু বিন্যাসে।

অভিযোগ ওঠে, বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির তাগিদে অনেক সময় ইতিহাস-বিকৃতির ঘটনা ঘটে থাকে, ফলে এর বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। এ বইয়ে সে কলুষতার স্পর্শ নাই। তথ্যাবলীর যাথার্থ বা প্রমাণিকতা প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি সাপেক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত।

আমাদের বিশ্বাস, ইতিহাস-অনুরাগী ছাত্র, শিক্ষক থেকে সাধারণ পাঠক সকলেই উপকৃত হবেন--অজানা বহু ঘটনার হদিস পাবেন, বহু জিজ্ঞাসার সত্যনিষ্ঠ উত্তর খুঁজে পাবেন এ বই থেকে।

বিশ্বনাথ মজুমদার
গ্রন্থরশ্মি

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ভারত বিভাগ মানব-ইতিহাসের সর্বাধিক বিপর্যয়কর ও বিয়োগান্ত কাহিনী। কেবল এই নয় যে, সভ্যতার প্রাচীনতম পীঠস্থান বিভক্ত হয়েছে; যে ব্যাপক লোকক্ষয় ও কোটি কোটি মানুষ দেশান্তরী হয়েছে, তা অশ্রুতপূর্ব। কিন্তু ভারত উপমহাদেশের সকল মানুষই কি এই হৃদয়-বিদারক অন্তহীন ব্যথা-বেদনার সম-অংশ ভাগী? ১৯৯৭ সাল। পার্টিশন ও খণ্ডিত স্বাধীনতার সুবর্ণ-জয়ন্তী বর্ষ। Asraf Jahangir Qazi ভারতে পাকিস্তানের হাইকমিশনার। The Asian Age-এর বিশেষ প্রতিনিধি আশীষ খানকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ ১৪ই আগষ্ট আমাদের (পাকিস্তানিদের) অবিমিশ্র আনন্দ-উৎসবের দিন। কারণ শুধু ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা নয়—এই দিনই আমাদের রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। ভারতে দিনটি আনন্দ ও বিষাদের। একদিকে স্বাধীনতা অন্যদিকে দেশভাগ। একটি আনন্দের, অন্যটি দুঃখের। (Qazi—for us it is an occasion of unalloyed celebration because it is not only independence from the British, but also our birthday. In India it is a sweet and sour situation; it was independence and it was partition. One was welcome but the other was regretted—The Asian Age, 14-8-97).

দেশ বিভাগের স্বর্ণজয়ন্তী বৎসর মুসলমানের কাছে আনন্দের মহোৎসব; হিন্দুদের কাছে বিষাদ সিন্ধু। হিন্দু-মুসলমানের এই বিপরীত প্রতিক্রিয়া কেন? প্রথমতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে মুসলমান পাকিস্তান দাবীতে দেশব্যাপী যে হিংসাত্মক আন্দোলন করে "পার্টিশন" তারই সফল পরিণতি। দ্বিতীয়তঃ, ইসলামের বিধান মেনে মুসলমান ৭১২ খ্রীঃ হতে ভারত ভূখণ্ডে প্রায় হাজার বৎসর ধরে যে জেহাদী অভিযান করেছে; ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তা সাফল্যমণ্ডিত হয়। ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড হতে "ভারত" নামটিই লুপ্ত হয়। সেখানে স্থাপিত হল মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান—দার-উল-ইসলাম। মুসলমান তাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত—হিন্দু বেদনাহত, বিষাদগ্রস্ত। পার্টিশন বা ভারত-বিভাগের এই হল মূল কারণ।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর ছয় দশক অতিক্রান্ত। কিন্তু আজও ভারতবিভাগ কেন, কে দায়ী—এ মূল প্রশ্ন সম্বন্ধে দেশবাসী সম্যক অবহিত নন। চলছে অন্তহীন বিতর্ক। সম্প্রতি যশোবন্ত সিং রচিত Jinnah—India Pakistan—

Independence বইখানি নতুন করে বিতর্কের ঝড় তুলেছে। সত্য উদ্‌ঘাটন ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিহাস যখন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয় এবং ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবিরা তার দ্বারা প্রভাবিত হন; তখনই দেখা দেয় অকারণ বিতর্ক। কারণ বিশ্লেষণ করে বরেণ্য ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন ঃ সম্রাট আওরঙ্গজেব দেশব্যাপী সকল হিন্দু মন্দির ভাঙার জন্য এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসরণ করেছিলেন। এই তথ্যের প্রকাশ পদস্থ সরকারি আধিকারিক ও একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ্‌দের ভাল লাগতে না পারে; কিন্তু ঐতিহাসিকের পবিত্র কর্তব্য হল—কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর নিকট খুব অপ্রিয় ও কলঙ্কজনক হলেও সত্যকে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করা। (Aurangzib who deliberately pursued the policy of destroying and descerating Hindu temples and idols with a thoroughness unknown before or since. Such disclosure may not be liked by the high officials and a section of politicians, but it is the solemn duty of the historian to state the truth, however unpleasant or discreditable it might be to any particular class or community.[1]

ব্যতিক্রম নয়—ইতিহাস রচনায় এটাই এখন রীতি। বিশেষ জনগোষ্ঠীকে তোষণ করে রাজনৈতিক নেতাদের প্রীতি ও আনুকূল্য লাভ করাই একশ্রেণীর ঐতিহাসিকদের লক্ষ্য। রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাই গভীর বেদনার সঙ্গে বলেন ঃ হিন্দুধর্মের প্রতি মুসলিম শাসকদের যে উগ্র ধর্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতা ছিল, সেই পুরো অধ্যায়টিকেই সুস্পষ্ট ও সচেতনভাবে পুনর্লিখনের প্রয়াস চলছে। (It is painful to mention, though impossible to ignore the fact that there is a distinct and conscious attempt to re-write the whole chapter of bigotry and intolerance of the Muslim rulers towards Hindu religion.)[2] উদ্দেশ্য পরিস্কার। দেশবাসীকে অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখা। মুসলিম শাসনের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং দেশভাগের কারণ সম্বন্ধে ভারতবাসীর যদি যথার্থ প্রতীতি না হয়, তবে তার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর। যে কারণে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়েছিল—সেই একই কারণে ভারত পুনরায় বিভক্ত হবে।

দ্বিতীয় সংস্করণ দুই বৎসর পূর্বে নিঃশেষ হয়। সহৃদয় পাঠক ও প্রকাশকের বারংবার তাগিদ সত্ত্বেও আমার সময়াভাবের জন্য তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে এই বিলম্ব। এই

---

1. R.C. Majumder & others—The History and Culture of the Indian People (The Mughul Empire) Preface—XI
2. Ibid Preface–X-II

সংস্করণে পরিবর্তন নয়; মূল্যবান তথ্য সংকলনে হয়েছে পরিবর্দ্ধন। পরিশিষ্টে "জিন্না বিতর্ক ও বর্তমান ভারতে মুসলমান" অধ্যায়টি সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। শ্রী তপনকুমার ঘোষ বিশিষ্ট সমাজ সংগঠক, সমাজসেবী। তিনি শত কাজের মধ্যেও পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছেন। অন্য যারা মূল্যবান উপদেশ ও সহযোগিতার দ্বারা আমাকে উৎসাহিত করেছেন—তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, রাণাপ্রতাপ রায়, গোপাল সরকার, ডাঃ নারায়ণ দেবনাথ, শান্তি দত্ত এবং অধ্যাপক কৃষ্ণকান্ত সরকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ণ সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি আমার স্ত্রী ও দুই কন্যা—দেবযানী ও ইন্দ্রাণীর কাছ থেকে। পরিশেষে, বর্তমান সংস্করণ প্রকাশে তুহিনা প্রকাশনীর স্বত্ত্বাধিকারী শ্রী হিমাংশু মাইতি মহাশয়ের আন্তরিক আগ্রহে আমি অভিভূত। সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

নিত্যরঞ্জন দাস

অশোকনগর
উঃ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

বিষয়সূচি

অধ্যায়		পৃষ্ঠা

— পরিশিষ্ট —

আমন্ত্রণ

ভারতবর্ষ মানব সভ্যতার জননী স্বরূপা। ইউরোপ যখন ঘন তমসায় নিমজ্জিত, ভারতবর্ষে তখন সভ্যতা-সূর্য মধ্য-গগনে। হিমালয় থেকে সিংহল, পারস্য থেকে কম্বোডিয়া পর্যন্ত ছিল সেই মহান সভ্যতার লীলাভূমি। সংঘাত নয় সহযোগিতা, বিদ্বেষ নয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা, উচ্চ মহতী ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি। ধর্মের মূল ভাবও তাই। বরেণ্য মনীষী আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, 'ইহলোক নিয়ে সাধনা হল সংস্কৃতি---অনন্ত লোক নিয়ে সাধনা হল ধর্ম।' বসুন্ধরা বীরভোগ্যা হতে পারে-- অনন্ত লোক নয়। সে অমৃত লোকের সাধনায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের স্থান নেই। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মুখে তাই করুণা-ঘন হাসি, ঘাতকের কল্যাণ কামনায় দয়াময় ঈশ্বরের নিকট কাতর প্রার্থনা। ভগবান বুদ্ধ ও মহাবীর ছিলেন প্রেম ও অহিংসার জীবন্ত বিগ্রহ। এই ভারতবর্ষের তপোবনেই একদা ঋষি-কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল সেই অমৃত বাণী : "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। ভারতবর্ষের ধর্ম বিশ্বাস করে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"—যে যেভাবেই উপাসনা করুক না কেন তার দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। ভারতীয় মনীষা আজ সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত। জনৈক ইউরোপিয়ান দার্শনিকের সশ্রদ্ধ মন্তব্য এ সম্বন্ধে উল্লেখ্য : ভারতীয় প্রজ্ঞার গভীরতা অতুলনীয় (Indian wisdom is the profoundest that exists)।

ভারত শুধু অনন্ত লোকের সাধনাই করেনি---ইহলোকের সাধনায়ও তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত। পৌরাণিক যুগে ভারতের আয়তন ছিল বিশালতম। ভারত যুদ্ধের পর মৌর্য যুগে ভারত তার লুপ্তগৌরব আংশিক উদ্ধারে সমর্থ হয়। এই যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে ভারতের সীমানা পশ্চিমে আফগানিস্থান ছাড়িয়ে পারস্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহুধা-বিভক্ত ভারতে গড়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় ঐক্য। জনগণের মধ্যে বিকাশলাভ করে রাষ্ট্রীয় চেতনা। চন্দ্রগুপ্তের পর পুত্র বিন্দুসার ২৭ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন সম্রাট অশোক। ঐতিহাসিকদের বিচারে তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। ভারত ইতিহাসে তাঁর রাজত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কলিঙ্গ যুদ্ধে ব্যাপক নরহত্যা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। দিগ্বিজয় নীতি ত্যাগ করে তিনি গ্রহণ করেন ধর্মবিজয় নীতি। প্রেম ও অহিংসার সাধনা হল তাঁর জীবনের ব্রত। অহিংসা হল রাষ্ট্রের আদর্শ, উপেক্ষিত হল রাজধর্ম। পরবর্তী ভারত-ইতিহাসে এর প্রভাব

হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ক্ষাত্র-ভূমি ভারতে ক্ষাত্রবৃত্তি হল অবহেলিত। শান্তি ও অহিংসার নামে ভারতীয়দের মধ্যে দেখা দেয় সমরবিদ্যা, রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও উন্নয়নের প্রতি প্রবল অনীহা, উদ্যমহীনতা ও কর্মে অনাসক্তি। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তারা হল উদাসীন।

চতুর্থ অনুশাসনে তিনি মহোল্লাসে ঘোষণা করেন—"ভেরী ঘোষ (রণদামামা) এখন ধর্মঘোষে (ধার্মিকতা-ধর্মবিজয়) রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি তাঁর পুত্র-প্রপৌত্রদেরও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধাভিযান পরিহার করতে বলেন। (In Edict IV he exultingly says "the reverberation of the Kettle-drums (Bherighosa) has become the reverberation of the Law of Piety (Dharmaghosa)...he called upon his sons and even his great-grandsons to eschew the new conquests...)[1] "শক্তিমান মাত্রই যুদ্ধ করবে ও শত্রুনিপাত করবে"—সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতি বিদ কৌটিল্যের এই নীতি সম্রাট অশোক লঙঘন করেন। তাঁর তিরোধানের পরই তাই দেখা দিল রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়—ঘরে বাইরে। অশোকের সময় উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বত থেকে দক্ষিণে তামিলভূমি পর্যন্ত ছিল মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তার। সেই বিশাল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হল। একের পর এক প্রদেশ ঘোষণা করে স্বাধীনতা। উত্তর-পঃ সীমান্ত পথ দিয়ে শুরু হয় বিদেশী বর্বরদের উপুর্যপরি আক্রমণ। একটা সময় এল যখন, যে অন্ধ্র ও কলিঙ্গ নৃপতিদের অবজ্ঞা করা হত—তাঁদের সম্মুখে পাটলিপুত্র ও রাজগৃহের মহামহিম সম্রাটদের নতজানু হতে হয়। (The Magadha Empire under Asoka extended from the foot of the Hindukush to the borders of the Tamil country. But the withdrawal of the strong arm of Piyadasi was perhaps the signal for the disintegration of this mighty monarchy...Foreign barbarians began to pour across the N.W.gates of the empire and a time came when the proud monarchs of Patliputra and Rajgriha---had to bend their knees before the despised provinicials of Andhra and Kalinga.)[2]

রাজধর্ম ও লোকধর্ম এক নয়। সম্রাট অশোক সম্ভবত বিস্মৃত হয়েছিলেন; রাজধর্মে রাজ্যের স্বার্থই মুখ্য—রাজার ব্যক্তিগত আদর্শ গৌণ। কিন্তু সম্রাট অশোক সাম্রাজ্যের মঙ্গল ও স্বার্থের ওপর আপন আদর্শকেই চাপিয়ে দিলেন। অবশ্য আধ্যাত্মিকতার বিচারে অশোকের অহিংসা নীতি নিঃসন্দেহে মহত্তম। ঐতিহাসিক ভাণ্ডারকর যথার্থই বলেছেনঃ "এই যে নীতিগত পরিবর্তন—সাম্রাজ্য বিজয় রূপান্তরিত হল ধর্মবিজয়ে, রাষ্ট্রনীতির

1. Hemchandra Roychowdhury—The Political History of Ancient India—P-290
2. Ibid, P-309-310

ক্ষেত্রে তা ছিল বিপর্যয়কর যদিও আধ্যাত্মিকতার নিরীখে মহত্তম।" অশোকের অহিংসা নীতির ফলে সামরিক বাহিনী হল দুর্বল। সীমান্ত সুরক্ষায় দেখা দিল অবহেলা। বিদেশি আক্রমণকারিগণ এইরকম সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। অশোকের মৃত্যুর পর একাধিক বৈদেশিক জাতি ভারত আক্রমণ করে। এদের মধ্যে ব্যাকট্রীয়, গ্রীক, শক, পব, কুষাণ ও হুন উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক Will Durant-ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। 'হিন্দুরা অভ্যন্তরীণ কলহ, গৃহযুদ্ধে শক্তিক্ষয় করেছে। তারা গ্রহণ করেছে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম, যা তাদের উদ্যম ও তেজকে নষ্ট করেছে—জীবন সংগ্রামে সাফল্যের জন্য যা একান্ত প্রয়োজনীয়। সীথিয়ান, হুন, আফগান ও তুর্কি হানাদার বাহিনী জাতীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারত অভিযানের জন্য সীমান্তে অপেক্ষামাণ ছিল। হিন্দুরা তাঁদের শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে এই সকল হানাদারদের হাত থেকে তাদের সীমান্ত, রাজধানী, ঐশ্বর্য ও স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে (The Hindus had allowed their strength to be wasted in internal division and war; they had adopted religion like Buddhism and Jainism, which unnerved them for the tasks of life; they had failed to organise their forces for the protection of their frontiers and their capitals, their wealth and their freedom, from the hordes of Scythians, Huns, Afgans and Turks hovering about—India's boundaries and waiting for national weakness to let them in...)।[1]

ক্ষাত্র-ভূমি ভারতে যে সহসা বৈরাগ্যের প্লাবন দেখা দিল—এজন্য অনেকেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মকে দায়ী করেন। নৈরাশ্যবাদী (Pessimistic) এই দুই ধর্মের শিক্ষার ফলেই জনগণ জাগতিক অপেক্ষা অতীন্দ্রিয় লোক বা নির্বাণতত্ত্বের প্রতি অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠে; যার অনিবার্য পরিণতি হল বৈদেশিক আক্রমণ। হিন্দুধর্মের আচার্যগণের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ করা যায়। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী পরিব্রাজক শ্রীশংকরাচার্য অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা। তার তত্ত্ব "ব্রহ্ম-সত্য জগৎ মিথ্যা" ভারতীয় জনমানসকে কম প্রভাবিত করেনি। এই পরিদৃশ্যমান সুন্দর জগৎ যদি শুধুই মায়া-ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তবে এই নশ্বর ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য আর দ্বন্দ্ব-সংঘাত কেন? এরকম এক নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্য ভারতের জনগণের এক বিরাট অংশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ঐহিক সুখ-ভোগে বীতরাগ হলে রাজ্যবিস্তার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয় তুচ্ছ মনে হয়। ইউরোপের চিত্রটা কিন্তু ভিন্নতর। খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণ কিন্তু ইহলোককে উপেক্ষা করে অনন্ত লোকের সাধনার শিক্ষা দেননি। মহম্মদের দেহাবসানের পর বিজয়ী মুসলিম বাহিনী তারিকের নেতৃত্বে স্পেন জয় করে। অধিকার করে ফ্রান্সের কিয়দংশ।

1 Will Durant—The Story of Civilization, P-459

তখন ইউরোপে ছিল বহু ছোট রাজ্য। পোপের আহ্বানে তারা সকলে হলেন ঐক্যবদ্ধ। চার্লস মারটেলের নেতৃত্বে ৭৩২ খ্রিঃ টৌরের (Taur) যুদ্ধে ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনী তারিকের মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে। প্রায় একই সময়ে মুসলিম বাহিনী আক্রমণ করে ভারত। ৭১২ খ্রিঃ মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু জয় করে ভারত ভূখণ্ডে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তখন শংকরাচার্য সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে প্রচার করছেন "অদ্বৈতবাদ"। চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন খলজীর সেনাপতি দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরক্তে হোলি খেলছে। বৈষ্ণব আচার্য রামানুজম্ তখন দাক্ষিণাত্যে। নিরুদ্বেগ নির্বিকার চিত্তে তিনি শিষ্যদের দান করছেন শাস্ত্রজ্ঞান। সহিষ্ণুতা, উদারতা শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কিন্তু তা দুর্বলের জন্য নয়। ইহলোককে অস্বীকার করে অমৃতলোকের সাধনা অসম্ভব, রোমের পোপ তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর সক্রিয়তায় ইউরোপ রক্ষা করেছে তাঁর ধর্ম ও সভ্যতা। হিন্দু আচার্যগণ এই কঠিন বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করেছেন। তাই হিন্দুর ধর্ম-সভ্যতা হয়েছে বিপন্ন—দেশ পরাধীন।

কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল, নৃপতিগণ অন্তর্কলহে লিপ্ত; সীমান্তে ঘনায়মান বিপদ সম্বন্ধে নির্লিপ্ত। জনগণ জগৎবিমুখ—ধর্মীয় নেতাগণ আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন। অবস্থা এমন যেন বিদেশি আক্রমণকারীদের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। Will Durant যথার্থই বলেছেন ঃ 'ভারত চারশো বছর ধরে বিদেশি আক্রমণ আহ্বান করেছে; অবশেষে সত্যিই সে এল' (For four hundred years (600-1000 A.D.) India invited Conquest : at last it came.)[1]

ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হত যদি ভারত শৌর্য সাধনাকে অবহেলা না করত। শান্তি ও অহিংসা নিঃসন্দেহে মহত্তম আদর্শ। কিন্তু তার সুরক্ষার জন্যও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই। ভারতে বহিরাক্রমণ ও প্রায় হাজার বছরের মুসলিম শাসন প্রসঙ্গে Will Durant-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'এই বিয়োগান্ত, তিক্ত দুঃখজনক ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, সভ্যতার মূল্য হল বিরামহীন সদাজাগ্রত অতন্দ্র প্রহরা, জাতি অবশ্যই হবে শান্তিকামী---কিন্তু সে কামানের বারুদও শুষ্ক রাখবে (The bitter lesson that may be drawn from this tragedy is that eternal vigilance is the price of civilization. A nation must love peace but keep its powder dry)।[2]

ভারত রাষ্ট্রনীতির এই মূল সূত্রকে লঙ্ঘন করে। প্রশস্ত হয় বহিরাক্রমণের পথ। আসে গ্রীক-শক-কুষাণ-হুন এবং মুসলমান। অন্যান্য বিদেশী জাতির আক্রমণের সঙ্গে

1. Will Durant—The Story of Civilization, P-459.
2. Will Durant—The Story of Civilization, P-463.

মুসলমান আক্রমণের মৌলিক ও গুণগত পার্থক্য আছে। অন্যান্য জাতিসমূহ কালক্রমে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে বিশাল ভারতীয় জাতির মধ্যে লীন হয়ে যায়। ব্যতিক্রম মুসলমান। হাজার বছর ভারতে বাস করেও তারা স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। Will Durant 'মুসলমানের ভারত বিজয়কে বলেছেন ইতিহাসের সর্বাধিক রক্তাক্ত অধ্যায়। এ এক হতাশাব্যঞ্জক মর্মান্তিক কাহিনী। এর শিক্ষা হল এই—শান্তি, শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির অপূর্ব সূক্ষ্ম সংমিশ্রণে যে সভ্যতা তা খুবই অনিশ্চিত বস্তু; বহিরাগত বর্বরদের আক্রমণে তা যে কোনো সময়ে লুপ্ত হতে পারে" (The Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story in history. It is a discouraging tale, for its evident moral is that civilization is a precarious thing, whose delicate complex of order and liberty, culture and peace may at any time be overthrown by barbarians invading from without...)[1]. অন্য বৈদেশিক জাতি ও মুসলমানের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন Will Durant—'তাদের প্রধান অস্ত্র ছিল এমন এক ধর্ম—যা পরিচালিত হয় সামরিক আদর্শে' (All of them were armed with a religion militaristic in operation)[2]. সকল জাতিই নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদের রাষ্ট্রনীতি কখনই ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। মুসলমান একমাত্র ব্যতিক্রম। তারা ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতিকে শুধু অভিন্নই দেখে না—ধর্মের ভূমিকাই মুখ্য। ধর্মীয় লক্ষ্য পূরণ করাই হল তাদের রাষ্ট্রের আদর্শ। ধর্মীয় বিধান অনুসারেই পরিচালিত হয় তাদের রাষ্ট্রনীতি। পয়গম্বর হজরত মহম্মদ এই নীতির সার্থক রূপকার। তাই হজরত মহম্মদের জীবনী ও ইসলামের ধর্মতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতীত মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস হবে অসম্পূর্ণ।

1 Ibid. P-459.
2 Ibid. P-462.

ইসলামের ধর্মতত্ত্ব

সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু আল্লাহ্ এই বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও একমাত্র অধীশ্বর। বিশ্ব চরাচর ব্যাপী তাঁর নামে সকল মানুষ নমাজ পড়বে; আল্লা-হো-আকবর ধ্বনিতে নিনাদিত হবে অম্বর ও ধরণি—এ হল আল্লাহর খুবই সঙ্গত বাসনা। আল্লাহর বাণী বিশ্ব মানবের নিকট পৌঁছে দিয়ে তাঁর বাসনাকে চরিতার্থ করতেই মহানবী মহম্মদের ধরাধামে আবির্ভাব। কোরান হল মহম্মদের নিকট প্রকাশিত (Revealed) আল্লার বাণীর সংকলন। ইসলামিক পণ্ডিত ও প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ রফিক জাকারিয়া যথার্থই বলেছেনঃ কোরানের মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক ইসলাম মহম্মদের নিকট প্রেরিত হয়েছে এবং মহম্মদের মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার ও কোরানের অমরত্ব লাভ। সুতরাং কোরান হতে মহম্মদকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তারা অবিচ্ছিন্ন। আল্লাহ্ হলেন উভয়ের মধ্যে মূল যোগসূত্র। (Through the Quran, Allah gave Islam to Muhammad; but it was through Muhammad that Islam spread and the Quran lives. Hence Muhammad and the Quran can not be separated, they co-exist and their common link is God.)[1]

কোরানে মোট ৬৬৬৬টি আয়াত বা আল্লার বাণী আছে। এই সব কিন্তু একদিনেই স্বর্গীয় দূতের মাধ্যমে মহম্মদের নিকট প্রকাশিত বা প্রেরিত হয়নি। হয়েছে পর্যায়ক্রমে। মহম্মদ কোন বাণী শোনা মাত্রই তা তাঁর অনুগামীদের নিকট পুনঃপুন বলতেন। শিষ্যরা তা প্রথমে মুখস্থ করত—পরে লিখে রাখত পাথর, তালপাতা, চামড়া ইত্যাদিতে।

"কোরান" ও "হাদিস" হল ইসলাম ধর্মের মূল উৎস। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত দিব্য বাণীর সংকলিত রূপ হল কোরান। শেষ নবী মহম্মদ কর্তৃক সেই বাণীর বাস্তাবায়ন হল হাদিস। কোরানে পয়গম্বর মহম্মদের মাধ্যমে সর্বশক্তিমান পরম কারুণিক আল্লা দিব্যবাণী মর্তমানবের কল্যাণের জন্য প্রকাশ করেছেন। হাদিসে নবীকে দিয়ে সেই ঐশী বাণীসমূহকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং বলা যায় কোরান হল Theory; হাদিস হল তার Practical রূপ। অর্থাৎ Applied (ফলিত) কোরান অথবা Koran in action. বস্তুত ইসলামের ধর্মতত্ত্ববিদ্‌রা (ইমাম উলেমা) কোরান ও হাদিসের মধ্যে

1. Rafiq Zakaria—Muhammad And The Quran, P-92

কোনরূপ পার্থক্য করেন না। কোরানে ঘোষিত নীতি ও আদর্শই মহম্মদের কর্মজীবনের গৌরবময় ইতিহাস।

ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী পৃথিবী দুই বিপরীত শিবিরে বিভক্ত। দার-উল-ইসলাম (abode of peace—মুসলিম শাসিত) দার-উল-হারব (abode of war—অ-মুসলমান শাসিত। যুদ্ধ করে যে দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাই একে বলা হয়েছে abode of war.) মুসলমান শাসক মাত্রেরই কর্তব্য হবে ইসলামের শাসনকে সম্প্রসারিত করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র পৃথিবী Dar-ul-Islam-এ রূপান্তরিত হয়। (According to Muslim canon law the world is divided into two camps, Dar-ul-Islam (abode of Islam) and Dar-ul-Harb (abode of war)...it becomes incumbent on a Muslim ruler to extend the rule of Islam until the whole World shall have been brought under its sway.)[1]

জেহাদ ঃ

ক্ষণজন্মা চিন্তানায়ক নীরদ চন্দ্র চৌধুরী এই তত্ত্ব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন; 'মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ মতো মুসলিম মাত্রেরই নিকট পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত—(১) দার-উল-ইসলাম; (২) দার-উল-হারব। দার-উল-ইসলামের অর্থ ইসলামের দেশ, অর্থাৎ যে দেশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী শাসক কর্তৃক অধিকৃত ও শাসিত। দার-উল-হারবের অর্থ যুদ্ধের দেশ; যে দেশে যুদ্ধ করিয়া ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন করিতে হইবে। ইসলামের বিধান অনুসারে কোন মুসলমান অ-মুসলমানের অধীন থাকিতে পারে না। শুধু তাই নয়, অ-মুসলমান জগৎ ও মুসলমান জগতের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ। এই জন্যই অ-মুসলমান জগতের নামকরণ হইয়াছে দার-উল-হারব, যুদ্ধের দেশ। এই নির্দেশের জন্য অ-মুসলমান ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে কোন মৈত্রী হইতে পারে না; যতদিন পর্যন্ত না দার-উল-হারব দার-উল-ইসলামে পরিণত হইবে ততদিন পর্যন্ত বিশ্বাসী মুসলমান মাত্রকেই জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ চালাইতে হইবে। জিহাদের নিয়ম অনুযায়ী অবিশ্বাসীকে হয় (১) মুসলমান হইতে হইবে, কিংবা (২) মুসলমানের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ও জিজিয়া দিতে স্বীকৃতি হইয়া আশ্রিত (জিম্মী) হইয়া থাকিতে হইবে, কিংবা (৩) যুদ্ধ করিতে হইবে। ইসলামের বিধান মানিলে এই তিন পথের এক পথ ভিন্ন মুসলমানের অ-মুসলমানের নিকট যাইবার চতুর্থ আর কোনো পথ নাই।'[2]

---

1. Dr B. R. Ambedkar—Writings and Speeches Vol-8, P. 294-295
2. নীরদ চন্দ্র চৌধুরী—আমার দেশ আমার শতক, পৃ. ২৬-২৭

যেহেতু মুসলমান ও অ-মুসলমান জগতের মধ্যে রয়েছে চিরন্তন বিরোধ—তাই জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ইসলামের স্থায়ী বিধান। নীরদ চন্দ্র চৌধুরী বলেন, 'তিনটি ধাপে জিহাদের নির্দেশ ধর্মশাস্ত্রের বিধান বলিয়া স্বীকৃত হয়। ধাপগুলি এই—(১) বিশ্বাসীরা আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে, (কোরান ২২।৩৯-৪২) (২) যুদ্ধ মুসলমানের কর্তব্য—The strife is prescribed for you. (কোরান ২।২১২-২১৩) (৩) অবিশ্বাসী মাত্রকেই ইসলামে দীক্ষিত করিতে হইবে।' মহম্মদের কঠোর নির্দেশ—ইসলামকে স্বীকার না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে হইবে। (I am commanded to fight against men until they bear witness that there is no God but Allah and that Muhammad is God's messenger; only by pronouncing these words can they make their property and blood secure from me')[1]। এই জিহাদের প্রবর্তক স্বয়ং পয়গম্বর হজরত মহম্মদ। ধর্মের জন্য তাকে অসংখ্যবার বিধর্মী কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করতে হয়েছে। তাঁর দেহাবসানের পর মুসলমান আল্লা-হো-আকবর ধ্বনিতে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে প্রথম আক্রমণ করে ইউরোপ, পরে ভারতবর্ষ। ৭১২ খ্রিঃ মহম্মদ বিন-কাশেম থেকে ১৭৫৭ খ্রিঃ আহম্মদ শাহ আবদালি পর্যন্ত সকল মুসলিম সুলতানগণ ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদের উদ্দেশ্য নিয়েই আক্রমণ করে ভারতবর্ষ। ভারতে প্রায় হাজার বৎসরের মুসলিম শাসন ছিল হিন্দুর বিরুদ্ধে জেহাদ।

বর্তমান যুগ ও জেহাদ ঃ

বর্তমান যুগে এরকম মনে হতে পারে যে, প্রায় ১৪শ বৎসর পূর্বে সপ্তম শতাব্দীতে বিশেষ ধর্মীয়-সামাজিক পরিস্থিতিতে জেহাদের প্রয়োজন হয়েছিল। যুক্তি ও বিজ্ঞান সচেতন মানবতাবাদী বর্তমান বিশ্বে তা অচল ও অপ্রাসঙ্গিক। নিজ নিজ ধর্মীয়-শিক্ষা সঞ্জাত মানসিকতার অধিকারী অ-মুসলমানের পক্ষে এ রকম ভাবনা খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমানের ক্ষেত্রে বিষয়টির বিশেষ তাৎপর্য আছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। আল্লাহর অমোঘ বিধান, অ-মুসলমানকে ইসলামে দীক্ষিত করে বিশ্বব্যাপী দার-উল-ইসলাম বা ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একমাত্র বলপ্রয়োগ বা যুদ্ধের মাধ্যমেই তা সম্ভব। যেহেতু ধর্মের জন্য ধর্মের নির্দেশে এ যুদ্ধ, তাই এ যুদ্ধ পবিত্র ধর্মযুদ্ধ (Holy war) বা জেহাদ। ইসলাম ও জেহাদ অবিচ্ছেদ্য, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কোরানের সুস্পষ্ট নির্দেশ ঃ তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতদিন না (তাদের) ধর্মদ্রোহিতা দূর হয় এবং আল্লাহর

1. নীরদ চন্দ্র চৌধুরী—আমার দেশ আমার শতক, পৃ. ২৭

দীন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় (২।১৯৩)। নশ্বর মরণশীল মানুষের ধ্যানধারণা ও প্রয়োজন বাস্তব পরিস্থিতির দ্বারা নির্ধারিত। কিন্তু আল্লার বাণী শাশ্বত, চিরন্তন, বিশ্বজনীন ও দেশ-কাল নিরপেক্ষ। সুতরাং একবিংশ শতাব্দীতেও জেহাদের রূপ ও চরিত্র যে অপরিবর্তিত থাকবে, ইহাই স্বাভাবিক ও যুক্তিপূর্ণ। শুধু শব্দ চয়নে পরিবর্তন করে তাকে আধুনিক ভাবে ও ভাষায় উপস্থাপিত করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের লক্ষ্য সাধনই মুসলিম রাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য—তাই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও ইসলামের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন, ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলন, ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন (OIC), ইসলামিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন, ইসলামিক ব্যাঙ্ক, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ইত্যাদি নামকরণের মধ্যে সেই বার্তাই নিহিত।*

বিশ্বব্যাপী সক্রিয় লক্ষ লক্ষ মুসলিম ধর্মযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ নেতা সৌদি ধনকুবের ওসামা বিন লাদেন Al-Jazzera টি.ভি.তে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলেন ঃ পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত—একটি খ্রিস্টান দুনিয়া, যার নেতা হল কাফের বুশ (আমেরিকান প্রেসিডেন্ট), অপরটি হল ইসলামিক বিশ্ব। মুসলমানদের উদ্দেশ্য তাঁর আহ্বান ঃ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মুসলমান ভাই সব, ইসলামকে বিজয়ী করার দিন আগত। তোমরা প্রস্তুত হও। (The world has been divided in two camps : one under the banner of the cross, as the head of infidel Bush, and one under the banner of Islam. He calls upon the Muslims : 'Adherents to Islam, this is your day to make Islam victorious'—The Statesman. dt.3.11.2001)

ওসামা বিন লাদেনের নামে একটি সুদৃশ্য রঙিন পোস্টার। কোরান ও তরবারি চিত্রিত এই পোস্টারে রয়েছে ভারত, ইজরায়েল ও আমেরিকার জাতীয় পতাকার জ্বলন্ত চিত্র। পোস্টারে মুসলিম যুবকদের প্রতি লাদেনের আহ্বান ঃ

যুবকবৃন্দ, যতশীঘ্র সম্ভব আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আমাদের দৃষ্টিতে আঞ্চলিক সীমানার কোনও গুরুত্ব নেই। আল্লাহ্ সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর। অ-মুসলমান জগতের জানা উচিত যে আল্লার নামে মৃত্যু বরণে মুসলমান সর্বদাই প্রস্তুত। ('The youths should contact us as soon as possible. Territorial boundaries have no importance in our eyes. All the land belongs to God. the non-Muslim world should know it that a muslim is always ready to die in the name of God".—The Statesman. dt.18.4.2000)

* খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের এরূপ কোন সংগঠন নেই।

আল্লাহর পথে সংগ্রামে মুসলমানের জীবন উৎসর্গীকৃত। সেই সংগ্রামের নাম ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের (world trade centre) গগনচুম্বী ২টি টাওয়ারে ২টি আত্মঘাতী বিমান হানা হয়তো বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম রক্তাক্ত "জেহাদ" রূপে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। লাদেনের নির্দেশে আলকায়দা (Al-Qaeda) কর্তৃক সংগঠিত এই জেহাদী হানায় মুহূর্তে নিহত হয় প্রায় ৩০০০ মানুষ। ইসলামিক জেহাদের বিভীষিকায় বিশ্ববাসী আতঙ্কিত, ত্রস্ত। বিব্রত বোধ করেন কতিপয় বিদগ্ধ মুসলমান। ইসলামের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে তাঁরা ব্রতী হয়েছেন আত্মসমীক্ষায়।

(ক) Muhammad Said Al-Ashmawy. মিশরের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আদালতের প্রধান বিচারপতি, ইসলামিক আইন বিশারদ। হোসেনুর রহমানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন ঃ গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য হল অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসা। ইসলামিক দুনিয়ায় এই বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার একান্ত অভাব। বরঞ্চ মুসলিম জনগণকে নেতৃত্বের নিকট নিঃশর্ত আত্মসর্পণের শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্দেহ, জিজ্ঞাসা ও বিতর্ক মুসলিম বিশ্বে নিষিদ্ধ। কট্টরপন্থীরা "জিহাদকে" ধর্মযুদ্ধ রূপে ব্যবহার করে। মুসলমান অ-মুসলমানের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ রত। কট্টরবাদীরা ধর্মের নামে ধর্মীয় একনায়কতন্ত্রের প্রবক্তা। সকল ইসলামিক দেশে এই একই চিত্র। (Science and democracy are the two essentials for a modern society. And modern society stands for the spirit of inquiry. We lack it in the Islamic world. On the contrary our people are taught to surrender to the leaders unconditionally. To doubt and debate and question are strictly forbidden in the Islamic world...The militants use jihad as a holy war. Muslims are always in war against non-Muslims. The militants champion the cause of religious dictatorship in the name of religion. It occurs in all Islamic countries.— The Statesman. dt.26.12.1993.

(খ) Rafiq Zakaria—প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ ও ইসলামি শাস্ত্রবিদ্। হিন্দুস্থান টাইমসে এক নিবন্ধে —Stop this alienation—dt. 24.4.2001. বলেন ঃ যারা ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ তারাই প্রকৃত বিশ্বাসীদের (মুসলমান) ওপর উপর্যুপরি বিপর্যয় ডেকে আনছে। কতিপয় ধর্মোন্মাদ দুষ্কৃতীর পাপের মূল্য দিতে হচ্ছে গোটা সম্প্রদায়কে.... দেশ বিভাগের পর যাঁরা ভারতীয় মুসলমানের নেতৃত্ব দিয়েছেন; তাঁদের অধিকাংশই (পূর্বের ন্যায়) হিন্দুদের সঙ্গে সংঘাতের পথ অনুসরণ করেছেন... সম্প্রতি একদল জেহাদি

গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে—যাঁরা ইসলামের নামে দিনের পর দিন নির্দোষ নিরীহ হিন্দুদের হত্যা করছে—বিশেষত জম্মু ও কাশ্মীরে। (Those who know nothing of Islam are bringing disaster after disaster on the real followers of the religion. The sins of some lunatics in the community are being visited upon the whole people...After partition most of those who took over the leadership of Indian Muslims continued the policy of confrontation against Hindus...Of late the so called jihadis have emerged, who in the name of Islam are murdering innocent Hindus day after day, particularly in Jammu and Kasmir.)

বর্তমানে অনেক মুসলমান কোরানের যুগোপযোগী ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। কিন্তু কোন মুসলিম পণ্ডিত আজও পর্যন্ত এই দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হননি। মিশরীয় পণ্ডিত মহম্মদ সৈয়দ অল-অসমওয়ী "নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের" উল্লেখ করেছেন। ইসলামের একটি অর্থ হল "আত্মসমর্পণ", অবশ্যই আল্লাহর নিকট। "আত্মসমর্পণ" করার পর আর কি প্রশ্ন সন্দেহ বা বিতর্কের অবকাশ থাকে? তিনি মুসলিম সমাজের গঠন-বৈশিষ্ট্যগত ত্রুটির উল্লেখ করেছেন। এ সত্য সকলেরই জানা যে কোরানের বিধান অনুসারেই মুসলিম সমাজ গঠিত। রফিক জাকারিয়া বলেন ঃ কোরান হল মুসলমানের সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক ও আদর্শ গ্রন্থ। একমাত্র মহানবী মহম্মদই এই গ্রন্থের সারমর্ম ও তাৎপর্য যথাযথ উপলব্ধি করেছিলেন। হজরত মহম্মদ ও পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমানের নিকট আল্লাহর বাণীই হল আইন। রিচার্ড বেল বিষয়টির বিশ্লেষণ করে তার বিখ্যাত গ্রন্থ "কোরান"-এর ভূমিকায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন—কোরানের ন্যায় অন্য কোন গ্রন্থ মানুষের জীবনে এত ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেনি...এই গ্রন্থই মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি ও আইনের ভিত্তি স্বরূপ; তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনচর্যার পথপ্রদর্শক। কোরানের অনুশাসন অনুসারেই তাদের মানসিকতা ও চিন্তাধারা গঠিত। তাদের সাহিত্য ও দৈনন্দিন আলাপচারিতায় রয়েছে কোরানের প্রভাব। (The Quran has remained the supreme guide for Muslims ever since it was revealed, and no one could have emphasized its importance more than Muhammad. The word of God was law to him as it is to a billion of his followers throughout the world today. As Richard Bell has observed in his introduction to the Quran: Few books have exercised a wider or deeper influence upon the spirit of man than the Quran...It is the basis of [Muslim's]

religious beliefs, their ritual and their law; the guide of their conduct, both public and private. It moulds their thought and its phrases enter into their literature and their daily speech.)[1]

মানুষের দেওয়া বিধান সম্বন্ধে প্রশ্ন বা বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু কোরান তো আল্লাহর বিধান ও বাণীর সংকলন। আল্লাহর বিধান সম্বন্ধে প্রশ্ন বা সন্দেহ করা তো মহাপাপ। রফিক জাকারিয়া বলেন ঃ মুসলমান বিশ্বাস করে স্বয়ং আল্লাহ মহম্মদের নিকট কোরান প্রেরণ করেছেন। বাধ্যবাধকতা যাই থাক না কেন, এইজন্যই কোরানের সামান্য পরিবর্তন বা রূপান্তরের আভাস ইঙ্গিতেরও তারা তীব্র বিরোধী। স্বয়ং মহম্মদ পর্যন্ত কোরানের একটি শব্দও পরিবর্তন করতে পারেননি। কোরানেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে; তা করা হলে তাঁর ওপর নেমে আসত আল্লাহর ভয়ংকর অভিসম্পাত। (Muslims believe that God gave the Quran to Muhammad...That is why they resent the slightest suggestion of alteration or modification in it, whatever the compulsions. Even Muhammad could not change a word in it : that, as the Quran says, would have brought the wrath of Allah on him.)[2] মুসলমান বিশ্বাস করে, কোরান অপরিবর্তনীয়। রূপালংকার বা প্রতীকী নয়। আক্ষরিক অর্থেও তাঁদের নিকট ইহা বিশ্বাসের প্রশ্ন। বিখ্যাত ইসলামিক চিন্তাবিদ ইমাম-গজলী তাই বলেছেন—'যুক্তির যেখানে শেষ, বিশ্বাসের সেখানে শুরু।' The Quran is, therefore, regarded by Muslims as immutable and unchangeable, not metaphorically or symbolically but literally. This is a matter of faith for them...Imam Ghazzali, one of the greatest thinkers in the annals of Islam has said : 'Where reason departs, faith enters.'[3] এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, কোরান ধর্মগ্রন্থ। তার ব্যাখ্যার অবিসংবাদী অধিকারী ইসলামের ধর্মীয় নেতৃত্ব (ইমাম, উলেমা); আইন বিশারদ বা রাজনীতিবিদরা নন। সৈয়দ অল অসমওয়ী বলেছেন—অ-মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমান সর্বদাই যুদ্ধরত। এটাই তো স্বাভাবিক। জেহাদের প্রবর্তক ও অসংখ্য জেহাদের নায়ক যে পয়গম্বর মহম্মদ; মুসলিম জাতি তাকেই নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করছে।

রফিক জাকারিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন ঃ ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞ একদল ধর্মান্ধ (lunatics) জেহাদি গোষ্ঠী ইসলামকে কলঙ্কিত করছে—নির্বিচারে হত্যা করছে হিন্দুদের। কিন্তু বর্তমান মুসলিম দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মযোদ্ধা, ওসামা-বিন-লাদেন,

1. Rafiq Zakaria—Muhammad and The Quran, P-93.
2. Ibid, P-4.
3. Ibid, P-4

আফগানিস্থানের তালিবান প্রধান মোল্লা মহম্মদ ওমর অথবা সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লের হত্যাকারী শেখ ওমরের উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। নির্বিচার গণহত্যার জন্য অভিযুক্ত করেননি সুলতান মামুদ, তৈমুরলঙ, নাদির শা ও মুসলিম সম্রাট ও নবাবদের-—যারা হাজার বৎসর ধরে ভারতবর্ষে হিন্দুরক্তে হোলি খেলেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে এরা ইসলামের মহান সন্তান ও জাতীয়বীর রূপে সম্মানিত। লক্ষ লক্ষ মুসলিম ধর্মযোদ্ধা ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। তারা সকলেই নিষ্ঠাবান মুসলমান। মসজিদে নিয়মিত নামাজ পাঠ করে এবং মাদ্রাসায় ইমাম-উলেমাদের কাছে কোরান, ইসলামের ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে—আল্লার পথে সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেছে।

ধর্মযুদ্ধ মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। মুসলমানকে ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আল্লার আদেশ-নির্দেশ ও উৎসাহব্যঞ্জক বাণী রয়েছে কোরানের সর্বত্র। কোরানে আল্লার হুশিয়ারি ঃ তোমরা কি মনে কর তোমরা স্বর্গে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জেহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা না জানাচ্ছেন (৩-১৪২)। বস্তুত যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করব (৪-৭৪)। সে মহাপুরস্কার হল অন্তে বেহেস্তে গমন। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে রয়েছে বেহেস্তের বর্ণাঢ্য বর্ণনা। 'স্বর্গে জিহাদকারীরা বিশেষভাবে সম্মানিত হবে এবং আল্লাহ্ ফেরেস্তাদের আদেশ দেবেন স্বর্গের দরজায় তাদের বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করার জন্য। তারপর তাদের সৌরভময়, স্বর্ণময় সর্বোচ্চ স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে তারা যা চাইবে তাই পাবে।...একজন স্বর্গবাসী (মুসলমান) কতজন করে হুরি পাবে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, আবদুল্লা বিন ওমরের মতে প্রত্যেক স্বর্গবাসীর ৫০০ হুরি ৪০০ কুমারী এবং পুরুষের সঙ্গে সহবাস করেছে এমন আরও ৬০০০ অন্যান্য রমণী থাকবে।...এই সব হুরী এবং দাসীরা যে সমস্ত জামাকাপড় পরে থাকবে তার বাইরে থেকে ভিতর দেখা যাবে এবং ওই স্বর্গবাসী মুসলমান এদের সকলের সঙ্গে যৌন মিলন করার ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। এ ছাড়া স্বর্গে থাকবে নারী কেনা-বেচার হাট*, যেখানে স্বর্গবাসীরা (মুসলমান) ইচ্ছামত পছন্দসই নারী কিনতে পারবে। অনেকের মতে এই সব হুরীদের সঙ্গে স্বর্গবাসীর সঙ্গমকাল ৬০০ বছর স্থায়ী হবে'।[1]

---

* এদেশেও মুসলিম রাজত্বে দিল্লিতে এই ধরনের নারী (প্রধানত হিন্দু) কেনা-বেচার হাট বসত। নাম ছিল তার 'মীনা বাজার'।

---

1. ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী—ইসলামি ধর্মতত্ত্ব : এবার ঘরে ফেরার পালা।, P.–81-82

(Móksa. A. Huxley---P.112 As quoted in---Understanding Islam Through Hadis --Ram Swarup. P.205).

নশ্বর এ পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনে এর চেয়ে কাম্য বস্তু আর কি থাকতে পারে? সর্বশক্তিমান আল্লাহর আদেশ শিরোধার্য করে মহম্মদ প্রদর্শিত পথে সংগ্রাম করলে পরলোকে অনন্ত স্বর্গবাস; অসূর্যস্পর্শা চিরযৌবনা সহস্র নারীর রোমাঞ্চকর মধুর সঙ্গসুখ। আদেশ অমান্যে দোজাখে ভয়ংকর শাস্তি। অতএব কোরানের বিধান মেনে চলাই শ্রেয়।

আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য ও বেহেস্তের হাতছানি কোটি কোটি মুসলমানকে যুগ যুগ ধরে ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদে উদ্দীপিত করে। প্যালেস্টাইনের একটি দৃষ্টান্ত খুবই প্রাসঙ্গিক। সৈয়দ হোতারি ও তার দুই প্যালেস্টাইনীয় বন্ধু একদিন মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে জেহাদী সংগঠন হামাসের (Hamas) নেতা জনৈক শেখ জামালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। শেখ জামাল তাদের হামাস পরিচালিত স্কুলে ইসলামি ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসাহিত করে। স্কুলে কয়েক সপ্তাহ পাঠ নেওয়ার পর এই তিন নবীন শিক্ষার্থী আত্মঘাতী মানব বোমার তালিকায় স্বেচ্ছায় নাম লেখায়। হামাস থেকে বলা হয়, শহীদ হওয়ার বিনিময়ে তাদের পরিবারকে পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। প্রতি মসজিদে ও মাদ্রাসায় শোভা পাবে তাদের ছবি—এবং তাদের স্থান হবে সর্বোচ্চ স্বর্গে। (Saeed Hotari and two other palestinian youths went to a mosque, where Sk. Jamal, a Hamas leader persuaded them to attend a Hamas run class of Islamic study...After several weeks of schooling, the youths volunteer to be suicide bombers. In return for "martyrdom" Hamas tells the youth that 'their families will be financially compensated, their pictures will be posted in school and mosques and they will earn a special place in heaven...'—Hindustan times, dt.28.6.2001)

অ-মুসলমানের পক্ষে ইসলামের ধর্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কিঞ্চিৎ কঠিন। "জেহাদ" বা 'ধর্মযুদ্ধ' অ-মুসলমানের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদ। মুসলমান জেহাদে সহস্র মানুষ হত্যা করেও বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নয়। কোন অন্যায় বা পাপবোধ তাদের বিবেককে পীড়া দেয় না। কারণ তারা তো ধর্মের জন্য সংগ্রাম করছে। তাই ওসামা বিন লাদেনের সমর্থনে রয়েছে পৃথিবীর শতকোটি মুসলমান। এদেশে দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম আবদুল্লা বুখারী লাদেনের সমর্থনে জেহাদের আহ্বান জানান। ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লাদেনের ছবি ও তাঁর জেহাদী ভাষণ সংকলিত ক্যাসেট বিক্রি হচ্ছে কোটি কোটি।

ধর্মযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও নিযুক্তি কেন্দ্র হল মাদ্রাসা ও মসজিদ। পাকিস্তানের বৃহত্তম মাদ্রাসা জানিয়া বানুরীর (Banuri) প্রধান শিক্ষক নিজামুদ্দিন সামাজাই গর্বের

সঙ্গে বলেন, লাদেন তাঁর আদর্শ ও অনুপ্রেরণা; এবং তালিবান প্রধান মোল্লা মহম্মদ ওমর তাঁর বন্ধু। তাঁর মাদ্রাসায় প্রশিক্ষণ পেয়েছে অনেক তালিবান নেতা। তিনি বলেন কোন পলাতক তালিবান ও আলকায়দা নেতা যদি তাঁর আশ্রয়প্রার্থী হন—তিনি তাদের স্বাগত জানাবেন। কেউ তাদের তাড়িয়ে দেবে না। প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হবে তাদের সাহায্য করা। (...And if any Taliban or Al-Qaida fugitives turn up at his door, he says they will be welcome. There is not any one who would turn them away, shamazai said. It is every Muslim's duty to help them...—The Statesman. dt.20.8.2002). বিশ্বব্যাপী জেহাদের জন্য অর্থ কোন প্রতিবন্ধক নয়। মসজিদ ও মাদ্রাসায় অর্থসংগ্রহ কেন্দ্রে মুক্তহস্তে দান করে সাধারণ ও ধনাঢ্য মুসলমান এবং মুসলিম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ। হিন্দুস্থান টাইমসে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়—'কাশ্মীরে জেহাদের জন্য ইংলন্ডের বিভিন্ন মসজিদে প্রকাশ্যেই অর্থ সংগ্রহ করা হয়। শুধুমাত্র জৈশ-এ মহম্মদ ও লস্কর-ই-তৈবার বার্ষিক প্রাপ্তির পরিমাণ ৫০ লক্ষ পাউন্ড (৩৫ কোটি টাকার অধিক)। রিজেন্ট পার্ক মসজিদ—ইংলন্ডের বৃহত্তম। sunday Telegraph-কে এই মসজিদের ইমাম আবু হামজা বলেন ঃ যদি জেহাদের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তবে তিনি তা সমর্থন করবেন। কারণ এরা (জেহাদিরা) তাদের মুসলিম ভাইদের জন্য লড়াই করছে। (Fund for Holy war in Kasmir are being openly raised at mosques in England. Over 5 million pounds are being annually collected by Laskar-e-Toyeba and Jaish-e-Mahammad. Sunday Telegraph quotes Abu Hamza, the Imam of Regent Park mosque, the biggest in Britain as having said---'if funds were collected for terrorism (read Jihad), he would support such activities. These people are defending their Islamic brothers'.—Hindustan Times. dt.10.6.2002).

এরকম মনে হতে পারে যে ইজরায়েল ও পশ্চিম এশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম দেশগুলির প্রতি আমেরিকার সমর্থনের জন্যই ওসামা-বিন-লাদেন আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, শরিয়তি শাসনাধীন অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের তুলনায় মিশর, তুরস্ক, আলজেরিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইজরায়েল তো একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। উপরিউক্ত মুসলিম দেশগুলির ওপর থেকে মার্কিন সমর্থন প্রত্যাহৃত হলে সেখানে স্থাপিত হবে শরিয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা। জনৈক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মতে-—'এর ফলে শুধু ইসলামের শত্রুর সংজ্ঞা পরিবর্তিত হবে; বিদ্বেষ দূরীভূত হবে না। তখন ইসলামিক জেহাদের লক্ষ্য হবে কাফের ক্যাথলিক খ্রিস্টান, হিন্দু ও কম্যুনিস্টরা'।

('...it will change the definition of the enemy of Islam rather than eliminate the animosity itself. The Islamic war may then turn to infidel Catholic Christians, Hindus and communists etc.' "—Materialism Vs Spritualism—Bharat Jhunjhunwala—The Statesman. dt.6.1.2002).

পৃথিবীব্যাপী ইসলামের প্রসার ও দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রধান মাধ্যম হল এই জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ। "জেহাদ" যে দেশেই হোক না কেন পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানের (কারণ মুসলমান হল একটি জাতি) তাতে অংশগ্রহণ করা পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য। চীনের Xingiang অঞ্চল। মুসলমানরা বলে East Turkestan. এখানকার মুসলমান "উঘুর" (Uighurs) নামে পরিচিত। যেহেতু তারা মুসলমান, তাই তাদের দাবি হল স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। অখণ্ড ভারতে যেমন ছিল মুসলমানের পাকিস্তান দাবি। কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীনে কোন গান্ধী—নেহেরুর আবির্ভাব হয়নি; নেই "ধর্মনিরপেক্ষতা"। তাই চীন সরকার মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিকে কঠোর হস্তে দমন করে। এর বিরুদ্ধে বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় জেহাদী সংগঠন অল্-কায়দা (Al-Qaida) চীনে মুসলমানদের সমর্থন করে। সম্প্রতি অল্-কায়দা নেতা Abu-yahia al-Libi চীনের মুসলমানদের প্রতি চীনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার আহ্বান জানান। তিনি বলেন—"East Turkestan-এ নিপীড়িত মুসলমানদের সাহায্য করা সকল মুসলমানদের কর্তব্য। সেখানকার মুসলিম ভাইদের বুঝতে হবে, অত্যাচার—অবিচারের অবসান ও মুক্তির জন্য ধর্মে নিষ্ঠা ও জেহাদ ঘোষণা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।" (It is the duty of Muslims to-day to stand by the side of their wounded and wronged brothers in East Turkestan...let our Muslim brothers in East Turkestan know that there is no way to lift oppression and injustice but with truthful return to their faith and attachment to it as much as possible, to seriously prepare for Jihad (Holy war)—The Statesman-9.10.2009.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথিতযশা সাংবাদিক, টি.ভি, সঞ্চালক Brigitte Gabriel সাতবৎসর কাটিয়েছেন লেবাননে, ভ্রমণ করেছেন বহু দেশ, ইসলাম সম্বন্ধে রয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ ও প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা। Mrs. Gabriel অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী, মার্কিন কংগ্রেস, FBI, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ইসলামি জেহাদ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন—"পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত। Dar-ul-Islam (ইসলামের দেশ) ও Dar-ul-Harb (যুদ্ধের দেশ)—যে দেশ এখনও মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়নি। সেই কাফের অধ্যুষিত দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সকলে ইসলামে ধর্মান্তরিত অথবা নিহত হয়। এই হল ইসলামি জেহাদের ভিত্তি। (The world was now devided into two : Dar-ul-Islam (the house of Islam) and

Dar-ul-Harb (the house of war)...this is the basis of the Islamist's drive to fight all infidels until they either convert to Islam or be killed.)[1]

তিনি বলেন—মহম্মদ স্বয়ং কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন, সেই হল প্রথম জেহাদ। বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা প্রিয় মানুষের বিরুদ্ধে সেই জেহাদই নতুনভাবে আরণ্যক হিংস্রতার সঙ্গে সংঘটিত হচ্ছে। (The initial Islamic war Mahammed declared on the infidels—the original Islamic war—has reemerged and is ramping up its attack on freedom-loving people)[2] ইসলামি জেহাদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ায় বিচলিত পাশ্চাত্য মুসলিম পণ্ডিতরা বলেন—"জেহাদ হল প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম (আত্মনিগ্রহ)—সামরিক অভিযান নয়। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস—ও কোরানের বিধান অনুযায়ী জেহাদ হল যুদ্ধ; অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।" (Many Islamic pundits in the West to-day explain that Jihad is mostly a spiritual struggle and not a military one. However, when you examine the history of Islam and the commandments of the Koran that endorses Jihad as a military tool, that it becomes clear that the term Jihad refers mostly to war against non-believers.)[3]

কোরানের অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও এদেশেও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা ইসলামের পক্ষে অনুরূপ সওয়াল করেন। কিন্তু সুরা বরাটে (IX-অনুতাপ) আল্লাহ্ সকল চুক্তি ছুঁড়ে ফেলে পৌত্তলিক, ইহুদি ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেন—যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে।* (Then Allah revealed in Sura Bara'at (Repentence---IX) the order to discard all the obligations (covenents etc.) and commanded the Muslims to fight against all the pagans as well as against the people of the scriptures (Jews and Christians) if they do not embrace Islam, Allah made "the fighting" (Jihad) obligatory for the Muslims and gave importance to the subject matter of Jihad in all the Suras (Chatper of the Koran) which were revealed at Madina.)[4]

1. তপন কুমার ঘোষ ও নিত্যরঞ্জন দাস-ধর্ম-ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ইসলামি জেহাদ, পৃ. ৪৬
(Quoted from Mr. Brigitte Gabriel-They Must be stopped-P-32)
2. ঐ, পৃ. ৪৭
3. ঐ (B. Gabriel-They Must be stopped-P-23), পৃ. ৪৭
4. Dr. Muhammed Mushin Khan–Sahih Al Bukhari (Islamic University–Madina–Al-Munawwara), P-26

* মদিনায় প্রকাশিত কোরাণের সকল সুরায় আল্লা মুসলমানদের জন্য "জেহাদ" বাধ্যতামূলক বলে বিধান দিয়েছেন।

"জেহাদ" মুসলমানদের নিকট বাধ্যতামূলক করার জন্য আল্লা দুটি বিকল্প রেখেছেন। প্রলোভন ও শাস্তি। জেহাদে অংশ নিলে বেহেস্তে নারী সঙ্গসুখ ও উৎকৃষ্ট ভোগ্যদ্রব্য ও পানীয়ের অফুরন্ত সম্ভার; অন্যথায় দোযখের আগুনে অনন্তকাল ধরে দহন যন্ত্রণা। আল্লা বলেন যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে আমি তোমাদের ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেব এবং তোমাদের পরিবর্তে নিয়ে আসব অন্য জাতিকে। তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লা সর্বশক্তিমান। (...If you march not forth, I will punish you with a painful torment and will replace you by another people and you cannot harm Me at all and Allah is able to do all things. (9-39)[1]

Mrs. Gabriel লিখেছেন—প্রায় ১৪০০ বছর ধরে ইসলামিক জেহাদে ২৭ কোটি মানুষ নিহত হয়, আফ্রিকান ১২ কোটি, খ্রিস্টান ৬ কোটি, হিন্দু ৮ কোটি* বৌদ্ধ ১ কোটি। (By 1905 the West had liberated its territory previously conquered and savaged by Islam, and declared an economic and military victory, thus marking the end of 1,400 years of Islamic rule and Jihad. During this period, Muslims had killed 270 million people across the globe. 120 million Africans, 60 million Christians, 80 million

---

* প্রায় ১৩০০ বছর ধরে হিন্দুস্থান ইসলামের পৈশাচিক তাণ্ডবে রক্তাক্ত বিধ্বস্ত...লেখিকা হিন্দু নিহতের সংখ্যা বলেছেন মার ৮ কোটি। প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাটি হবে তার কয়েকগুণ বেশী। ১৯৩৯ ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল মাত্র ২৬ কোটি, তা হলে ২০০ বছর পূর্বে যখন ইংরেজের হাতে পরাজিত হয়ে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের অবসান হয় তখন হিন্দু কত ছিল ? তারও ১০০০ বছর পুর্বে যখন একহাতে তরবারি ও অন্য হাতে কোরান নিয়ে এদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে তখন হিন্দুর সংখ্যা কত হতে পারে ? কত হিন্দু ১২০০ বৎসরে বেড়ে হয় ২৬ কোটি ?

নদী-মাতৃক উর্বরা সমতল ভারতবর্ষ সর্বদাই ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। ভারতযুদ্ধে কৌরব-পাণ্ডবের সম্মিলিত সেনা ছিল ১৮ অক্ষৌহিনী। ১ অক্ষৌহিনী হল—রথঃ ২১৮৭০, হাতিঃ ২১৮৭০, ঘোড়াঃ ৬৫৬১০, পদাতিকঃ ১০৯৩৫০ (মহাভারত, আদি ২/২৩-২৬)। ৩২৬ খ্রিঃ পূঃ বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডার ভারত অভিযানে আসেন, তখন নন্দবংশের শাসনাধীন মগধ সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীতে (Standing Army) সৈন্য ছিল ১০,০০,০০০। এই বিশাল বাহিনীর ভয়ে গ্রিক বীর ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নি; সীমান্ত হতেই ফিরে গিয়েছেন। একটি রাজ্যে জনসংখ্যা কত হলে তার সেনা বাহিনীতে ১০,০০,০০০ সৈন্য থাকে ? সেই বিশাল হিন্দু জনসংখ্যা কি কর্পূরের ন্যায় বাতাসে মিলিয়ে গেল ?

"প্রবুদ্ধ -ভারত" পত্রিকায় স্বামীজীর এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়—"যখন মুসলমানরা প্রথম এদেশে আসিয়াছিল, তখন প্রবীণ মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল। এখন আমরা ২০ কোটিতে পরিণত হইয়াছি। (When the Mohammedans first came, we are said—I think on the authority of Ferista, the oldest Mohammedan Historian to have been six hundred millioms of Hindus. Now we are about two hundred millions—The complete works of Swami Vivekananda—Vol-5, P-233)

এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে জনসংখ্যা বিশারদদের গবেষণা করা উচিৎ...।

---

1. Ibid, P-31

Hindus and 10 million Buddhists)[1] তিনি তাই ইসলামকে বলেছেন Islamofascism বা ইসলামি ফ্যাসিবাদ। এই জেহাদ হল আল্লার অলঙ্ঘ্য বিধান। সুতরাং ধর্মীয় কারণেই মুসলমান মাত্রেই জেহাদী বা ধর্ম যোদ্ধা। এমনকি তথাকথিত "উদার" মুসলমান হয়তো জেহাদীদের সন্ত্রাসবাদী কাজের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না; কিন্তু তাঁরাও তাদের (জেহাদীদের) গভীর ভাবাবেগ ও অঙ্গীকারের (ইসলামের জন্য) প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মুসলমানের পক্ষে জেহাদ ও জেহাদীদের নিন্দা করা সম্ভব নয়। কারণ, তার অর্থ হবে মহম্মদ ও আল্লার বিধানকে নিন্দা করার সামিলা। (Even the so called moderate Muslims, who don't agree with these Jihadist's devotion to the purest form of Islam or their terror tactics, respect their passion and commitment..For most Muslims to denounce what the Jihadists do in the name of their religion would be denouncing the Prophet and the words of Allah...)[2]

Mrs. Gabriel লিখেছেন—১৯৭৯ সালে ইরান বিপ্লবের পর থেকে পৃথিবীব্যাপী ইসলামি ফ্যাসিবাদ ও সন্ত্রাসের ব্যাপ্তি কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কম্যুনিজমের অভিশাপ* ও আতঙ্কের স্থানে এসেছে ইসলামি অভিশাপ ও সন্ত্রাস।...বেঁচে থাকার চেয়ে

* "জারের স্মৃতি-আকুল রাশিয়ায় আজ স্তালিনই ঘাতক"—লিখেছেন প্রবীণ সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল।

...সাদা এই গীর্জা। নাম—ক্যাথিড্রাল অফ দ্য ব্লাড।...আজ যেখানে এই গীর্জা দাঁড়িয়ে রয়েছে, ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের সময় সেখানে ছিল এক বাস্তুকার ইপাটিয়েভের বাড়ি। রেড আর্মি দ্বিতীয় নিকোলাসকে (জার) বেঁধে ওই ইপাটিয়েভের বাড়িতেই বন্দী করে রেখেছিল। ১৯১৮ সালের ১৬ জুলাই মধ্যরাতে জার, তাঁর স্ত্রী ও পাঁচ শিশু সন্তানকে হত্যা করা হয়। পেরেস্ত্রৈকার যুগে ওই রক্তস্নাত ভূমিতে গড়ে ওঠে এই গীর্জা। তাই এর নাম, ক্যাথিড্রাল অফ দ্য ব্লাড। নিকোলাসের মৃত্যু বার্ষিকী আরও এক মাস পরে। এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে (স্মরণ) উৎসব।....

গীর্জার ভিতরে অনেক ছোট ছোট দোকান। কোথাও বিপ্লবের নাম গন্ধ নেই। কিন্তু বিক্রী হচ্ছে নিহত জার ও তাঁর পরিবারের ছবি।...যারা এই গীর্জাটি গড়ে তুলেছেন, সেইসব মানুষকে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছে...বেরোনোর সময় দেখা হল আর্চ বিশপ, গ্রেট সেন্ট ভিকেন্টির সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম, "বলশেভিক বিপ্লবের পর তো বলা হয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাস্তিকতার প্রচার করবে।" জবাবে তিনি বললেন, "রাশিয়ার মানুষ নতুন করে ইতিহাস রচনা করেছে। এদেশে নাস্তিকতাই পরাস্ত হয়েছে। শুধু পুতিনের মতো রাষ্ট্রনায়ক নন, কাতারে কাতারে সাধারণ মানুষ ধর্ম বিশ্বাসী, ঈশ্বর বিশ্বাসী। তরুণ-তরুণীরাও গীর্জায় আসে।"

...বিশাল গীর্জা ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে গাইড ভ্যালেন্তিনা বলে ওঠেন, "জারদের যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সে কথা ভেবে, আজ এ দেশের মাটি মানুষের চোখের জলে ভিজে যায়।" যে স্তালিনকে মার্কসবাদীরা বলেন জাতীয়তাবাদী আধুনিক রাশিয়ার রূপকার, তার সম্পর্কে ভ্যালেন্তিনার মতো অসংখ্য রুশ মানুষ বলছেন, "আসলে তিনিই ছিলেন ঘাতক।" ভারতীয় সাংবাদিকদের প্রতিনিধি দলকে নিয়ে আমাদের গাড়ির চালক পৌঁছে যান স্তালিনের হাতে নিহতদের স্মরণে গড়ে তোলা সৌধের কাছে।...একদিকে নিহত জারের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার ঢল অন্যদিকে

1 B. Gabriel—They Must be stopped, P-36

2 Ibid, P-52

ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়া শ্রেয়ঃ—এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম নর-নারীরা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে পৃথিবীতে ১০,০০০ বেশী জেহাদী হানা ঘটিয়েছে। (Since the Iranian revolution in 1970, Islamic fascism and world wide Islamic terrorist acts hve escalated to a level beyond any one's imagination. The scourge and fear of communism has been replaced by the scourge and fear of Islam...Since Sept.11, 2001 there have been more than ten thousand Islamic terrorist attacks world wide carried out by men and women who believe that dying for their religious beliefs is more important than life itself.)[1]

ইংলন্ডে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভুত বিখ্যাত সাহিত্যিক সলমন রুশদিকে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ—ব্রিটিশ সরকার "নাইট-হুড" উপাধি প্রদান করে।

দুনিয়ার মুসলমান ব্রিটিশ সরকারের তীব্র নিন্দা করে। প্রতিবাদে পাকিস্তানের মোল্লারা ওসামা-বি-লাদেনকে সম্মান-সূচক Saif-ul-Allah (The Sword of Islam—ইসলামের তরবারি) উপাধি দেয়।

Salman Rushdie, the great litterateur of Indian origin, living in England was honoured by the British Govt. with "Knight-Hood"

Muslims all over te world renounced this move by the British Govt.

In response, the Mullas in Pakistan conferred on Osama Bin Laden, the title, Saif-ul-Allah (The sword of Islam)—Rajinder Puri, The Statesman-4-7-2007.)

তরবারির সাহায্যেই ইসলামের দিগ্‌বিজয়। মুসলমানের নয়ন-মণি, এযুগের শ্রেষ্ঠ জেহাদী, ধনকুবের ওসামা-বিন্‌-লাদেনকে The Sword of Islam উপাধি দিয়ে পাকিস্তানি মোল্লারা তাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়েছেন এবং আধুনিক বিশ্বে ইসলামকে পুনরায় স্ব-মহিমায় স্থাপন করেছেন।

এইখানে লম্বা দেওয়ালের উপরে লক্ষ লক্ষ নিহতের নামের দীর্ঘ তালিকা।...শহীদ স্মারকের কাছেই একটি ছোট কাফেটেরিয়ার ম্যানেজার বলছিলেন, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যত লোক মারা গিয়েছে, তার থেকে বেশী লোককে স্তালিন হত্যা করেছেন। কিন্তু সে সব আমরা জানতে পারিনি। আমাদের আর্কাইভগুলি মানুষের জন্য খোলা ছিল না।"...প্রবীণ এক রুশ ভদ্রলোক আমাদের কথোপকথন শুনতে শুনতে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে বললেন, "এদেশের সব শহরেই লেনিনের নামে রাস্তা আছে। তবে ওইটুকুই সার"। সেই সঙ্গে আরও একটা কথা জানাতে ভুললেন না—"লেনিন-স্তালিনকে মানুষ ঘৃণা করে। কিন্তু টলস্টয়, গোর্কি, দস্তয়েভস্কিদের কিন্তু মানুষ এখনও ভোলেনি।"

—আনন্দবাজার-১৭-৬-২০০৯

---

1. Ibid, P-38-39

দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হারব তত্ত্ব ইসলামের নির্যাস; প্রধান হাতিয়ার হল জেহাদ। মনীষী নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর বিশ্লেষণে—যতদিন পর্যন্ত না দার-উল-হারব, দার-উল-ইসলামে রূপান্তরিত হইবে ততদিন পর্যন্ত বিশ্বাসী মুসলমান মাত্রকেই জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ চালাইতে হইবে। ইসলামের ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক Samuel P. Huntington এই জেহাদকে বলেছেন Clash of civilization—সভ্যতার সংঘাত। সপ্তম শতাব্দী হতে এই জেহাদ চলেছে অবিরাম—তেমনি চলবে অনাগত ভবিষ্যতেও, যতদিন ইসলাম ততদিন জেহাদ।

একদা ইংল্যান্ডের স্বনামধন্য প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন পার্লামেন্টের সদস্যদের কোরান গ্রন্থ দেখিয়ে বলেছিলেন—'যতদিন এই গ্রন্থ আছে; ততদিন পৃথিবীতে শান্তি আসবে না। (So long as there is this book, there will be no peace in the world.)[1] বিস্ময়কর প্রশংসনীয় তাঁর দূরদৃষ্টি...।

1 Rafiq Zakaria—Muhammad and The Quran, P-59.

হজরত মহম্মদ

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবরা পৌত্তলিক ধর্মের উপাসনা করত। তারা ছিল সভ্য। তারা চর্চা করত জ্ঞান-বিজ্ঞানের। অবশ্য বেদুইন বা যাযাবরদের কথা স্বতন্ত্র। আরবদের মাধ্যমেই প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু অনেকে মনে করেন ইসলাম প্রচারের পূর্বে আরবদের মধ্যে সভ্যতার আলো প্রবেশ করেনি। তারা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। পণ্ডিত নেহেরু এই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন—'ইসলামি পণ্ডিতদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের আগেকার আরবদের নিন্দা করার প্রবণতা দেখা যায়। তাঁরা সেই সময়ের নাম দিয়েছেন "জাহিলিয়ৎ" অর্থাৎ একপ্রকার অজ্ঞান ও কুসংস্কারপূর্ণ অন্ধকার যুগ। অন্যান্য সভ্যতার ন্যায় আরব সভ্যতাও বহুকালের; সেমেটিক জাতিগুলির অর্থাৎ ফিনিসিয়ান, ক্রিটান, চ্যালডিয়ান এবং হিব্রু এইগুলির উন্নতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিল।...সমগ্র সেমেটিক দেশগুলিতে সংযোগ ও আদানপ্রদান ছিল। ইয়েমেনে ইসলাম-পূর্ব আরব সভ্যতা বিশেষ ভাবে গড়ে ওঠে। মহম্মদের আগমনের সময় আরবী একটি উন্নত ভাষা ছিল, এবং এর সঙ্গে মিশ্রিত ছিল কিছু পারসিক শব্দ, এমনকি ভারতীয় শব্দও ছিল।ফিনিসিয়ানদের ন্যায় আরবেরা বাণিজ্যের জন্য দূর সমুদ্রপথে যেত। ইসলাম-পূর্ব কালে চিনে ক্যান্টনের কাছে একটা আরব উপনিবেশ ছিল।'[1]

পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতি সুন্দররূপে বিকশিত হয়েছিল। এদের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল আরব ও ইরানীয় বা পারসিক সভ্যতা। আরবদের শক্তি ও অনুসন্ধান স্পৃহার সঙ্গে ইরানীদের মাধুর্য ও শিল্পবোধের এক অপূর্ব মিলন ঘটেছিল। তাঁরা ছিল স্বাধীন মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী। প্রতি সন্ধ্যায় সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হত। এমনকি মহিলারা পর্যন্ত অনুরূপ বৈঠকের আয়োজন করত। মহম্মদের জীবনীকার D.S.Margoliouth-এর মতে ইসলামি পরদা প্রথা চালু হওয়ার পূর্বে আরব রমণীরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত। (...and in pagan times women were doubtless freer than after Islam had introduced the veil)[2]—এর থেকেই আরবদের উন্নত সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। জনসাধারণ ছিল স্বচ্ছল ও সুখী।

---

1. পণ্ডিত নেহেরু—ভারত সন্ধানে— (Discovery of India), পৃ. ১৯২-১৯৩
2. D.S. Margoliouth—Mahammed And The Rise of Islam, P-67.

জীবনধারা ছিল উন্নত, শান্তিপূর্ণ ও আরামপ্রদ। আরবরা ছিল সরল ও উদার। যুদ্ধ করত বীরত্বের সঙ্গে, রীতি-নীতি মেনে, শত্রুর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করত না। কিন্তু ইসলাম প্রবর্তিত হওয়ার পর পুরো চিত্রটাই পালটে যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার পরিবর্তে যুদ্ধ-বিদ্যার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়। পণ্ডিত নেহেরু আক্ষেপের সঙ্গে বলেন ঃ 'আরবদের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্তি আর ফিরে আসেনি। ইসলাম একটি কঠোর ধর্মমতে পরিণত হয়ে মন জয় করা অপেক্ষা সামরিক বিজয়ের অধিক উপযোগী হয়েছিল।'[1]

৫৭০ খ্রিঃ মক্কা শহরে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। জন্মের পূর্বেই পিতা আবদাল্লার মৃত্যু হয়। ৬ বছর বয়সে তাঁর মাতা আমিনা ইহধাম ত্যাগ করেন। স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষা বলতে যা বোঝায়—অনাথ মহম্মদের তা হয়নি। আরব, বিশেষত মক্কাবাসীরা ছিল শিল্পরসিক। কাব্য-চর্চা ছিল খুব জনপ্রিয়। মক্কায় প্রতি বছর হত কবি সম্মেলন। মহম্মদের অবশ্য এ বিষয়েও খুব একটা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু তিনি যে বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কাকা আবু তালিম মহম্মদের লালন-পালনের দায়িত্ব নেয়। সে মহম্মদকে উট ও মেষপালনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করে।

মক্কার বণিকদল তাঁদের Caravan (নিরাপত্তার কারণে প্রহরীবেষ্টিত বণিকদলের বাণিজ্য সম্ভার) নিয়ে মিশর, সিরিয়া, ইয়েমেন, পারস্য, আবিসিনীয়া প্রভৃতি দূরদেশে যেত। তরুণ বয়স থেকেই মহম্মদ এদের সঙ্গী হত। তাঁর জীবনীকার D. S. Margoliouth বলেন, "বাল্যের এই অভিজ্ঞতাই তাকে শত্রুপক্ষের গতিবিধি, তাঁদের সংখ্যা, উদ্দেশ্য, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ও অস্ত্র-শস্ত্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের শিক্ষা দিয়েছিল। ভবিষ্যতে বণিকদের ক্যারাভান আক্রমণ এবং ইহুদি ও মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই অভিজ্ঞতা তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে' (Experience as a Caravan-boy taught him the art of scouting; the power of inferring from minute signs and indications much about the whereabouts, the numbers, and the equipments of the enemy,.....yet sufficient to stand him in good stead when he became captain of banditti).'[2]

অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি শোভিত কাবা ছিল আরববাসীদের জাতীয় উপাসনাগার। এই কাবা মন্দিরেই তারা তাদের ধর্মীয় সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করত। সকল আরববাসীই গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে যে তাদের জাতীয় ধর্মই (National Religion) শক্তিশালী আবিসিনীয়দের আক্রমণ থেকে অলৌকিক উপায়ে তাদের রক্ষা করেছিল। মহম্মদ

১। পণ্ডিত নেহেরু— ভারত সন্ধানে— পৃঃ ১৯৮
২। D.S. Margoliouth—Mohammad And The Rise of Islam. P-63.

প্রবর্তিত "ইসলাম" আরববাসীদের জাতীয় ধর্ম ও স্বাভিমানের উপর অপ্রত্যাশিত এক বিরাট আঘাত। কারণ ইসলামকে স্বীকার করার অর্থই হল এই জাতীয় ধর্মকে প্রকাশ্যে অস্বীকার, হেয় ও উপহাস করা, এবং সম্ভব হলে দেব-মূর্তি চূর্ণ করা। একথা স্মরণ রাখতে হবে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার ইসলামের* প্রকৃতিগত। ইসলামের আল্লাহ অন্য দেবতাদের প্রতি অসহিষ্ণু। তিনি প্রীত হন—যদি অন্য দেবতার পরিবর্তে শুধুমাত্র তাঁরই উপাসনা করা হয়। (To avow Islam meant to renounce publicly the national worship, to ridicule and if possible, break-down idols...For it must be remembered that Islam was in its nature polemical. Its Allah was not satisfied with worship, unless similar honour was paid to no other name; and his worship also was intolerant of idols).[1]

ইসলামের মূল ভিত্তি হল নিছক ব্যক্তিগত। আর তা হল এই অন্ধবিশ্বাস বা তত্ত্ব (Dogma) যে মহম্মদ হলেন আল্লাহ প্রেরিত নবী বা পয়গম্বর। মহম্মদ প্রথমে নিজেকে পরে অন্যদের এই তত্ত্ব শিখিয়েছেন। (It is certain that a fundamental dogma of his system was the personal one that he was God's prophet...Belief therefore in himself was the dogma which he taught himself first, and afterwards taught others).[2]

মহম্মদ প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন—যাঁরা তাঁকে পয়গম্বর বলে স্বীকার করে না তাঁরা নরকের আগুনে অনন্তকাল ধরে জ্বলবে। অবিশ্বাসীদের এই দীর্ঘ তালিকায় তাঁর আশ্রয়দাতা, রক্ষক ও পিতৃব্য আবু তালিবও ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই ইসলাম ধর্মের প্রচারে পরিবারের মধ্যে বিভেদ, কলহ ও অশান্তি সৃষ্টি হল। ক্ষুণ্ণ হল সামাজিক সম্প্রীতি ও স্থিতি। (The growth of the new religion tended to spread discord between families and so keep the city in a state of turmoil and confusion).[3]

---

* ইসলামের অনুগামীরা মুসলমান নামে পরিচিত। এই মুসলিম পদটির স্বাভাবিক অর্থ হল বিশ্বাসঘাতক। যে শত্রুর হাতে মিত্রদের সঁপে দেয়। কিন্তু পয়গম্বর মহৎ অর্থে পদটির ব্যবহার করেন—যিনি আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। (The other name, Muslim, meant naturally 'traitor'...Mahammad displayed great ingenuity in giving it an honourable meaning : Whereas it ordinarily signified one who handed over his friends to their enemies, it was glorified into meaning one who handed over his person to God)[4]

1. Ibid, P-118
2. Ibid, P-77, 79
3. Ibid, P-155
4. Ibid, P-116-117

মহম্মদ ছিলেন দূরদৃষ্টি ও প্রখর বাস্তববুদ্ধির অধিকারী। তিনি বুঝেছিলেন যে, সুসভ্য আরব, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মতত্ত্ব। পক্ষান্তরে তাঁর ইসলাম ধর্মে এমন কোন মহত্তর আধ্যাত্মিক দর্শন বা তত্ত্ব নেই যার আকর্ষণে দলে দলে লোক স্বধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করবে। কিন্তু আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত পয়গম্বর রূপে স্বীকৃতি ও আরব ভূখণ্ডে প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য চাই ইসলামের প্রচার ও প্রসার। একমাত্র ভয়ভীতি প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগের দ্বারাই এই বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব। অভিজ্ঞতা বলে, শান্তিপ্রিয় সজ্জন ব্যক্তিরা নিরীহ প্রকৃতির হয়। দুর্জনের সংসর্গ তাঁরা সযত্নে পরিহার করে। মনুষ্য চরিত্র-অভিজ্ঞ মহম্মদ এই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেন। তাই দেখা যায়, বেপরোয়া হিংস্র দুর্বৃত্ত—যারা সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়, ইসলাম তাঁদের সর্বাগ্রে সাদরে বরণ করে নেয়। পরিবার বা সমাজের প্রতি ক্ষোভ বশত অনেকে দুষ্ট অভিসন্ধি বা ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য মহম্মদের আনুগত্য স্বীকার করে। (Those who for any reason felt aggrieved with their condition could gratify their ill-will by joining Mahammad----Desperadoes of whom the whole city was ashamed seemed to have been received into the fold of Islam).'[1]

কোরানেও স্বীকার করা হয়েছে যে "অধম ব্যক্তিরাই মহম্মদের অনুগামী।"[2]

মক্কার অধিবাসীরা মহম্মদ ও তাঁর প্রচারিত ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে। এ নিয়ে ছোট-খাটো সংঘর্ষও হয়। মহম্মদের অনুগামীরা ছিল নিতান্তই সংখ্যালঘু। তাই মক্কা আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাতে তিনি কতিপয় অনুচরকে আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান নৃপতি নিগাসের (Negus) নিকট প্রেরণ করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে বিস্ময়ের কিছু নেই। মনস্তত্ত্ব বলে মানুষ যখন আপন সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন সে প্রতিশোধ কামনায় শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। ৫৭০ খ্রিঃ শক্তিশালী আবিসিনিয়া নৃপতি মক্কা আক্রমণ করে। কিন্তু তাঁর সেনাবাহিনীর মধ্যে ভয়ংকর প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়লে তিনি স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। মক্কাবাসীরা মনে করে দেবতার কৃপায় সে যাত্রা তাঁরা রক্ষা পেয়েছে। Margoliough বলেন : অনুরূপভাবে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মহম্মদ-প্রেরিত দূত আবিসিনিয়া নৃপতির নিকট মক্কার পৌত্তলিকতা দমন করার আর্জি পেশ করে। তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়—একসময় দক্ষিণ আরবিয়া আবিসিনিয়ার অধীনে ছিল। সুতরাং সে দেশের (মহম্মদের জন্মভূমি) ওপর তার অধিকার আছে। সেই অধিকার ফিরে পাওয়ার আশাতেই নিগাস মক্কার বিদ্রোহীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মহম্মদের আশা ছিল তাঁর প্রেরিত অনুগামীরা অনতিবিলম্বেই আবিসিনিয়ার সেনাবাহিনীকে নিয়ে বিজয়

1. Ibid P-155.

2. কোরান, সুরা-১১-আয়াত-২৭

গর্বে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবে। (On the analogy of similar scenes we should suppose that the envoys of Mohammed urged the Negus to take an active part in suppressing paganism, reminding him of the Abyssinian rule in South Arabia, a fact which gave him some sort of title to the country; and that the idea of regaining this ancient possession was what led him to favour the Meccan insurgents---Mahammed resolved to find a refuge for his followers, perhaps looking forward to seeing them return at the head of an Abyssinian army)[1] কিন্তু আবিসিনিয়া মক্কায় সেনা পাঠাতে অসম্মত হয়। ব্যর্থ হল চক্রান্ত।

মদিনায় মহম্মদের মুষ্টিমেয় অনুচর ছিল। এই নব মুসলমানের দল ইসলামে তাঁদের নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। দেবতার বিগ্রহ কুকুরের গলায় বেঁধে জলে ডুবিয়ে দিত। পূর্বে যা ছিল উপাস্য—তাকে মাটিতে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিত। নির্বিচারে ভেঙে দিত দেবতার মূর্তি। (once Islam had begun to spread in Yathrib (Medina) the younger converts burned to give some exhibition of their zeal. Idols were attached to dogs and sunk in wells and that which was too much honoured beforehand was eagerly trampled in the dust; in their enthusiasm for the new God the fiery proselytes indulged in a fit of icnoclasm---breaking the heads of idols).[2] মদিনার ধর্মান্তরিত মুসলমান মহম্মদের নির্দেশেই পরিচালিত হত। পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করার জন্য তিনি চরদের (Agents) মাধ্যমে নির্দেশ পাঠাতেন এবং সংবাদ সংগ্রহ করতেন। মক্কা থেকে সদলে মদিনা যাওয়ার জন্য তিনি গোপনে একটি পরিকল্পনাও তৈরি করলেন। মক্কায় এই সময় তাঁর অনুগামীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ জন। মহম্মদ এদের নিয়ে একটি গুপ্ত মন্ত্রণা সভায় মিলিত হলেন। সেখানেই চূড়ান্ত হয় ভবিষ্যৎ কর্মসূচি। কিন্তু ৭০ জনের এই গোপন আলোচনা আর গোপন থাকে না। মক্কাবাসীরা পরদিনই তা জানতে পারেন। মক্কার নেতৃবৃন্দ ছিলেন সম্মানীয় ও সজ্জন কিন্তু কূটনীতিতে অনভিজ্ঞ। মহম্মদের প্রতি তাঁরা ছিলেন সহনশীল। চরম দুঃসময়েও তাঁর সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করেননি। Margoliouth মন্তব্য করেন—মক্কায় যদি দূরদর্শী ও সাহসী একজন নেতাও থাকতেন—এবং তিনি দায়িত্ব নিয়ে মহম্মদের মোকাবিলা করতে পারতেন তবে সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ইসলাম নয় পৌত্তলিক ধর্মের অবিসংবাদী প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকত।

1. D.S. Margoliouh—Mahammad And The Rise of Islam. P-157, 161-162
2. Ibid, P-202

(Arabia would have remained pagan had there been a man in Mecca who could strike a blow; who would act and be ready to accept responsibility for acting).[1]

আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো ভগবান নেই—There is no God but Allah. জাতীয় ধর্মের বিরোধী এই তত্ত্ব প্রচার করতে গিয়ে মহম্মদ একাধিকবার জনরোষে পড়েছেন। কিন্তু কুরেশীয় নেতৃবৃন্দ তাঁকে রক্ষা করেছেন। (...he was mobbed by the fanatical populace, his sufferings being witnessed by some of his Kurashite opponents, who, however, as usual,. treated him with generosity).[2] এই সহৃদয়তাই মক্কার নেতৃবৃন্দের পরাজয়ের মূল কারণ। বদরের রণক্ষেত্রে মক্কার সেনাবাহিনী দেখল তাঁদের অনেক আত্মীয় বিপক্ষদলে—মহম্মদের পক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এই দৃশ্যই মক্কার সৈন্যদের মনোবল ও উদ্যম নষ্ট করে। আত্মীয় বিনাশে তাঁদের তীব্র ঘৃণা ও অনীহা। মহম্মদের অবশ্য এরূপ নীতিবোধ বা স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক দুর্বলতা ছিল না। পয়গম্বরের অন্যতম জীবনীকার যথার্থই বলেছেন- —'এক পক্ষে (মক্কাবাসীর) স্বজাতি বধে ঘৃণা ও অনীহা—অন্যপক্ষে একান্ত আগ্রহ বদর যুদ্ধে মুসলমানের জয়ের প্রধান কারণ।' (But it is likely that the point on which Sir Willium Muir insists, the horror of shedding kindred blood on the one side, with the desire to shed it which prevailed on the other side, was after all the leading factor in deciding the battle in favour of the Moslems).[3]

স্বজাতিপ্রীতি বা রক্তের সম্পর্ক অপেক্ষা ধর্মের বন্ধনই ছিল মহম্মদের নিকট প্রধান বিবেচ্য। পিতা-পুত্রের সম্পর্কও নির্ধারিত হবে ধর্মের বিচারে। অ-মুসলমান পিতাকে হত্যা করা ধর্মান্তরিত মুসলমান পুত্রের ধর্মীয় কর্তব্য। জনৈক মুসলমান যুবক তাকে জানায় যে তার পিতা পয়গম্বর সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করায় সে পিতাকে হত্যা করেছে। মহম্মদ পিতৃহত্যা অনুমোদন করে ঘোষণা করেন কেউ যেন তাঁর অবিশ্বাসী মৃত পিতার আত্মার শান্তি কামনা করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা না করে। (...he expressly forbade men to pray for the souls of their unbelieving fathers).[4] মহম্মদের প্রিয় অনুচর আবু বকর আপন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তার পুত্র তখনও স্ব-ধর্ম ত্যাগ করেনি। সে তার পিতাকে বলছে-

1. Ibid, P-207
2. Ibid, P-179
3. Ibid, P-265
4. Ibid, P-265

—'বদর যুদ্ধে সুযোগ পেয়েও আপনাকে হত্যা করিনি। উত্তরে পিতা আবু বকর বলে- —সুযোগ পেলে সে তাকে হত্যা করত। এই যুদ্ধে আল-যারা (Al-Jarrah) ছিল মক্কার পক্ষে। পুত্র আবু-উবাইদ (Abu-ubaidah) মহম্মদের দলে। যুদ্ধে সে পিতাকে হত্যা করে।

মক্কার নেতৃবৃন্দ এতদিন পর্যন্ত জ্ঞাতিত্ব, অহিংসা ও শান্তির নামে প্রকৃতপক্ষে কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু মহম্মদের গোপন মন্ত্রণা সভার সিদ্ধান্ত জানতে পেরে তাঁরা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। তাঁরা স্থির করেন যে, তাঁদের ধর্ম ও সভ্যতার ওপর বিধর্মীর আক্রমণ আর সহ্য করা হবে না। মহম্মদকে চরম শাস্তি দেওয়া হবে। তাঁদের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন আবু বকরের পুত্র আবদাল্লা। যথারীতি মহম্মদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যায়। মহম্মদ আবু বকরের ঘরেই ছিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ভোর রাতেই আবু বকরের ঘরে হানা দেওয়া হয়। মহম্মদ পেছনের জানালা টপকে পালিয়ে যান। তাঁর বিছানায় পাওয়া গেল জামাতা আলিকে। কিন্তু কুরেশী আক্রমণকারীরা ছিল মধ্যযুগীয় নাইটের ন্যায় বীরত্ব ও শৌর্যের পূজারী। জামাতা আলিকে "প্রতিভূ" রূপে আটক করলে মহম্মদ ধরা দিতে বাধ্য হতেন। কিন্তু তা হত বীরধর্ম ও শিষ্টাচার বিরোধী। তাই তাঁরা ফিরে গেলেন। মক্কার দক্ষিণে থউর (Thaur) পাহাড়ের এক গুহায় কয়েকদিন আত্মগোপন করে মহম্মদ পাড়ি দিলেন মদিনায়।

মদিনায় এসে দেশত্যাগী অনুচরদের নিয়ে মহম্মদ প্রথম কয়েক মাস ভালোই ছিলেন। কিন্তু তারপরই দেখা দিল সমস্যা। এত লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠল। মহম্মদের সঞ্চিত সম্পদও প্রায় শেষ। যদি ইহকাল বা পরকালে শাস্তির ভয় না থাকে তবে জীবিকা অর্জনের সহজ পথ হল দস্যুবৃত্তি।* মহম্মদ এই সহজ পথই বেছে নিলেন। তরুণ বয়সে কাকা আবু তালিব ও খাদিজার Caravan পরিচালনার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। মরুভূমির পথঘাট তাঁর পরিচিত। মক্কার বণিকদের Caravan লুঠ করার দায়িত্ব দেন কাকা হামজা (Hamzah) ও খুড়তুতো ভাই উবাইদাকে (Ubaidah)। কিন্তু তাঁরা দুজনেই ব্যর্থ হন। মহম্মদ এবার নিজেই আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারেননি। উপর্যুপরি ব্যর্থতায় তিনি হলেন বেপরোয়া। পবিত্র মাসেই (পবিত্র মাসে হিংসা ও হত্যা আরবজগতে নিষিদ্ধ ছিল) Caravan আক্রমণের নির্দেশ দেন। অভিযানের সেনাপতি নিযুক্ত হয় খুড়তুতো ভাই আবদাল্লা। চারজন রক্ষী সহ একটি Caravan তাঁরা লুঠ করে নিয়ে আসে। এই চারজনের মধ্যে একজন পালিয়ে যায়—দুইজনকে বন্দি ও একজনকে হত্যা করা হয়। এ প্রসঙ্গে Margoliouth-এর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য ঃ আল্লা ও তাঁর পয়গম্বরের নামে

* ইসলামে অ-মুসলমান হত্যা ও তাঁদের সম্পত্তি লুঠ করা শুধু বৈধ নয়—এই মহৎ কাজের জন্য জান্নাতে আল্লা দেন মহাপুরস্কার।

যে কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করা হয় অল-হদ্‌রামির পুত্র অমর তাঁদের মধ্যে প্রথম' (Amr, son of Al-Hadrami was the first of the millions to be slaughtered in the name of Allah and his prophet).[1]

ইসলাম ধর্মে জেহাদ হল Exertion in the path of God[2]—আল্লার পথে সংগ্রাম। যাঁরা কাফেরের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, বেহেস্তে আল্লাহ্ তাঁদের দেন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ইসলামের ইতিহাসে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের প্রথম নায়ক স্বয়ং মহম্মদ। তাঁর জীবনীলেখকদের বিবরণী থেকে জানা যায় যে মহম্মদ-ই একমাত্র ধর্মপ্রবর্তক যিনি ৮২টি যুদ্ধ পরিচালনা করেন;এর মধ্যে ২৬টি যুদ্ধে তিনি স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। বাইজানটাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য জয় করার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। কিন্তু মৃত্যু তাঁর সে স্বপ্ন সফল হতে দেয়নি।[3]

মদিনায় ইহুদি জাতি ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অগ্রণী। অর্থনীতিতে তাঁদের অপ্রতিহত প্রাধান্য। মহম্মদ প্রথমেই ইহুদিদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ইহুদিদের অনুকরণ করতেন। মক্কা নয়—জেরুজালেমে ইহুদি মন্দিরের দিকে মুখ করেই নামাজ পাঠ হত। বেশভূষা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানেও ইহুদি প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। তাঁর আশা ছিল ইহুদিদের কাছ থেকে পয়গম্বরের স্বীকৃতি পাবেন। কিন্তু ইহুদিরা শুধু তাঁকে প্রত্যাখ্যানই করেনি তাঁর অজ্ঞতাকে বিদ্রূপ করত। মহম্মদ তাঁদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের রীতি-নীতির পুনর্বিন্যাস করেন। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন—ইহুদিদের নির্মূল না করতে পারলে তাঁর নব ধর্মের সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। দুটি ইহুদি গোষ্ঠী মহম্মদের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে মদিনা ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু Banu Quariza গোষ্ঠী স্বদেশের মায়া কাটাতে পারেনি। বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে তাদের অভিযুক্ত করা হয়। মহম্মদ তাদের অবরোধ করে। ২৫ দিন পর তারা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করে। সকলকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। মহম্মদের জীবনীলেখক William Muir-এর বর্ণনায় ঃ সুন্দরী রিহানা (Rehana) ব্যতীত প্রত্যেককে একটি ঘেরা জায়গায় আবদ্ধ করা হয়। শহরের প্রধান বাজারে হতভাগ্যদের জন্য খোঁড়া হল বিশাল পরিখা বা কবর। অতঃপর মহম্মদের আদেশে বন্দিদের ৫/৬ জনের এক একটি দলকে পরিখার কাছে আনা হল। তাঁরা পরিখার পাড়ে হাঁটু মুড়ে বসল। তারপর তরবারির এক এক আঘাতে তাঁদের ছিন্ন শির লুটিয়ে পড়ল। এইভাবে সকলকে হত্যা করা হল। তৃপ্ত হল মহম্মদের প্রতিহিংসা। ৮০০ বন্দির রক্তে প্লাবিত হল বধ্যভূমি। মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল সেই গণ কবর। অতঃপর লাবণ্যময়ী নারীর

1. Ibid, P-245
2. J.N. Sarkar—History of Aurangzib—Vol.III, P-168
3. The Calcutta Quran petition, P-31

কোমল বাহুবেষ্টনে চরম আনন্দ পেতে মহম্মদ রিহানাকে নিয়ে স্থান ত্যাগ করেন। রিহানার স্বামী ও সকল আত্মীয়কে ক্ষণকাল পূর্বেই হত্যা করা হয়েছে। "The captives were dragged", writes William Muir, "roughly along; one alone was treated with tenderness and care—it was Rihana, the beautiful Jewess set apart for Mahamet. The men were penned up in a closed Yard, while graves or trenches were being dug for them in the chief market place of the city. When these were ready, Mahamet, himself a spectator of the tragedy, gave command that the captives should be brought forth in companies of five or six at a time. Each company was made to sit down by the brink of the trench destined for its grave and there beheaded. Party by party they were led out and butchered, till the whole were slain" ...."Having sated his revenge", Muir continues, and drenched the market place with the blood of eight hundred victims', and having given command for earth to be smoothed over their remains, Mahomet returned from the horried spectacle to solace himself with the charms of Rihana, whose husband and all whose male relatives had just perished in the massacre...)[1]

কাফের বা অ-মুসলমানদের প্রতি ইসলামের বাণী—Either Islam or Death. হয় ইসলাম গ্রহণ কর—নতুবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। মহম্মদ-ই প্রথম পরাজিত ইহুদিদের ওপর এই নীতির সার্থক প্রয়োগ করেন। তিনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৮০০ ইহুদিদের বলেন যে তারা যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তবে তাদের দণ্ড মকুব করা হবে। আশ্চর্যের বিষয় দুই-একজন বাদে কেউ-ই এই সুযোগ গ্রহণ করেনি। এমনকি রিহানাও ধর্মত্যাগ করে মহম্মদকে বিবাহ্ করেনি। স্বধর্মে অবিচল থেকে পয়গম্বরের উপপত্নী বা রক্ষিতা পরিচয় নিয়েই তাঁর হারেমে জীবন অতিবাহিত করেছে (Prophet indeed offered them one more alternative—to accept Islam----It seems surprising that so very few of the conquered availed themselves of this escape. Even a woman, Rihana whom Mahammed made his slave concubine, long preferred concubinage as a jewess to wifedom as a Moslem)[2]।

1. William Muir, Life of Mohomet, London, 1861. Vol—III, P-276-279
   Quoted from The Calcutta Koran Petition, P-27
   A. Ghosh—The Koran And The Kafir, P-118
2. D. S. Margoliouth—Mahammed And the Rise of Islam, P-334

মহম্মদ ক্রমশই ন্যায়-নীতি ও যুক্তিবাদকে বর্জন করে শক্তিমত্ততাকেই মূল সূত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইহুদি বানু কুরেইজা গোষ্ঠীকে সমূলে ধ্বংস করার পর এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত হয়। (...The Change from a basis of reason to a basis of force had taken place gradually, but now was finally achieved).[1]

মদিনায় একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে মহম্মদ মক্কা অভিযানের পরিকল্পনা করেন। ৬৩০ খ্রিঃ ১০০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হন। মার জারানে (Marr Zahran) একটি পর্যবেক্ষণকারী দলের সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর সাক্ষাৎ হয়। এই দলের নেতা ছিলেন মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব খাদিজার ভ্রাতুষ্পুত্র আবু সুফাইন (Abu Sufyan). মহম্মদের কাকা আব্বাস (যিনি মক্কাবাসী হয়েও ছিলেন মহম্মদের গুপ্তচর) তাঁকে বলেন- —মক্কার পতন অনিবার্য। যদিও তিনি মহম্মদকে ভণ্ড, প্রতারক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন—এখন সময় আছে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তিনি নিজের এবং অসংখ্য মক্কাবাসীর প্রাণ রক্ষা করতে পারেন। (Abu Sufyan was told by Abbas that it was not too late for him to save his head by a profession of faith in the mission of the man whom it had been the object of his life to prove an imposter : and that such an example might save many lives, seeing that Mecca must in any case fall).[2]

সব দিক বিবেচনা করে লোকক্ষয় এড়াতে এই অপমানজনক প্রস্তাব তিনি মেনে নেন। ফিরে যান মক্কা। আত্মসমর্পণের জন্য মক্কার মহিলারা পর্যন্ত তাঁকে তিরস্কার করে। অন্তর্ঘাত ও কূটকৌশলের দ্বারা মহম্মদ মক্কায় বিভেদ সৃষ্টি ও জনগণের মনোবল ভেঙে দিতে সমর্থ হন। যা হোক, সাফান, সুহেইন ও আবু জাল মক্কার অদূরে খান্দাময় (Khandamah) মহম্মদকে বাধা দেন। মহম্মদের সেনাপতি খালিদের নিকট তাঁরা হন পরাজিত। বিজয় গর্বে মহম্মদ মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁর আদেশে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় কাবা মন্দিরের সকল দেবমূর্তি (তিন শতাধিক), খালিদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় মক্কা ও প্রতিবেশী অঞ্চলের সকল দেবমন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করার (Khalid was employed to destroy other idols and sacred houses in the neighbourhood).[3]

মহম্মদের দাম্পত্য জীবন

মহম্মদের দাম্পত্য জীবনও ছিল বর্ণাঢ্য। তাঁর জীবনীকার D.S. Margoliouth-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, তরুণ মহম্মদ কাকা আবু তালিবের কন্যা উম হানির

1. Ibid, P-335
2. Ibid, P-385
3. Ibid, P-391

(Umm Hani) পাণি প্রার্থনা করে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি ধনী বিধবা খাদিজার প্রণয়াসক্ত হন। মহম্মদ ছিলেন খাদিজার বাড়ির কর্মচারী, ক্যারাভানের (Caravan) তত্ত্বাবধায়ক। খাদিজার বয়স ৪০—মহম্মদের ২৪। প্রণয় পরিণত হয় পরিণয়ে। মহম্মদ খাদিজার তৃতীয় পতি। পূর্ব স্বামীদের ঔরসজাত সন্তানরা খাদিজার সঙ্গেই ছিল। মহম্মদের ঔরসেও তাঁর গর্ভে চার কন্যা ও এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়। একমাত্র পুত্র শৈশবে মারা গেলে তিনি জায়েদকে (Zaid) দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। প্রথমা পত্নী খাদিজা ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না। মহম্মদের অসংখ্য পত্নী ও উপপত্নী ছিল। কিন্তু খাদিজার জীবিতাবস্থায় বহুবিবাহ করার অদম্য বাসনা তিনি দমন করে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। অনেকের মতে মহম্মদ যে সংযম দেখিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। অবশ্য খাদিজার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যেই তিনি বিবাহ করেন জামার (Zamah) কন্যা সৌদাকে (Saudah)। বাক্‌দান করেন প্রিয় অনুচর আবু বকরের সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা আয়েষাকে। যদিও আয়েষা ছিল মুতিমের (Mutim) পুত্রের বাক্‌দত্তা। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মতে প্রবল লালসার তৃপ্তির জন্যই খাদিজার মৃত্যুর পর মহম্মদ বহুবিবাহ করেন। (Mahammed's numerous marriage after Khadijah's death have been attributed by many European Writers to gross passion...).[1]

নবাব বাদশাহদের ন্যায় মহম্মদের ইচ্ছা ছিল যে তাঁর থাকবে একটি হারেম। সেখানে পায়ে মল বাজিয়ে ঘুরে বেড়াবে পরীর মতো সুন্দরী এক ঝাঁক বেগম। কিন্তু প্রধান অন্তরায় ছিল খাদিজা। তাঁর মৃত্যুতে সে বাধা দূর হয়। খাদিজার মৃত্যুকালে মহম্মদের বয়স ছিল ৪৯। তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন ৬৩ বছর বয়সে। এই স্বল্প সময়ে তিনি ১৩টি বিবাহ করেন। তাঁর ১১ জন স্ত্রীর নাম নীচে দেওয়া হল।[2]

খাদিজা বিবি (Khadija Bibi)
সৌদা বিবি (Sauda Bibi)
আয়েষা বিবি (Ayesha Bibi)
হাফনা বিবি (Hafna Bibi)
উম্মে-হাবিবা বিবি (Umme-Habiba Bibi)
উম্মে-সলমা বিবি (Umme Salma Bibi)
সফিয়া বিবি (Sofia Bibi)
মজুমানা বিবি (Mayumana Bibi)
জয়নাব-বিন্ট-জাস বিবি (Zainab Bint-Jahsh Bibi)

1. D. S. Margoliouth—Mahammed And the Rise of Islam, P-176
2. A. Ghosh—The Koran and The Kafir, P-117

জয়নাব-বিন্ট-খুজানা বিবি (Zainab-Bint-Khuzymah Bibi)

জুডিয়া বিবি (Zudia Bibi)

১৩ জন বিবাহিত স্ত্রী ছাড়াও ছিল বহু উপপত্নী বা রক্ষিতা। ছিল শতাধিক ক্রীতদাসী, যাঁদের সঙ্গে ছিল তাঁর অবাধ দৈহিক সম্পর্ক। আরও অনেক সুন্দরী নারীকে (পরাজিত শত্রুর স্ত্রী/কন্যা) মহম্মদের হারেমে আনা হয়েছিল। কিন্তু সপত্নীদের গঞ্জনা ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারায় অল্পকালের মধ্যেই তাঁদের বিদায় নিতে হয়েছে। জয়ের সঙ্গে আসে খ্যাতি। মক্কা অধিকারের পর বহু নারীই পয়গম্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সামান্য দাম্পত্য কলহের অজুহাতে তারা পতিগৃহ ত্যাগ করে মহম্মদের আশ্রয়ে চলে আসে...। মহম্মদের এই চারিত্রিক দুর্বলতার কাহিনি ক্রমশ সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। তখন অনেকেই (আনুকূল্য বা অন্যায় সুযোগ লাভের জন্য) তাঁদের স্ত্রী বা কন্যাকে মহম্মদকে উপহার দেয়। পরিস্থিতি এমন হল যে মদিনায় কোন নারী বিধবা হলে তাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়ার পূর্বে মহম্মদের মতামত নেওয়া হত যে তিনি সেই নারীকে কামনা করেন কিনা। (A certain number of Meccan ladies were, as might be expected, moved by the fame which the prophet had now acquired, to desire to join him in his place of refuge, sometimes, perhaps in a fit of vexation after a conjugal dispute...At a later time, when the prophet's weakness was generally known,...the husbands of fair and fruitful women offered to hand them over to the prophet; and indeed at Medinah, whenever a woman became a widow, her relations would not find her a husband before asking whether the prophet wanted her).[1]

কামনা-বাসনার এই হল স্বাভাবিক পরিণতি। দৈহিক কামনা-বাসনার কখনও নিবৃত্তি হয় না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় কামনা তৃপ্তির নব নব উপকরণ কামাগ্নিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে মাত্র। William Muir বলেন ঃ বহুবিবাহও মহম্মদের লালসাকে হারেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং হারেমের বিচিত্র ও বহুমুখী আকর্ষণে তার সংযম শিথিল হয়েছে। নব নব সুন্দরী বরবর্ণিনীদের জন্য তাঁর অতৃপ্ত লালসা হয়েছে উদ্দীপিত। (The numerous marriages of Mahomet failed to confine his inclinations within the ample circuit of his harem. Rather, its multiplied attraction weakened restraint, and stimulated desire after new and varied charms.)[2]। রূঢ় সত্য প্রকাশে বিশ্বাসীদের (মুসলমান) ভাবাবেগ আহত হয়।

1. D. S. Margoliouth—Mahammed And the Rise of Islam, P-151-352.
2. Rafiq Zakaria—Muhammed And the Quran, P-43

আহত হন রফিক জাকারিয়া। নিষ্ঠাবান মুসলমান, ইসলামের ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ (M.P.) জাকারিয়া, মহম্মদের বহু বিবাহের পটভূমি ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ লালসার তৃপ্তি নয়;..সামাজিক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অথবা (অসহায় পতিহারা নারীর জন্য) মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই মহানবী বহু নারীর পাণিগ্রহণ করেছেন। (From these accounts it can be seen that none of the Prophet's marriage was for carnal pleasure...the marriages of the Prophet were contracted for social or political purposes or on humanitarian grounds to further the cause which was closest to his heart.)[1]

আল্লাহর রসুলের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য ও ভক্তির স্থান যুক্তির উর্ধ্বে। প্রথমা পত্নী খাদিজার মৃত্যু হয় ৬৫ বৎসর বয়সে—মহম্মদের বয়স তখন ৪৯। খাদিজার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন। ৬৩ বৎসর পর্যন্ত মহম্মদ ছিলেন এই মর্তলোকে; এবং মাত্র ১৪ বৎসরের মধ্যে তিনি ১৩ জন নারীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রথমা পত্নী খাদিজার জীবিতাবস্থায় মহম্মদের হারেমে কোন পরনারীর প্রবেশাধিকার ছিল না। তখন কি কোন সামাজিক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন দেখা দেয়নি? অথবা স্বামীহারা কোন তরুণীর জন্য মহম্মদের কোমল হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়নি?

মহম্মদের জীবনে আরেকটি স্মরণীয় ঘটনা হল—পুত্রবধূ জয়নাবকে বিয়ে করা। বহু বৎসর পূর্বেই মহম্মদ হরিথার (Harithah) পুত্র জায়েদকে দত্তক নেন। তৎকালীন আরব সমাজে ঔরসজাত ও দত্তক পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করা হত না। মহম্মদ জায়েদের সঙ্গে তাঁর ভগিনী সম্পর্কীয় (cousin) জয়নাবের বিয়ে দেন। মনে হয় জয়নাবের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। একদিন "স্বল্পবাস জয়নাবের শিথিল বরতনু" দেখে মহম্মদ তাঁর প্রতি আসক্ত হন। মীনকেতনের পুষ্পবাণে তখন তিনি প্রেমোন্মাদ। হয়তো গোপনে চলতে থাকে প্রণয়লীলা। কিন্তু এই গোপন লীলা জায়েদের কাছেও আর গোপন থাকে না। কিন্তু সে অসহায়। পিতা তাঁর স্ত্রীর রূপমুগ্ধ-প্রণয়াসক্ত। তাঁর আর কি-ই বা করার আছে? নিরুপায় জায়েদ জয়নাবকে ত্যাগ করতে সম্মত হয়। কিন্তু বাধ সাধে জয়নাব। ঐশী অনুমোদন ব্যতীত সে মহম্মদকে বিবাহ করতে সম্মত হয় না। অতঃপর কোরানে সংযোজিত হল আর একটি বাণী। অনুরূপ অবস্থায় তালাক এবং পুনর্বিবাহ বিধিসম্মত।* জায়েদ স্ত্রীকে তালাক দেয়; পিতা পয়গম্বর মহম্মদ তাকে

---

1. Ibid, P-53-54.

---

* কোরানে এরকম বহু নিদর্শন আছে, মহম্মদ কোনও কাজ করবেন—অথবা করে ফেলেছেন—যা প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি বা আইন অনুমোদন করে না। সেক্ষেত্রে মহম্মদের মুখ দিয়ে তাঁর অনুচরদের নিকট খোদার প্রত্যাদেশ প্রকাশিত হত ইতিপূর্বে সংঘটিত অথবা পরিকল্পিত কোনো বিশেষ কাজের সমর্থনে। গবেষকরা বলতে পারবেন—ইসলাম ধর্মে হয়তো এইটিই প্রথম তালাক; এবং মহম্মদের জন্যই তা প্রচলিত হয়েছে।

বিবাহ করেন। কোরানের নির্দেশ সত্ত্বেও এই কলঙ্কিত বিবাহ—তাঁর অনুচর ও সমগ্র আরবে সৃষ্টি করে তুমুল আলোড়ন। মহম্মদের নিন্দায়-ধিক্কারে সকলে মুখর। মহম্মদ কৌশলে এই বিরূপ সমালোচনা বন্ধের উদ্দেশ্যে জাঁকজমকপূর্ণ ভুরিভোজনে (Marriage feast with special luxary) সকলকে আপ্যায়িত করেন। পূর্বে এই জাতীয় ভোজসভায় অতিথিদের দেওয়া হত খেজুর ও ঘোলের শরবত। কিন্তু এবারের অনুষ্ঠানে প্রধান ছিল রুটি ও মাংস। এতৎসত্ত্বেও কিন্তু সমালোচনার কণ্ঠ রোধ করা যায়নি। যাঁরা দত্তকপুত্র ও ঔরসজাত পুত্রের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করেন না, তাঁদের কাছে এ কাজ হল অজাচার। (Zainab, daughter of Jhash was initially married to his adopted son Zayed. But once the prophet beheld in a loose undress, the beauty of Zainab, and burst froth into an ejaculation of devotion and desire.)[1] ...But ('Zainab refused to assent to this step without a special revelation, which speedily was produced, zaid therefore, divorced Zainab, who was married by the prophet, who foresaw that this act would give rise to grave scandal, but gave the usual marriage feast, and, indeed with special luxary, his followers being entertained with bread and mutton, whereas, on other similar occasions they had to be content with dates and whey. This liberality did not prevent severe comments from those who regarded adopted sonship as real sonship...and therefore regarded this union as incestuous').[2]

পুত্রবধূকে বিবাহ করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই আরবদের মধ্যে মহম্মদের বিরুদ্ধে প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে প্রায় সকল ঐতিহাসিক ও বিদগ্ধজনেরা এইজন্য মহম্মদের তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু রফিক জাকারিয়ার দৃষ্টিতে এক্ষেত্রেও মহানবী নির্দোষ। তাঁর রচনায় কাহিনীটি এইরূপ ঃ

সামাজিক পদমর্যাদায় বৈষম্য হেতু জায়েদের সঙ্গে বিবাহে জয়নাব সুখী হয়নি। সে জায়েদকে ঘৃণা করত—করত চরম দুর্ব্যবহার। জায়েদ প্রায়ই জয়নাবের বিরুদ্ধে মহম্মদের নিকট অভিযোগ করে—মহম্মদ তাকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন। জয়নাব তার দুরবস্থার জন্য মহম্মদকেই দায়ী করে এবং বিবাহ করার জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করে। জয়নাবের ঔদ্ধত্য ও রূঢ় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ জায়েদ একদিন তাকে তালাক দেয়। জয়নাবের আত্মীয়রা তাকে বিবাহের জন্য মহম্মদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। মহানবী

1. A. Ghosh—The Koran and The Kafir, P-117.
2. D. S. Margoliuth—Mohammed and the Rise of Islam, P-320-321.

অসম্মত হন—তিনি বলেন ইহা তাঁর পক্ষে অকল্পনীয়...কারণ সে তাঁর পুত্রবধূ। তখন নেমে আসে আকাশ (আল্লার) বাণী—'দত্তক পুত্র ঔরসজাত পুত্রের সঙ্গে তুলনীয় নয়।' আল্লাহর আদেশ শিরোধার্য করেই পয়গম্বর হজরত মহম্মদ জয়নাবকে বিবাহ্ করেন। (...that Zainab was not happy with her marriage to Zaid because of the disparity in their social status. ...looked down upon him and treated him shabbily. Zaid often complained to the prophet about her behaviour but the Prophet always cautioned patience. Zainab held the Prophet responsible for her humiliation and pleaded with him that he should marry her...So incensed was Zaid with her overbearing manner, that one day in a fit of temper he divorced her. Zainab's relatives pressed the Prophet to marry her. Muhammad did not agree saying it was unthinkable for him to do so. She was the wife of his son... It was then that a revelation came, clarifying the position that an adopted son cannot be a son : filial affiliation has to be natural. Muhammad was thus given permission by Allah to marry Zainab.)[1] অতএব জাকারিয়ার মতে মহম্মদকে দায়ী করা যায় না।

রফিক জাকারিয়া বলেন ঃ 'যে পরম্পরাগত সমসাময়িক প্রচলিত কাহিনির (tradition) ওপর ভিত্তি করে জয়নাবের তালাকের জন্য মহম্মদকে অভিযুক্ত করা হয়-—তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। এই কাহিনী অনুযায়ী, একদিন মহম্মদ সহসা জয়নাবের গৃহে উপস্থিত হন। গৃহে একাকিনী মদন বাণে জর্জরিতা জয়নাবের বর-তনুর অনাবৃত সৌন্দর্য দেখে তিনি এতই মোহিত হন যে, নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন। সেই দিন থেকেই তিনি জয়নাবের প্রেমে উন্মাদ। (The charge that the Prophet was responsible for the divorce is based on a patently unreliable tradition. According to this, the Prophet went to Zaid's house one day, unannounced and found Zainab on her own. The Prophet was so bewitched by her beauty that he was unable to restarian himself and abruptly left Zaid's house. Since that time he is said to have wanted to marry her.)[2] জাকারিয়া সাহেবের মতে মহানবীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্যের অপলাপ মাত্র। কারণ, জয়নাব মহম্মদের অপরিচিত

1. Rafiq Zakaria—Muhammad And the Quran, P-49-50.
2. Ibid, P-49

ছিলেন না—তিনি ছিলেন সম্পর্কে তাঁর ভগিনী, বাল্যকাল থেকেই পরিচিত। তার প্রথম স্বামীর মৃত্যু হলে তিনি তাকে পুনরায় পাত্রস্থ করেন। মহম্মদ যদি প্রকৃতই জয়নাবের রূপ-মুগ্ধ হতেন তবে জায়েদের সঙ্গে তার বিবাহ দিতেন না। (But nothing could be further from the truth. Zainab was no stranger to Muhammad; she was his cousin and he had known her since childhood. It was because of the loss of her first husband that he was keen to rehabilitate her. Had he been so attracted by her beauty, he would not have arranged her marriage with Zaid).[1]

মহম্মদের সমর্থনে জাকারিয়া জোরালো সওয়াল করেছেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের প্রধান ত্রুটি হল—

(ক) মহম্মদ-জয়নাব সম্পর্কিত পরম্পরাগত প্রচলিত কাহিনি কেন নির্ভরযোগ্য নয়--সে সম্বন্ধে কোনো কারণ দর্শানো হয়নি। চিরাচরিত বিশ্বাস, পরম্পরাগত কাহিনির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

(খ) জাকারিয়া মনে করেন, সম্পর্কে ভগিনী জয়নাবকে মহম্মদ ইচ্ছে করলে নিজেই বিবাহ করতে পারতেন; সেজন্য জায়েদের সঙ্গে বিবাহ ও তালাকের প্রয়োজন ছিল না। পূর্বেই আমরা দেখেছি, প্রথম পত্নী খাদিজার মৃত্যুর পূর্বে কোনো দ্বিতীয় নারীকে বিবাহ করার দুঃসাহস মহম্মদের ছিল না। এক্ষেত্রেও মহম্মদ-জয়নাবের প্রধান অন্তরায় হতেন খাদিজা।

(গ) জাকারিয়ার বিবরণে দেখা যায় যে, মহম্মদের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু জয়নাবের আত্মীয়দের চাপে পড়েই (অন্য কোনো গ্রন্থে উল্লেখ নেই) তিনি বিবাহ করতে বাধ্য হন। প্রশ্ন হল, এরকম অসঙ্গত ও অশালীন প্রস্তাব করার অধিকার জয়নাবের আত্মীয়দের আছে কি? দ্বিতীয়ত সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে মহম্মদ বাধ্য হবেন কেন?

মহম্মদ ছিলেন কোরানের মূর্তিমান প্রকাশ। In the Quran, Allah speaks through Muhammad; in the Sunnah, He acts through him. লোক (মুসলমান) শিক্ষার জন্য তিনি কোরানের মূল বিধানগুলিকে নিজের জীবনেই বাস্তবায়িত করেন। মহম্মদ মুসলিম জাতির আদর্শ পুরুষ। ভারত আক্রমণকারী সকল মুসলমান, নবাব-বাদশাগণ ও সাধারণ মুসলমানও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত।

---

1 Ibid, P-49

মুসলমানের ভারত বিজয়

দাবি করা হয় ভেদাভেদে দীর্ণ অন্যায়, অসাম্য অবিচারে অশান্ত বিক্ষুব্ধ এ পৃথিবীতে সাম্য-সৌভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠাই ইসলাম ধর্মের মহৎ লক্ষ্য। ইসলানের এই মহান বাণী বিশ্বমানবের নিকট পৌঁছে দিতেই মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়। এক হাতে কোরান অন্য হাতে তরবারি নিয়ে তারা জয় করে সিরিয়া ও মিশর। অতঃপর মুসলিম শক্তি সাম্রাজ্য বিস্তারে দ্বি-মুখী অভিযান করে। এক বাহিনী উঃ আফ্রিকা জয় করে জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে ৭১৩ খ্রিঃ ইউরোপ অভিযান করে। স্পেনে স্থাপিত হয় মুসলিম রাজত্ব; অধিকার করে ফ্রান্সের কিয়দংশ। অন্য বাহিনী পারস্য জয় করে মধ্য এশিয়া ও ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে মুসলিম শক্তি প্রথম আঘাত হানে।

সেই সময় ভারতের পশ্চিম সীমান্তে তিনটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল; যথা—কাবুল, জাবুল ও সিন্ধু। বর্তমান কান্দাহার প্রদেশকে বলা হত জাবুল বা জাবুলিস্তান; কাবুলকে কাবুলিস্তান—উত্তরে যার সীমা বামিয়ান অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনটি রাজ্যের মধ্যে Sind বা সিন্ধুই ছিল বৃহত্তম। উত্তরে পাঞ্জাব, পশ্চিমে বোলান গিরিপথ পর্যন্ত ছিল এই রাজ্যের বিস্তার; উপকূলবর্তী মাকরান (Makran) ও পার্বত্য রাজ্য কিক্কানা (Kikkana) সিন্ধু রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীনকালে গান্ধার প্রদেশ (বর্তমান আফগানিস্তান) এবং তার পশ্চিমে কম্বোজ রাজ্যও ছিল ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমসাময়িক আরব ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য অনুযায়ী এই তিনটি রাজ্যই আরব অভিযানের সময় ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল।

মহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু জয়ের কাহিনির সঙ্গে ইতিহাসের সকল পাঠক পরিচিত। এরূপ ধারণা খুবই স্বাভাবিক যে, পিরিনিজ থেকে পামির পর্যন্ত সুবিশাল ভূ-ভাগ যে বিজয়োন্মত্ত আরব বাহিনীর পদভারে কম্পিত—তাদের পক্ষে সিন্ধু জয় ছিল অতি নগণ্য ঘটনা। তারা যেন প্রায় বিনাযুদ্ধেই সিন্ধু অধিকার করেছিল। কিন্তু তা নয়—সিন্ধু জয় দিয়ে আরবের ভারত বিজয় শুরু হয়নি। বরং বলা চলে সুদীর্ঘ ও উপর্যুপরি ব্যর্থতার সফল পরিণতি ছিল সিন্ধু বিজয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল মুসলিম বাহিনীর হাতে ভারতের পরাজয় সবিস্তারে লেখা আছে। কিন্তু দুইশত বৎসর

ভারতবাসী সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে পশ্চিম সীমান্তে আরব আক্রমণ প্রতিহত করেছে,—সেই গৌরবময় গাথা রয়েছে উপেক্ষিত।

পশ্চিম থেকে এই অঞ্চলে প্রবেশের মাত্র চারটি পথ ছিল। সমুদ্র পথে, খাইবার ও বোলান গিরিপথ এবং মাকরান উপকূল। আরব বাহিনী সকল পথেই ভারত আক্রমণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে একাধিক নৌ-অভিযান। কিক্কানার সাহসী জাঠ (Jaths of Kekkan) সম্প্রদায় কর্তৃক সুরক্ষিত ছিল বোলান গিরিপথ। আরও উত্তরে কাবুলিস্তান ও জাবুলিস্তানের সৈন্যবাহিনীর অতন্দ্র প্রহরায় দুর্ভেদ্য ছিল খাইবার গিরিপথ। স্থলপথে আফগানিস্তান অভিযান ব্যর্থ হলে, খলিফা ওমরের সময়ে (634–643 A.D.) মুসলিম বাহিনী সমুদ্রপথে দেবল আক্রমণ করে। চাচনামার বিবরণ অনুসারে যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়, নিহত হয় তাদের সেনাপতি। পরবর্তী খলিফা আলি (Ali) ভারতের বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান প্রেরণ করেন। (660 A.D.) মুসলিম বাহিনী অল্-কিকান (Al-Kikan বা কিক্কানা—বর্তমান বালুচিস্তান ও তার সংলগ্ন এলাকা) পযন্ত অগ্রসর হয়। যুদ্ধে হিন্দুরা মুসলিম বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত করে। সেনাপতি সহ অধিকাংশ সৈন্য ও সেনানায়কগণ হয় নিহত। এ বিবরণ অল-বালাধুরির। চাচনামার বর্ণনা অনুসারে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধে জয়লাভ করে; কিন্তু খলিফা আলির নিহত হওয়ার সংবাদে ফিরে যায়। মনে হয় এ হল পরাজয়ের অপমান গোপন করার ব্যর্থ প্রয়াস। (During the next caliphate, that of Ali, a great expedition was sent against India ...The people of this country made a brave stand and routed the Muslim Army. The leader of the Muslim host was killed together with all but a few of his soldiers. ...This is the version of al Baladhuri. The Chachnama, on the other hand, relates, that the Muslims obtained a victory at Kikkana, but turned back on hearing of the murder of Ali. This seems to be only a thin pretext for hiding the defeat and disgrace, and the version of al Baladhuri seems to be confirmed by later events.)[1] পরবর্তী ঘটনার বিচারে অল-বালাধুরির অভিমতই সত্য বলে মনে হয়।

সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি মুসলিম শক্তি জয় করে সিজিস্তান (Sijistan) । বিজয়ী মুসলিম বাহিনী কান্দাহারের দঃ পশ্চিমে অবস্থিত বুস্ট (Bust) পর্যন্ত ভারতভূমি দখল করে। সেনাপতি আবদুর-রহমানের সঙ্গে জাবুলিস্তানের রাজার বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়। আবদুর রহমান উমরকে সিজিস্তানের শাসক পদে নিযুক্ত করে স্বদেশে ফিরে যান। কিন্তু

1 R C Majumder–Reading in Political History of India, P-217

বিদ্রোহী জনগণ উমরকে বিতাড়িত করে শাসনক্ষমতা দখল করে। পরবর্তী প্রধান শক্তি সঞ্চয় করে সিজিস্তান পুনরায় অধিকার করে। এরপর আবদুর-রহমান কাবুল আক্রমণ করে। হিন্দুরা বাধা দিলে মুসলিম বাহিনী নগর অবরোধ করে। অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে কয়েকমাস পর তারা নগর প্রাচীরে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়। মুসলমান রাত্রে আক্রমণ করে; সারারাত্রি উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ হয়। কিন্তু হানাদার বাহিনী নগরের প্রবেশ করতে পারে না। সকালে হিন্দুরা পুনরায় প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করে। এই সময় একটি বিশালদেহী রণহস্তী নিহত হয়ে প্রধান ফটকের সামনে পড়ে গেলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, এই সুযোগে মুসলমান নগরে প্রবেশ করে। উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। কিন্তু শীঘ্রই সন্ধি ভঙ্গ হয়। হিন্দু-নৃপতি কাবুল অধিকার করে। Raverty তাঁর "Note on Afganistan and part of Baluchistan"-এ কাবুল জয়ের বিবরণীতে লিখেছেন ঃ আব-দুর-রহমান ৬৬৩-৬৪ খ্রিঃ কাবুল আক্রমণ করেন। কাবুলের শাসক কাবুল শা ("শা"-আরবী শব্দ—অর্থ জন্ম থেকেই "খোঁড়া", তাঁর নাম অন্য অরিজ) সসৈন্যে তাকে বাধা দেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। কাবুল শা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। প্রাচীর বেষ্টিত কাবুল নগরে প্রবেশ করে প্রধান ফটক বন্ধ করে দেন। আব-দুর-রহমান নগরী অবরোধ করেন। এক বৎসর পর দুর্দশাগ্রস্ত রণক্লান্ত হীনবল কাবুল বাহিনী করে আত্মসমর্পণ। মুসলমান নগরীতে প্রবেশ করে সকল পুরুষকে হত্যা করে—বন্দি করা হয় নারী ও শিশুদের। বন্দী হন কাবুল অধিপতি। তাঁর শিরশ্ছেদের আদেশ হয়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে মার্জনা করা হয়। বার্ষিক নির্দিষ্ট করদানে প্রতিশ্রুতি দিলে ফিরে পান হৃতরাজ্য। (Raverty gives a somewhat different account of this conquest of Kabul on P. 62 of his "Note on Afganistan and part of Baluchistan." He writes :

In 43AH (663–664 A.D.) the Arabs invaded the territory of Kabul under Abd-ur-Rahman. Kabul Shah, at that period, was known by the title or name Arij, but this appears to be an Arabic word, and signifies "lameness" from birth. He moved out with his forces to meet the Musalman invaders, and after a severe battle, retired within the walls of Kabul and did not sally out again. Abd-ur-Rahman continued before it for a full year, after which his (Kabul Shah) army having suffered great hardship and fatigue, the place was taken. The fighting men were put to the sword, and the women and children made captives. The Kabul Shah was also taken, and his head was

ordered to be struck off, but he was spared on his agreeing to become a convert to Islam. He was then received into favour, a tribute was fixed, and the Musalmans retired.)[1]

কাবুল জয় করে সেনাপতি আব-দর-রহমান জাবুলিস্তান* অভিমুখে অগ্রসর হন। প্রবল যুদ্ধের পর জাবুলিস্তান আরব অধিকারভুক্ত হয়।

৬৭০ খ্রিঃ আব-দর রহমানকে পদচ্যুত করা হয়, নতুন সেনাপতি নিযুক্ত হন—অর-রবি-ইবন-জিয়াদ। এই পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে হিন্দুরা পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কাবুল ও জাবুলিস্তান থেকে সকল মুসলমানকে বিতাড়িত করা হয়। কাবুলের শাসক র‍্যাটবিল (Ratbil** সম্ভবত শাসকের উপাধি) জাবুলিস্তান অধিকার করে বুস্টের (Bust) কাছে অর-রুখজ অঞ্চল পর্যন্ত বিশাল এলাকা পুনর্দখল করে। কিন্তু আরব সেনাপতি অর-রবির পালটা আক্রমণে র‍্যাটবিল পশ্চাৎ অপসারণ করে। অর-রবি অর-রুখজ ও আদওয়ার (Ad-Dawar) নগরী দখল করে। পরবর্তী সেনাপতি উবেইদল্লার সাথে র‍্যাটবিলের শান্তি চুক্তি হয়। চুক্তির শর্ত সম্পন্ধে শুধু জানা যায় যে, র‍্যাটবিলকে দশ লক্ষ দিরহাম দিতে হয়েছে। কিন্তু এই শান্তি ছিল ক্ষণস্থায়ী। খলিফা এজিদের (Yezid-683 A.D.) সময় কাবুলবাসীরা বিদ্রোহ করে। বন্দি করে শাসনকর্তা আবু-উবেইদ-ইবন-জিয়াদকে। এই সংবাদ পেয়ে সিজিস্তানের শাসক আজিত-ইবন্-জিয়াদ বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হয়। জুনজার (Junzah) নিকটে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রবল যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। আজিদ-ইবন্-জিয়াদ ও তাঁর প্রধান সমরনায়কগণ নিহত হন—অবশিষ্টরা পলায়ন করে। পাঁচ লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে আবু উবেইদকে মুক্তি দেওয়া হয়। (Towards the end of the reign of Caliph Yezid (64 A.H.–683 A.D.), Kabul revolted once more and imprisoned Abu-Ubaidah-ibn-ziyad. Yazid-ibn-ziyad the governor of Sijisthan proceeded against Kabul and a great battle took place at Junzah. But the Muslim army was completely routed. The governor and some distinguished members

* Le Strange সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিকদের লেখার ওপর নির্ভর করে জাবুলিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান এইভাবে নির্ণয় করেছেন ঃ বর্তমান কান্দাহার এবং হেলমুন্ড নদীর উচ্চ-অববাহিকা সংলগ্ন অঞ্চল জাবুলিস্তান নামে খ্যাত ছিল (The highlands of the Kandahar country, along the upper waters of the Helmond were known as Zabulistan.)[2]

** র‍্যাটবিল নামের উচ্চারণ বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন বিচিত্র উচ্চারণ ঃ Ockley–Zentil, Weil–Zenbil, Remaud–Ratbyl and Zenbil, Wilson–Rateil. E. Thomal–Ratbal.

1. Ibid, P-219
2. Ibid, P-220

of the aristocracy lay dead on the field and the rest fled. Abu-Ubaidah had to be ransomed for 500,000 dirhams.)[1]

কাবুল অধিপতি র‍্যাটবিল অতঃপর মুসলমান অধিকৃত সিজিস্তানের অধিবাসীদের বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উৎসাহিত করে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেন। হিন্দুরা আরব শাসককে বিতাড়িত করে। র‍্যাটবিল আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জারা (zarah) হ্রদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হলে পুত্র র‍্যাটবিল ২-য় কাবুলের শাসনভার গ্রহণ করেন। মুসলিম বাহিনী কাবুল আক্রমণ করে। বিনা বাধায় রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে সকল গিরিপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবরুদ্ধ অসহায় মুসলিম সেনাপতি আবদাল্লা সন্ধি করতে বাধ্য হন। খলিফা আবদাল মালিক সন্ধির শর্ত অনুমোদন করেন না, আবদাল্লা পদচ্যুত হন।

৬৯৫ খ্রিঃ অল-হাজ্জাজ (Al-Hajjaj) ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁর সেনাপতি ওবেইদাল্লা (Ubaidallah) কাবুলের বিরুদ্ধে অভিযান করে। এবারেও সীমান্তে বাধা না দিয়ে—মুসলিম বাহিনীকে রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। তারপর বন্ধ করে দেওয়া হয় সকল গিরিপথ। নিশ্চিত পরাজয় ও ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে সহজ শর্তে সন্ধির প্রস্তাব করেন। বাধ সাধে সুরাইয়া-ইবন-হানি-হরিথি (Shuraih-ibn-Hani-Harithi) । তিনি বলেন ঃ 'শুধুমাত্র আল্লাকে ভয় করো। যুদ্ধ না করে তুমি যদি ফিরে যাও—তবে ইসলাম দুর্বল হবে।' অবরুদ্ধ মুসলিম বাহিনী সুরাইয়ার নেতৃত্বে প্রবল আক্রমণ করে। যুদ্ধে সুরাইয়া নিহত হয়। কিন্তু অবরোধ ভেঙে মুসলিম সৈন্য পালাতে সক্ষম হয়। মরুভূমির মধ্য দিয়ে তারা এগিয়ে চলে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, অধিকাংশ মুসলমান সৈন্য মরুভূমিতেই মৃত্যু বরণ করে। মন্দভাগ্য, শোকে দুঃখে ভগ্ন-হৃদয় ও ওবেইদাল্লারও শীঘ্র মৃত্যু হয়। (Shortly after, Al-Hajjaj became governor of Irak (695 A.D.), his general Ubaidallah made an attemp to subdue Kabul. Here, too, his enemy blocked the mountain path and Ratbil soon joined them, Ubaidallah was ready to extricate himself from this difficult position by offering easy terms to his opponents, but Suraih ibn–Hani al-Harithi dissuaded him from this course, saying 'Fear Allah and fight this people, for if thou doest what thou art about to do, thou wilt weaken Islam on this frontier'. So 'a battle ensued and Suraih made a charge, but was killed. The army fought their way out, although hard pressed, and made in their way along

1. Ibid, P-221

the desert of Boost. Many of the men perished of thirst and hunger, and Ubaidallah died of grief for what he had brought upon his men and the fate that had overtaken them.)[1]

মুসলিম সেনাবাহিনীর এই জাতীয় বিপর্যয়ে ইসলামিক দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অল-বালাধুরিতে এই পরাজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কিন্তু Elliot অন্য সূত্র (Tarikh-i-Alfi) উদ্ধৃত করে বলেন ঃ 'র‍্যানবলের সৈন্যরা পলায়মান মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে; অবরোধ করে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। মুসলিম বাহিনী অবরুদ্ধ—অনাহারে মৃত্যু অবধারিত। এই অবস্থায় সাত লক্ষ দিরহাম মুক্তিপণ দিলে—তাদের যেতে দেওয়া হয়। (Ranbal retiring before his assailant, detached troops to their rear, and blocking up the defiles, entirely intercepted their retreat, and in this situation, exposed to the danger of perishing by famine, "Abdulla was compelled to purchase the liberation of himself and followers for a ransom of seven hundred thousand dirhams"—Elliot Vol.II. P-416)[2] এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে সর্বাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত Peacock army নামে এক বিশাল বাহিনী গঠিত হয়। আবদুর-রহমান-ইবন-মহম্মদ নিযুক্ত হন প্রধান সেনাপতি। ৬৯৯ খ্রিঃ আবদুর-রহমান র‍্যাটবিলের রাজ্য আক্রমণ করে। র‍্যাটবিল সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুর্গম অঞ্চলে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে মুসলিম বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় আবদুর-রহমান বিস্মৃত হননি। তিনি সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অল-হাজ্জাজ ভীরু দুর্বলচিত্ত বলে আবদুর-রহমানকে ভর্ৎসনা করে দ্রুত অগ্রসরের আদেশ দেন। সেনাপতি অসম্মত হলে তাকে পদচ্যুতির হুমকি দিলে—আবদুর-রহমান ও তাঁর সৈন্যরা ক্ষুব্ধ হন। আবদুর-রহমান র‍্যাটবিলের সঙ্গে সন্ধি করে হল-হজ্জাজ ও খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বিদ্রোহী বাহিনী অল-বসরা অধিকার করে। খলিফা আপস মীমাংসার প্রস্তাব করলে বিদ্রোহীরা তা প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে ৭০১-৭০২ খ্রিঃ এক ভীষণ যুদ্ধে অল-হাজ্জাজের কাছে আবদুর-রহমানের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। আবদার-রহমান র‍্যাটবিলের আশ্রয় নেন। কিছুদিন পরে র‍্যাটবিল আবদুর-রহমানকে অল-হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু পথিমধ্যেই তিনি আত্মহত্যা করেন।

র‍্যাটবিল আরবদের মধ্যে বিভেদের সুযোগ নিয়ে অনুকূল শর্তে অল-হাজ্জাজের সঙ্গে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী অল-হাজ্জাজ র‍্যাটবিলের রাজ্য আক্রমণ করবে

1. Ibid, P-222
2. Ibid, P-222

না—বিনিময়ে র‍্যাটবিলকে বার্ষিক নামমাত্র কর দিতে হবে। অল-হাজ্জাজের মৃত্যুর পর এজিদ (Yazid) ৭১৫ খ্রিঃ ইরাকের শাসনভার গ্রহণ করলে—র‍্যাটবিল কর দিতে অস্বীকৃত হন। এরপর প্রায় ৪০ বৎসর আরবরা কাবুল-নৃপতির কাছ থেকে কোনো কর আদায় করতে পারেনি।

আরবের মুসলমান কাবুল ও জাবুলে যে নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ চালিয়েছে তা সাফল্য ও ব্যর্থতার মিশ্র ইতিহাস। আরবরা প্রথম আক্রমণ করে ৬৪৯ খ্রিঃ। প্রথম সাত বৎসর কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ ঘটেনি। খলিফা আলি ও মু-আওইয়ার (Muawiyah) নেতৃত্বে মুসলমান নবোদ্যমে আক্রমণ শুরু করে। সেনাপতি আবদুর-রহমানের (Abdur-Rahaman-ibn-Sanurah) রণনৈপুণ্যে মুসলিম শক্তি কাবুল ও জাবুলের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। কিন্তু আব-দুর-রহমানের অপসারণ ও ৬৭০ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু হলে; পরবর্তী ৩০ বৎসর আরব বাহিনীর উপর্যুপুরি বিপর্যয়ে আরব জগতে আলোড়ন দেখা দেয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী ব্যর্থ অভিযানের পর আরবরা এই রাজ্য দুটি জয় করার আশা ছেড়ে দেয়। তৎপরবর্তী দেড়শো বৎসর কাবুল ও জাবুলিস্তান নিজেদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তের দুটি ছোট রাজ্য, কাবুল ও জাবুলিস্তান বিশ্ব বিজয়ী মুসলিম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হিন্দুস্থানে প্রবেশের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ভারতবর্ষে প্রবেশের দুটি পথ—খাইবার ও বোলান গিরিপথ এই দুটি রাজ্যের দুর্জয় সাহস ও পরাক্রমে ছিল সুরক্ষিত। মাঝে মাঝে তারা অবশ্য সাময়িক পরাজয় স্বীকার করেছে--কিন্তু বশ্যতা কখনও নয়। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার আক্ষেপ করে বলেন ঃ 'দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় দুই শতাব্দী এই দুই রাজ্যের সাহসী জনগণ যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছে—নিজস্ব তথ্যের অভাবে, বিজয়ী মুসলিম জাতির ঐতিহাসিকদের বিবরণী থেকেই সেই সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের জানতে হয়। ভারতবর্ষের যদি নিজস্ব ইতিহাস থাকত--তবে যে বীর যোদ্ধারা দুই শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে ইসলামকে বাধা দিয়ে রেখেছিল—তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকত।' (Unfortunately we have no independent evidence of the brave and heroic fights they put up for more than two hunderd years, and our knowledge is entirely derived from the picture as painted by the hands of the victors. But even from the records of the Muhammadan writers we can have some idea of the wonderful skill and energy which they displayed against enormous odds, and the crushing and humiliating defeats which they not unoften inflicted upon the army of the Arabs. If India had her

history the heroic deeds of these brave peoples, who defended her gates against Islam for two centuries, would probably have been written in letters of gold.)[1]

মহম্মদ বিন কাশিম

কাবুল ও জাবুলিস্তান অধিকারে ব্যর্থ হয়ে মুসলমান সিন্ধু জয়ে উদ্যোগী হয়। পারস্য ইতিপূর্বেই মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়েছে। ওমায়েদ (Omayyad) বংশীয়দের সময় সাম্রাজ্যের সীমা পূর্বদিকে বিস্তৃত হলে, খিলাফতের প্রভাব-প্রতিপত্তি, খ্যাতি ও মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই সময় ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ (Hajjaj), ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ও ঘোর সাম্রাজ্যবাদী।* তিনিই ছিলেন পূর্বতন বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিকর্তা। তিনি বোখারা, সমরখন্দ ও ফারগানা প্রদেশকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সন্ধি করেন কাশগড়ের চৈনিক শাসকের সঙ্গে। অতঃপর সামান্য একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে হাজ্জাজ সিন্ধু রাজ্য আক্রমণ করে। উপলক্ষটি হল— সিংহলরাজ দুটি জাহাজে খলিফা ও হাজ্জাজের নিকট মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। দেবলের কাছে জাহাজ দুটি জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। অবশ্য এই ঘটনা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অন্যমতে (১) সিংহলে বাণিজ্য ব্যপদেশে যে সকল আরব বণিকের মৃত্যু হয়—তাহাদের নিরাশ্রয় কন্যাদের মহানুভব সিংহল-রাজ জাহাজে করে হাজ্জাজের নিকট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে জাহাজ দুটি দেবলের জলদস্যুগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। (২) ভারতের ক্রীতদাসী ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করার জন্য খলিফা তার কয়েকজন অনুচরকে ভারতে পাঠান। সিন্ধুর কাছে সমুদ্রপথে জাহাজটি জলদস্যুগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ সিন্ধুরাজ দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে, দাহির তা দিতে অস্বীকৃত হলে হাজ্জাজ সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নেন। ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, 'হাজ্জাজের একান্ত অনুরোধেই খলিফা সিন্ধু আক্রমণে অনুমতি দেন। সিন্ধুর বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হয় — নিহত হয় সেনাপতি (But this Punitive expedition against Debal, which the khalifa had sanctioned at the special request of Hajjaj, failed and the Arab general who captained it was defeated and put to death by the Sindhians)[2] ধূল্যবলুণ্ঠিত হয় সাম্রাজ্যবাদী গর্ব। এই শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হাজ্জাজ

* ইসলামের জন্যই তিনি সাম্রাজ্যবাদী। ইসলাম প্রচারের জন্য রাজ্য জয় করতে হয়—প্রতিষ্ঠা হয় সাম্রাজ্যের।

1. Ibid, P-224
2. Iswari Prasad—History of Mediaeval India, P-54

নবউদ্যমে শুরু করেন সমরসজ্জা। মহম্মদ বিন কাশিমের সৈনাপত্যে সুসজ্জিত এক বিশাল বাহিনী সিন্ধু আক্রমণে অগ্রসর হয়।'

মহম্মদ বিন্‌কাশিম ছিলেন বীর, সাহসী, দূরদর্শী ও রণনিপুণ। সামরিক খ্যাতির শীর্ষে তাঁর উত্থান, আবার তাঁর জীবন নাট্যের আকস্মিক বিয়োগান্ত অবসান ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। বিন্‌কাশিমের সেনাবাহিনীতে ছিল ৬০০০ রণদক্ষ সিরিয়ান ও ইরাকি যোদ্ধা ও সমসংখ্যক সশস্ত্র উষ্ট্রারোহী। বিন্ কাশিম মেকরান পৌঁছোলে, সেখানকার শাসনকর্তা মহম্মদ হারুন সসৈন্যে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। দাহিরের শাসনে ক্ষুব্ধ জাঠ ও মেড়দের এক অংশ বিন্ কাশিমের সঙ্গে সহযোগিতা করে। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য যুদ্ধ জয়ে বিন্ কাশিমের সহায়ক হয়। অন্যদিকে এই জাতীয় অনৈক্য সিন্ধু-রাজের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

৭১২ খ্রিঃ বসন্তকালে বিন্ কাশিম দেবল পৌঁছিলে, হাজ্জাজ প্রেরিত এক বিরাট সৈন্যদল সমরোপকরণ সহ বিন্ কাশিমের সঙ্গে মিলিত হয়। দেবলে একটি বিখ্যাত হিন্দু মন্দির ছিল। মুসলিম বাহিনী মন্দির আক্রমণ করলে— হিন্দুরা বাধা দেয়। কিন্তু হয় পরাজিত। মুসলমান মন্দির ধ্বংস করে নগর অধিকার করে। তিনদিন ধরে চলে নির্বিচার হত্যা ও লুন্ঠন। বিন্ কাশিম নগরে স্থাপন করে একটি সেনানিবাস। নির্মাণ করে মসজিদ। চার হাজার সৈন্যের ওপর নগর রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ফরিস্তার বিবরণ অনুযায়ী ধর্মান্তরে অনিচ্ছুক ১৭ বৎসরের অধিক সকল পুরুষকে হত্যা করা হয়। হাজ্জাজকে উপহার স্বরূপ পাঠানো হয় লুন্ঠিত সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ ও ৭৫ জন সুন্দরী হিন্দু রমণী।

ঝটিকা আক্রমণে দেবল অধিকার করে বিন্ কাশিম আক্রমণ করে নিরুন (Nirun। অধিবাসীরা আত্মসমর্পণ করে; সাহায্য করে খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণ যুগিয়ে। বিন্ কাশিম সিন্ধু নদ অতিক্রম করলে রাজা দাহির রাওয়ারে (Rawar) বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। সিন্ধু অভিযানে হিন্দুর সামরিক শক্তির সঙ্গে বিন্ কাশিমের এই প্রথম সম্মুখ সমর। উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। অলবিলাদুরির বর্ণনায়—এরকম ভয়ংকর যুদ্ধ ইতিপূর্বে কেউ কখনও দেখেনি। রণদুর্মদ রাজা দাহির হস্তীপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে অসংখ্য শত্রু সংহার করেন। কিন্তু দিনশেষে তিনি নিহত হলে পৌত্তলিক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে রণেভঙ্গ দেয়। মহোল্লাসে মুসলমান মত্ত হয় কাফের নিধনে। (A dreadful conflict ensued, such as had never been heard of. Dahir dismounted and fought valiantly, but he was killed towards the evening, when the idolators fled and the Musalmans glutted themselves with massacre)[1] মুসলিম ঐতিহাসিক আল-মাদাইনির (Al-Madaini) বর্ণনা অনুসারে—

1. Ibid, P-56

একটি ন্যাপথা [মাখানো] তীর দাহিরের হাওদায় এসে আঘাত করলে তাতে আগুন ধরে যায়। রণহস্তী তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ছুটে যায় জলাশয়ের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসে রণক্ষেত্রে। আরব সৈন্য দাহিরকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে। তীর বর্ষণ করে অবিরাম। দাহির মাটিতে পড়ে যায় -- কিন্তু পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ায়। একজন আরব সৈন্যের সঙ্গে তাঁর হাতাহাতি লড়াই হয়; সে দাহিরকে তরবারি দিয়ে মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করে। দাহিরের মস্তক দ্বি-খণ্ডিত হয়। রাজার মৃত্যুতে হিন্দুরা বেপরোয়া আক্রমণ করে মুসলমানদের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। মুসলমান মত্ত উল্লাসে নির্বিচারে হত্যা করে পরাজিত হিন্দুদের। (According to Al-Madaini, 'A naptha Arrow struck Dahir's howdah and set it ablaze. At this inopportune moment Dahir's elephant rushed into water to quench his thrust, and when he retreated, he was surrounded on all sides by the Arabs who showered arrows upon him. Dahir fell upon the ground, but he at ònce raised himself up and had a scuffle with an Arab who struck him with a sword on the very centre of his head and cleft it to his neck'. Driven to desperation by the death of their valiant king and leader, the Hindus assailed the Muslims with relentless furry, but they were defeated and the faithful glutted themselves with massacre)[1]। রাজা দাহির ও তাঁর সেনাবাহিনী এই যুদ্ধে যে বীরত্ব ও শৌর্যের পরিচয় দিয়েছে "চাঁচনামা"র (Chachnama) রচনায় তার নিখুঁত বিবরণ পাওয়া যায়।

দাহির মহিষী রাণী বাঈ ছিলেন বীরাঙ্গনা। স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তিনি ১৫০০০ সৈন্য নিয়ে রাওয়ার দুর্গে শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন। বিন্ কাশিম দুর্গ অবরোধ করে। দুর্গের ওপর থেকে নীচে শত্রু সৈন্যের ওপর বর্ষিত হয় পাথর, তির ও বর্শা। মুসলিম বাহিনী খুবই শক্তিশালী। প্রচুর লোকক্ষয় সত্ত্বেও দুর্জয় সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে তারা আক্রমণ প্রতিহত করে। রাণী বাঈ বুঝতে পারেন ব্যর্থ চেষ্টা — পরাজয় অনিবার্য। কিন্তু শঙ্কিত হন পুরললনাদের জন্য। মুসলিম চরিত্র সম্বন্ধে তিনি অবহিত। তাঁর আহ্বানে সকল রমণীগণ দুর্গমধ্যস্থ একটি স্থানে সমবেত হন। তাঁদের সম্বোধন করে রাণী বাঈ বলেন ঃ "ভগবান না করুন, আমরা যেন স্বাধীনতার জন্য গো-মাংস ভক্ষণকারী এই ম্লেচ্ছ যবনদের নিকট বাধিত না থাকি। নারীত্বের মর্যাদা হবে লুণ্ঠিত। সময়-সংক্ষেপ, চিন্তার কোনো অবকাশ নেই। পলায়নের সকল পথ রুদ্ধ। এস, আমরা সকলে মিলে কাঠ, তৈল ও বস্ত্র সংগ্রহ করি। তারপর একসঙ্গে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়ে পরলোকে

1. Ibid, P-57

পতির সঙ্গে মিলিত হই। যদি কেহ বাঁচতে চান, তিনি যেতে পারেন।' তারা প্রবেশ করে একটি প্রশস্ত কক্ষে। নারীত্বের সম্মান রক্ষায় প্রজ্বলিত হুতাশনে দেয় আত্মবিসর্জন। (When the Rani saw her doom inevitable, she assembled all the women in the fort and addressed them thus : 'God forbid that we should owe our liberty to those outcaste cow-eaters. Our honour would be lost. Our respite is at an end, and there is nowhere any hope of escape; let us collect wood, cotton and oil, for I think we should burn ourselves and go to meet our husbands. If any wish to save herself, she may.' They entered into a house, where they burnt themselves, and by means of this ghastly holocaust vindicated the honour of their race)[1] সহস্র বৎসরের মুসলিম শাসনে লক্ষ লক্ষ ভারতের নারী সম্ভ্রম রক্ষায় "জহরব্রত" করে আত্মাহুতি দেয়। রাণী বাঈ ও সিন্ধু রমণীগণ তাদের পথিকৃৎ।

বিন্ কাশিম দুর্গ অধিকার করে। বধ করে ৬০০০ হিন্দুকে। লুণ্ঠন করেন রাজ কোষাগার। সিন্ধু জয় করে রাজা দাহিরের ছিন্ন শির হাজ্জাজকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন; সঙ্গে একখানি পত্র। পত্রে বিন্ কাশিম জানান ঃ 'রাজা দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র, সমর নায়ক ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের ইতিপূর্বেই পরলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিধর্মীদের ইসলামে ধর্মান্তর অথবা বধ করা হয়েছে। মন্দির ভেঙে নির্মিত হয়েছে মসজিদ। প্রতি সকাল সন্ধ্যায় আল্লার উদ্দেশে পাঠ করা হয় নামাজ।' (The nephew of Raja Dahir, his warriors and principal officers have been dispatched and the infidels converted to Islam or destroyed. Instead of idol-temples, mosques and other places of worship have been created, ...The takbir and praise to the Almighty God are offered every morning and evening.)*[2]

* হত্যা ও মন্দির ধ্বংস সম্বন্ধে আধুনিক কোনো কোনো পণ্ডিত এরূপ মন্তব্য করেন যে ইহাই ছিল নাকি সেই যুগের রীতি-নীতি—অর্থাৎ যুগধর্ম। কিন্তু এ সম্বন্ধে চাচনামার বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিন্‌কাশিমের পূর্বে যে সকল মুসলমান সিন্ধু রাজ্যে বন্দি হয়েছিল, তারা বিন্ কাশিমকে বলেছে যে, হিন্দুরা তাদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছে। বালাধুরির বর্ণনা অনুযায়ী—হিন্দুরা যখন সিন্দানের (Sindan) মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাকে হত্যা করে—তখনও তারা মসজিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেনি।

1. Iswari Prasad—History of Mediaeval India, P-58
2. Dr. Titas—Indian Islam, P-10
   Quoted from Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol—8, P-55

বিন্ কাশিমের পত্র পেয়ে হাজ্জাজ তাঁকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে লেখেন ঃ 'আল্লাহ্ বলেছেন, বিধর্মী কাফেরদের প্রতি কোনো দয়া প্রদর্শন নয়, তাদের বধ করবে। তুমি জেনে রাখো, ইহাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র আদেশ। তুমি যদি তাদের সুরক্ষা দাও, তবে তার দ্বারা তোমার আরব্ধ কাজ (মুসলিম-রাজ প্রতিষ্ঠা) বিলম্বিত হবে।'

বিজয়োন্মত্ত মুসলিম বাহিনী এরপর প্রায় বিনা বাধায় ব্রাহ্মণাবাদ ও আলোর দুর্গ জয় করে মুলতানের দিকে অগ্রসর হয়। মুলতান সিন্ধু নদের তীরবর্তী একটি প্রধান নগর। চাচনামার বিবরণ অনুযায়ী ঃ 'কাফের হিন্দু ও বিশ্বাসী মুসলমানের সঙ্গে সাতদিন ধরে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন মুলতান নরপতির ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবল সাহস ও পরাক্রমের সঙ্গে লড়াই করেও তিনি মুসলিম বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। বিন কাশিম দুর্গ দখল করে ৬০০০ নারী ও শিশুকে বন্দী করেন এবং অবশিষ্ট সকলকে করেন হত্যা।' (The author of the Chachnama writes that the contest between the infidels and the faithful was fierce and bitter and lasted for seven days. At last the nephew of the Multan chief, inspite of the tremendous attack he delivered upon the Muslims, was overpowered and defeated. The garrison in the fort was put to the sword, and the families of the chiefs and warriors of Multan numbering six thousands in all were enslaved)[1]

সিন্ধু জয় সমাপ্ত করে বিন্ কাশিম শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ইসলামি আইন অনুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে জমি বণ্টন করা হয়;আবার অনেকে ছিল বেতনভুক। তারা অসহায় হিন্দু মেয়েদের সাদি করে এদেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যেই সিন্ধু প্রদেশে গড়ে ওঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরব সামরিক উপনিবেশ (Military Colonies)। ক্রমশ তারা ব্যাবসা-বাণিজ্যেও অংশগ্রহণ করে। জমির মালিক আরব মুসলমান, কিন্তু চাষ করতে হত হিন্দুদের। তাদের অবস্থা ছিল মধ্যযুগের ভূমিদাসের মতো করুণ ও দুর্বিষহ। (The Muslim soldiers were not allowed to cultivate land and therefore the main burden of agricultural labour fell upon the natives who were reduced to the conditions of villeins and serfs)[2]

রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল জমির খাজনা ও জিজিয়া কর। উৎপন্ন শস্যের ২/৫ ভাগ খাজনা স্বরূপ দিতে হত। এছাড়া অন্য করও ধার্য করা হত। হিন্দুদের কর দেওয়ার

1. Iswari Prasad—History of Mediaeval India, P-60
2. Ibid, P-62-63

পদ্ধতি ছিল খুবই অপমানজনক। মহার্ঘ পোশাক, অশ্বারোহণ ছিল নিষিদ্ধ। যে জাঠ ও মেড় সম্প্রদায়ের লোকেরা দাহিরের বিরুদ্ধে বিন্ কাশিমকে সাহায্য করেছিল, তাদের ওপরও এই সকল বিধিনিষেধ সমভাবে প্রযুক্ত ছিল। নিয়মিত কঠোরভাবে ও অপমানজনক পদ্ধতিতে হিন্দুদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করা হত। কোনো হিন্দু চুরি করলে শাস্তি স্বরূপ তার স্ত্রী ও সন্তানদের পুড়িয়ে মারা হত। হিন্দু-মুসলমানে কোনো বিরোধ হলে কাজি ইসলামের বিধান অনুযায়ী তার বিচার করতেন। ফলে হিন্দুরা সুবিচার থেকে ছিল বঞ্চিত। বিচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল — 'হিন্দুদের কাছ থেকে আর্থিক জরিমানা সংগ্রহ অথবা ধর্মান্তরে (জরিমানা দিতে অক্ষম হলে) বাধ্য করা।' (The public tribunal, were to the Hindus only the means of extortion and forcible conversion.)[1]

ঐতিহাসিক Dr. Titus বলেন, সিন্ধু জয় করে বিন্ কাশিম অসংখ্য হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছেন; অপবিত্র করেছেন দেবতার বিগ্রহ। দেবল, নিরুন ও আলোরে বহু মন্দির ধ্বংস করে সেখানে নির্মিত হয় মসজিদ। হিন্দুরা বাধা দিলে তাদের নির্বিচারে হত্যা করা হয় — স্ত্রী ও সন্তানদের বিক্রি করা হয় ক্রীতদাসরূপে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Andre Wink বলেন, সিন্ধু জয়ের পর ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস করে ইরাক ও অন্যত্র পাঠানো হয়। চাচনামার বিবরণ অনুযায়ী কয়েক লক্ষ হিন্দু নারীকেও পাঠানো হয় আরবে। মন্দির ধ্বংসের উদ্দেশ্য ছিল দ্বি-বিধ। হিন্দুর ধর্মবোধে আঘাত দেওয়া ও আরবের রাজকোষ সমৃদ্ধ করা। চাচনামার রচনায় প্রকাশ, একটি মন্দির থেকেই লুণ্ঠিত হয়েছে ২৩০ মন সোনা ও ৪০টি বৃহৎ কলস ভর্তি স্বর্ণ-চূর্ণ; সর্বমোট ১৩২০০ মন সোনা। (The author of the Chachnama writes that from one temple two hundred mans of gold were obtained and forty jars filled with gold dust. These were weighed and were found to contain thirteen thousand and two hundred mans of gold)[2] এ পরিসংখ্যানে অতিরঞ্জন থাকলেও মন্দিরের ধনভাণ্ডার থেকে যে বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন লুণ্ঠিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মুলতানে একটি বিখ্যাত মন্দির ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সারা বৎসর অসংখ্য ভক্ত সমাগম হত। প্রণামী বাবদ আয় হত লক্ষ লক্ষ টাকা। এই বিপুল অর্থের লোভে বিন্ কাশিম মন্দিরটি ধ্বংস করেননি, কিন্তু অপবিত্র করেছেন। পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের নিদর্শনস্বরূপ তিনি মন্দিরের দেবতার কণ্ঠে বেঁধে দিয়েছিলেন এক টুকরো গো-মাংস। (Of the destruction of temples and the

1. Ibid, P-65
2. Ibid, P-60-61

desecration of idols we have an abundance of evidence. Mahammad bin Qasim carried out his plan of destruction systematically in Sind, we have seen, but he made an exception of the famous temple at Multan for purposes of revenue, as this temple was a place of resort for pilgrims, who made large gifts to the idol. Nevertheless, while he thus satisfied his avarice by letting the temple stand, he gave vent to his malignity by having a piece of cow's flesh tied around the neck of the idol)[1]

মহম্মদ বিন কাশিমের উত্থান যেমন বিস্ময়কর তাঁর পতনও তেমনি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। সিন্ধু জয় করে সিন্ধু নরেশ দাহিরের পরমা সুন্দরী দুই কন্যা পারমল দেবী ও সুরজ দেবীকে উপহার স্বরূপ খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। পিতৃহত্যাকারী বিন্ কাশিমের ওপর কন্যা-দ্বয়ের ছিল বিষম ক্রোধ। তাঁরা খলিফাকে জানায় যে, বিন কাশিম তাঁদের নারীত্বের অমর্যাদা করেছে; তাই তাঁরা ইসলামের ধর্মগুরুর যোগ্য নয়। ক্রুদ্ধ খলিফা তৎক্ষণাত বিন্ কাশিমের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। সাধারণ প্রাণদণ্ড এ নয়। খলিফার আদেশ-নামায় বলা হয়, ষাঁড়ের চামড়ার খোলের মধ্যে বিন কাশিমকে জীবন্ত ঢুকিয়ে খোলের মুখ সেলাই করে অবিলম্বে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিতে হবে। মুসলিম দুনিয়ায় খলিফা চরম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। ভয়ে আতঙ্কে বিন কাশিম খলিফার আদেশ অনুযায়ী নিজেই মৃত্যুকে বরণ করেন। যথাসময়ে তাঁর প্রাণহীন দেহ খলিফার নিকট প্রেরিত হলে, দাহির তনয়াদ্বয় সাক্ষ্য দেয় যে বিন্ কাশিম নির্দোষ। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতেই তাঁরা মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন। বিচার-বিবেচনা না করেই বিন্ কাশিমকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য তাঁরা খলিফাকে মৃদু তিরস্কার করেন। খলিফা পারমলদেবী ও সুরজদেবীকে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে হত্যার আদেশ দেন। মীর মাসুম ও চাচনামার লেখকের রচনা থেকে এ বিবরণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে Futuhu-i-Buldan-এর বিবরণে প্রকাশ, খলিফার আদেশে বন্দী শৃঙ্খলিত বিন্ কাশিমকে অত্যাচার ও যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়।

মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু জয় করেছিলেন, কিন্তু ভারতে তাঁর সামরিক সাফল্যকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করার সুযোগ পাননি। আরব ভূ-খণ্ডে খলিফার প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পেলে তার প্রতিক্রিয়া হয় ভারতবর্ষেও। সিন্ধুর আরবদের মধ্যে দেখা দেয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সিন্ধু ও মুলতানের শাসকদ্বয় খলিফার রাজনৈতিক প্রভুত্ব অস্বীকার করে কার্যত স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করে। প্রধানত রাজপুত শক্তির জন্যই এই মুসলিম শক্তি ভারতের

1 Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches—Vol-8, P-58.

অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। ভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশে আরব অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে কয়েকটি আরবদেশীয় পরিবার ও ক্ষুদ্র উপনিবেশ আরবদের ভারত বিজয়ের স্মারকস্তম্ভ হয়ে রইল। .... ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, স্থাপত্য, শিল্পকলা, ভাষা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি আরব বিজয়ে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয়নি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মুসলমানের সিন্ধু বিজয় কোনো উত্তরাধিকার রেখে যায়নি। তাদের বর্বরতার সাক্ষী স্বরূপ, রুক্ষ ধ্বংসের ক্ষতচিহ্ন বক্ষে নিয়ে পড়ে রইল কতিপয় প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। (only a few settlements and a few families constituted the memorial of Arab conquest in India. The Arabs have left no legacy behind.......... language, architecture, art, tradition, customs and manners were little affected by them, and all that remained was the debris of ancient buildings, which proclaimed to the world the vandalism of their destroyers)[1] সুতরাং বলা যায়, ভারত ইতিহাসে মুসলমানের সিন্ধু বিজয় কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। স্টেনলি লেনপুল যথার্থই বলেছেন ঃ ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে এই জয় ফলাফলহীন একটি ঘটনা মাত্র। (an episode in the history of India and of Islam, a triumph without results.)[2]

তবে একেবারে গুরুত্বহীন একথা বলা সঙ্গত হবে না। সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমেই সামরিক শক্তির সাহায্যে রাজধর্মরূপে মূল ভারত-ভূখণ্ডে ইসলামের আবির্ভাব। ইসলামের রীতি অনুযায়ী স্বল্পসংখ্যক হলেও স্থানীয় হিন্দুদের বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করা হয়। তারা গ্রহণ করে ইসলামী আচার ও রীতি-নীতি। স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তীকালে গজনী ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত স্বধর্মাবলম্বী মুসলিম আক্রমণকারীদের প্রতি তারা ছিল একান্ত সহানুভূতিশীল। যুদ্ধে স্থানীয় জনগণের একাংশের সমর্থন ও সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বলা যায় আরবদের সিন্ধু বিজয় মুসলমানের ভারত বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।

সাংস্কৃতিক ফলাফল ঃ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে মুসলিম শক্তি সিন্ধু অধিকার করলেও ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু মুসলিম জাতি ও ইউরোপের ওপর এর প্রভাব ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। অতি উন্নত হিন্দু সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মুসলমান বিস্মিত হয়েছিল। হিন্দুর মহত্তম জীবন দর্শন, তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা তাদের মুগ্ধ করেছিল। "আল্লাহ্ এক" ইসলামের এই মূল

1. Iswari Prasad—History of Mediaeval India, P-67
2. Ibid, P-66

তত্ত্ব হিন্দু সন্ন্যাসী দার্শনিক পূর্ব হতেই জ্ঞাত ছিলেন। যে মহৎ শিল্পকলা মানবজীবনকে করে মহীয়ান তাতেও হিন্দুর চরম উৎকর্ষ। (When the Arabs came to India, they were astonished at the superiority of the civilization which they found in the country. The sublimity of Hindu philosophical ideas and the richness and versatility of Hindu intellect were a strange revelation to them. The cardinal doctrine of Muslim theology that there is one God was already known to Hindu saints and philosophers, and they found that in the nobler arts, which enhance the dignity of man, the Hindus far excelled them.)[1]

যে আরব সংস্কৃতি ইউরোপীয় সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছিল তা ভারত হতে আহৃত। ভারতে তখন সভ্যতার চরম বিকাশ। আরবের জ্ঞান-পিপাসু পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পদপ্রান্তে বসে দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করতেন। (A great many of the elements of Arabian culture, which afterwards had such a marvellous effect upon European civilisation, were borrowed from India. India then stood on a much higher intellectual plane, and the Arab scholars sat at the feet of Buddhist monks and Brahmana pandits to learn philosophy, astronomy, mathematics, medicine, chemistry, and other subjects of study.)[2] ধর্মান্ধতা তখনও হিন্দু সংস্কৃতির থেকে জ্ঞানলাভে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। হিন্দুদের কাছ থেকে আরবরা শিখেছিল সংখ্যাতত্ত্ব ও সংগীতের সপ্তসুর। রাজ্য শাসনপ্রণালীও শিখেছিল হিন্দুদের কাছ থেকে। শাসনকার্যে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। তাই ব্রাহ্মণদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করা হত। পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকবৃন্দও এই ধারা অনুসরণ করেন। ভারত থেকে আরবে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হত হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, স্থপতি ও চিকিৎসকদের। ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত "ব্রহ্মসিদ্ধান্ত" গ্রন্থখানি ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় আলফাজারী (Alfazari) আরবিভাষায় অনুবাদ করেন। এই বই থেকেই আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। ভারত থেকে সংগৃহীত জ্ঞানভাণ্ডারকে আরবি পোশাকে সজ্জিত করে (আরবি সংস্করণ) তারা ইউরোপে পরিবেশন করে। আব্বাসাইদ বংশের পতন হলে বাগদাদের গৌরব রবি হয় অস্তমিত। এই সুযোগে সিন্ধুর আরব শাসকবর্গ বাগদাদের

1. Ibid P-67
2. Ibid P-68

সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আরব ছাত্রদের অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে ভারতে আসা বন্ধ হয়। বাধ্য হয়ে তারা গ্রিক সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলার অধ্যয়ন শুরু করে। হ্যাভেল যথার্থই মন্তব্য করেছেন ঃ 'ভারতবর্ষের সংস্পর্শে এসে আরব সভ্যতা প্রভূত সমৃদ্ধ হয়। আরবদের মাধ্যমেই ইউরোপে প্রচারিত হয় ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ।'

জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে ইসলামের অবদান সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু হিন্দু বা ভারতীয় সভ্যতা যে ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। সহস্র বৎসর ভারত শাসন করেও ইসলামের পদচারণা বহির্দ্বারেই — অন্দর মহলে সে প্রবেশাধিকার পায়নি।

সম্ভবত খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দী থেকেই বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হয়। এক সংকীর্ণ মনোভাব ভারতীয়দের আচ্ছন্ন করে। হজরত মহম্মদের দেহাবসানের ১০০ বৎসরের মধ্যে মুসলমান সর্বশক্তি নিয়ে চতুর্দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যত হয়। সিন্ধু আক্রমণের প্রাক্কালে মুসলিম সাম্রাজ্য ইউরোপের স্পেন থেকে ভারতের পঃ সীমান্ত ও কাস্পিয়ান সাগর থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। অথচ হিন্দুরা এ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিল না। অন্যান্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইসলামিক সাম্রাজ্যের যে মৌলিক পার্থক্য আছে, হিন্দুরা তাও বোঝেনি। অন্য জাতির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল কারণ আর্থ-রাজনৈতিক। কিন্তু মুসলমানের সাম্রাজ্য বিস্তারের মূল কারণ ধর্মীয়। ইসলাম ধর্মের প্রসারের জন্যই তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার। আরবদের সিন্ধু-আক্রমণকে শাস্তিমূলক অভিযান বলে কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু ডঃ আম্বেদকর বলেন ঃ 'হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও বহুদেবত্ববাদের মূলে আঘাত করে ভারতবর্ষে ইসলামের প্রতিষ্ঠাই এই অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।' (But, there is no doubt that striking a blow at the idolatry and polytheism of Hindus and establishing Islam in India was also one of the aims of this expedition.)[1] পরবর্তীকালের মুসলিম আক্রমণ, শাসন ও রাজনীতি ডঃ আম্বেদকরের অভিমতকে নিঃসন্দেহে সত্য বলে প্রমাণিত করে।

৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বহু শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য ছিল। মুসলিম আক্রমণের লক্ষ্য উপলব্ধি করতে পারলে ভারতের পশ্চিম-প্রবেশ দ্বার আফগানিস্তানেই মুসলিম আক্রমণকে তারা প্রতিহত করতে পারত। সে শক্তি তাঁদের ছিল, কিন্তু ছিল না রাজনৈতিক দূরদর্শিতা। তাই নিঃসঙ্গ সিন্ধু-নরেশ দাহিরকে বিন কাশিমের কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়। নবম শতাব্দীর শেষার্ধে সিন্ধু ও মুলতানে দুটি মুসলিম রাজ্য ছিল। খলিফার প্রভাবমুক্ত হয়ে তারা স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করছিল।

---

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writigns and Speeches Vol-8, P-55

বিন কাশিমের অত্যাচার ও পূর্ব-অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হয়ে পার্শ্ববর্তী হিন্দু-নৃপতিরা এই দুটি মুসলিম রাজ্যকে নির্বিবাদে অস্তিত্ব রাখতে দেন। আরব ও ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বিষয়ে হিন্দুরা কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। এই সহিষ্ণুতার পরিণাম ভারত-ইতিহাসে কল্যাণকর হয়নি। আবার একথাও সত্য হিন্দু-নৃপতিদের জন্যই মুসলমান ভারতের অভ্যন্তরে আর অগ্রসর হতে পারেনি। চেনাব থেকে হিন্দুকুশ পর্যন্ত হিন্দু শাহী নৃপতিদের ছিল নিরঙ্কুশ একাধিপত্য। এই রাজবংশের সামরিক শক্তি ও পরাক্রমের জন্য প্রায় ৩০০ বৎসর ভারতবর্ষে আর বৃহদাকারে মুসলিম আক্রমণ ঘটেনি। এই দীর্ঘ বিরতির ফলে হিন্দুরা শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। সীমান্ত সুরক্ষায় দেখা যায় চরম ঔদাসীন্য ও অবহেলা।

এরপর একাদশ শতকে শুরু হয় বাত্যাতাড়িত জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় বিরামহীন মুসলিম আক্রমণ। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরু বলেন — 'উঃ-পশ্চিম থেকে বারবার আক্রমণ ঘটায় ভারত বাহিরের প্রভাব সম্বন্ধে উন্মুক্ত না হলেও অনেক নূতন বিষয় তার মধ্যে প্রবেশলাভ করেছিল। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়েছিল নিষ্ঠুর সামরিক বিজয়ের সঙ্গে ইসলামের আগমন। এতদিন পর্যন্ত তিনশো বছরেরও অধিককাল ধরে ইসলাম ধর্মরূপে শান্তির সঙ্গে কোনো বিরোধ না ঘটিয়ে ভারতের ধর্মগুলির মধ্যে আপন স্থান নিয়েছিল। এখন সে নূতনরূপে এল। এতে দেশবাসীর মধ্যে একটা মনস্তত্ত্ব-ঘটিত প্রতিক্রিয়া ঘটল, তাদের মন তিক্ততায় ভরে গেল। একটা নূতন ধর্মে কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু যা অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা দেশের জীবনকে ওলট-পালট করে দেয় তাতে লোকের ঘোরতর আপত্তি ছিল'।[1]

সুলতান মামুদ

পূর্ব আফগানিস্তানের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গজনী। সুলতান সুবুক্তিগীনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আমীর ইসমাইল গজনীর সিংহাসন অধিকার করে। কিন্তু কনিষ্ঠ আমুর মামুদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরাজিত করে ৯৯৭ খ্রিঃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর রাজত্বে ক্ষুদ্র গজনী এক বিশাল শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক Will Durant-এর বিবরণ অনুযায়ী প্রতি শীতে তিনি হিন্দুস্থানে হানা দিতেন। হিন্দুস্থানের সম্পদ লুণ্ঠন করে পূর্ণ করতেন তাঁর কোষাগার। (রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর) চিত্ত বিনোদনের জন্য লুণ্ঠন ও হত্যায় সৈন্যদের দিতেন অবাধ স্বাধীনতা। তারপর পূর্বাপেক্ষা আরও ধনী হয়ে বসন্তে ফিরে যেতেন স্বদেশে। হিন্দুস্থান থেকে লুণ্ঠিত মণিরত্নের প্রদর্শনী করে তিনি বিদেশী রাজদূতদের চমৎকৃত করতেন। এই সকল রত্নরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য

1. পণ্ডিত নেহেরু—ভারত সন্ধানে (Discovery of India) পৃ.২০০

— পরিস্রুত হিমায়িত মদ অথবা অগ্নিকণার ন্যায় প্রদীপ্ত মুক্তা ও পদ্মরাগ মণি, চিরহরিৎ গুল্মের সবুজ সতেজ পত্ররাজির ন্যায় পান্না এবং আকার ও ওজনে পক্ক দাড়িম্বের ন্যায় বৃহৎ হীরকখণ্ড। (Each winter Mahmud descended into India, filled his treasure chest with spoils and amused his men with full freedom to pillage and kill; each spring he returned to his capital richer than before. Returning to Ghazni he astonished the ambassadors of foreign powers by displaying 'jewels and unbored pearls and rubies shining like sparks, or like wine congealed with ice, and emeralds like fresh sprigs of myrtle and diamonds in size and weight like pomegranates)'[1]

মামুদের ঐতিহাসিক Al' Utbi লিখেছেন — তিনি মন্দির ধ্বংস করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করেছেন। নগরের পর নগর তিনি অধিকার করেছেন; মুসলমানদের অভিলাষ পূর্ণ করতে নীচ কাফেরদের হত্যা করেছেন — ভেঙেছেন তাঁদের দেবতার বিগ্রহ। তারপর স্বদেশে ফিরে গিয়ে সগর্বে প্রচার করেছেন ইসলামের বিজয় কাহিনি...... । খোদার নামে শপথ নিয়েছেন প্রতি বছর তিনি হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করবেন। (He demolished idol temples and established Islam. He captured....cities, killed the polluted wretches, destroying the idolators, and gratifying Muslims. He then returned home and promulgated accounts of the victories obtained for Islam.... and vowed that every year he would undertake a holy war against Hind.)[2] ভারত অভিযানে তিনি এরূপ হিংস্র বর্বর পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন যা হিন্দুদের মনে ভীতির সঞ্চার করত। উদ্দেশ্য পরিষ্কার — যাতে মনোবল হারিয়ে হিন্দুরা প্রতিরোধের চেষ্টা না করে।

১০০১ খ্রিঃ তিনি রাজা জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত ও বন্দি হন। মামুদ আদেশ দিলেন — 'শৃঙ্খলিত জয়পালকে রাজপথে ঘোরানো হবে। রাজার এই চরম দুর্গতি ও অপমান রাজপুত্রগণ ও অমাত্যবর্গ স্বচক্ষেই দেখবে। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে ইসলামের আতঙ্ক' (Mahmud ordered that Jaipal 'be paraded about in the streets so that his sons and chieftains might see him in that condition of shame, bonds and disgrace; and that fear of Islam might fly abroad through the country of the infidels.')[3] ১০১৯ খ্রিঃ চাঁদ রাই যুদ্ধে মামুদের নিকট পরাজিত হয়। অসংখ্য হিন্দু নিহত অথবা বন্দি হয়। রাজধানী

1. Will Durant—The Story of Civilization, P-460
2. Quoted by Dr. Ambedkar—Writings and Speeches, P-56
3. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches. Vol-8, P-57

অরক্ষিত। লুণ্ঠনের সুবর্ণ সুযোগ। 'ইসলামের—' বীর ধর্মযোদ্ধাদের সেদিকে কিন্তু খেয়াল নেই — যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা সূর্য ও অগ্নির উপাসক কাফেরদের রক্তে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন। "কাফের হত্যা" সুলতান মামুদ ও তাঁর সৈনিকদের দিত অপার আনন্দ ("The slaughtering of infidels" seemed to be one thing that gave Muhammad particular pleasure. In one attack on Chand Rai, in A.D. 1019, many infidels were slain or taken prisoners, and the Muslims paid no regard to booty until they had satiated themselves with the slaughter of the infidels and worshippers of the sun and fire)[1]

সুলতান জানতে পারেন যে হিন্দুস্থানে থানেশ্বর নামে একটি রাজ্য আছে। সেখানে আছে জাগরসম (Jagarsom) দেবের বিশাল মন্দির। হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে তিনি সংগ্রহ করেন এক বিশাল বাহিনী। অতঃপর হিন্দুস্থান অভিমুখে অগ্রসর হন। জয়পালের পুত্র গুপ্তচর মুখে এ সংবাদ শুনে মামুদের নিকট প্রস্তাব করেন যে সুলতান যদি এ অভিযানে বিরত হন তবে তাঁকে ৫০টি হাতি "নজরানা" বাবদ দেওয়া হবে। মামুদ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। থানেশ্বর পৌঁছে তিনি দেখেন শহর জনশূন্য। সৈন্যরা রাজধানী বিধ্বস্ত করে লুণ্ঠনে মত্ত হয়। ভেঙে দেয় অসংখ্য দেবমূর্তি। জাগরসম দেবের মূর্তি নিয়ে যায় গজনী। সুলতানের আদেশে বিগ্রহকে মসজিদের সোপানে বসানো হয়—যাতে বিশ্বাসীগণ ঐ মূর্তি পা দিয়ে মাড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে পারে (...He collected a large force with the object of carrying on a religious war, and in the year 402 A.H. marched towards Thaneswar. The son of Jaipal having received intelligence of this, sent an envoy and represented through him,–that if the Sultan would relinquish this enterprise, he would send 50 elephants–as tribute. The Sultan paid no heed to this offer, and when he reached Thaneswar he found the city empty. The soldiers ravaged and plundered whatever they could lay hands upon, broke the idols and carried Jagarsom to Ghazni. The Sultan ordered that the idol should be placed in front of the place of prayer, so that the people would trample upon it).[2]

মথুরা। ভগবান কৃষ্ণ বাসুদেবের জন্মস্থান। হিন্দুদের পুণ্য তীর্থক্ষেত্র। বৈরাগী, সাধু-সন্ন্যাসীর বাস; পুণ্যার্থী জনতার সমাগম। বিনা বাধায় মামুদ মথুরায় প্রবেশ করলেন। কে তাঁকে বাধা দেবে? মথুরাকে বলা যায় প্রাসাদ নগরী; অনুপম অনবদ্য তার স্থাপত্য।

1. Ibid, P-57
2. Khwajah Nizamuddin Ahmad—The Tabaqat-I-Akbari. Vol-I, P-7

সুলতান মুগ্ধ বিস্মিত। তিনি হিসাব কষে বললেন—এরকম একটি সুন্দর নগর তৈরি করতে ২০০ বছরের শ্রম ও ১০ কোটি dinar প্রয়োজন হবে। সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই মথুরাকে ভস্মস্তূপে পরিণত করতে সৈন্যদের আদেশ দিলেন। (---He expressed his admiration for the architecture of the great shrine, judged that its duplication would cost one hundred million dinars and the labour of two hundred years, and then ordered it to be soaked with naphtha and burnt to the ground)[1]। মথুরার অপূর্ব স্থাপত্যশৈলী যে সুলতান মামুদকে মুগ্ধ করেছিল, পণ্ডিত নেহেরুও তাঁর Glimpses Of World History-তে তা উল্লেখ করেছেন। মামুদ গজনীতে তাঁর প্রতিনিধিকে লিখছেন, 'এখানে আছে এক সহস্র দেবতার মূর্তি। বিশ্বাসীদের ধর্মের ন্যায় যা অটল, মজবুত ও সুদৃঢ়। কোটি কোটি দিনার ব্যয় করেই নগরীর এরূপ বিকাশ সম্ভব হয়েছে এবং ২০০ বছরেও অনুরূপ আর একটি নগর নির্মাণ করা সম্ভব নয়।' (Of Mathura, Mahmud has given us a glimpse, which shows us what a great city it was. Writing to his Governor at Ghazni, Mahamud Says, 'There are here (Mathura) a thousand edifices as firm as the faith of the faithful; nor it is likely that this city has attained its present condition but at the expense of many millions of dinars; nor could such another be constructed under a period of 200 yrs.')[2] কিন্তু মামুদ যে এমন সুন্দর নগরটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছেন—পণ্ডিত নেহেরু সে কাহিনি সযত্নে পরিহার করেছেন। খাজা নিজামুদ্দিনের বিবরণ অনুযায়ী সুলতান তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে বিনা বাধায় মথুরা প্রবেশ করেন। তাঁর আদেশে সকল মন্দির ভস্মীভূত হয় — ধ্বংস হয় সারি সারি বিশাল অট্টালিকা; লুণ্ঠন থেকে সংগৃহীত হয় অপর্যাপ্ত রত্নভাণ্ডার। মথুরায় নিখাদ সোনার একটি বিরাট বিগ্রহ ছিল — যাঁর ওজন ৯৮৩০০ মিসকাল।* সুলতানের আদেশে মূর্তিটিকে ভাঙা হয়। একটি বহু মূল্যবান রত্ন** যার ওজন ৪৫০ মিসকাল, সুলতানের রত্নভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। (---When the Sultan arrived in this city no one came forward to give him a battle; and the sultan's army completely destroyed the city and burnt the temples and obtained boundless

* এক মিসকাল এক সেরের $\frac{১}{৬০০}$ ভাগ

** মহার্ঘ রত্নটি হল পদ্মরাগ/নীলকান্ত মণি

1. Will Durant—The Story of Civilization, P-460
2. Pt. Nehru—Glimpses of World History, P-155-156

wealth. There was one golden idol, which was broken up under the orders of the sultan, which weighed 98,300 Miskals of pure gold. They found a precious stone the weight of which was 450 Miskals)[1]

ঐতিহাসিক Lane Poole বলেন ঃ 'মামুদের প্রতিজ্ঞা ছিল প্রতিবছর তিনি হিন্দুস্থানের কাফেরদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের (Holy war—জেহাদ) উদ্দেশ্যে অভিযান করবেন। 'যতদিন পর্যন্ত সোমনাথ মন্দির অক্ষত থাকবে ততদিন তিনি মূর্তিভাঙার অভিযান থেকে বিরত হবেন না। মুলতান থেকে মামুদ বিশাল বাহিনী নিয়ে সোমনাথের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। মন্দিরে ছিল এক হাজার ব্রাহ্মণ, শত শত নর্তকী ও গায়িকা। অর্ধ লক্ষাধিক নর-নারীও আশ্রয় নিয়েছে মন্দির চত্বরে। গর্ভগৃহের মাঝখানে ছিল মণি-মাণিক্য খচিত কষ্টিপাথরে নির্মিত বিশাল লিঙ্গদেব। চারিদিকে ছিল অতি সুন্দর কারুকার্য শোভিত নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল বিচিত্র বিবিধ রত্নখচিত ঝুলন্ত দীপাধার। সেই রত্নদীপের বর্ণময় বিচ্ছুরিত দীপ্তিতেই আলোকিত হত বিগ্রহ।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে ইসলামের ধর্মযোদ্ধারা, মত্ত কলেরবে। শোনা যাচ্ছে তাঁদের রণহুঙ্কার, আল্লা হো আকবর। ভীত অসহায় নরনারীর আকুল আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয় দিক হতে দিগন্তরে। পৈশাচিক উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মামুদের সৈন্যদল। বয়ে গেল রক্তের প্লাবন। লুণ্ঠিত হয় সোমনাথের অতুল ঐশ্বর্য। ধূলিসাৎ হয় তাঁর মন্দির। নিহত হয় ৫০০০০ হিন্দু।* (It is said by Lane Poole that Mahmud of Ghazni "who had vowed that every year should see him wage a holy war against the infidels of Hindusthan' could not rest from his idol-breaking campaign so long as the temple of Somnath remained inviolate------a thousand brahmins served the temple and guarded its treasures, and hundreds of dancers and singers played before its gates. Within stood the famous linga, a rude pillar stone adorned with gems and lighted by jewelled candelebra which were reflected in rich hangings, embroidered with precious stones like stars, that decked the shrine-------The foreigners nothing daunted, scaled the walls; the God remained dumb to the urgent appeals of his servants; fifty thousand Hindus suffered for their faith and the sacred shrine was sacked

* মূর্তিটিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয়। বিগ্রহের ভাঙা অংশগুলি ও মন্দিরের বিশাল ফটক গজনীতে বিজেতার প্রাসাদে বসানো হয় শোভা বর্ধনের জন্য।

1. Khwajah Nizamuddin Ahmed—Tabaqat-I-Akbari. Vol-I, P-11

to the joy of the true believers. The great stone was cast down and its fragments were carried off to grace the conqueror's palace. The temple gates were set up at Ghazni and a million pounds worth of treasure rewarded the iconoclast.)[1] খাজা নিজামুদ্দিনের বর্ণনায় — ......দুর্গ অধিকৃত হল। শুরু হল পরিকল্পনা অনুযায়ী ধ্বংস ও লুণ্ঠন। অসংখ্য মানুষ নিহত ও বন্দি হয়। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় সোমনাথ মন্দির। বিগ্রহকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয়। একটি টুকরো গজনীতে জামা মসজিদের দরওয়াজায় (সোপান?) স্থাপন করা হয়। (----the fort was taken, and the methods of plunder and destruction were carried into effect, and vast multitudes were killed and taken prisoner. The temples were pulled down, and destroyed from their very foundations. The idol of Somnath was broken to pieces, and one piece was sent to Ghazni, and was placed at the gate of the Jama Masjid; and for years it remained there)[2]

ঐতিহাসিক খাজা নিজামুদ্দিন আহম্মদের বিবরণ থেকে জানা যায়—মন্দিরে অনেক সুবর্ণ-নির্মিত বিগ্রহ ছিল। তাঁদের মধ্যে বৃহত্তম বিগ্রহের নাম ছিল মানত (Manat)*। কাবার মন্দির থেকে এই বিগ্রহ এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। (There were many golden idols in the temple in the city, and the largest of these idols was called Manat-------this idol was taken out of the house of Kaaba and was brought here)[3] ঐতিহাসিক Minhaj-as-Siraj লিখেছেন ঃ এক সহস্র মন্দির ভেঙে মামুদ জগদ্বিখ্যাত (ইসলামিক জগৎ) হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল সোমনাথ মন্দির ধ্বংস। সোমনাথ বিগ্রহ নিয়ে যান গজনীতে। তাকে ভেঙে চার টুকরো করা হয়। এক ভাগ শোভা পায় গজনীর জামা মসজিদে আর এক ভাগ রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকে। অবশিষ্ট দু'ভাগ পাঠিয়ে দেওয়া হয় মক্কা ও মদিনায়। (Minhaj-as-Siraj further tells how Mahmud became widely known for having destroyed as many as a thousand temples, and of his great feat in destroying the temple of Somnath and carrying off its idol, which he asserts was broken into four parts. One part he deposited

* ইসালম ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে মক্কাবাসীরা যে সকল দেবতার পূজা করত—তাঁদের মধ্যে 'মানত' ছিলেন অন্যতম প্রধান।

1. Quoted from Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-58
2. Khwajah Nizamuddin Ahmed—The Tabaqat-I-Akbari, Vol-8, P-15
3. Ibid, P-15

in the Jama Masjid of Ghazni, one he placed at the entrance of the royal palace, the third he sent to Mecca, and the fourth to Medina.)[1]

মামুদের ভারত অভিযান সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরুর বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ ঃ আরব থেকে মুসলমান এদেশে আসত আবার চলে যেত। তাঁরা মসজিদ নির্মাণ, ধর্মপ্রচার আবার ধর্মান্তরও করত। এসব নিয়ে কোন আপত্তি ওঠেনি; হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে হয়নি কোনো সংঘাত। কিন্তু একাদশ শতকে যখন ইসলাম ভারতে এল মুক্ত কৃপাণ হাতে বিজয়ীর ছদ্মবেশে তখনই সৃষ্টি হল প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। পূর্বের সহিষ্ণুতার পরিবর্তে দেখা দিল ঘৃণা ও সংঘর্ষ। প্রজ্বলিত মশাল ও মুক্ত কৃপাণ হাতে যিনি এলেন তিনি গজনীর সুলতান মামুদ। প্রতিবছর ভারত আক্রমণ করে তিনি হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করতেন। তারপর দেশে ফিরে যেতেন বিপুল ধন-সম্পদ ও লক্ষ বন্দী নরনারী নিয়ে। সুলতান মামুদ মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। শুধু কাশ্মীর অভিযানে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। উত্তর ভারতে তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিভীষিকা। ......থানেশ্বর আক্রমণ করে তিনি ২,০০,০০০ বন্দি ও প্রচুর সম্পদ নিয়ে দেশে ফিরে যান। ......মামুদ যখন সোমনাথ আক্রমণ করেন, তখন মন্দিরে হাজার হাজার নরনারী আশ্রয় নিয়েছিল। আশা ছিল দেবতার অলৌকিক শক্তি তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু ভক্তদের কল্পজগৎ ব্যতীত অলৌকিক লীলা কদাচিৎ ঘটে। মামুদ মন্দিরে আশ্রিত ৫০,০০০ নর-নারীকে হত্যা করে মন্দিরের সর্বস্ব লুঠ করে—সর্বশেষ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে সোমনাথ মন্দির। (Muslim Arabs came and built mosques, and sometimes preached their religion, and sometimes even converted people. There seems to have been no objection to this in those days, no trouble or friction between Hinduism and Islam ----It was only when in the eleventh century Islam came to India in the guise of a conqueror, sword in hand, that it produced violent reaction, and the old toleration gave way to hatred and conflict.

This weilder of the sword who came to India with fire and slaughter was Mahmud of Ghazni--------Year after year he raided India and sacked and killed and took away with him vast treasure and large number of captives. Altogether he made seventeen raids and only one of these into Kashmir – was a failure.....and he became

---

1. Dr. Titus—Indian Islam. P-22-23
Quoted from Dr. B.R.Ambedkar—Writings and Speeches.Vol-8, P-58

a terror all over the north.......From Thaneswar he took away, it is said 2,00,000 captives and vast wealth.........It is said that thousands of people took refuge in the temple when Mahmud approached, in the hope that a miracle would happen and the god they worshipped would protect them. But miracles seldom occur, except in the imaginations of the faithful, and the temple was broken and looted by Mahmood and 50,000 people perished--)[1]

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের (AMU) অধ্যাপক প্রয়াত মহম্মদ হাবিব (ইরফান হাবিবের পিতা) Sultan Mahmud of Ghazni বইতে হিন্দুস্থানে মামুদের জেহাদের সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে ধর্মীয় প্রেরণা নয় — বিপুল ঐশ্বর্যের লোভেই মামুদ সোমনাথ আক্রমণ করেন। 'মামুদের বিজয় বার্তা পেয়ে বাগদাদের খলিফা (মুসলিম জগতের ধর্মগুরু) বিশাল উৎসবের আয়োজন করেন। সেখানে মামুদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। তাঁকে তুলনা করা হয় পয়গম্বরের ঘনিষ্ঠ সহচর বীর মুসলিম যোদ্ধাদের সঙ্গে — যাঁদের শৌর্যে পরাজিত হয়েছে আরবিয়া, সিরিয়া, ইরান ও ইরাক। মহম্মদ হাবিবের বর্ণনা থেকে জানা যায় — মামুদ হিন্দুস্থানের "বেথেলহেম" প্রাসাদনগরী মথুরার বিস্ময়কর স্থাপত্যে মুগ্ধ হয়েও প্রায় ১০০০ মন্দির ধ্বংস করেন।"[2]

মামুদের হিন্দুস্থান অভিযানের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে মহম্মদ হাবিবের সঙ্গে নেহেরুর বিস্ময়কর ঐক্যমত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নেহেরু লিখেছেন — 'ইসলামের একজন মহান বীর রূপেই মামুদ পরিচিত, যিনি ভারতে এসেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে। অধিকাংশ মুসলমান তাঁকে শ্রদ্ধা করে—তেমনি অধিকাংশ হিন্দু তাঁকে ঘৃণা করে। অবশ্যই ধর্মে তিনি ছিলেন মুসলমান — কিন্তু তা নেহাতই নৈমিত্তিক বা দৈব। সর্বোপরি তিনি ছিলেন সৈনিক — শ্রেষ্ঠ সৈনিক। দুর্ভাগ্যক্রমে সৈনিকরা যা করে — তিনিও ভারতে এসেছিলেন জয় ও লুঠ করতে। তিনি অন্য ধর্মাবলম্বী হলেও এই কাজই করতেন।' (He is looked upon as a great leader of Islam who came to spread Islam in India. Most Muslims adore him, most Hindus hate him. As a matter of fact, he was hardly a religious man. He was a Mahammedan, of course, but that was by the way. Above everything he was soldier, and a brilliant soldier. He came to India to conquer and loot, as soldiers unfortunately do, and he would have done so

1. Pt. Nehru—Glimpses of World History, P-154-155
2. Arun Shourie and others—Hindu Temples—What Happened to Them, P-20.

to whatever religion he might have belonged.)[1] ধর্মপ্রচার নয় — মামুদ হিন্দুস্থানে এসেছিলেন ঐশ্বর্যের লোভে—লুঠ করার জন্য; নেহেরু ও মহম্মদ হাবিবের এই মত কতটা যুক্তিগ্রাহ্য? যেমন মন্দির—তেমনি বড় বড় মসজিদেরও ছিল প্রভূত সম্পদ। কিন্তু মামুদ কেন, কোনো মুসলমান আক্রমণকারী কখনও কোনো মসজিদ আক্রমণ করেনি। দ্বিতীয়ত, উদ্দেশ্য শুধুমাত্র লুণ্ঠন হলে মন্দিরে আশ্রিত প্রাণভয়ে ভীত ৫০,০০০ হিন্দুকে সোমনাথ মন্দিরে হত্যা করা হত না। তৃতীয়ত, সোমনাথ ও অন্যান্য মন্দিরের বিগ্রহ ভেঙে গজনী, মক্কা-মদিনার মসজিদের সোপানশ্রেণিতে বসানোর উদ্দেশ্য হিন্দুর ধর্মবোধকে চূড়ান্ত অপমান করা—তাঁর মর্মে আঘাত দেওয়া; লুণ্ঠন নয়।*

পণ্ডিত নেহেরুর বিশ্লেষণে সুচিন্তিত অভিমতের অভাব লক্ষণীয়। স্ব-বিরোধিতা সুস্পষ্ট। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী এদেশে আরব মুসলমানের অবাধ যাতায়াত আগে থেকেই ছিল। তারা মসজিদ নির্মাণ করত—ধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তরও করত। কিন্তু হিন্দু মুসলমানে কোনো সংঘাত হয়নি। একাদশ শতাব্দীতে যখন ইসলাম এদেশে এল মুক্ত কৃপাণ হাতে বিজয়ীর ছদ্মবেশে তখনই দেখা দিল প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কে এই অসিধারী ছদ্মবেশী? গজনীর সুলতান মামুদ। পণ্ডিত নেহেরুর ভাষায়—অধিকাংশ মুসলমান তাঁকে শ্রদ্ধা করে; অধিকাংশ হিন্দু তাঁকে করে ঘৃণা। মুসলমান তাঁকে শ্রদ্ধা করে কেন? লুণ্ঠনের জন্য? লুণ্ঠনের ভাগ পায় সৈন্যরা — সাধারণ মুসলমান নয়। সুতরাং তা শ্রদ্ধার কারণ হতে পারে না। নির্বিচারে ব্যাপক হত্যা, ধ্বংস ও ইসলামে ধর্মান্তর মামুদকে মুসলমানের নিকট গৌরব ও শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে। কারণ এই কাজে ইসলামের মহিমা প্রচার হয় — হয় অগ্রগতি। নির্মূল হয় কাফেরের ধর্ম। আর ঠিক এই কারণেই হিন্দু মানসে দেখা দেয় প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া — হিন্দু তাঁকে করে ঘৃণা।**

দ্বিতীয়ত, সুপ্রাচীন কাল থেকে বহির্বিশ্বে এদেশের পরিচিতি—হিন্দুস্থান। সকল মুসলমান ঐতিহাসিক ও বিজেতাগণ এদেশকে হিন্দুস্থান নামেই অভিহিত করেছে। "India" বা "ভারত" নামের প্রচলন ইংরেজ শাসনকালে। "সিন্ধু"—ভাষা ও উচ্চারণগত কারণে পারসিকদের নিকট হয় "হিন্দু"—গ্রিকদের ইন্দু (Indu–Indus valley civilization) সর্বশেষ ইংরেজদের কাছে India. সিন্ধু-হিন্দু-ইন্দু-ইন্ডিয়া। নেহেরু

* মামুদের সভা ঐতিহাসিক উৎবী (Utbi) বলেন, 'নিজ বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি মামুদ মহৎ কর্তব্য পালন করে গেছেন।'

** মুসলিম ঐতিহাসিক সুপণ্ডিত অলবেরুনী মামুদের সমসাময়িক। মামুদের অত্যাচার সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ 'হিন্দুদের যেন ধূলিকণার মত, পুরাতন জনশ্রুতির মতো চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের বিক্ষিপ্ত অবশেষ মুসলমানদের উপর গভীর ঘৃণা পোষণ করে।'[2]

1. Pt. Nehru—Glimpses of World History, P-155
2. পণ্ডিত নেহেরু—ভারত সন্ধানে, পৃঃ ১৯৮

সচেতনভাবেই India বা ভারত এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। হিন্দুস্থানের পরিবর্তে India বা "ভারত" শব্দের প্রয়োগ উদ্দেশ্যপূর্ণ।

১০১৭ খ্রিঃ কনৌজ আক্রমণ করে মামুদ এত সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী গজনীতে নিয়ে গিয়েছিলেন যে তা গুণে শেষ করা যায়নি। এই সকল বন্দীদের দাস বাজারে (Slave market) বিক্রি করা হত। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে ক্রেতার অভাব দেখা দেয়। তখন তাঁদের নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করা হত। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণী উদ্ধৃত করে Dr. Titus বলেছেন ঃ যুদ্ধবন্দীদের বিক্রি করা হত ২-১০ দিনারে (১ দিনারের মূল্য ৫০/৬০ পয়সা)। এর থেকেই যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব। এই বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হত গজনীতে। তাঁদের কেনার জন্য দূরদেশ থেকে আসত বণিকের দল।.....এবং সুন্দর-কুৎসিত, ধনী-দরিদ্র সকলেরই হল এক পরিণতি—দাসত্ব। ("The number of prisoners may be conceived from the fact that each was sold for from two to ten dirhams. These were afterwards taken to Ghazni, and merchants came from far distant cities to purchase them;------ and the fair and the dark, the rich and the poor were comingled in one common slavery.')[1] সাহিবে কমলের (Sahibe Kamal) লেখক দৌলত রায়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে মামুদ লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে হত্যা করে। আরও লক্ষ লক্ষকে দাস-দাসী করে গজনীর বাজারে বিক্রি করে মাথা পিছু ২ দিনার মূল্যে।[2]

হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে প্রত্যেক মুসলিম আক্রমণকারীর লক্ষ্য ছিল যত বেশি সম্ভব মন্দির ধ্বংস করা, হিন্দু হত্যা করে হিন্দুস্থানকে পৌত্তলিকতার পাপ থেকে মুক্ত

শুধু সুলতান মামুদ নয়—সকল মুসলিম বিজয়ী বীরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামের মহিমা—বিশ্বব্যাপী আল্লার মাহাত্ম্য প্রচার। পয়গম্বরের তিরোধানের পর ইসলামের রণোন্মত্ত বাহিনী পূর্বে ও পশ্চিমে অভিযান করে। পূর্বে হীরাট, কাবুল ও সিন্ধু পর্যন্ত অধিকার করে। পশ্চিম দিকে সেনাপতি ওকবা (Okba) মরোক্কোর পঃ উপকূলে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে উপস্থিত হন। কিন্তু হতাশ হন সম্মুখে দুরতিক্রম্য বাধা দেখে। তবু তিনি সাগর পাড়ি দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অনন্ত জলরাশি, ভূ-ভাগের চিহ্নমাত্র নেই। অবশেষে পরমশক্তিমান আল্লার নিকট আক্ষেপ করে বলেন—এদিকে আর কোন দেশ নেই যা সে তাঁর (আল্লার) নামে জয় করতে পারেন। (General Okba went right across northern Africa till he reached the Atlantic ocean, on the western coast of what is now known as Morocco. He was rather disappointed at the Obstacle, and he rode as far as he could into the sea, and then expressed his sorrows to the Almighty that there was no more land in that direction for him to conquer in his name.)[3]

---

1. Dr. Titus—Indian Islam, P-26
Quoted from Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches Vo.-8, P-61
2. Daulat Roy—Sahibe Kamal, P-4
3. Pt. Nehru—Glimpses of World History, P-146

করা; হিন্দু নর-নারীকে বন্দী করে আরবের "দাস বাজারে" (Slave Market) বিক্রি করা এবং যথেচ্ছ লুণ্ঠন করা। এ ব্যাপারে সুলতান মামুদের ভূমিকা ইসলামের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ঐতিহাসিক Dr. Titus-এর ভাষায়—শুধু মন্দির ধ্বংস ও হত্যা নয়, বিজিতদের জন্য ছিল কঠিনতম শাস্তি—দাসত্ব। হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে জেহাদে আকৃষ্ট করার জন্য সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্যদের লুণ্ঠনের ভাগ দেওয়া হত। মামুদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কাফেরদের নির্বিচার হত্যা, তাঁদের মন্দির ধ্বংস, লক্ষ লক্ষ হিন্দু নর-নারীকে বন্দী করা এবং লুণ্ঠন। প্রথমবার ভারত আক্রমণেই মামুদ ৫০,০০০ হিন্দুকে বন্দী করে গজনীতে নিয়ে যান। (Not only was slaughter of the infidels and the destruction of their temples resorted to in earlier period of Islamic contact with India, but as we have seen, many of the vanquished were led into slavery. The dividing up of booty was one of the special attraction, to the leaders as well as to the common soldiers in these expeditions. Mahamud seems to have made the slaughter of infidels, the destruction of their temples the capturing of slaves and the plundering of the wealth of the people, particularly of the priests, the main object of his raids. On the ocassion of his first raid he is said to have taken much booty, and half a million Hindus, 'beautiful men and women' were reduced to slavery and taken back to Ghazni)[1].

ঐতিহাসিক Will Durant বলেন ঃ 'সব সময়ই তিনি অধিকৃত রাজ্যের অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করতেন না। ক্রীতদাসরূপে বিক্রির জন্য তাদের বন্দি করে গজনীতে নিয়ে যেতেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত বেশি হল যে ক্রেতার অভাব দেখা দিল। মুষ্টিমেয় ক্রেতা যারা দাস বাজারে আসত তারা ক্রীতদাসের মাথাপিছু দাম দিত মাত্র কয়েক শিলিং। প্রতিবার অভিযানের পূর্বে মামুদ নতজানু হয়ে আল্লাহ্‌র দোয়া প্রার্থনা করতেন। সুদীর্ঘকাল রাজত্বের পর তাঁর গৌরবোজ্জ্বল বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান ঘটে ১০৩০ খ্রিঃ। মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিচারে মামুদ ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট।' (Sometimes he spared the population of ravaged cities and took them home to be sold as slaves; but so great was the number of such captives that after some years no one could be found to offer more than a few shillings for a slave. Before every important engagement,

1. Dr. Titus—Indian Islam, P-24
Quoted from Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches Vo.-8, P-61

Mahmud knelt in prayer, and asked the blessing of God upon his arms....He reigned for a third of a century, and when he died, full of years and honours, Moslem historians ranked him as the greatest monarch of his time, and one of the greatest sovereigns of any age.)[1]

মহম্মদ ঘোরী

মামুদের মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারের অভাবে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে ১১৭৩ খ্রিঃ তুর্কো-আফগান গোষ্ঠীর গিয়াসুদ্দিন ঘোরী গজনীর সিংহাসন অধিকার করেন। মহম্মদ ঘোরী ছিলেন গিয়াসুদ্দিনের ভ্রাতা। ১১৮৬ খ্রিঃ তিনি গুজরাট আক্রমণ করেন। কিন্তু শক্তিশালী নরপতি ভীমদেব-২য়-এর নিকট চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকার করে কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন। ১১৯১ খ্রিঃ মহম্মদ ঘোরী এক বিশাল বাহিনী নিয়ে হিন্দুস্থান অভিযান করেন। মাতৃভূমির বিপদ উপলব্ধি করে উত্তর ভারতের প্রায় সকল হিন্দু নৃপতি অন্তর্কলহ ভুলে দিল্লীর শাসক চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হন (মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসে এরকম ঐক্য কদাচিৎ দেখা গেছে)। কুরুক্ষেত্র এবং পানিপথের অদূরে তরাইনের রণক্ষেত্রে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনী সমবেত হয়। মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বিরাজের ভ্রাতার সঙ্গে দ্বৈত যুদ্ধে গুরুতর আহত ও পরাজিত হন। অবরুদ্ধ ও বিধ্বস্ত হয় তাঁর সেনাবাহিনী। সম্ভবত পৃথ্বীরাজের মহানুভবতায় মহম্মদ ঘোরী পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এই পরাজয়ের গ্লানি তিনি ভুলতে পারেননি। এক বছর পরে, ১১৯২ খ্রিঃ তিনি পুনরায় হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন। তরাইনের রণক্ষেত্রে সম্মিলিত হিন্দুবাহিনী পরাজিত হয়। রাজা পৃথ্বীরাজ বন্দী হন। মহম্মদ ঘোরীর আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক V.A.Smith বলেছেন — তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধে হিন্দুদের পরাভব হিন্দুস্থানে পরবর্তী মুসলিম আক্রমণের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করে (In fact, the second battle of Tarain in 1192 may be regarded as the decisive contest which ensured ultimate success of the Muslim attack on Hindusthan).[2]

দিল্লিতে সুলতান শাহীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে Will Durant বলেন — তুর্কি-আফগান বংশীয় ঘোরী ভারত আক্রমণ করে দিল্লী অধিকার করেন। ধ্বংস হয় সকল মন্দির। লুণ্ঠিত হয় ধন-সম্পদ। প্রতিষ্ঠিত হল সুলতান শাহী। প্রায় ৩০০ বছর এই বিদেশি স্বৈরাচারী সুলতানি শাসন সমগ্র উত্তর ভারতের উপর জাঁকিয়ে বসেছিল। পরে অভ্যন্তরীণ

1. Will Durant—The Story of Civilization, P-460
2. V. A. Smith—The Oxford History of India, P-235

বিদ্রোহ ও গুপ্তহত্যায় সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে। (The Ghuri, A Turkish Tribe of Afganistan invaded India, captured the city of Delhi, destroyed its temples, confiscated its wealth, and settled down in its palaces, to establish the Sultanate of Delhi – an alien despotism fastened upon northern India for three centuries and ckecked only by assassination and revolt).[1]

হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর সাফল্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে মুসলিম ঐতিহাসিক Hassan Nizami বলেন—'তিনি তাঁর শাণিত কৃপাণের দ্বারা হিন্দুস্থান থেকে অবিশ্বাস (ইসলাম ধর্মে) ও ব্যভিচারের পাপ নির্মূল করেন। মুক্ত করেন সমগ্র দেশকে বহু-দেবত্ববাদ ও মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে। তাঁর অমিতবিক্রম, দুর্জয় সাহস ও ক্ষাত্র শৌর্যের রুদ্র তেজে ধ্বংস হয় সকল মন্দির (He purged by his sword the land of Hind from the filth of infidelity and vice, freed the whole of that country from the thorn of God-plurality and the impurity of idol-worship and by his regal vigour and intrepidity left not one temple standing.)[2]

কুতুবুদ্দিন আইবক ঃ

তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভ করে মহম্মদ ঘোরী স্বদেশে ফিরে যান। ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন-আইবকের উপর অর্পিত হয় ভারত সাম্রাজ্যের দায়িত্ব। কুতুবুদ্দিন তাঁর মনিবের ন্যায় ছিলেন ধর্মান্ধ—ভয়ংকর ও নির্দয়। মুসলিম ঐতিহাসিকের সপ্রশংস মন্তব্য 'তাঁর ছিল লক্ষ গুণ — তিনি লক্ষ মানুষকে (হিন্দু) হত্যা করেন।' (Kutbuddin Aibak was a normal specimen of his kind–fanatical, ferocious and merciless. His gifts, as the Mahammadan historian tells us, 'were bestowed by hundreds of thousands, and his slaughters likewise were by, hundreds of thousands.')[3] কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি বখতিয়ারের পুত্র মহম্মদ খলজি ১১৯৩ খ্রিঃ বিহার জয় করেন। বিহারে তখন রাজ পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য। যদিচ তার শক্তি ক্ষীয়মাণ। মুসলিম ঐতিহাসিক হিন্দু ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোনো পার্থক্য বিচার করেননি। তাঁর মতে জনগণের অধিকাংশই ছিল মুণ্ডিতমস্তক (বৌদ্ধ হতে পারেন)

1 Will Durant—The Story of Civilization, P-460-461
2 Dr B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-56
3 Will Durant—The Story of Civilization, P-461

ব্রাহ্মণ—যাঁদের সকলকেই হত্যা করা হয়। এক বিশাল গ্রন্থাগার ধ্বংস করা হয়।* বেনারসের সন্নিকটে সারনাথে বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আজও মূর্তি ভঙ্গকারীদের ক্রোধ ও বিদ্বেষের সাক্ষ্য বহন করে। (The muslim historian indifferent to distinctions among idolators, states that the majority of the inhabitants were 'Shaven-headed Brahmins, who were all put to the sword.'---A great library was scattered. The ashes of the Buddhist sanctuaries at Sarnath near Benaras still bear witness to the rage of the image breakers.)[1] ১২০৩ খ্রিঃ আইবক বুন্দেলখণ্ড জয় করেন। তৃপ্ত, পূর্ণ-অভিলাষ ঐতিহাসিকের বর্ণনায়—সকল মন্দির রূপান্তরিত হল মসজিদে......পৌত্তলিকতার নাম পর্যন্ত লুপ্ত হয়। ৫০০০০ মানুষ (হিন্দু) দাসত্বের শৃঙ্খলে হল বন্দি। (The gratified historian of the conqueror's exploits states that the temples were converted into mosques........and the very name of idolatry was anihilated........fifty thousands men came under the collar of slavery)[2]

ঐতিহাসিক Dr. Titus-এর বিবরণ থেকে জানা যায় — 'কুতুবুদ্দিন আইবক প্রায় ১০০০ মন্দির ধ্বংস করেন — সেখানেই তৈরি করেন মসজিদ। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত জামা মসজিদ নির্মাণ করেন। হাতির সাহায্যে যে সকল মন্দির ধ্বংস করেছেন সেই সকল মন্দিরের বহু মূল্যবান পাথর ও রত্নরাজি নিয়ে সুসজ্জিত করেন জামা মসজিদ; — কোরানের দিব্য বাণী খোদিত করেন মসজিদের দেয়ালে। এ কাহিনি খোদিত আছে জামা মসজিদের পূর্ব দিকের দরওয়াজায়। সেখানে উল্লেখ আছে যে ২৭টি মন্দির ধ্বংস করে তার সামগ্রী দিয়ে নির্মিত হয় জামা মসজিদ।'[3]

উলুগ্ খান বলবন ঃ সুলতান নাসিরুদ্দিন ছিলেন অপুত্রক। মন্ত্রী ও শ্বশুর বলবন উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন। বলবন ছিলেন ঘোর অত্যাচারী, নির্মম ও নিষ্ঠুর। এই সময় দোয়াব অঞ্চলের হিন্দুরা বিদ্রোহ করে। ১২৬০ খ্রিঃ বলবন বিদ্রোহী হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ২০ দিনের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পর্যুদস্ত করেন। নির্বিচারে চলে হত্যা ও লুণ্ঠন। বিদ্রোহীদের ২০০ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বন্দী করে দিল্লী আনা হয়। সুলতানের আদেশে ১০০ বন্দীকে হাতীর পায়ের তলায় নিক্ষেপ করে অথবা ভীষণ-দর্শন তুর্কী

---

* এখানে বিহারের বিশ্ববিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল গ্রন্থাগারের কথা বলা হয়েছে। ভারত ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ১০০০০ আবাসিক ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। মহম্মদ খলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০০০ ছাত্রকেই হত্যা করে। গ্রন্থাগারের বিপুল পুস্তকভাণ্ডারকে সেনা বাহিনীর রান্নার জ্বালানি রূপে ব্যবহার করে।

1. Vincent A. Smith—The Oxford History of India, P-235
2. Vincent A. Smith—The Oxford History of India, P-236
3. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches. Vol-8, P-59

জল্লাদের দ্বারা হত্যা করা হয়। জীবন্ত চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয় প্রায় ১০০ বন্দীর। অতঃপর সেই চামড়ার খোলের মধ্যে খড় ভর্তি করে দিল্লীর প্রতিটি ফটকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এইরূপ ভয়ংকর শাস্তি দিল্লীবাসীরা কোনোদিন শোনেনি (---About a hundred met their death at the hands of the flayers, being skinned from head to foot; their skins were all stuffed with straw and some of them were hung over every gate of the city---Delhi remembered no punishment like this, nor had one ever heard such a tale of horror.)[1] Will Durant বলেন আর একজন সুলতান বলবন, বিদ্রোহী ও দস্যুদের হাতীর পায়ের তলায় ফেলে শাস্তি দিতেন। অথবা বিদ্রোহীদের জীবন্ত চামড়া ছাড়িয়ে — তারপর সেই চামড়ার খোলে খড় ভর্তি করে দিল্লীর ফটকে ঝুলিয়ে রাখা হত। (Another Sultan Balban, punished rebels and brigands by casting them under the feet of elephants, or removing their skins, stuffing these with straw, and hanging them from the gates of Delhi).[2]

এইরূপ ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়েও হিন্দুদের সম্পূর্ণ দমন করা যায়নি। ১২৬০ খ্রিঃ জুলাই মাসে সুলতান বলবন বিদ্রোহী হিন্দুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। 'এই আক্রমণের সম্ভাবনা হিন্দুরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। ১২,০০০ নরনারী ও শিশু বন্দী ও নিহত হল। আল্লাহ্‌র অসীম কৃপায় ইসলামের এই বিজয় সম্ভব হয়েছে। তাঁকে জানাই কৃতজ্ঞতা' (Even so a second stroke was needed, in july-1260. 'He fell upon the insurgents unawares, and captured them all, to the number of 12,000 – men, women and children–whom he put to the sword. Thanks be to God for this victory of Islam').[3]

মহম্মদ বিন্ তুঘলক ঃ পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী বলে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ঐতিহাসিক Will Durant-এর ভাষায়, হত্যা ও বর্বরতায় তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের কীর্তিকেও ম্লান করেছেন। জনৈক মুসলিম ঐতিহাসিকের বর্ণনায়—তিনি এত হিন্দুহত্যা করেছেন যে তাঁর রাজপ্রাসাদ ও দরবারের সম্মুখে সর্বদাই রাশি রাশি মৃতদেহ স্তূপীকৃত থাকত। সর্বক্ষণ হত্যা ও মৃতদেহ সরানোর কাজে নিযুক্ত জল্লাদ ও সাফাইওয়ালার দল ক্লান্ত হয়ে পড়ত (---Surpassed his predecessors in bloodshed and brutality. He killed so many Hindus

1. V. A. Smith—The Oxford History of India, P-240-241
2. Will Durant—The Story of Civilization, P-461
3. V. A. Smith—The Oxford History of India, P-241

that, in the words of a Muslim historian, 'there was constantly in front of his royal pavilion and his civil court a mound of dead bodies and a heaps of corpses, while the sweepers and executioners were wearied out by their work of dragging')[1]

ফিরোজ শাহ্ তুঘলক ঃ

মহম্মদ বিন্ তুঘলকের মৃত্যুর পর ফিরোজ শাহ্ তুঘলক দিল্লীর মসনদে আসীন হন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারাউনির মতে ফিরোজ শাহ্ ছিলেন দয়ালু ও প্রজাবৎসল সুলতান। তাঁর রাজত্বে প্রজারা সুখে-শান্তিতেই বাস করত। ক্রীতদাস সংগ্রহের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। সেনাপতিদের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যুদ্ধে যত সম্ভব অধিক সংখ্যায় হিন্দুদের বন্দী করে ক্রীতদাস সংগ্রহ করতে হবে। তাঁদের মধ্যে বাছাই করে সেরা দলটিকে সুলতানকে দিতে হবে উপঢৌকন। যে সব সেনাপতি অধিক সংখ্যক ক্রীতদাস পাঠাতেন, তাঁদের দেওয়া হত বিশেষ পুরস্কার। সুলতানের ছিল ১২,০০০ ক্রীতদাস — যাঁদের বিভিন্ন পেশাগত দক্ষতা ছিল। ৪০,০০০ ক্রীতদাস প্রহরা ও প্রাসাদের বিভিন্ন কাজের তদারকিতে নিযুক্ত ছিল। রাজধানী ও বিভিন্ন প্রদেশে মোট ১,৮০,০০০ ক্রীতদাস ছিল। কালক্রমে এই সকল ক্রীতদাস অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। এইভাবে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা সহজ বলেই সুলতান দাস ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। (The Sultan was very diligent in providing slaves, and he carried his care so as to command his great fief holders and officers to capture slaves whenever they were at war, and to pick out and send the best for the service of the court.---Those chiefs who brought many slaves received the highest favour---About 12,000 slaves became artisans of various kinds. Forty thousands were every day in readiness to attend as guards in the Sultan's equipage or at the palace. Altogether, in the city and in the various fiefs, there were 1,80,000 slaves-------. The slaves, of course, all became Muslims, and the proselytism thus effected probably was the chief reason why the sultan favoured the system.)[2] Will Durant বলেন ফিরোজ শাহ্ বঙ্গদেশ আক্রমণ করে প্রতি হিন্দুর ছিন্ন শিরের জন্য নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১,৮০,০০০

1. Will Durant—The Story of Civilization, P-461
2. V. A. Smith—The Oxford History of India, P-258

হিন্দুর ছিন্ন মুণ্ডের জন্য তাঁকে নগদ মূল্য দিতে হয়েছে। হিন্দু ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্য তিনি বিভিন্ন গ্রামে হানা দিতেন। (Firoz Shah invaded Bengal, offered a reward for every Hindu head, paid for 1,80,000 of them, raided Hindu villages for slaves.)[1]

কিন্তু ফিরোজ শাহ ছিলেন ধর্মান্ধ। কাফেরদের ধর্মাচরণ তাকে ভয়ংকর করে তুলত। তাঁর নিজের বর্ণনা অনুযায়ী—(আমার আদেশে) একজন উলেমা জনৈক মাধীকে (Mahdi) স্বহস্তে বধ করেছে। সুলতান লিখেছেন— 'এই মহৎ কাজের জন্য আমি পরকালে নিশ্চয়ই পুরস্কার পাব।'

দিল্লীর উপকণ্ঠে মালুয়া গ্রামে হিন্দুদের একটি ধর্মীয় উৎসব চলেছে। সে উৎসবে কতিপয় নিচু শ্রেণীর মুসলমানও যোগ দিয়েছে। এই সংবাদ শুনে সুলতান স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হলেন।

'আমি এই ঘৃণ্য উৎসবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম। সাধারণ হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যায় আমার অবশ্য নিষেধ ছিল। কিন্তু আমি তাঁদের দেবতার মন্দির ভেঙ্গে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করি।'

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দিচ্ছেন—যে ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। (I ordered that the leaders of these people and promoters of this abomination should be put to death. I forbade the infliction of any severe punishment on the Hindus in general, but I destroyed their idol temples and instead thereof raised mosques.

The historian witnessed the burning alive of a Brahmin who had practised his rites in public.)[2]

ফিরোজ শাহ ছিলেন খাঁটি মুসলমান। ইসলাম ধর্মের প্রসারে তিনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মুসলমান হবার জন্য তিনি কাফের হিন্দুদের উৎসাহ দিতেন। তিনি ঘোষণা করেন, যাঁরা মুসলমান হবে তাঁদের জিজিয়া কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। সুলতানের এই ঘোষণা সাম্রাজ্যব্যাপী প্রচারিত হলে বহুসংখ্যক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাঁদের জিজিয়া কর থেকে ছাড় দেওয়া হয় এবং সম্মান জানানো হয় মূল্যবান উপহার দিয়ে।

ঐতিহাসিক V.A.Smith বলেন, বর্তমান মুসলিম জনসংখ্যার এক বিরাট অংশই এইভাবে হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে। উৎকোচ দিয়ে ধর্মান্তর করার এই পদ্ধতি পরবর্তী

1. Will Durant—The Story of Civilization, P-461
2. Vincent A. Smith—The Oxford History of India, P-259

শাসকগণও অনুসরণ করেছেন। (Such was the origin of a large part of the existing Muslim population. Several other sovereigns continued the process of conversion by bribery.)[1]

তৈমুরলঙ ঃ

ইসলামের গৌরব, শ্রেষ্ঠ বীর; হিন্দুস্থানের ত্রাস! তিনি তাঁর আত্মজীবনী ও বিভিন্ন রচনায় হিন্দুস্থান জয়ের কাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সমরখন্দে সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করেন। এবার তিনি হিন্দুস্থান জয় করতে সংকল্প করেন। তিনি তাঁর পুত্রগণ ও আমীরদের অভিমত জানতে চাইলেন।

যুবরাজ পীর মহম্মদ জাহাঙ্গীর বলেন ঃ 'স্বর্ণ প্রসবিনী হিন্দুস্থান জয় করে আমরা হব বিশ্বজয়ী।' (Behold, when we shall subdue the empire of Hind, with the gold of Hind, we shall become the conqueror of the world.)

যুবরাজ সুলতান হোসেন বলেন ঃ 'আমরা যখন হিন্দুস্থান জয় করব—তখন আমরা হব চার দেশের শাসক ও প্রভু'—When we shall have conquered Hindusthan, we shall become the lords and rulers of four regions.*

আমীরগণ বলেন ঃ 'যদিও আমরা হিন্দুস্থান জয় করতে পারি, কিন্তু সেদেশে আমরা যদি থেকে যাই, আমাদের সন্তান ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণ হিন্দের (হিন্দুস্থান) ভাষায় কথা বলবে; তাঁরা হারাবে তাঁদের পূর্ব পুরুষদের শৌর্য-বীর্যের ঐতিহ্য। কালক্রমে আমাদের বংশধরগণ কালস্রোতে হবে লুপ্ত।' The Ameers spoke and said 'Although we may subdue Hind, yet if we tarry in that land, our posterity will be lost; and our children, and our grand children, will degenerate from the vigour of their fore-fathers, and become speakers of the language of the Hind.'

আমার হিন্দুস্থান জয়ের সংকল্প অনড় অটল। তার থেকে আমি বিরত হব না। আমি তাঁদের বললাম, আমি খোদা ও কোরানের নির্দেশ প্রার্থনা করব। খোদার যে রূপ ইচ্ছা আমি তাই করব। তাঁরা সকলেই সম্মতি জানালেন।

And I had resolved on the conquest of Hindostun, and I was loth to desist from my resolution : and I answered them saying; 'I

---

* গ্রীসের অনুসরণে আরব ও পারস্যবাসীরা পৃথিবীকে (যে অংশে জনবসতি আছে।) সাত অংশে ভাগ করত। এখানে তার চার অংশকে বোঝানো হয়েছে।

1. Ibid, P-259

will turn to Almighty God, and I will seek the sign of war in the Koran, that whatever be the will of God, that I may do'; And they all consented thereto.

আমি সঠিক নির্দেশের জন্য পবিত্র কোরানের শরণাপন্ন হলাম—প্রথম যে আয়াতটি আমার দৃষ্টিগোচর হল, তাতে বলা হয়েছে 'হে মহম্মদ! বিধর্মী-ও অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো'। উলেমাগণ যখন এই বাণীটির তাৎপর্য আমীরদের নিকট ব্যাখ্যা করলেন, নীরব লজ্জায় তাঁরা অধোবদন হলেন। তাঁদের নীরবতায় আমারও কষ্ট হল।

And when I sought an omen in the holy book, this sacred verse came forth–"O prophet fight with the Infidels and Unbelievers". And when the doctors of the law explained the meaning of the verse to the Ameers, they hung down their heads, and they were silent. And my heart was grieved by their silence.[1] তৈমুর লঙ তাঁর আত্মজীবনী Malfuzat-I-Timuri-তে হিন্দুস্থান আক্রমণের উদ্যোগ পর্ব প্রায় অনুরূপ ভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ এই সময় কাফেরদের বিরুদ্ধে এক অভিযানের প্রবল বাসনা আমার হৃদয়-মনকে আলোড়িত করে। কারণ, আমি শুনেছি ধর্মযুদ্ধে (জেহাদ) কাফের হত্যা করলে "গাজী" হওয়া যায় এবং নিহত হলে হয় "শহীদ"। কিন্তু আমি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। জেহাদ কার বিরুদ্ধে ? চিন অথবা হিন্দুস্থান? আমি সঠিক নির্দেশের জন্য পবিত্র কোরান শরীফের শরণাপন্ন হলাম। প্রথম যে আয়াতটি আমার দৃষ্টিগোচর হল তাতে বলা হয়েছে ঃ 'হে মহম্মদ! অবিশ্বাসী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তাদের কঠোর শাস্তি দাও'। About this time there arose in my heart the desire to lead an expedition against the infidels, and to become a ghazi; for it had reached my ears that the slayer of infidels is a Ghazi, and if he is slain, he becomes a martyr....but I was undetermined in my mind, whether I should direct my expedition against the infidels of China or against the infidels and polytheists of India. In this matter, I sought an omen from the Koran, and the verse I opened upon was this, 'O prophet, make war upon infidels and unbelievers and treat them with severity.....')[2]

1. INSTITUTES, Political and Military of the Emperor Timur : originally written in the Turkish language by the Timur...translated in English by Major Davy. P-71, 73
2. Quran P-66-9
   Timur—Malfuzat-I-Timuri, P-394-395
   Ouoted from—The Calcutta Koran Petition, P-57-58

অতঃপর সকলের মতামত জানার জন্য তিনি যুবরাজ ও আমীরগণকে মন্ত্রণা সভায় আহ্বান করলেন।

যুবরাজ মহম্মদ সুলতান বলেন ঃ 'হিন্দুস্থান এক বিশাল রত্নভাণ্ডার। সেদেশে আছে ১৭টি সোনা ও রূপার খনি। আছে পান্না, চুনি ও হিরার খনি। পাওয়া যায় টিন, লোহা, স্টিল, তামা, পারদ ইত্যাদি। শস্যশ্যামলা হিন্দুস্থানের জলবায়ু খুব মনোরম।....অধিবাসীরা যেহেতু বহু-দেবতায় বিশ্বাসী, পৌত্তলিক, সূর্য-উপাসক ও কাফের—আল্লাহ্ এবং তাঁর পয়গম্বরের নির্দেশ অনুযায়ী এই দেশটিই আমাদের জয় করা উচিত। (Then the prince Mahammed Sultan said : 'The whole country is full of gold and jewells, and in it there are seventeen mines of gold and silver, diamond and ruby and emerald, and tin and iron and steel and copper and quicksilver etc.....it is a country which is green and verdant and the whole aspect of the country is pleasant and delightful. Now, since the inhabitants are chiefly polytheists and infidels and idolators and worshippers of the sun, by the order of Allah and his prophet, it is right for us to conquer them')[1]* চীন নয়, সকলের সম্মতিতে হিন্দুস্থান অভিযানের সিদ্ধান্তই গৃহীত হল। আত্মজীবনীতে তৈমুর তাঁর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন —

হিন্দুস্থান আক্রমণে আমার উদ্দেশ্য হল ঃ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করে মহম্মদের (তাঁর ও তাঁর পরিবারের ওপর আল্লার কৃপা বর্ষিত হোক) নির্দেশ অনুসারে তাদের সত্যধর্ম ইসলামে ধর্মান্তরিত করা, অবিশ্বাস ও পৌত্তলিকতার পাপ থেকে দেশকে

---

* সুতরাং ভারতের অতুল ঐশ্বর্য লুণ্ঠনের লোভ অতিরিক্ত প্রেরণা মাত্র—মূল প্রেরণা হল ধর্মীয়। আল্লাহ লুণ্ঠনের জন্য ধর্মযুদ্ধের নির্দেশ দেননি। লুণ্ঠন উপরি পাওনা। পৌত্তলিক কাফেরদের নির্মূল করে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় কেতন ওড়াবার জন্যই কোরানে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের অলঙ্ঘ্য বিধান। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নির্দেশ, 'তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতদিন না (তাদের) ধর্মদ্রোহীতা দূর হয় এবং আল্লাহ্র দীনধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়' (কোরান)—২-১৯৩। চীন ও হিন্দুস্থান—উভয় দেশই বিধর্মী। তবে চীনের পরিবর্তে হিন্দুস্থান আক্রমণের সিদ্ধান্ত হল কেন? এরকম হতে পারে-—চীনে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্ম—তারা বহু দেবতায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু হিন্দুরা বহু দেবতায় বিশ্বাস করে। চীন অনেক দূরে। দুর্গম পর্বত ও গোবী মরুভূমি অতিক্রম করে চীনে যেতে হবে। সেদেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে হয়তে পর্যাপ্ত তথ্য তৈমুরের জানা ছিল না। পক্ষান্তরে হিন্দুস্থান নিকটবর্তী। ইতিপূর্বে সেখানে বহুবার মুসলিম আক্রমণ ঘটেছে—সেদেশের মুসলিম জনসংখ্যাও কম নয়। হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলমানের সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে—অন্তত তারা সক্রিয় বিরোধিতা করবে না এরকম আশা করা যায়। তাছাড়া হিন্দুস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, ও অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য তৈমুরের জানা ছিল। সম্ভবত এ সকল কারণেই তিনি হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।

---

1. Timur—Malfizat-I-Timuri, P-394-395
   Quoted from The Calcutta Koran Petition, P-58

মুক্ত করা এবং মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করা। এর দ্বারা আমরা হব "গাজী" ও "মুজাহিদ" (My object in the invasion of Hindustan is to lead a campaign against the infidels, to convert them to the true faith according to the command of Muhammad (on whom and his family be the blessing and peace of God), to purify the land from the defilement of misbelief and Polytheism, and overthrow the temples and idols, whereby we shall be "Ghazis" and "Mujahids".[1]

১৩৯৮ সাল। কাটোর, (Kator) উঃ পঃ সীমান্তের একটি ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য। হিন্দুস্থানে তৈমুরের প্রথম আক্রমণ এই রাজ্যের বিরুদ্ধে। অধিবাসীরা বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে জয় অসম্ভব বুঝে দুর্গম পাহাড়ে আশ্রয় নিল। তৈমুর পরিত্যক্ত নগরী লুণ্ঠন ও ধ্বংসের আদেশ দেন। তার আদেশে মুসলিম বাহিনী আল্লা-হো-আকবর রণধ্বনি দিয়ে পাহাড়ে উঠে হিন্দুদের আক্রমণ করে। নিহত হল অসংখ্য হিন্দু। বহু আহত হল—পালিয়ে গেল অনেকে। তৈমুর আক সুলতানকে (Ak Sultan) পাঠালেন পরাজিত হিন্দু বাহিনীর নিকট। শর্ত—ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত। তাঁরা সকলেই প্রাণ রক্ষার তাগিদে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর দুর্বিনীত অবাধ্য অবিশ্বাসীদের ছিন্নমুণ্ড দিয়ে পাহাড়ের ওপর তৈরি হল স্তম্ভ (Next he directed towers to be built on the Mountain of the skulls of those obstinate unbelievers.)[2]

এগিয়ে চলে তৈমুর বাহিনী। লক্ষ্য রাজস্থানের ভাটনীর (Bhatnir) রাজ্য। রাজা দুল চাঁদ শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু রণোন্মত্ত মুসলিম বাহিনীর প্রবল আক্রমণে চূর্ণ হয় রাজপুত প্রতিরোধ। মাত্র এক ঘন্টার যুদ্ধে নিহত হয় ১০ হাজার রাজপুত। লুণ্ঠিত হয় ধন সম্পদ ও শস্যাগার। ভস্মীভূত হয় দুর্গ ও সংলগ্ন অট্টালিকা-সমূহ। (......and in the course of one hour the heads of ten thousand infidels were cut off. The sword of Islam was washed in the blood of the infidels, and all the goods and effects, the treasure and the grain....became the spoil of my soldiers. They set fire to the houses and reduced them to ashes, and they razed the buildings and the fort to the ground.)[3]

---

1. Lane poole—Medieval India, P-155
   Quoted from Dr. B.R.Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-56
2. A. Ghosh—The Koran And The Kafir, P-31
3. Timur-Malfuzat-I-Timuri, P-427
   Quoted from The Calcutta Koran Petition, P-61

সারসুতি (Sarsuti—হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত সিরসা) নগরের অধিবাসীরা ইসলামের নাম পর্যন্ত শোনেনি—একথা শুনে তৈমুর সারসুতি অভিমুখে অগ্রসর হন। হিন্দুরা নগর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তৈমুর তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করতে অশ্বারোহী বাহিনী পাঠান; তুমুল যুদ্ধ হল—নিহত হল সকল হিন্দু। তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানগণ হল বন্দী; সম্পত্তি লুণ্ঠিত হল। সৈন্যবাহিনী ফিরে এল। সঙ্গে কয়েক হাজার বন্দী হিন্দু রমণী। তারা সকলেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। (....When they heard of my arrival they abandoned their city. I sent my cavalry in persuit of them, and a great fight ensued. All those infidels were slain, their wives and children were made prisoners, and their property and goods became the spoil of the victors. The soldiers then returned, bringing with them several thousand Hindu women and children who became Muhammadans....)[1]

তৈমুর জানতে পারেন যে হিন্দুস্থানের জাঠ সম্প্রদায় দুর্দান্ত প্রকৃতির—সংখ্যায়ও বিশাল। আক্রমণের আশঙ্কায় তাঁরা দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও মরুভূমিতে আত্মগোপন করেছে। তৈমুর তাদের দমন করতে কৃতসংকল্প হলেন। তাঁর নিজের ভাষায়—'আমার হিন্দুস্থান অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য হল—কাফের হিন্দুদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ (Holy war—জেহাদ) পরিচালনা করা। আমার মনে হয় এই জাঠদের দমন করা প্রয়োজন' (My great object in invading Hindusthan had been to wage a religious war against the infidel Hindus and it now appeared to me that it was necessary for me to put down these jats.)[2]

তৈমুর বাহিনী জঙ্গল ঘিরে ফেলে। অবরুদ্ধ হিন্দুরা মরিয়া হয়ে আক্রমণ করে, ২০০০ জাঠ নিহত হয়। তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানরা হল বন্দী। 'সেই দিনই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সৈয়দ বংশীয় মুসলিম গোষ্ঠীর এক প্রতিনিধি দল সৌজন্য ও বিনয়ের সঙ্গে আমার দর্শন প্রার্থনা করে।* পয়গম্বরের বংশের বলে আমিও তাঁদের যথাযথ সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করি।'(---On the same day a party of Saiyads, who dwelt in the vicinity, came with courtesy and humility to wait upon me and were very graciously received. In my reverence for the race of the prophet, I treated their chief with great honour.)[3]

* যদিও মুসলিমরা ছিল জাঠদের প্রতিবেশী—তবু বিদেশী আক্রমণে বিপন্ন জাঠদের প্রতি তাঁদের কোন সহানুভূতি ছিল না। তৈমুর এমনটিই আশা করেছিলেন।

1. Ibid, P-61
2. Ibid, P-421, P-61
3. Ibid, P-61, 62
   A. Ghosh—The Koran And Kafu, P-31

তৈমুর যমুনার তীরে ছাউনি ফেলেছেন। নদীর অপর পারে লোনী (Loni) শহর ও দুর্গ। তৈমুর দুর্গ আক্রমণ করে। রাজপুতরা তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের ঘরের মধ্যে পুড়িয়ে মারে।* অতঃপর বেপরোয়া রাজপুত বাহিনী আক্রমণ করে। প্রচণ্ড লড়াই হয়। কিন্তু তারা পরাজিত ও নিহত হয়। অনেকে হয় বন্দী। তাদেরও পরদিন করা হয় হত্যা। তৈমুর আদেশ দিলেন—শেখ, সৈয়দ ও উলেমাদের গৃহ ব্যতীত হিন্দুদের সকল বাড়ি লুঠ ও দুর্গ ধ্বংস করতে হবে। (---I also ordered that the houses of Saiyads, Shaikhs and learned Musalmans should be preserved but that all the other houses should be plundered and the fort destroyed.)[1]

দিল্লীতে তৈমুরের তাণ্ডব

১৩৯৮ সালে তৈমুর লঙের হিন্দুস্থান অভিযান। দিল্লীতে তখন তুঘলক বংশের শাসন। ১৩৮৮ সালে ফিরোজ শা তুঘলকের মৃত্যু হয়। কোনো যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকায় দুর্বল সাম্রাজ্য প্রায় ভাঙনের মুখে। মামুদ তুঘলক দিল্লীর সুলতান। একের পর এক রাজ্য জয় করে তৈমুরলঙ দিল্লীর দ্বারপ্রান্তে এসে শিবির স্থাপন করেছেন। বহু লক্ষ কাফের হিন্দু হত্যা করেও লক্ষাধিক হিন্দু তাঁর শিবিরে বন্দী। পেছনে শত্রু রেখে যুদ্ধযাত্রা নিরাপদ নয়—প্রধান আমীরদের এই পরামর্শ মেনে তৈমুর সেই অসহায় শৃঙ্খলিত লক্ষ হিন্দু বন্দীকে হত্যার আদেশ দেন।** তৈমুর আত্মজীবনীতে লিখছেন—'ধার্মিক ও মহাজ্ঞানী মৌলানা নাসিরুদ্দিন হিন্দুস্থান অভিযানে আমার সঙ্গী ছিলেন। তিনি এত দয়ালু ছিলেন যে জীবনে একটি চড়ুই পাখিও মারেননি। কিন্তু আমার আদেশ পেয়ে তিনিও ১৫ জন কাফের হিন্দুকে স্ব-হস্তে বধ করেন। (---When this order became known to the Ghazis of Islam, they drew their swords and put their prisoners to death. 1,00,000 infidels, impious idolaters were on that day slain. Maulana Nasiru-d-din 'Umar, a counsellor and man of learning, who in all his life, had never killed a sparrow, now, in execution of my order, slew with his sword fifteen idolatrous Hindus)[2] বিদ্বান, ধার্মিক ও দয়ালু বলতে মুসলমান কি বোঝে—তার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত—মৌলভী নাসিরুদ্দিন।

---

* মুসলমানের হাতে বন্দী হলে রমণীদের যে অশেষ লাঞ্ছনা হবে তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। তাই এই মৃত্যু। এও এক প্রকার জহরব্রত।

** পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে লক্ষ বন্দীকে হত্যা এক নজিরবিহীন ঘটনা।

---

1. Timur—Malfuzat-I-Timuri, P-433
   Quoted from the Calcutta Quran Petition, P-62
2. Ibid, P-435-436, 63
   A. Ghosh—The Koran And The Kafir, P-32

এবার লক্ষ্য দিল্লী। সুলতান মামুদ শা তুঘলক অবশ্য বাধা দিয়েছিলেন; কিন্তু বৃথাই সে প্রয়াস! দিল্লী তৈমুরের অধিকারে। তিনি তাঁর দুর্ধর্ষ তুর্কী সেনাদের আদেশ দিলেন নির্বিচারে হিন্দু হত্যার। হিন্দুরা তাদের গৃহে আগুন ধরিয়ে দিল। জীবন্ত ভস্মীভূত হল তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানগণ। অতঃপর তারা বাধা দিল তুর্কীবাহিনীকে। অসম যুদ্ধ। কাতারে কাতারে হিন্দু প্রাণ দিল। দিল্লী প্লাবিত হল হিন্দুরক্তে। রাজপথে তৈরি হল শবদেহের পাহাড়। তিনদিন ধরে চলল ১৫০০০ তুর্কী সৈন্যের এই রক্ত হিম করা তাণ্ডব। হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ। প্রত্যেক সৈন্য নিয়ে এল অন্ততঃ ৫০/১০০ জন বন্দী। তৈমুরের নির্দেশে কোনো মুসলমান নিহত হয়নি। লুণ্ঠিত হয়নি তার গৃহ। সৈয়দ, উলেমা ও অন্যান্য মুসলমানের গৃহ ব্যতীত পুরো শহরটি পরিণত হল ধ্বংসস্তূপে। (....The Hindus set fire to their houses with their own hands, burned their wives and children in them, and rushed into the fight and were killed---on that day, thursday and all the night of Friday, nearly 15000 Turks– were engaged in slaying, plundering and destroying---and the spoil was so great that each man secured from fifty to a hundred prisoners---Excepting the quarters of the Saiyads, the Ulema and the other Mussalmans, the whole city was sacked).[1]

তৈমুর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—দিল্লীতে আমি ১৫ দিন ছিলাম। দিনগুলি বেশ সুখে আনন্দেই কাটছিল। দরবার বসিয়েছি—বড় বড় ভোজসভা দিয়েছি। তারপরই মনে পড়ল — কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই আমার হিন্দুস্থানে আসা। খোদার দয়ায় আমি সর্বত্রই আশাতীত সাফল্যও পেয়েছি। লক্ষ লক্ষ কাফের হিন্দু আমি বধ করেছি; তাদের তপ্ত শোণিতে ধৌত হয়েছে ইসলামের পবিত্র তরবারি।...তাই এখন আরাম-আয়েসের সময় নয় বরং কাফেরদের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করা উচিত। (I reflected that I had come to Hindusthan for war against infidels---I had put to death some lakhs of infidels---and I felt that I ought not to indulge in ease but rather to exert myself in warring against the infidels of Hindusthan.)[2]

বিলাস-ব্যসন নয়—চাই যুদ্ধ—কাফেরদের রক্তেই হোক পরম তৃপ্তি। এগিয়ে চলে হানাদার বাহিনী আল্লা-হো-আকবর (God is great) রণহুঙ্কারে চারিদিক প্রকম্পিত করে।

---

1. Timur—Malfuzat-I-Timuri, P-445-446
   Quoted from The Calcutta Quran Petition, P-63-64
   A. Ghosh—The Koran And Kafir, P-32
2. Timur—Malfuzat-I-Timuri, P-448
   Quoted from The Calcutta Quran Petition, P-64

হরিদ্বার। হিন্দুদের পুণ্যতীর্থ। পুণ্য স্নান উপলক্ষ্যে পতিত পাবনী গঙ্গাতীরে সমাগত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। অধিকাংশই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। নিরস্ত্র পুন্যার্থী জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিম হানাদার বাহিনী। অনেকে পাহাড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু রেহাই পায় না। প্রায় সকলেই হল নিহত। গঙ্গাজল হল রক্তবর্ণ—পাহাড় থেকে নেমে এল রক্তের স্রোত (---during a bathing festival on the bank of the Ganges, they slaughtered many of the infidels, and pursued those who fled to the mountains. So many of them were killed that their blood ran down the mountains and plain, and thus (nearly) all were sent to hell.)[1]

কালের ব্যবধানেও তৈমুরের অত্যাচারের দানবীয় বীভৎসতার স্মৃতি কিছুমাত্র ম্লান হয়নি। ঐতিহাসিক Will Durant বলেন ঃ '১৩৯৮ সালে তৈমুর সিন্ধুনদ অতিক্রম করে হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন। যাঁরা পালাতে পারেননি তাঁদের সকলকে হত্যা অথবা বন্দী করেন। দিল্লীর শাসক মামুদ তুঘলককে পরাস্ত করে অধিকার করেন দিল্লী; নির্বিচার চিত্তে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেন ১,০০,০০০ বন্দীকে। দিল্লী নগরী লুণ্ঠন করে ফিরে যান সমরখন্দে—সঙ্গে লক্ষ বন্দী—নারী ও দাস। হিন্দুস্থানের জন্য রেখে গেল অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী' (Timur crossed the Indus (1398), Massacred or enslaved such of the inhabitants as could not flee from him, defeated the forces of Sultan Mahmud Tughlak, occupied Delhi, slew a hundred Thousands prisoners in cold blood, plundered the city of all the wealth------and carried it off to Samarkhand with a multitude of women and slaves, leaving anarchy, famine and pestilence in his wake).[2]

পণ্ডিত নেহেরুর বিচারে তৈমুরের যে রূপটি ফুটে ওঠে তা বোধ করি বীভৎসতায় তুলনাহীন। তিনি বলেন ঃ 'তৈমুর ছিলেন নিঃসন্দেহে সুদক্ষ রণনিপুণ সেনাপতি, কিন্তু পুরাপুরি বর্বর। তিনি যেখানেই গেছেন সে স্থান হয়েছে জনশূন্য শ্মশান, দেখা দিয়েছে মহামারি ও অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশা। নরমুণ্ড দিয়ে বিশাল পিরামিড তৈরি করে তিনি পেতেন অপার আনন্দ —।'

চেঙ্গিস খাঁ ও মঙ্গল বাহিনী ছিল নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসের প্রতীক। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক মানুষের মতো ছিল। তৈমুর ছিলেন শতগুণ জঘন্য। নির্মম ও ভয়ংকর দানবীয় অত্যাচারের জন্যই তিনি সকলের থেকে স্বতন্ত্র। এক জায়গায় ২০০০ জীবিত মানুষকে স্তম্ভের আকারে সাজিয়ে তাঁদের চারিদিকে ইট গেঁথে জীবন্ত কবর দেন। (He

1. Ibid, P-459, P-65
2. Will Durant—The Story of Cizilization, P-463

was a great general, but he was a complete savage---wherever he went he spread desolation and pestilence and utter misery. His chief pleasure was the erection of enormous Pyramids of skulls.

Chengis Khan and his mongols were cruel and destructive, but they were like others of their time.

But Timur was much worse. He stands apart for wanton and fiendish cruelty. In one place, it is said, he erected a tower of 2000 live men and covered them with brick and mortar.)[1]

'সে কয়েক মাস মাত্র ভারতে ছিল', লিখেছেন নেহেরু—। "কেবল দিল্লীতে এসেই ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু এই অল্প দিনেই তাঁর পথের দুই ধারের সমস্ত নাশ করে, যাঁদের হত্যা করেছিল তাঁদের মুণ্ড দিয়ে পিরামিড* তৈরি করেছিল।"[2] নেহেরুর দৃষ্টিতে তৈমুরের হৃদয় ছিল বর্বর যাযাবরের। তার নির্মম হৃদয়হীন অত্যাচারের বর্ণনায় নেহেরু

* ইসলাম ও মার্কসবাদ। প্রথমটি একটি বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ—দ্বিতীয়টি পুরোপুরি বস্তুবাদী রাজনৈতিক দর্শন;ধর্ম ও ঈশ্বর ভাবনার ঘোরতর বিরোধী এবং যথার্থই সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ। এই আপাতত বৈপরীত্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে রয়েছে বিস্ময়কর সাদৃশ্য;তত্ত্ব ও প্রয়োগে। ইসলাম পৃথিবীতে একমাত্র সত্য ধর্ম। বেহেস্তে যাবার জন্য মর্ত মানুষের একমাত্র অবলম্বন। মার্কসবাদ অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য—শোষিত জনতার শোষণ মুক্তি ও ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি র একমাত্র পথ। উভয়েরই ঘোষিত আর্দশ—সাম্য—স্বাধীনতা—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব।
ইসলাম পৃথিবীকে দুইভাগে ভাগ করে—দার-উল-ইসলাম (মুসলিম শাসিত দেশ—Abode of Peace) ও দার-উল-হারব (অ-মুসলমান শাসিত দেশ—Abode of War)। মাকর্সবাদও পৃথিবীকে কম্যুনিস্ট ও অ-কম্যুনিস্ট (ধনবাদী) এই দুই ভাগে ভাগ করে। ইসলামের লক্ষ্য বিধর্মীদের নির্মূল করে সমগ্র পৃথিবীকে দার-উল-ইসলাম করা। মার্কসবাদেরও লক্ষ্য অ-কম্যুনিস্ট দের (শ্রেণীশত্রু) নির্মূল করে বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদ ও কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য সাধনে ইসলাম গ্রহণ করেছে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধে র (Holy war) পথ আর মাকর্সবাদের পথ হল শ্রেণী-সংগ্রাম (class struggle)।
পয়গম্বর হজরত মহম্মদ ইসলামের প্রধান প্রবক্তা ও রূপকার। তেমনি মহামতি লেনিন-স্টালিন মার্কসবাদের অবিসংবাদী প্রবক্তা ও রূপকার। তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে যেমন এই সাদৃশ্য—তেমনি সাদৃশ্য রয়েছে প্রয়োগের ক্ষেত্রে। উভয় মতবাদ End justifies the means—এই নীতিতে বিশ্বাসী। উদ্দেশ্য সিদ্ধি র জন্য যে কোন পথই গ্রহণযোগ্য। মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা কোন প্রতিবন্ধক নয়। সম্মতি নয়—বলপ্রয়োগ উভয় মতবাদের ভিত্তি স্বরূপ। তাই দেখা যায় মানুষের রক্ত-পিছল পথে, লক্ষ মানুষের মৃতদেহের উপর দিয়েই এগিয়ে গেছে ইসলামের বিজয় শকট। শুধুমাত্র ভারতে যে রক্তপাত হয়েছে তা তুলনাহীন। ঐতিহাসিক Will Durant-এর মতে মুসলমানের ভারত-বিজয় ইতিহাসের সর্বাধিক রক্তাক্ত অধ্যায়। (The Mohammadan conquest of India is probably the bloodist chapter in history)। একইভাবে মার্কসবাদের রক্তাক্ত জয়রথ ভূমণ্ডলের যে অঞ্চল দিয়ে গেছে-—সেখানেই রেখে গেছে দানবীয় হত্যাকাণ্ড ও বিশ্বগ্রাসী ধ্বংসের পদচিহ্ন;উঠেছে গগনভেদী ক্রন্দনরোল, স্বজন-হারা মানুষের বুকভাঙা হাহাকার। আদিম বর্বর হিংসার মাহাত্ম্য প্রচার উভয় মতবাদেরই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

1. Pt. Nehru—Glimpses of World History, P-247
2. পণ্ডিত নেহেরু— ভারত সন্ধানে (Discovery of India), পৃ. ২০৩

বোধ হয় মানসিক ক্লান্তি বোধ করতেন। তাঁর তীক্ষ্ণ মন্তব্য,—'আমি কেন এই ভয়ংকর লোমহর্ষক কাহিনী বারংবার বর্ণনা করব? সর্বত্রই তো একই চিত্র (But why should I go on repeating this story of horror? It was the same all along his route...But at heart he was barbarous nomad.)[1]

দিল্লীর পর তৈমুর মীরাট, হরিদ্বার ও জম্মু জয় করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তৈমুরের আক্রমণের মত নৃশংস ও নারকীয় হত্যাকাণ্ড খুব কমই ঘটেছে। জনৈক ঐতিহাসিকের মতে —'তৈমুরলঙের ভারতবর্ষ আক্রমণের ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ...দুই জাতির মধ্যে বিদ্বেষ স্থায়ীরূপ লাভ করেছিল। তৈমুরের আক্রমণের ফলে মুসলমানদের ভয়ে হিন্দুরা তাদের মেয়েদের অল্পবয়সে বিবাহ দিতে শুরু করেছিল'[2]

ইসলাম ও তৈমুরের আক্রমণ হিন্দুর ধর্ম ও সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পণ্ডিত নেহেরুর অভিমত হল—'ইসলামের আবির্ভাবে হিন্দু ধর্মে দু'দিক থেকে পরিবর্তন আসে। একদিকে আত্মরক্ষার তাগিদে হিন্দু ধর্ম শক্ত খোলকের (shell) মধ্যে আশ্রয় নেয়, হয়ে ওঠে রক্ষণশীল। জাতিভেদ প্রথা, যা ছিল নমনীয়—তা হয় কঠিনতর। ....অন্যদিকে জাতিভেদ প্রথা, পূজা-অর্চনা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ ভেতর থেকে সরব হয়। (Hinduism was shaken up in two ways by the coming of Islam, and strange to say, these ways were contrary to each other. On the one side it became conservative, it hardened and retired into a shell in an attempt at protecting itself against the attack on it. Caste became stiffer and exclusive.....on

৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যা করে হিটলার নিন্দিত; ৫ কোটি রাশিয়ানকে হত্যা করে*[3] মার্কসবাদের প্রাণপুরুষ, সফল রূপকার মহান স্ট্যালিন বিশ্ববন্দিত। ১৯৬৫-১৯৭৫ সাল। শুধুমাত্র এই দশ বছরেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে কম্যুনিস্ট চিনে চার কোটি চীনাকে হত্যা করা হয়। তবুও মাও-সে-তুঙ-এর গুণমুগ্ধ ভক্তের অভাব নেই। তৈমুর-বাবর-আহম্মদ শাহ্ আবদালি তাঁদের শিবিরের সম্মুখে নিহত হিন্দুদের মুণ্ড কেটে তৈরি করতেন বিশাল বিশাল নরমুণ্ডের স্তম্ভ (tower)। সিংহাসনে বসে উপভোগ করতেন সেই বীভৎস সুন্দর দৃশ্য। একি শুধুই ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য? মনে হয় না। পলপট। শান্তি ও অহিংসার দেশ কম্বোডিয়ার (কামপুচিয়া) কম্যুনিস্ট শাসক। মাত্র ১০ বছর কম্বোডিয়া শাসন করেছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই সে দেশের ৬০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২০ লক্ষকে হত্যা করে। সেই রাশি রাশি নরমুণ্ড সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিল। তার ছবি The Statesman (১৭-৪-৯৮) সহ দেশ-বিদেশের বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

1. Pt. Nehru—Glimpses of World History, P-247-248
2. ডঃ প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত—ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ. ২২১
   ডঃ সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী (পঃ বঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত)
3. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ, পৃ. ৩২

the other hand, there was a kind of internal revolt against caste and too much pujas and ceremonial.)[1] এ বিশ্লেষণ যথার্থ। মুসলিম শাসনে ভারতের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তা বাহিরের;অন্তরের নয়। তাঁর অন্তস্থলে সঞ্চিত থাকত অফুরন্ত প্রাণশক্তি। সেই শক্তির বলেই সে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বেঁচে আছে। পণ্ডিত নেহেরু বলেন ঃ 'যা কিছু (পরিবর্তন) ঘটেছে তা উপরিভাগের ব্যাপার, তা হতে ভারতীয় জীবনের মূলগত ধারায় বিশেষ কোন পার্থক্য আসেনি।'[2]

কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? উত্তরে বলতে হয়—এর কারণ হল ভারতের অখণ্ড ঐক্যবোধ। আর এই ঐক্যবোধের ভিত্তি হল সংস্কৃতি। রাজনৈতিক নয়। পণ্ডিত নেহেরুও এই মতের সমর্থনে বলেন ঃ 'ভারত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু সংস্কৃতিগত ভাবে ভারত ছিল ঐক্যবদ্ধ' (India has been culturally united even though politically it may have split up into many warring states)[3] সনাতন শাশ্বত হিন্দুধর্ম এই সাংস্কৃতিক ঐক্যের আধার স্বরূপ। কার্যত এই সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রকৃত অর্থে আধ্যাত্মিক ঐক্য। প্রায় ১১০ বছর ভারতের সঙ্গে যুক্ত থেকে ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। এই ঘটনার উল্লেখ করে ডঃ আম্বেদকর বলেন রাজনৈতিক ঐক্য কোন ঐক্যই নয়। যথার্থ যা ঐক্য তা হল আধ্যাত্মিক (In short it must be spiritual.)[4]

মুসলমানের নিকট পরাজিত হয়ে ভারতের রাজন্যবর্গ রাজ্যহারা হয়েছেন। কিন্তু আ-সমুদ্র হিমাচল হিন্দুর ধর্মীয় নেতা ও সমাজপতিদের প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ণ। তাঁরা দেখলেন মাতৃভূমি পরাধীন। রাষ্ট্রশক্তি বিদেশীর করায়ত্ত। কিন্তু ধর্ম ও সমাজকে তো রক্ষা করতে হবে। তাই তাঁরা প্রবেশ করে আপন খোলে (shell); অর্থাৎ বিধিনিষেধের কঠিন আবরণের মধ্যে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বোধ করি বিষয়টি পরিষ্কার হবে। কচ্ছপ। শুঁড় বের করে চলে, বিপদের আঁচ পেলেই মুখ ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়। পিঠ তার সুকঠিন বর্মের ন্যায়—শত আঘাতেও কিছু হয় না। হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ কু-সংস্কার (সংস্কার ও কু-সংস্কারের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান) ও কু-প্রথা মুসলিম শাসনের অনিবার্য পরিণতি। বাল্য বিবাহ ও সতীদাহ এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দু নারীর প্রতি মুসলমানের লোলুপদৃষ্টি আজ প্রবাদে পরিণত। মুসলমান শাসকদের "সিন্ধুকী" নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিল। তারা গ্রাম-শহরে খোঁজ নিত কোন্ হিন্দুর বাড়ীতে অবিবাহিতা কন্যা, সুন্দরী বধূ বা অল্পবয়সী বিধবা আছে। কোন সংবাদ পেলে যথাসময়ে তা তারা মনিবের নিকট পৌঁছে দিত; এবং অনতিবিলম্বেই হতভাগিনীর স্থান হত মুসলমানের হারেমে।

1. Pt. Nehru—Glimpses of World History, P-250
2. পণ্ডিত নেহেরু—ভারত সন্ধানে, পৃ. ২০১
3. Pt. Nehru—Glimpses of World History, P-251
4. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-66

তখন মুসলমানের রাজত্ব। হিন্দু তার দাসানুদাস—সর্ব অধিকার বঞ্চিত। দিন কাটে তার ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মধ্যে। সাধারণ মুসলমানেরও হাবভাব প্রায় নবাব-বাদশার ন্যায়। কোন হিন্দু নারীর প্রতি নজর পড়লে তাঁর আর রক্ষে নেই। পিতা-মাতা সদাই ভয়ে কম্পিত। অল্প-বয়সেই তাই গোত্রান্তরের চেষ্টা। বিবাহ একটা বাধা তো বটে। সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ও কেটে যেত। মুসলিম শাসনকালে অ-মানবিক সতীদাহ ঘটনার যে বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, তারও এই একই কারণ।

এ পৃথিবীতে কিছুই অবিমিশ্র নয়। যার ভাল আছে—তার মন্দও আছে। সেই সুদীর্ঘ পরাধীনতা, চরম অরাজকতা ও স্বৈরাচারী মুসলিম শাসনে হিন্দু তাঁর ধর্ম ও সমাজ রক্ষার প্রয়োজনেই রক্ষণশীল হতে বাধ্য হয়েছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানাবিধ কু-সংস্কার, ভেদাভেদ। পরিণামে জাতি হয়েছে দুর্বল। কিন্তু যদি এরকম না হয়ে হিন্দু ধর্ম তার স্বাভাবিক উদারতা বজায় রাখত, তবে কি হত? হয়তো ধর্ম ও জাতির অস্তিত্বই লোপ পেত। যেমন ঘটেছে পারস্য (ইরান), ইরাক (ব্যাবিলন) ও মিশরে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ওই সকল দেশে খুব উন্নত ধরনের সভ্যতা ছিল। কিন্তু ওই সকল দেশ ইসলামের শাসনাধীন হওয়ার পর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য আর রক্ষা করতে পারেনি। তাই তাঁদের সুপ্রাচীন গৌরবময় সভ্যতার চিহ্ন মাত্রও আজ অবশিষ্ট নেই। কিন্তু হিন্দুস্থান হাজার বছর ধরে মুসলিম তাণ্ডব সত্ত্বেও তার ধর্ম ও সমাজকে সে রক্ষা করতে পেরেছে — তার অন্যতম কারণ হিন্দু ধর্মের কৃত্রিম রক্ষণশীলতা। যা বর্মের মত ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করেছে।

বাবর ঃ

জাতিতে মোঙ্গল। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের ধমনীতে প্রবাহিত ছিল দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙের রক্ত। পূর্বসূরী তৈমুরলঙের হিন্দুস্থান অভিযানের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বাবরও হিন্দুস্থান জয়ের সংকল্প করেন। তার আত্মচরিত "বাবরনামা"য় হিন্দুস্থান অভিযানের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথম অধিকার করেন উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ক্ষুদ্র রাজ্য বাজাউর (Bajaur)। বাবরনামার বর্ণনা অনুযায়ী—'বাজাউরের অধিবাসীরা ছিল বিদ্রোহী এবং ইসলামের শত্রু। বর্বর ও ইসলাম-বিরোধী আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকায় ইসলামের নাম পর্যন্ত সে রাজ্য থেকে লুপ্ত হয়। (প্রবল যুদ্ধের পর দুর্গ অধিকৃত হলে) সকলকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। নারী ও শিশুরা হয় বন্দী। নিহত হয় অন্তত ৩০০০ হিন্দু। আমরা দুর্গে প্রবেশ করে চতুর্দিকে ঘুরে দেখলাম। প্রতি কক্ষে, রাস্তায় অলিতে-গলিতে রাশি রাশি মৃতদেহ। সকলে শবদেহের উপর দিয়েই যাতায়াত করছে'। (As the Bajauris were rebels and at enmity with the people of Islam, and as, by reason of the heathenish and hostile customs prevailing

in their midst, the very name of Islam was rooted out from their tribe, they were put to general massacre and their wives and children were made captive. At a guess more than 3000 men went to their death. The fort taken, we entered and inspected it. On the walls, in houses, streets and alleys, the dead lay, in what numbers! Comers and goers to and fro were passing over the bodies.)[1]

১১ জানুয়ারী ঃ বাজাউর দুর্গ নিয়ে মন এখন শান্ত-উদ্বেগহীন। আমরা বাজাউর উপত্যকা ধরে এগিয়ে চলেছি। হিন্দুদের ছিন্নমুণ্ড দিয়ে উঁচু জায়গায় টাওয়ার (Tower—চতুর্ভুজ বা গোলাকার বুরুজ) তৈরি করতে আদেশ দিলাম।*

(Jan.11th.) With mind easy about the important affairs of the Bajaur fort, we marched, on Tuesday the 9th of Muharram, one Kuroh (2-miles) down the dale of Bajaur and ordered that a tower of heads should be set up on the rising-ground.)[2]

বাবরের হিন্দুস্থান অভিযানে প্রথম পানিপথ নয়—খানুয়ার যুদ্ধই ছিল সামরিক দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধে মেবার অধিপতি রাজপুত কুলতিলক সংগ্রাম সিং-এর পরাজয়ে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় ও নিষ্কণ্টক হল। "বাবরনামা"র বর্ণনায় খানুয়ার যুদ্ধ ঃ

পৌত্তলিক বাহিনী ডানদিক থেকে ইসলামের ধর্মযোদ্ধাদের বাঁ দিকে একাধিকবার প্রচণ্ড আক্রমণ করে। কিন্তু প্রতিবারই প্রত্যাঘাতে জর্জরিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। ওদের গতি হবে নরকে। নরকের ভয়ংকর আগুনে ওদের নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর বিশ্বস্ত সেনাপতি মুমিন আটকা এবং রুস্তম তুর্কমান পেছন থেকে কাফেরদের আক্রমণ করে। যুদ্ধে বেপরোয়া ধর্মযোদ্ধারা যখন কাতারে কাতারে মৃত্যু বরণ করছিল তখন তারা শুনতে পায় এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর ঃ হতাশ হয়ো না, শোক কর না। যদি বিশ্বাস রাখ—জয় নিশ্চিত। পুনরায় সেই অমোঘ দৈববাণী ঃ আল্লাহ্ সাহায্য পাঠাচ্ছেন; শীঘ্রই

---

* রাশিয়া অভিযানে "আউস্তাবলিৎসের" একদিনের যুদ্ধেই যত রাশিয়ান প্রাণ হারাইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে শুধু মৃত অভিজাত বংশীয় সেনানীদের মৃতদেহ দেখিয়াই নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, many fine ladies will weep tomorrow in st. Petersburg.[3]

যুদ্ধ ক্ষেত্রে রণক্ষেত্রে নিহত সেনানীদের মৃতদেহ দেখে সম্রাট নেপোলিয়নের হয় অনুশোচনা, আর সম্রাট বাবরের হয় উল্লাস!

---

1. A. S. Beveridge—Babur Nama, P-370
2. A. S. Beveridge—Babur Nama, P-371
3. নীরদ চন্দ্র চৌধুরী—আমার দেশ আমার শতক, পৃ. ১১৯

জয় হবে, অতঃপর নব উদ্যমে আক্রমণ করে তারা। বেহেস্তে ওঠে জয়ধ্বনি, স্বর্গীয় দেবদূতেরা প্রজাপতির ন্যায় ডানা মেলে তাঁদের চারপাশে উড়তে থাকে।

(The pagan right wing made repeated and desperate attack on the left wing of the army of Islam, falling furiously on the holy warrior's, possessors of salvation, but each time was made to turn back or smitten with the arrows of victory, was 'made to descend into hell, the house of perdition : they shall be thrown to burn therein, and an unhappy dwelling shall it be.' Then the trusty amongst the nobles, Mumin Ataka and Rustam Turkman betook themselves to the rear of the host of darkened pagans.

At the moment when the holy warriors were heedlessly flinging away their lives, they heard a secret voice say. 'Be not dismayed, neither be grieved, for, if ye believe, ye shall be exalted above the unbelievers, and from the infallible informer heard the joyful words, Assistance is from Allah, and a speedy victory!' Then they fought with such delight that the plaudits of the saints of the Holy Assembly reached them and the angels from near the throne, fluttered round their heads like moths.)[1]

রণক্ষেত্রে অসংখ্য শত্রু (হিন্দু) নিহত হল। অন্যরা পালিয়ে গেল মরুভূমিতে; এবং অচিরেই কাক ও চিলের খাদ্যে পরিণত হল। মৃতদেহ স্তূপীকৃত করে নির্মিত হল টিলা বা টিপি — তার ওপর ছিন্নমুণ্ড দিয়ে স্তম্ভ। (Many fell dead on the field of battle; others, desisting from fighting, fled to the desert exile and became the food of crows and kites. Mounds were made of the bodies of the slain, pillars of their heads.)[2]

হিন্দুর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে জয়লাভ করে বাবর গাজী (ধর্মযুদ্ধে জয়ী) উপাধি পেয়েছেন। কৃতজ্ঞতায় তিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে রচনা করেন চতুষ্পদী শ্লোক।

ইসলামের জয় লাগি
ঘুরেছি আমি দেশ হতে দেশান্তরে,
পৌত্তলিক ও হিন্দু সাথে

1. A. S. Beveridge—Babur Nama, P-569, 572
2. Ibid, P-572-573

যুদ্ধ অভিলাষে।
শহীদের মৃত্যু লভিব আমি
এ ছিল মোর শপথ
খোদার কাছে কৃতজ্ঞ আমি
হয়েছি আজ গাজী।

(For Islam's sake, I wandered in the wilds, prepared for war with pagans and Hindus, Resolved myself to meet the martyr's death. Thanks be to God ! a Ghazi I became.)[1]

সংগ্রাম সিংহের পরাজয় ও মৃত্যুতে রাজপুতরা হয় হতবল। তবু পরাজয়ের প্রতিশোধ ও হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের সংকল্পে তারা মেদিনী রাও-য়ের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়। বাবর তাদের প্রধান দুর্গ চান্দেরী অবরোধ করেন। এই যুদ্ধের সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে "বাবরনামায়"।

জানুয়ারী২৯। রাজপুতদের চান্দেরী দুর্গ অবরুদ্ধ। সকালেই বাবর দুর্গ আক্রমণের আদেশ দেন। যুদ্ধ দীর্ঘক্ষণ হয়নি। আমার সৈন্যরা যখন দলে দলে দুর্গ প্রাকারে উঠে গেল—তাঁরা দ্রুত পালিয়ে গেল। (পরাজয় অনিবার্য বুঝে) তাঁরা স্ত্রী ও পরিজনদের সকলকে হত্যা করল। অতঃপর ফিরে এল রণক্ষেত্রে। বেপরোয়া হয়ে আক্রমণ করল। আমার অনেক সৈন্য নিহত হল — পালিয়ে গেল বহু সৈন্য। কিন্তু আমার সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণে রাজপুতগণ পিছু হটল। ২০০/৩০০ রাজপুত প্রবেশ করে মেদিনী রাও'র কক্ষে। সেখানে তাঁরা সকলে স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণ করে। ঘটনাটি এইভাবে ঘটে। একজন শাণিত তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যরা একে একে গলাটি এগিয়ে দেয়। মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ে তার ছিন্নমুণ্ড। খোদার কৃপায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই (২/৩ ঘড়ি) দুর্গ জয় সম্পূর্ণ হল। দুর্গের উত্তর-পশ্চিমে একটি ছোট পাহাড়ে কাফেরদের ছিন্নশির দিয়ে স্তম্ভ তৈরি করার আদেশ দিই। (...Not even as much as this did the pagans fight in the citadel; when a number of our men swarmed up, they fled in haste. In a little while they came out again, quite naked, and renewed the fight; they put many of our men to flight; .....some they cut down and killed. Why they had gone so suddenly off the walls seems to have been that they had taken the resolve of those who give up a place as lost; they put all their ladies and beauties to death, then looking themselves to die, came naked out

1. A. S. Beveridge—Babur Nama, P-575

to fight. Our men attacking, each one from his post, drove them from the walls whereupon 200/300 of them entered Medini Rao's house and there almost all killed one another in this way :–one having taken stand with a sword, the rest eagerly stretched out the neck for his blow. Thus went the greater number to hell.

By God's grace this renowned fort was captured in 2 or 3 garis........A pillar of pagan heads was ordered set up on a hill north-west of Chandiri.)[1]

Beveridge মনে করেন —

চাঁদেরী দুর্গ অবরোধ সম্বন্ধে বাবরের বিবরণী সম্পূর্ণ নয়। কারণ যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল, বাবর সে ঘটনার উল্লেখ করেননি। ঐতিহাসিক কাফি খাঁ বলেন — নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে দুর্গবাসীরা আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু তারপর বাবরের সৈন্যরা ৩০০০/৪০০০ (নিরস্ত্র) কাফেরকে হত্যা করে। অন্তত ১০০০ স্ত্রীলোক ও শিশু জহরব্রত করে আত্মহত্যা করে। মেদিনী রাও সহ বহু রাজপুত তাঁর ঘরে স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণ করে। (Babur's account of the siege of Chandiri is incomplete in as much as it says nothing of the general massacre of pagans he has mentioned on F. 272. Khwafi Khan records the massacre, saying, that after the fort was surrenderd, as was done on condition of safety for the garrison; from 3000 to 4000 pagans were put to death by Babur's troops..The time assigned to the massacre is previous to the Juhar of 1000 women and children and the self slaughter of men in Medini Rao's house, in which he himself died.)[2]

বাবরের আত্মজীবনী থেকে এ সত্য প্রমাণিত যে তিনি সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী ও তৈমুরলঙের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই হিন্দুস্থানে এসেছেন। একই লক্ষ্য। কাফের হত্যা ও ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণ করে দার-উল-হারব হিন্দুস্থানকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। পূর্ববর্তী মুসলিম বিজেতা ও শাসকদের ন্যায় তিনিও যুদ্ধ শেষে শিবিরের সম্মুখে "নরমুণ্ডের" স্তম্ভ তৈরি করে সে দৃশ্য উপভোগ করতেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীর প্রায় প্রতি ছত্রে "ইসলাম" ও "আল্লাহ্‌র" মহিমা প্রচার করেছেন। তাঁর শব্দচয়নও বিশেষ ইঙ্গিতবহ ঃ Army of Islam, standard of Islam, Holy warriors.

1. A. S. Beveridge—Babur Nama, P-595-596
2. Ibid, P-596

রণক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। কোরানের আয়াত উদ্ধৃত করে বলেছেন—'বিধর্মী কাফেরদের স্থান হবে নরকে। নরকের আগুনে তাদের নিক্ষেপ করা হবে।' খানুয়ার যুদ্ধে ব্যাপক হিন্দু-নিধনের পর তার মন্তব্য ঃ নরক যেমন পাপীদের দ্বারা পূর্ণ, শত্রুভূমিও (Dar-Ul-Harb) তেমনি শবদেহে পরিপূর্ণ (The enemy's country (Dar-Ul-Harb) was full, as Hell is full of wounded who had died on the road--Babur Nama--P-573). ইসলাম ধর্মের সেবায় তিনি নিবেদিত। শদীদের মৃত্যু তার কাম্য। ধর্মযুদ্ধে (Holy war—জেহাদ) কাফের হত্যা করে "গাজী" হওয়া তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য।

পথ ও লক্ষ্যের বিচারে ইসলামের অন্যান্য মহান ও বীর সেনানীদের সঙ্গে বাবরের কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না।

বাবরের গুণমুগ্ধ পণ্ডিত নেহেরু অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন ঃ চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙের বংশধর বাবর তাঁর পূর্বপুরুষদের মহানুভবতা* ও সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মার্জিত ও সংস্কৃতি-অনুরাগী বাবর ছিলেন এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তিনি ছিলেন কবি, বিদ্যোৎসাহী ও শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক (Descended from Chengiz and Timur, he had something of their greatness and military ability.....Babur was one of the most cultured and delightful persons one could meet. There was no sectarianism in him, no religious (bigotry)....He was devoted to art and literature and was himself a poet in Persian).[1]

এদেশে ইতিহাস যেভাবে পড়ানো হয় তাতে এরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব যে মুসলিম আক্রমণের যে ধ্বংসাত্মক রূপ আমরা দেখি, তা বিদেশি মুসলমান ও দিল্লির বাদশাহ্‌দের কীর্তি, এবং তা সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত উঃ ভারতে। ইতিহাসের সাক্ষ্য অবশ্য অন্যরূপ। কাফেরের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ঘোষণায় বিদেশি ও দেশি মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। ধ্বংসের লেলিহান শিখা শুধু উঃ ভারত নয়, দক্ষিণ ভারতকেও গ্রাস করেছিল। শুধু দিল্লির বাদশাহ্‌রাই নন, আঞ্চলিক মুসলিম শাসকবৃন্দও সাধ্যমতো মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, তৈমুরলঙ—বাবরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার চেষ্টা করেছেন।

---

* তৈমুরলঙ ভারতে যে অত্যাচার করেছিলেন, চেঙ্গিস খাঁ ততোধিক করেছিলেন মধ্য এশিয়ায়। নিপীড়িত মানুষের নিকট তাঁর পরিচয় Scourage of God—"ঈশ্বরের অভিশাপ।" ভারতবাসীর নিকট তৈমুর ছিলেন এক মূর্তিমান বিভীষিকা। নেহেরু তাঁকে বলেছেন মানুষ হিসেবে "পুরোপুরি বর্বর"—A complete savage. এঁদের মধ্যে মহত্ত্ব "মহানুভবতা"—এই দেব-দুর্লভ গুণ নেহেরু কোথায় পেলেন, তা বোধগম্য নয়।

1. Pt. Nehru—Glimpses of World History, P-303

মহম্মদ শাহ্

দক্ষিণের মুসলমান রাজ্যগুলির মধ্যে বাহমনি সুলতানরাই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এই বংশের প্রথম সুলতান আলাউদ্দিন হাসান শাহ্ ১৩৪৭ খ্রিঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র মহম্মদ শাহ্ ১৩৫৮ খ্রিঃ মসনদে আরোহণ করেন। তরুণ উদ্যমী নতুন নবাব ধর্মযুদ্ধ ও রাজ্যজয়ের উদ্দেশ্যে সুসজ্জিত এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করে বিলামপটন অভিমুখে অগ্রসর হন। (Applying all his energies to the conquest of territory and the reviving of the customs of religious warfare [Jehad], he in the spring time of his reign........collected a well-equipped army and started for Bilampatan.)[1] অধিকার করেন দুপাশের বিশাল ভূ-খণ্ড। ওই অঞ্চলের হিন্দুরাজা সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেন। মহম্মদ শা দুর্গ অধিকার করে সকলকে নির্বিচারে হত্যা করেন। আয়োজন করেন বিজয় উৎসবের—তারপর ফিরে যান নিজ রাজ্যে।

মুজাহিদ শাহ্

মহম্মদ শাহ্র মৃত্যুর পর মসনদে বসেন পুত্র মুজাহিদ শাহ্। তিনি পিতার সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। ১৩৭৮ সালে তিনি বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা কৃষ্ণ রায় সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিলে সেনাপতি সফদার খানের ওপর দুর্গ অবরোধের দায়িত্ব দিয়ে সুলতান সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাত্রা করেন। সেখানে তিনি আলাউদ্দিন খলজি নির্মিত মসজিদের সংস্কার করেন। ধ্বংস করেন সকল মন্দির (....and there he repaired a mosque, which Sultan Ala-ud-din Khaljee had built and demolished the idol temples.[2] **Robert Sewell-**এর বর্ণনায়—The Sultan at this place repaired a mosque which had been built by the officers of Sultan Ala-uddin Khiljee. He broke down many temples of the idolaters.)[3] ফিরিস্তার বিবরণ অনুসারে সুলতান বিজয়নগর ফিরে নগরীর মণি মাণিক্য খচিত সর্ববৃহৎ মন্দিরটি ধ্বংস করেন। অতঃপর তিনি আক্রমণ করেন রাজা কৃষ্ণ রায়কে। যুদ্ধে কৃষ্ণ রায়ের পরাজয় যখন অনিবার্য, তখন তার ভাই এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুজাহিদ শাহ্কে পালটা আক্রমণ করে। জয় অসম্ভব বুঝে সুলতান নিজ রাজ্যে ফিরে যান।

---

1. Khwajah Nizamuddin—Tabaqat-I-Akbari. Vol-III, P-13
2. Khwajah Nizamuddin—The Tabaqat-I-Akbari Vol-3. P-19
3. Robert Sewell—A Forgotten Empire, P-41

ফিরোজ শাহ্ ঃ

ফিরোজ শাহ্ বাহমনি বংশের আর এক বিখ্যাত সুলতান। তাঁর অন্যতম সামরিক লক্ষ্য ছিল বিজয়নগর রাজ্য জয় করা। ফিরিস্তা বলেন—অনেক ঐতিহাসিকের মতে তিনি ২৪ বার কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করেন। (Firistha also says that according to various historians he carried on Ghazi [religious war] with the Kafirs twenty four times)[1] ১৩৯৮ সালে তৈমুরলঙের নিকট দূত পাঠিয়ে হিন্দুস্থান আক্রমণের আমন্ত্রণ* জানিয়েছিলেন। আনুগত্য স্বীকার করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সৈন্য ও রসদ সহ সর্বপ্রকার সাহায্যের। (In 804 A. H. 1398 A.D.) Firuz Shah sent an embassy to Taimur, who it appears was then contemplating the conquest of Hindusthan, and offering his submission and proposing to render help and send reinforcements in the event of his sending an army to conquer Hindusthan.)[2]

আহম্মদ শাহ্ বাহমনি

পরবর্তী সুলতান আহম্মদ খান; আহম্মদ শাহ্ বাহমনি উপাধি নিয়ে ১৪২২ খ্রিঃ মসনদে আরোহণ করেন। পূর্বতন সুলতানদের ন্যায় আহম্মদ শাহ্র অন্যতম প্রধান সামরিক লক্ষ্য ছিল বিজয়নগর জয় করা। ঐতিহাসিক ফিরিস্তা সুলতানের বিজয়নগর অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ৪০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তুঙ্গ ভদ্রা নদী তীরে উপস্থিত হন। বিজয়নগর অধিপতি দেব রায় সসৈন্যে নদীর অপর তীরে শিবির স্থাপন করেছেন। স্রোতের জন্য সুলতানি বাহিনী নদী পার হতে পারছে না। সুলতান ৪০ দিন অপেক্ষা করে পরে অধৈর্য হয়ে রাতের অন্ধকারে নদী পার হন। দেব রায় তখন নিদ্রিত। শত্রুর আকস্মিক আক্রমণে অপ্রস্তুত দেব রায় পালিয়ে যান। সুলতানি বাহিনী গণহত্যা ও লুণ্ঠনে মেতে ওঠে। নির্বিচারে নিহত হয় সাধারণ মানুষ; নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে। নিহতের সংখ্যা ২০০০০ পূর্ণ হলেই সুলতান ঘোষণা করতেন তিনদিনের বিরতি। এই সময় শিবিরে শিবিরে অনুষ্ঠিত হত বিজয় উৎসব—খানা-পিনা ও উপহার দেওয়া-নেওয়ার পালা। অতঃপর পুনরায় শুরু হত হত্যার উৎসব।

* ১৯২০-২১ সালে ভারতের মুসলমান আফগানিস্তানের নবাবকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, সদম্ভে ঘোষণা করেছিল হিন্দুরা যদি এই অভিযান সমর্থন না করে, তবে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

1. Khwajah Nizamuddin—The Tabaqat-I-Akbari Vol-3, P-29
2. Ibid, P-32

অধিকৃত অঞ্চলের সকল মন্দির ও বিদ্যালয় ধ্বংস করা হয়। (The Sultan without waiting to besiege the Ray's capital, overran the open country and put men, women and children to death without mercy; and whenever the number of the slain amounted to twenty thousand, he halted for three days and held great feast. He also destroyed Hindu temples and colleges of the Brahmins.)[1] ইওরোপীয়ান ঐতিহাসিক Robert Sewell-এর বর্ণনায়—নিহতের সংখ্যা ২০০০০ পূর্ণ হলেই, মহম্মদ শাহ্ সকল মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনদিন ধরে উৎসবের আয়োজন করতেন। তিনি সকল মন্দির ও বিদ্যালয় ধ্বংস করেন। (Laying aside all humanity, whenever the number of the slain amounted to twenty thousand, he halted three days, and made a festival in celebration of the bloody work. He broke down the idol temples, and destroyed the colleges of the Brahmins.)[2]

এই বর্বর হত্যাকাণ্ড ও ধর্মে আঘাত দেওয়ায় হিন্দুরা ক্রুদ্ধ হয়। প্রায় ৫০০০ হিন্দু সংঘবদ্ধ হয়। তারা প্রতিজ্ঞা করে যে প্রাণ দিয়েও এই বর্বরতার প্রতিশোধ নেবে। সুলতানের পেছনে তারা গুপ্তচর নিয়োগ করে। সুলতান একদিন শিকারে বেরিয়ে সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হিন্দুরা সংবাদ পেয়ে তাড়া করে সুলতানকে। ইতিমধ্যে সুলতানের দেহরক্ষী ও সৈন্যরা এসে যায়। দুপক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়—হতাহত হয় অসংখ্য। সুলতান রক্ষা পান।

১৪২৫ খ্রিঃ সুলতান মাহুর (Ray of Mahu) অধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আনুগত্য স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করেন মাহুর নরপতি। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার বিবরণ অনুযায়ী সুলতান চুক্তিভঙ্গ করে ছয় সহস্র সৈন্য সহ মাহুর রাজাকে হত্যার আদেশ দেন। রাজার পুত্র-কন্যাদের বন্দি করে বলপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। সুলতান অধিকার করেন কালান দুর্গ ও হিরার খনি (Firisthah says that after the Zaminder of Mahu had submitted, the Sultan breaking his engagement with him, had him and five or six thousand Hindus put to death, and imprisoned their sons and daughters, and forced them to become Musalmans. Firisthah also says that at this time the Sultan took possession of the fort of Kalan and also of a diamond mine.)[3]

1. Khwajah Nizamuddin—The Tabaqat-I-Akbari Vol-III. P-44
2. Robert Sewell—A Forgotten Empire, P-68
3. Khwajah Nizamuddin—The Tabaqat-I-Akbari Vol-III, P-47

ধর্মযুদ্ধ ও বিজয়নগর

দক্ষিণের মুসলিম রাজ্যগুলির সঙ্গে বিজয়নগরের বৈরিতা দীর্ঘ দিনের। প্রায় প্রত্যেক মুসলিম শাসক আক্রমণ করেছে বিজয়নগর—কিন্তু সম্পূর্ণ জয় করতে পারেনি। রামরাজার সময় বিজয়নগর দক্ষিণের সর্বাধিক সমৃদ্ধশালী রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। সামরিক শক্তিতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, বিজয়নগরের অতুল বৈভব ও অনুপম স্থাপত্য শিল্প ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনীয়—এ অভিমত বিদেশী পর্যটকদের। দক্ষিণের মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যেও সংঘর্ষ লেগে থাকত। সেই যুদ্ধে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে রামরাজার সাহায্য নিতেন। হুসেন নিজাম শাহ্ আদিল শাহের রাজ্য আক্রমণ করলে তিনি রামরাজার সাহায্যে সে আক্রমণ প্রতিহত করেন। রামরাজা ইতিপূর্বে মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত ভূখণ্ড উদ্ধার করে রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। শঙ্কিত হলেন মুসলিম শাসকবৃন্দ। বিজয়নগর তাদের সকলের শত্রু। ইসলামের স্বার্থে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজন একতা—সম্মিলিত আক্রমণ। এই ইসলামিক ঐক্যের স্বার্থে হুসেন নিজাম শাহ্ চির-বৈরী আদিল শাহের সঙ্গে নিজকন্যা চাঁদবিবির এবং পুত্র মুরতাজার সঙ্গে আদিল শাহের ভগিনীর বিবাহ দিতে সম্মত হন। যথাসময়ে শুভকাজ সুসম্পন্ন হলে শুরু হল ধর্মযুদ্ধের প্রস্তুতি। (The marriages were celebrated in due course, and the Sultans began their preparations for the holy war.)[1]

আদিল শাহের সঙ্গে রামরাজার ছিল মিত্রতা। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় একটা অজুহাত প্রয়োজন। তিনি রামরাজার নিকট কয়েকটি জেলা দাবি করে দূত পাঠালেন। প্রত্যাশিত ভাবেই বিজয়নগর অধিপতি দূতকে অপমান করে রাজসভা থেকে বহিষ্কার করেন। অতঃপর মুসলিম সুলতানগণ ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে সমরায়োজনে উদ্যোগী হলেন (As he expected, Ramraja expelled the ambassador in a very disgraceful manner from his court; and the united Sultans now hastened the preparations to crush the common enemy of the Islam faith.)[2] ১৫৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর হুসেন নিজাম শাহ্, আলি আদিল শাহ্, ইব্রাহিম কুতুব শাহ্ এবং আলিবর্দ—এই চার সুলতান বিশাল বাহিনী নিয়ে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বিজয়নগর অধিপতি রাম রাজাও ততোধিক বিশালতর সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হন সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে। ইতিহাসে এই যুদ্ধ টালিকোত্রার যুদ্ধ নামে খ্যাত। সম্মিলিত ইসলামিক বাহিনীর সম্মুখে ছিল ১২জন ইমামের পতাকা (ধর্মযুদ্ধের প্রতীক?)

1. Robert Sewell—A Forgotten Empire, P-199
2. Ibid, P-199

রামরাজা ছিলেন বৃদ্ধ—বয়স ৯৬ বৎসর। কিন্তু শক্তি ও সাহসে তরুণকেও হার মানায়। আত্মবিশ্বাস তার অসাধারণ। জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত। অমাত্যবর্গের নিষেধ অগ্রাহ্য করে তিনি পাল্কিতে চেপে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সৈন্যদের মধ্যে উপস্থিত হলেন। নিজামুদ্দিন বলেন, চতুঃশক্তি ইসলামিক বাহিনীর পরাজয়ের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য রামরাজার, হুসেন নিজাম শাহের সৈন্যদের ছোঁড়া একটি কামানের গোলায় তিনি নিহত হন। (....and it was likely that the four rulers should meet with a defeat when by an act of fate, a cannon ball, shot from the army of Nizam-ul-Mulk, hit Ramraj and killed him–Tabaqat-I-Akbari-Vol-III P-142-143). Robert Sewell-এর বিবরণ অনুসারে বিজয়নগর বাহিনীর তীব্র গোলাবর্ষণ ও হাতাহাতি যুদ্ধে ইসলামিক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। তাদের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। এমন সময় হুসেন নিজাম শাহের সেনাদের গোলাবর্ষণে বিজয়নগরের বহু সৈন্য হতাহত হয়। সহসা নিজাম বাহিনীর একটি হাতি রণোন্মত্ত হয়ে ছুটে আসে রামরাজার দিকে—পেছনে মুসলিম অশ্বারোহী দল। বিজয়নগর সৈন্যদের মধ্যে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। পাল্কী-বাহকরা ভয়ে পাল্কী রেখে পালায়। রামরাজা অশ্বারোহণ বা আত্মরক্ষার সুযোগ পাননি। তাঁকে বন্দী করে হুসেন নিজাম শাহ্‌র সম্মুখে আনা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে হত্যার আদেশ দেন। তাঁর ছিন্ন শির একটি দীর্ঘ বর্শার মাথায় গেঁথে দেওয়া হয়*—যাতে দূর থেকে হিন্দু সৈন্যরা সে দৃশ্য দেখতে পায়। (The battle becoming more general, the Hindus opened a desolating fire from a number of field pieces and rocket batteries. The left and right of the Muhammadan line were pressed back after destructive hand to hand fighting....A second attack by the Hindus on the guns in the centre

* ফিরিস্তার বিবরণীর এই অংশের অনুবাদে Colonel Briggs-এর তীক্ষ্ণ মন্তব্য ঃ এই হিন্দু রাজার প্রতি মুসলমানের কি তীব্র বিদ্বেষ; একটি ঘটনা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। রামরাজার একটি পাথরের মুণ্ড তৈরি করে তা বসানো হয়েছে বীজাপুর দুর্গের নর্দমার মুখে। আজও (১৮২৯ সাল) মূল মুণ্ডটি রয়েছে হত্যাকারীর বংশধরদের কাছে। বিগত ২৫০ বৎসর ধরে তৈলসিক্ত এই মুণ্ডটিকে প্রতিবৎসর রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে টালিকোটরা যুদ্ধের বার্ষিক দিবসে আহম্মদনগরের পুণ্যাত্মা ধার্মিক মুসলমানদের দেখানো হয়। ধিক্ শতাধিক নীতিহীন এই কদর্য চিত্ত-বৃত্তিকে। (An interesting note by colonel Briggs is appended to his translation to these passage of Firistah. "It affords a striking example at once of the malignity of the Mahamedans towards this Hindu prince, and of the depraved taste of the times, when we see a sculptured representation of Ramraja's head, at the present day, serving as the opening of one of the sewers of the citadel of Beejapur; and we know that the real head, annually covered with oil and red pigment, has been exhibited to the pious Mahamadans of Ahmednuggur, on the anniversary of the battle, for the last two hundred and fifty years, by the descendants of the executioner, in whose hands it has remained till the present period". This was written in 1829—Robert Sewell—A Forgotten Empire. P-205-206.)

seemed likely to complete the overthrow of the whole Muhammadan line, when the front rank of pieces was fired at close quarters....and this proved so destructive that 5000 Hindus were left dead on the field.....when an elephant belonging to the Nizam Shah, wild with the exitement of the battle, dashed forward towards him [Ram Raja] and the litter–bearers let fall their precious burden in terror at the animal's approach. Before he had time to recover himself and mount a horse, a body of the allies was upon him, and he was seized and taken prisoner....Ram Raja was conducted by the officer who commanded the artillery of Hussain Nizam to his Sultan, who immediately ordered his captive to be decapitated, and the head to be elevated on a long spear, so that it might be visible to the Hindu troops.)[1]

হত্যা ও লুণ্ঠন

রামরাজা নিহত হলে তার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়। তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে। বিজয়োন্মত্ত মুসলিম বাহিনী নেতৃত্বহীন পলায়নপর হিন্দু সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করে। হত্যা করে নির্বিচারে। নিহত হয় অন্তত এক লক্ষ হিন্দু সৈন্য। তাঁদের রক্তে কৃষ্ণানদীর জলরাশি হয় রক্তবর্ণ। তারপর শুরু হয় অবাধ লুণ্ঠন। সোনা-রূপা, বহুমূল্য রত্নরাজি, হাতি-ঘোড়া, দাস-দাসী। অপর্যাপ্ত লুণ্ঠন করে একজন সাধারণ সৈনিকও বেশ ধনবান হয়। এর পর অরক্ষিত রাজধানীতে বিনা বাধায় প্রবেশ করে মুসলিম হানাদার বাহিনী। ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিক Robert Sewell-এর বর্ণনায়, 'সেই দিন থেকে দীর্ঘ পাঁচ মাস পর্যন্ত শান্তি কাকে বলে বিজয়নগর তা জানত না। শত্রু এসেছে ধ্বংস করতে, এবং সে কাজ তারা করেছে বিরামবিহীন ভাবে; নির্মম নির্দয়ভাবে, হত্যা করেছে নির্বিচারে। ভেঙ্গেছে মন্দির ও সুউচ্চ অট্টালিকা। রাজধানীতে এমন বর্বরভাবে তাঁদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে যে দু-একটি কঠিন প্রস্তর-নির্মিত দুর্ভেদ্য মন্দির ও প্রাচীর ব্যতীত আর কোনো বস্তুর চিহ্নমাত্র নেই। এ স্থানে যে একদা ছিল মহিমান্বিত, সুউচ্চ প্রাসাদোপম হর্ম্যরাজি সেই সাক্ষ্য বহন করে আজও রয়েছে রাশি রাশি স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষ। ভাস্কর্যের অনবদ্য নিদর্শন সুন্দর দেবমূর্তি ভেঙেছে। এমনকি এক পাথরের নির্মিত বিশাল নৃসিংহ (Narshimha) দেবের পদযুগল ভাঙতেও তারা সক্ষম হয়েছে। আক্রমণকারীদের রুদ্ররোষ থেকে কোনো কিছুই অব্যাহতি পায়নি। তারা ভেঙেছে উঁচু

1. Robert Sewell—A Forgotten Empire, P-204-205

মঞ্চের উপর নির্মিত কারুকার্যমণ্ডিত জাঁকজমকপূর্ণ পটমণ্ডপ—যেখানে দাঁড়িয়ে মহারাজা সকল উৎসব দর্শন করতেন। আক্রমণকারীরা ভস্মীভূত করে নদীতীরবর্তী জগদ্বিখ্যাত বিটলস্বামী মন্দির ও তার সংলগ্ন অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহ। চূর্ণ করে বহুমূল্য পাথরে খোদিত ভাস্কর্যের অনুপম শিল্পকর্ম। তরবারি, কুঠার, শাবল ও আগুনের সাহায্যে দিনের পর দিন চলেছে এই ধ্বংসের তাণ্ডব। বিশ্বের ইতিহাসে অতীতে কখনও এরূপ একটি উন্নত সমৃদ্ধশালী জনপদকে এমনভাবে সহসা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়নি; যে জনপদের অধিবাসীরা ছিল পরিশ্রমী, সুখী ও স্বচ্ছল (...from that time forward for a space of five months Vijaynagar knew no rest. The enemy had come to destroy, and they carried out their object relentlessly. They slaughtered the people without mercy, broke down the temples and palaces, and wreaked such savage vengeance on the abode of the kings, that, with the exception of a few great stone-built temples and walls, nothing now remains but a heap of ruins to mark the spot where once stately buildings stood. They demolished the statues and even succeeded in breaking the limbs of the huge Narashimha Monolith. Nothing seemed to escape them. They broke up the pavilions standing on the huge platform from which the kings used to watch the festivals, and overthrew all the carved work.....They lit huge fires in the magnificently decorated buildings forming the temple of Vitthalswami near the river, and smashed its exquisite stone sculptures. With fire and sword, with crowbars and axes, they carried on day after day their work of destruction....Never perhaps in the history of the world has such havoc been wrought, and wrought so suddenly, on so splendid a city, teeming with a wealthy and industrious population.)[1] ধ্বংসের এই অবর্ণনীয় ব্যাপকতা সত্ত্বেও বিজয়নগর রাজ্যে মুসলমান ইসলামিক স্থাপত্যের স্থায়ী কোন নিদর্শন রেখে যেতে পারেনি। তার কারণ হল বিজয়নগরের পরবর্তী শাসক সৈন্য সংগ্রহ করে রাজ্য উদ্ধারে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, সেখানে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলিম বসতি ছিল না। তৃতীয়ত, ইতিমধ্যে পর্তুগীজগণ আরব সাগরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে আরব থেকে নতুন সৈন্য আমদানি বন্ধ করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে দাক্ষিণাত্য নয়—সমগ্র ভারতেই মুসলিম অধিকৃত রাজ্যগুলি ছিল "a

1. Robert Sewell—A Forgotten Empire, P-207-208

chain of garrison cities". (দুর্গনগরী) হিন্দু রাজারা পরাজয়কে চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়নি। যখন যেখানে সম্ভব হয়েছে নতুন শক্তি অর্জন করে হৃত রাজ্য উদ্ধার করেছে। এই সকল প্রতিবন্ধকতা না থাকলে সমগ্র ভারতে মাহোবার পুনরাবৃত্তি হত। Alexander Cunning Ham-এর মতে ইহা অনস্বীকার্য, মুসলমানরা যে সমস্ত অঞ্চল অধিকার করেছিল সেখানে সকল মন্দিরই ধ্বংস করেছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম মদনসাগরে অবস্থিত মাহোবার এই মন্দির। অতলস্পর্শী সাগরের গভীর জলরাশি তাকে রক্ষা করেছে। দিল্লী, মথুরা, বেনারস, জৌনপুর, নারওয়ার, আজমীর—সর্বত্র প্রতিটি মন্দিরই মুসলিম ধর্মান্ধতার শিকার হয়েছে। হিন্দু মন্দিরের অনুপম কারুকার্যখচিত স্তম্ভকে তারা ব্যবহার করেছে মসজিদ অথবা সমাধি নির্মাণে। মাহোবায় পর্বত দুর্গে অবস্থিত পারমল প্রাসাদ ব্যতীত সকল মন্দিরই ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এই পারমল প্রাসাদ এখন মসজিদ। ১৮৪৩ সালে আমি পীর মুবারক শা'র দরগা ও সংলগ্ন কবরখানায় দেখেছিলাম গ্রানাইট পাথরের ৩১০-টি স্তম্ভ, কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ ও বৃষ; নিশ্চয়ই কোনো শিব মন্দিরের। (It must be admitted however, that in none of the cities which the early Muhammadans occupied permanently, have they left a single temple standing, save this solitary temple at Mahoba, which doubtless owed its preservation solely to its secured position amid the deep waters of Madan Sagar. In Delhi and Mathura, in Benaras and Jaunpur, in Narwar and Ajmer, every single temple was destroyed by their bigotry, but thanks to their cupidity, most of the beautiful Hindu Pillars were preserved, and many of them, perhaps on their original positions, to form new colonnades for the Masjids and tombs of the conquerors. In Mahoba all the other temples were utterly destroyed and the only Hindu building now standing is part of the palace of Parmal or Paramardi Deva, on the hill-fort, which has been converted into a Masjid.....In 1843 I found an inscription of Paramardi Deva built upside down in the wall of the fort just outside this masjid..... in the Dargah of Pir Mubarak Shah, and the adjacent Musalman burial-ground, I counted 310 Hindu pillars of granite. I found a black stone bull lying beside the road, and the argha of a lingam fixed as a water-spout in the terrace of the Dargah. This last must have belonged to a temple of Shiva).[1]

---

1. Archaeological Survey of India Vol-I, P-440-41
   Quoted from Sita Ram Goel–Hindu Temples–What Happened To them, P- 79-80

আজম হুমায়ুন জাফর খাঁ

চতুর্দশ শতাব্দী। মহম্মদ শা দিল্লীর বাদশাহ্। তাঁর অধীনে নিজাম মুফারা (Nizam Mufarrah) গুজরাটের সুবেদার। ফিরিস্তার বিবরণী থেকে জানা যায় দিল্লীর সুলতানের প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু জমিদার ও হিন্দুদের সঙ্গে তিনি সদ্ব্যবহার করতেন। পৌত্তলিকতা দমন করার কোনো চেষ্টা তিনি করেননি। তাই (গুজরাটের) বিদগ্ধ মুসলমান ও উলেমারা তার উপর অসন্তুষ্ট হন। তাঁরা দিল্লীর সুলতানের নিকট সুবেদারের অপকর্মের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রতিকারের আবেদন জানায়। (.....he (Firistah) says that he had the intention of hostility (to the emperor), and therefore treated the Zamindars and the infidels of the country well, and in order to flatter them, gave currency to the customs of heathenism and idolatry. Therefore the learned and erudite men of Gujrat sent the letter in which they spoke of Nizam Mufarrah's misdeeds, and prayed the Sultan to take necessary steps for remedying them).[1] সুলতান মহম্মদ শা দরবারের পদস্থ আমীরদের সঙ্গে পরামর্শ করে তার অনুগত ও একান্ত প্রিয় আমীর আজম হুমায়ুন জাফর খাঁ-কে গুজরাটের সুবেদার নিযুক্ত করেন। নিযুক্তি পত্রে (বাদশাহী ফারমান) সুলতান স্বহস্তে তাঁর উপাধি লিখে দেন ঃ জ্ঞানী, উদার, উদ্যমী, ন্যায়পরায়ণ, ইমানদার মুসলমান, সুলতান শাহীর সংহতিকারক, ইসলাম ও মুসলমানের রক্ষক, কাফের নিধনকারী, সুবিচারক ও পরমদয়ালু উলুঘ কুতলুঘ আজম হুমায়ুন জাফর খাঁ (...he [the Sultan] wrote the titles with his own hands and they were as follows : ....learned, just, generous, energetic, the most fortunate of the faith and religion, the defender of Islam and Musalmans the binder of the Sultanate, the supporter of the faith, the exterminator of Kurf,....the distributor of justice and beneficance. ..Ulugh Qutlugh A'zam Humayun Zafar Khan.)[2]

আজম হুমায়ুন খাঁ সুসজ্জিত বাদশাহী বাহিনী নিয়ে গুজরাট অভিমুখে যাত্রা করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা নিজাম মুফারা তাঁর এই পদচ্যুতি মেনে নিতে পারেননি। তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। পাটনের (Pattan) কাছে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষে নিজাম মুফারা পরাজিত ও নিহত হন। জাফর খাঁ গুজরাটের শাসনভার গ্রহণ করে আপন কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করেন।

1. Khwajah Nizamuddin—The Tabaqat-I-Akbari Vol-III, P-173
2. Ibid, P-174-175

১৩৯১ খ্রিঃ সোমনাথ মন্দির ধ্বংসের উদ্দেশ্যে তিনি বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। রাজপুতরা বাধা দিলে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেন। ধ্বংস করেন যাত্রাপথের দু'পাশের সকল মন্দির। সোমনাথে উপস্থিত হয়ে তিনি মন্দির জ্বালিয়ে দেন, চূর্ণ করেন সোমনাথের বিগ্রহ। নির্বিচারে নিহত হয় অসংখ্য কাফের; লুণ্ঠিত হয় নগর। মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপর জামা মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিয়ে তিনি ফিরে যান রাজধানী। (....on the way he made the Rajputs food for his merciless swords; and wherever a temple appeared before his eyes, he razed and destroyed it. When he arrived at Somnath he burnt the temple down and broke up the idol, he slew the Kafirs and plundered the city. He planned the erection of Jama Masjid.)[1]

১৩৯৮ খ্রিঃ সুলতান সংবাদ পান যে, হিন্দুরা পুনরায় সোমনাথ মন্দির নির্মাণ শুরু করেছে। সুলতান তৎক্ষণাৎ একটি অগ্রবর্তী বাহিনী প্রেরণ করেন। হিন্দুরা বাধা দিতে প্রস্তুত হয়। ইতিমধ্যে স্বয়ং সুলতান বায়ুবেগে সোমনাথে উপস্থিত হন। যুদ্ধে অগণিত হিন্দু নিহত হয়। অনেকে পালিয়ে দীপ বন্দরে দুর্গে আশ্রয় নেয়। সুলতান দুর্গ অবরোধ করেন। কয়েকদিন পরে দুর্গে প্রবেশ করে সকলকে হত্যা করেন। হিন্দুদের দলপতিদের হাতির পদতলে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে সেখানে তিনি জামা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। (Azam Humayun....sent an army in advance of himself. When the inhabitants of Somnath received information of this, they advanced to meet him by way of the sea and began a battle. Azam Humayun arrived there on wings of speed and routed and destroyed them. Those who escaped the sword fled, and took shelter in the citadel of the port of Dip. After a few days the gates of the citadel were opened and the garrison were made food for the sword. He had the chief men of that body thrown under the feet of elephants. He demolished the temple and laid the foundation of Jami Masjid.)[2]

কাশ্মীর

একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে দিল্লীতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশ সমগ্র উঃ ভারতে তা হয় প্রসারিত। কিন্তু ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত কাশ্মীর ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ নৃপতিদের শাসনাধীন।

1. Khwajah Nizamuddin Ahmed—The Tabaqat-I-Akbari Vol-III, P-178
2. Ibid, P-181-182

১৩০১ খ্রিঃ সুহদেব (Suhadeva) কাশ্মীরের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দমন করে তিনি সমগ্র রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করেন। কিন্তু শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অচিরেই বেজে ওঠে রণদামামা। রাজা কর্মসেনার (Karmasena) সেনাপতি দুলুচা (Dulucha) ৬০,০০০ অশ্বারোহী নিয়ে আক্রমণ করে কাশ্মীর। সুহদেব তাকে প্রচুর অর্থ উৎকোচ দিয়ে রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করেন। অর্থ পেয়েও দুলুচা আপন রাজ্যে ফিরে যায় না। তাঁর অত্যাচারে জনসাধারণের দুর্দশা চরমে ওঠে। শেষ পর্যন্ত প্রবল শীতের জন্য দুলুচা কাশ্মীর ত্যাগে বাধ্য হন।

জনগণের স্বস্তি নেই। এই সময় তিব্বতীয় সেনাপতি রিনচানা (Rinchana) উত্তর দিক থেকে কাশ্মীর আক্রমণ করেন। তাকে বাধা দেন জনৈক রামচন্দ্র (Ramchandra)। রিনচানা তাকে হত্যা করে তাঁর কন্যা কোটাদেবীকে বিবাহ করেন। রাজা সুহদেব গোপনে পালিয়ে গেলে ১৩২০ খ্রিঃ রিনচানা নিজেকে কাশ্মীরের স্বাধীন নৃপতিরূপে ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন দক্ষ শাসক। বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে তিনি রামচন্দ্রকে হত্যা করেন— এবার তাঁর তিব্বতীয় সাথীরা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। তাকে গুপ্ত হত্যার চেষ্টা করা হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হয় না। রাজা প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু মাথায় পান গুরুতর আঘাত। মাত্র তিন বৎসর রাজ্য শাসনের পর সম্ভবত এই আঘাতজনিত কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শাহমেরা (Sahamera) অথবা শাহমীর (Shah Mir) নামে জনৈক উচ্চাভিলাষী মুসলিম যুবক ১৩১৩ খ্রিঃ কাশ্মীরে আসে। ঐতিহাসিক জনরাজার (Janaraja) বিবরণ অনুযায়ী শাহমেরা তিব্বতী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগ না দিয়ে রাজা রিনচানার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। কেহ কেহ মনে করেন, শাহমেরার প্রভাবে রিনচানা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিক ফরিস্তা এবং নিজামউদ্দিন বলেন রিনচানা ছিলেন কাফের (অ-মুসলমান); তবে তাঁর স্ত্রী কোটাদেবী শাহমেরাকে বিবাহ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। যাহোক শাহমীর ছিলেন রাজার বিশ্বাসভাজন। রিনচানা তাঁর নাবালক পুত্র হায়দারের দায়িত্ব শাহমীরের হাতে অর্পণ করেন। রিনচানার মৃত্যু হলে রাণী উদয়নদেবকে (Udayandeva) বিবাহ করেন। হায়দার তখন নাবালক। ধূর্ত শাহমীর শক্তি সামর্থ্যের অভাবে সিংহাসন দখল অসম্ভব বুঝে উদয়নদেব ও রাণী কোটাদেবীর ওপর রাজ্যভার ন্যস্ত করেন। নতুন রাজা পার্থিব বিষয়ে উদাসীন। রাজ্য শাসনের দায়িত্ব রাণীর হাতে অর্পণ করে তিনি পূজা-অর্চনায় মগ্ন থাকেন। শাহমীর রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আপন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। এই সময় দেশ পুনরায় বিদেশী শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। রাজা উদয়নদেব তিব্বতে পালিয়ে যান। রাণী কোটাদেবীর

অসাধারণ সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় শত্রুপক্ষের সেনাপতি নিহত হন। শত্রুর পরাজয়ে শাহ্মীরেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। রাজ্য বিপদমুক্ত হলে রাজা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৩৩৮ খ্রিঃ রাজার মৃত্যু হলে রাণী পড়েন উভয় সঙ্কটে। রিনচানার ঔরসজাত তাঁর প্রথম পুত্র হায়দার রাজা হলে—তার মাধ্যমে শাহ্মীর-ই রাজ্য পরিচালনা করবেন। অন্যদিকে তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত পুত্র নাবালক। রাণী চার দিন রাজার মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখেন। অতঃপর স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করে বাজার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেন। শাহ্মীর, মন্ত্রী, সেনাপতি ও অন্যান্য অমাত্যগণ রাণীর প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন। শাহ্মীরের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঙ্গত কারণেই রাণী ছিলেন সন্দিহান। তিনি ভট্ট ভিক্ষুকে (Bhatta Bhikshana) প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। রুষ্ট হন শাহ্মীর। গুপ্ত ঘাতকের হাতে ভট্ট ভিক্ষু নিহত হন। রাণী কোটাদেবী রাজ্য শাসনে যথেষ্ট দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু কূট কৌশলে শাহ্মীরের সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি ক্ষমতালোভী ধূর্ত শাহ্মীরের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সতর্কতা গ্রহণ করেননি। সুযোগ বুঝে শাহ্মীর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রাণী ছিলেন কোটাদুর্গে। শাহ্মীর দুর্গ অবরোধ করেন। রাণী অসহায়। শাহ্মীর তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে হয়তো বাধ্য হয়েই তিনি সম্মত হন। ধূর্ত ক্ষমতালোভী শাহ্মীর এক রাত্রি রাণীর সঙ্গসুখ উপভোগ করে পরদিন দুই পুত্র সহ তাকে কারারুদ্ধ করেন। (After spending one night with kota, Sahamera imprisoned her in the morning and then imprisoned her two children also.)[1] ১৩৩৯ খ্রিঃ সামস্-উদ্-দীন-শাহ্ উপাধি নিয়ে তিনি আরোহণ করেন কাশ্মীরের সিংহাসনে। এইভাবে হিন্দুর স্বাভাবিক উদারতার সুযোগে বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম শাসন।

সামস্-উদ-দীন-শাহ্ ছিলেন দক্ষ শাসক। ফরিস্তার বর্ণনা অনুযায়ী, অতিরিক্ত করের বোঝা রদ করা হয়; উৎপন্ন ফসলের ওপর কর ধার্য হয় ১৭ শতাংশ। কাশগড় অধিপতি Dlijoo প্রতি বৎসরই কাশ্মীর আক্রমণ করে লুঠতরাজ করতেন। এই হামলা রোধে সামস্-উদ-দীন সীমান্ত সুরক্ষিত করেন। তিনি মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করেন। ১৩৪২ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জামসেদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হলে ভাই আলি শের কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। তিনি আলাউদ্দিন উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল শান্তিপূর্ণ। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন ভাই শিহাবুদ্দিন। শিহাবুদ্দিন ছিলেন যুদ্ধপ্রিয়। তিনি বহু অঞ্চল জয় করে কাশ্মীরের রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত

1. R.C. Majumder—The History and Culture of the Indian People, P-375 (The Delhi Sultanate)

করেন। অবশ্য তা স্থায়ী হয়নি। তবু তাঁর রাজত্বকাল কাশ্মীরের সুলতান শাহির ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় রূপে খ্যাত। জনরাজার মতে তাঁর ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়; ভারতের মুসলিম শাসকদের মধ্যে যা বিরলদৃষ্ট। তরুণী ভার্যা লাসার (Lasa) প্ররোচনায় তিনি তাঁর দুই পুত্রকে নির্বাসিত করেন। পরে অবশ্য এ কাজের জন্য তাকে অনুতপ্ত হতে হয়। মৃত্যুর পূর্বে পুত্রদের অনুপস্থিতিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কুতুবুদ্দিন উপাধি নিয়ে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর নাবালক পুত্র সিকান্দর আরোহণ করেন সিংহাসনে। রাজমাতা সুভটা (Subhata) মামা উদ্দকের (Uddaka) সাহায্যে অভিভাবিকারূপে (regent) শাসন কার্য নির্বাহ করতেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে শাসনভার সহস্তে গ্রহণ করলে উদ্দক বিদ্রোহী হয়। সিকান্দর সে বিদ্রোহ সহজেই দমন করেন।

কাশ্মীরের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সিকান্দরের শাসনকাল এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তার পূর্বে মুসলিম সুলতানদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি দেখা যায়নি। তাঁদের বেগমদের নাম ছিল লক্ষ্মী, শোভা.......। কুতুবউদ্দিন দুর্ভিক্ষ এড়াতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ থেকে মনে হয় হিন্দু-বৌদ্ধ-সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরে মুসলিম সংখ্যাল্পতাই এই আপাতঃ উদারতার কারণ। সিকান্দরের রাজত্বে ভারতের অন্যান্য মুসলিম রাজ্য থেকে দলে দলে মুসলমান এসে কাশ্মীরে বসবাস শুরু করে। ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য পৌত্তলিকতা বিরোধী জেহাদি মনোভাবকেও তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক জনারাজার বর্ণনায় ঃ

মুসলমান ছিল সুলতানের বিশেষ প্রীতিভাজন। তাদের দান করতে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। সুলতানের বদান্যতায় আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য রাজ্য থেকে মুসলমান এসে বসতি স্থাপন করে কাশ্মীরে। তাদের নেতা ছিলেন মেরা দেশের জনৈক মুহম্মদ। সুলতান প্রত্যহ ভৃত্যের ন্যায় তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতেন। তাঁর পদপ্রান্তে বসে ছাত্রের ন্যায় পাঠ গ্রহণ করতেন। রাজ্যে মুহম্মদের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। সুলতান একান্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাঁকে অনুসরণ করতেন। প্রবল বাত্যাপ্রবাহে যেমন বৃক্ষরাজি উৎপাটিত হয়, পতঙ্গ (locust) যেমন ধ্বংস করে সালি (sali) শস্য; তেমনি যবনজাতি ধ্বংস করে কাশ্মীরের চিরাচরিত রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য।

দয়ালু সুলতান মুসলমানদের দান করতেন অকাতরে। ভূষিত করতেন বিবিধ রাজকীয় সম্মানে। সেই আকর্ষণে ম্লেচ্ছজাতি জলস্রোতের ন্যায় প্রবেশ করে কাশ্মীরে, পতঙ্গ যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবেশ করে শস্যক্ষেত্রে। তারা সুলতানের মিত্রতা লাভ করে, অধিকার করে সকল উচ্চ রাজপদ। ('The King had a fondness for the yavanas....many yavanas left other sovereigns and took shelter under

this king who was renowned for charity. Muhammad of Mera country became their (that is, of the yavanas) chief. The king waited on him daily humble as a servant, and like a student he daily took his lesson form him. He placed Muhammad before him, and was attentive to him like a slave. As the wind destroys the trees, and the locust the sali crop, so did the yavanas destroy the usages of Kashmir. Attracted by the gifts and honours which the king bestowed, and by his kindness, the mlechchhas entered Kasmir even as locust enter a good field of corn'. They occupied all the offices of the state and became friends of the king.)[1]

সিকান্দর মুহম্মদের কাছ থেকে ইসলাম ধর্ম বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছিলেন; এবং বাস্তবে তা যথাযথভাবে রূপায়ণ করতে কোনো ত্রুটি বা শৈথিল্য দেখান নি। সুহভট্ট (Suhabhatta) ছিলেন তাঁর মন্ত্রী। হিন্দু ধর্মত্যাগ করে সুহভট্ট গ্রহণ করেন ইসলাম ধর্ম। মুসলমানদের প্ররোচনায় তিনি সুলতানকে উত্তেজিত করেন হিন্দুর দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙার জন্য। অবশ্য মহম্মদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করার পর এ ব্যাপারে সুলতানের কারুর প্ররোচনা বা পরামর্শের প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। জনারাজা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সুলতানের জেহাদের বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

সুলতান শাসকের কর্তব্য ভুলে গেলেন। দিবা-রাত্র মূর্তি ভাঙার আনন্দে মগ্ন থাকতেন।....মার্তণ্ডদেব, ভীষ্ম, ঈশান, চকভিরিট ও ত্রিপুরেশ্বরের মূর্তি তিনি ভেঙেছেন। এমন কোনো নগর, শহর, গ্রাম বা অরণ্য ছিল না—যেখানে সুহ তুরস্ক হিন্দু দেবালয় ধ্বংস করেননি। (The king forgot his kingly duties and took a delight day and night, in breaking images.....He broke the images of Martanda, Vishaya, Isana, Chakrabhrit and Tripuresvara.....There was no city, no town, no village, no wood where Suha Turushka left the temples of gods unbroken.)[2]

সুলতান সিকন্দরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার এক নিখুঁত পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। প্রবীণ মুসলিম ঐতিহাসিক ফরিস্তা সুলতানের হিন্দু-বিরোধী জেহাদি মনোভাবকে মহৎ কাজ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফরিস্তার বিবরণ থেকে জানা যায় ঃ সুলতান এক আদেশে মুসলমান ব্যতীত অন্য সকলের কাশ্মীরে বসবাস নিষিদ্ধ

1. Ibid, P-378
2. Ibid, P-378

ঘোষণা করেন। নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়—কপালে তিলক আঁকা ও সহমরণ। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত সকল দেব-মূর্তি ভেঙে তা দিয়ে মুদ্রা তৈরীর ব্যবস্থা হয়। অনেক ব্রাহ্মণ স্বদেশ ও স্বধর্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা বিষপানে মৃত্যু বরণ শ্রেয় মনে করেন। অনেকে দেশ ত্যাগ করেন, মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্রাহ্মণ বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে ইসলাম ধর্ম। এইভাবে কাশ্মীর ব্রাহ্মণশূন্য হলে সিকন্দর সকল দেব মন্দির ভেঙে ফেলার আদেশ দেন। (The Muslim version of the activities of Sikandar is given in detail by Firishta who, of course, includes them among his "good institutions." According to Firishta, Sikandar issued "Orders proscribing the residence of any person other than Muhammadans in Kashmir; and he required that no man should wear the mark on his forehead, or any woman be permitted to burn with his husband's corpse. Lastly he insisted on all the golden and silver images being broken and melted down and the metal coined into money. Many of the Brahmins, rather than abandon their religion or their country, poisoned themselves; some emigrated from their native homes, while a few escaped the evil of banishment by becoming Muhammadans. After the emigration of the Brahmins, Sikandar ordered all the temples in Kashmir to be thrown down.)[1]

অতঃপর সুলতান ও তাঁর মন্ত্রীর প্রধান কাজ হল হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা। সুলতান শুধু আদেশ জারি করেই ক্ষান্ত হননি, মন্দির ধ্বংস অভিযান যাতে যথাযথভাবে রূপায়িত হয় তিনি সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। এই অসাধারণ কাজের জন্য তাঁকে বাটশিখান (Butsikhan -- Destroyer of idols) উপাধি দেওয়া হয়। এই সকল হিন্দু-বিদ্বেষী কাজের জন্য কেহ কেহ মন্ত্রী সুহাভট্টকে দায়ী করেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক জনা রাজার মন্তব্য ঃ স্বীকৃত প্রথা হল ভৃত্য নয় মনিব বা প্রভুই সকল কাজের জন্য দায়ী। ফরিস্তার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সুলতান নিজে উপস্থিত থেকে একটি বিখ্যাত মন্দির ভাঙার তদারকি করেন। যতক্ষণ, মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভেঙে তার ভিত পর্যন্ত খনন করা হয়—ততক্ষণ সুলতান স্থান ত্যাগ করেননি। (....in one case we are told that Sikander, who was personally present, did not desist till the building was entirely razed to the ground and its foundations dug up)[2]

1. Ibid, P-379
2. Ibid, P-379

এই একটি ঘটনাই তাঁর হিন্দু বিদ্বেষ ও ধর্মান্ধতার অকাট্য প্রমাণ। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাই বলেন ঃ সর্বোপরি, তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে স্বধর্মী মুসলমান সুলতানকেই "বাতশিখান" (বিগ্রহ ধ্বংসকারী) এই উপাধি প্রদান করেন, মন্ত্রী সুহাভট্টকে নয়। (After all it was not Suhabhatta but Sikandar who was honoured by his co-religionists with the sobriquet Butsikhan (destroyer of idols).[1]

১৪১৩ খ্রিঃ সিকান্দরের মৃত্যু হলে, আলি শা উপাধি নিয়ে পুত্র মীর খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মন্ত্রীপদে সুহাভট্ট যথারীতি বহাল থাকেন। নতুন সুলতান ও মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে হিন্দুর দুর্দশা চরমে ওঠে। মুসলিম ঐতিহাসিক ফরিস্তার রচনায় তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। মুষ্টিমেয় ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তখনও কাশ্মীরে ছিল যারা ইসলাম ধর্ম স্বীকার করেনি। প্রধান ওয়াজির সুহাভট্ট ধর্মান্তরিতের পূর্ণ উদ্যম নিয়ে তাদের হয় কঠোর শাস্তি দিয়ে হত্যা করেন অথবা দেশ থেকে বিতাড়ন করেন। (That statesman (Suhabhatta), with all the zeal of a convert, persecuted the few Brahmins who still remained firm to their religion and by putting all to death who refused to embrace Mohamedanism, he drove those who still lingered in Kashmir entirely out of that kingdom.)[2] ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিনের রচনায়ও হিন্দুর প্রতি অত্যাচারের সমর্থন মেলে ঃ স্বৈরাচারী প্রধান ওয়াজির নব নব পদ্ধতিতে হিন্দুর ওপর উৎপীড়ন চালান; ফলে অধিকাংশ হিন্দু দেশত্যাগ করেন এবং অনেকে করেন আত্মহত্যা। (According to Nizam-ud-din, he perpetrated various kinds of oppressions and tyranny on the people, with the result that most of the Hindus left the country and some killed themselves.)[3]

সুহাভট্টর হিন্দু-পীড়ন কাহিনি কাশ্মীরের ঐতিহাসিক জনরাজার রচনায় বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত আছে। তিনি হিন্দুদের ওপর জরিমানা ধার্য করতেন, অথবা কঠোর শাস্তি দিতেন। নিষিদ্ধ করেন যাগযজ্ঞ ও ধর্মীয় শোভাযাত্রা। পাছে ব্রাহ্মণরা শাস্তি এড়াতে দেশত্যাগ করে ধর্ম রক্ষা করতে সক্ষম হয় তাই পাসপোর্ট ব্যতীত দেশত্যাগ নিষিদ্ধ হয়; যাতে ধীবর যেমন ক্রীড়াচ্ছলে জালে বদ্ধ মৎস্যকে পীড়ন করে, তেমনি সুহাভট্টও ব্রাহ্মণদের ওপর পীড়ন করতে পারে। (He imposed a fine or inflicted punishment on the Brahmins and forbade religious sacrifices and processions. Lest the Brahmins leave the country to avoid the oppression and maintain

1. Ibid, P-379
2. Ibid, P-380
3. Ibid, P-379-380

their caste, orders were issued that no one might leave Kashmir without a pass-port, so that Suhabhatta might torment the Brahmanas as a fisherman torments the fish after putting them in a net in river.)[1]

এত কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেও সুহাভট্টের মনোবাসনা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় না। কাশ্মীরের হিন্দুরা সিদ্ধান্ত নেয়, সুহাভট্টের অত্যাচার অপেক্ষা দেশান্তর অথবা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। তাই অনেকে দুর্গম পথে দেশত্যাগ করে। অবশিষ্টদের মধ্যে কেহ বা মুসলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করে, অন্যরা বিষ খেয়ে, জলে ডুবে, গলায় দড়ি দিয়ে, অথবা অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দেয়। এ বিষয়ে সুহাভট্টের স্বীকারোক্তি কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি বলেন, ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বশতই তিনি সব কিছু করেছেন; ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে নয়। (In spite of the regulation, some left the country by unfrequented roads. As to the rest, some tried to save themselves by putting on Muslim dress, while other put an end to their lives, by fire, poison, drowning, hanging, and jumping from a precipice. It is interesting to note that Suhabhatta maintained that all these he did out of his regard for Islamic faith, and not out of any malice towards the Brahmanas.)[2]

আলি শা'র রাজত্বের শেষ দিকে রাজ্যে দেখা দেয় বিদ্রোহ। সন্দেহ করা হয় এ ব্যাপারে তাঁর কোনো ভাইয়ের হাত ছিল। সুলতান বিদ্রোহ দমন করে, শাহি খানকে মসনদে বসিয়ে তীর্থযাত্রা করেন। কিন্তু শ্বশুরের পরামর্শে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করে অকারণ ভাইয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। শাহি খাঁ কাশ্মীর ত্যাগ করে খোককরদের (Khokkaras) নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে, আলি শা খোককরদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তাঁর জীবনাবসান সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই। তবে সম্ভবত তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

আলি শা'র মৃত্যু হলে ভাই শাহি খাঁ জৈন-উল-আবিদিন উপাধি নিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন বিদগ্ধ, উদার ও ন্যায়পরায়ণ। আরবী, পার্সী, সংস্কৃত, তিব্বতি ও অন্য অনেক ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। আরবী ও পার্সী ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ তিনি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। "মহাভারত" ও "রাজতরঙ্গিণী" অনুবাদ করেন পার্সী ভাষায়। সঙ্গীত ও ললিত কলা তাঁর প্রিয় ছিল। বিদ্যোৎসাহী এই সুলতান সম্রাট আকবরের অনুকরণে পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিদের তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ জানাতেন। তিনি

1. Ibid, P-380
2. Ibid, P-380

অনেক ব্রাহ্মণদের কাশ্মীরে ফিরিয়ে এনেছিলেন। মন্দির নির্মাণ ও ধর্মাচরণে হিন্দুদের দিয়েছিলেন স্বাধীনতা। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী দুই সুলতান কাশ্মীরে ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ধ্বংস করেছিলেন কাশ্মীরের চিরাচরিত শান্তি ও সম্প্রীতির ঐতিহ্য। জৈন-উল-আবিদিনের প্রশংসনীয় উদ্যোগ সত্ত্বেও রাজ্যে পূর্বের সামাজিক-ধর্মীয় পরিবেশ আর ফিরে আসেনি।*

জৈন-উল-আবিদিনের তিন পুত্রের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ভ্রাতৃঘাতী বিরোধ তাঁর শেষ জীবনকে বিষময় কবে তুলেছিল। ১৪৭০ খ্রিঃ সুলতান পরলোক গমন করলে পুত্র হাজি খাঁ, হায়দার শা উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দুর্ঘটনাজনিত আঘাতে মাত্র ১ বৎসরের মধ্যে হায়দার শা'র মৃত্যু হয়। এর পর শতবর্ষ কাশ্মীর গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়। জনসাধারণের দুর্দশা হয় সীমাহীন। অবশেষে ১৫৮৭ খ্রিঃ মোগল সম্রাট আকবর কাশ্মীর অধিকার করেন।

আহম্মদ শাহ্ আবদালি

১৭০৭ খ্রিঃ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে মোয়াজ্জম বাহাদুর শাহ্ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসন অধিকার করেন। ১৭১২ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যুর পর জাহান্দার শাহ্ ও ফারুকশীয়ার স্বল্পকালের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। উভয়েই নিহত হন কুটীল প্রাসাদ চক্রান্তে। ১৭১৭ খ্রিঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন মহম্মদ শাহ্। দুর্বল সম্রাট। চারিদিকে গোপন ষড়যন্ত্র। আমীর ওমরাহগণও নিজ নিজ শক্তিবৃদ্ধি র জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। দ্রুততর হয় বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অনিবার্য পতন। এই চরম বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ্ ১৭৩৯ সালে আক্রমণ করে হিন্দুস্থান। কার্ণালের যুদ্ধে মোগল সম্রাট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। নির্বিচার নৃশংস হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হয়। অপরিমেয় ধনরত্ন (তৎকালীন হিসাবে যার মূল্য ১৭ কোটি টাকা) নিয়ে নাদির শাহ্ ফিরে যান স্বদেশে। ধুলায় লুণ্ঠিত হল মোগল রাজশক্তির লুপ্তপ্রায় গৌরব মহিমা। দিকে দিকে প্রাদেশিক শাসকগণ কার্যত স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—অযোধ্যায় নবাব সাদাত খান, দাক্ষিণাত্যে নিজাম ও বাংলায় মুর্শিদ কুলি খাঁ। কিন্তু পঃ ভারতে মারাঠা শক্তির উত্থান সর্বাধিক বিস্ময়কর। রাজধানী দিল্লী সহ সমগ্র উত্তর ভারতে মারাঠা আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অপদার্থ ইমাদ-উল-মুলুক মারাঠাদের ২৫ লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিয়ে উজিরী লাভ করে। সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর সর্ব অর্থেই মারাঠাদের হাতের পুতুলে পরিণত হন।

---

* সিকান্দার শাহ্ কাশ্মীরকে হিন্দুশূন্য করেছিলেন—কাশ্মীর আজও হিন্দুশূন্য...।

পাঞ্জাব তখন আফগান প্রভাবাধীন। শাসনকর্ত্রী মুগলানী বেগম আবদালীর স্নেহধন্যা। মারাঠা শক্তি পাঞ্জাব অধিকার করে। উজীর ইমাদ-উল-মুলুকের হাতে অপমানিত হন মোগলানী বেগম। রুষ্ট হন আবদালী। ১৭৫৬ সালের অক্টোবর মাসে আবদালী পাঞ্জাব পুনরধিকার করে। সঙ্গে তাঁর ৮০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী। লক্ষ্য তাঁর দিল্লী। কিন্তু বৃদ্ধ সম্রাট অসহায়। প্রকৃত শাসক ওয়াজির ইমাদ অপদার্থ। শক্তিশালী রোহিলা নায়ক নাজিব ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মারাঠা-বিরোধী—কিন্তু উজিরী না পেয়ে ইমাদের উপর ক্ষুব্ধ। ইমাদ-উল-মুলুক তবু নিরুপায় হয়ে নাজিব খাঁ ও সুজার নিকট আবেদন করে সাহায্যের জন্য। কিন্তু ব্যর্থ হন। নাজিব খানের সঙ্গে আবদালীর পূর্ব থেকেই যোগাযোগ ছিল। ১৭৫৭ সালের ১৭/১৮ই জানুয়ারী রাত্রে নাজিব খান সসৈন্যে আবদালীর পক্ষে যোগ দেয়। আবদালীর দিল্লী জয় ও ভয়াবহ অত্যাচারের জন্য কে দায়ী — নাজিব খান অথবা উজির ইমাদ-উল-মুলুক তা নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। "একজন কপট বিশ্বাসঘাতক অন্যজন একেবারেই কাপুরুষ। উভয়েই স্বার্থপর,— দেশপ্রেমিক নন। কারণ ভারতবর্ষ তাঁদের স্বদেশ নয়" (...if the one was a double-eyed traitor, the other was an arrant coward; both were extremely selfish and incapable of patriotism, because India was not their patria).[1] সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর নিরুপায় হয়ে নিজে গিয়ে আবদালীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। বিনাযুদ্ধে জয়লাভ করে আবদালি সগৌরবে পরদিন দিল্লী প্রবেশ করেন।

১৭৩৯ সালে সম্রাট নাদির শাহ্ দিল্লীতে যে তাণ্ডব করেছিলেন, দিল্লীবাসীদের স্মৃতিতে তা আজও অম্লান রয়েছে। সে অভিযানে আবদালি ছিলেন তাঁর সেনাপতি। পরে নাদির শাহ্‌কে হত্যা করে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন। আবদালীর আগমনবার্তা শুনে আতঙ্ক ও ত্রাসের সৃষ্টি হয়। হিন্দুরা (যাঁদের সামর্থ্য আছে) দিল্লী ছেড়ে চলল অযোধ্যা—মথুরার দিকে। ধনাঢ্য মুসলমানদের অনেকেই দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে যায়। আবদালির নামে এক ঘোষণায় মুসলমান ভাইদের থেকে সহজে চিহ্নিত করার জন্য হিন্দুদের ললাটে তিলক চিহ্ন আঁকার নির্দেশ দেওয়া হয়। আদেশ অমান্যের শাস্তি জরিমানা। (....the Hindus were ordered, on pain of fine, to put paint marks on their foreheads to distinguish them from the invader's brethren of the faith.)[2] এই ঘোষণার উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার। শুরু হল দুরানী সেনাদের বীভৎস তাণ্ডব। দিল্লী হল রক্তস্নাতা। ফেব্রুয়ারীর শেষে হিন্দুদের দোল উৎসব। কিন্তু সেবার রঙের উৎসব আর হয়নি। দরবারের ঐতিহাসিকের ভাষায় "কোনো ব্যক্তিই

1. J. N. Sarkar—Fall of the Mughal Empire Vol-II, P-64
2. Sir J. N. Sarkar—Fall of the Mughal Empire Vol-II, P-68

এই আনন্দানুষ্ঠান পালন করেনি। প্রত্যেকেই শোকাহত, দুর্দশায় নিমজ্জিত" ("But this year", as the court historian of the reign writes, "not one man celebrated these rejoicings. Everyone was sunk in grief and misery.)[1] তবে হোলি হয়েছে মথুরা-বৃন্দাবনে। আবীর নয়, হিন্দুর রক্তে।

বেপরোয়া লুণ্ঠন ও নির্বিচার হত্যায় দিল্লী প্রায় জনশূন্য। আবদালি দিল্লীর শাহেন শা। তাঁর রক্ত-তৃষ্ণা অতৃপ্ত। অক্ষত মথুরা-বৃন্দাবন। অতঃপর তিনি উত্তর ভারতের হিন্দু পুণ্যতীর্থ মথুরা-বৃন্দাবন ধ্বংসের জন্য দায়িত্ব দেন নাজিব ও জাহান খাঁকে। তাঁদের অধীনে দেওয়া হয় ২০০০০ সৈন্য। আবদালির সুস্পষ্ট নির্দেশ ঃ ঘৃণ্য, নীচ সুরজমলের জাঠ রাজ্য আক্রমণ কর। তাঁর অধীন প্রতিটি শহর ও জেলায় চালাবে অবাধ লুণ্ঠন ও হত্যা। মথুরা হিন্দুদের তীর্থস্থান। সেখানে প্রবাহিত হোক রক্তস্রোত। (Move into the boundaries of the accursed jat, and in every town and district held by him (Surajmal) slay and plunder. The city of Mathura is a holy place of the Hindus.....let it be put entirely to the edge of the sword.)[2]

(সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে) আবদালির আর একটি আদেশে ঘোষণা করা হয়—হত্যা ও লুণ্ঠনে সৈন্যদের দেওয়া হল অবাধ ও নিরঙ্কুশ অধিকার। তাঁদের লুণ্ঠিত সামগ্রী সম্রাটের উপঢৌকন বলেই গণ্য হবে। কাফেরদের প্রতিটি ছিন্নশিরের জন্য তাঁদের বকশিশ দেওয়া হবে ৫৲। এই ছিন্নমুণ্ডগুলি প্রধান মন্ত্রীর শিবিরে জমা দিতে হবে। তা দিয়ে নির্মিত হবে নরমুণ্ডের স্তম্ভ। (The Shah also conveyed a general order to the army to plunder and slay at every place they reached. Any booty they might take was declared a free gift to them. Any person cutting off and bringing in heads of infidels should throw them down before the tent of the chief minister, where with to build a high tower. Five rupees for each enemy head would be paid from the govt. funds.)[3]

হিন্দু বেথেলহেম পুণ্যভূমি মথুরা নগরী। সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ১৭৫৭ সাল। ১লা মার্চ সকালে দুরানী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল মথুরার ওপর। মথুরাবাসী হিন্দুরা নিরস্ত্র অসামরিক জনতা। অধিকাংশই সাধু-সন্ন্যাসী, পুরোহিত। চার ঘন্টা ধরে চলল নির্বিচার হিন্দুহত্যা ও হিন্দু নারী নির্যাতন। দু-একজন মুসলমানও নিহত হয়েছে। তার কারণ—

1. Ibid, P-73
2. Ibid, P-82
3. Ibid, P-82

তাঁরা যে মুসলমান সে প্রমাণ দেওয়ার অবকাশ ছিল না; তার পূর্বেই তাঁদের ছিন্নমুণ্ড লুটিয়ে পড়েছে। হুসেন শাহ্ লিখেছেন—ইসলামের বীর সৈনিকরা পদাঘাতে বিগ্রহ চূর্ণ করেছে—তারপর তা দিয়ে পোলো বল খেলেছে। (Idols were broken and kicked about like Polo balls by the Islamic heroes.)[1] নীল যমুনা। মুক্তিকামী বিপন্ন মানুষের শেষ আশ্রয়। হিন্দু-রমণীগণ নারীত্বের মর্যাদা রক্ষায় দলে দলে ঝাঁপ দিল যমুনায়। কল্লোলিনী যমুনা পরম স্নেহে তাঁদের টেনে নিল বুকে। অন্যরা অনেকে বাড়ির কুঁয়োয় প্রাণ বিসর্জন দিল। এর পরেও যাঁরা বেঁচে রইল তাঁদের ভাগ্যে রইল মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা।

প্রত্যক্ষদর্শী মুসলমানের বর্ণনায়—পুরা শহরটাই জ্বলছে। ভগ্ন অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ, বাজার, প্রশস্ত রাজপথ, সরু গলি সর্বত্রই রাশি রাশি মুণ্ডহীন মৃতদেহ। এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে যমুনার জল ৭ দিন পর্যন্ত ছিল রক্তবর্ণ; তারপর (দূষিত হয়ে) রং হয় হলদে। নদীর একতীরে দেখলাম বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের কুটীর। প্রতি কুটিরেই একটি নরমুণ্ড। তাঁদের মুখে একটি করে গরুর মাথা দড়ি দিয়ে গলার সঙ্গে বাঁধা। (Everywhere in lane and Bazar lay the headless trunks of the slain, and the whole city was burning. Many buildings had been knocked down......for seven days following general slaughter the water flowed of a blood-red colour and then the water had turned yellow. At the edge of the stream I saw a number of huts of vairagis and sannyasis, in each of which lay a severed head with the head of a dead cow applied to its mouth and tied to it with a rope round its neck.[2]

মথুরার পর এবার বৃন্দাবন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় — যেদিকেই তাকাও দেখতে পাবে রাশিকৃত শবদেহ। ....একটা জায়গায় প্রায় দুইশত শিশুর মুণ্ডহীন মৃতদেহ স্তূপীকৃত। জনৈক মুসলমানের রচনায় আফগান নৃশংসতা ঃ নিশুতিরাত, অশ্বারোহী দুরানী সৈন্যরা একে একে নিষ্ক্রান্ত হল। প্রত্যেকের সঙ্গে অতিরিক্ত ১০-২০টি ঘোড়া। সূর্যোদয়ের প্রায় তিন ঘন্টা পর দেখলাম তারা ফিরে আসছে। প্রত্যেক সৈনিকের ঘোড়ার পিঠে লুটের মাল—তার ওপর বসে আছে বন্দী নারী ও ক্রীতদাস। শস্যের আঁটির ন্যায় নরমুণ্ডগুলি বেঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বন্দীদের মাথায়। বকশিশের বিনিময়ে বর্শার মাথায় গেঁথে এই মুণ্ডগুলি জমা দেওয়া হল মুখ্য উজিরের শিবিরের দ্বারপ্রান্তে। সে এক অসাধারণ অভূতপূর্ব দৃশ্য। এইভাবে প্রতিদিন চলত হত্যা ও লুণ্ঠন। রাত্রিবেলা শিবিরে শিবিরে উঠত ধর্ষিতা নারীর কর্ণভেদী আর্তনাদ। (...It was midnight

2 . Ibid, P-83
1. Ibid, P-84

when the camp followers went out to the attack. One horseman mounted a horse and took ten to twenty others...when it was one watch (3 hrs) after sun-rise I saw them come back. Every horseman had loaded up all his horses with the plundered property and atop of it rode the girl-captives and the slaves. The severed heads were tied up in rugs like bundles of grain and placed on the heads of the captives....Then the heads were stuck upon lances and taken to the gate of the chief minister for payment. It was an extraordinary display....And at night the shrieks of the women captives who were being ravished deafened the ears of people...)[1]

আবদালির রোষানলে মথুরা-বৃন্দাবন হল শ্মশান; শৃগাল-কুকুর-গৃধিনী-শকুনির বিচরণ ক্ষেত্র। কিন্তু যেমন তাঁর শোণিত পিপাসা, তেমনি তাঁর সীমাহীন অর্থলিপ্সা। তিনি শুনেছেন বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের বসতি গোকুলে; তাদের আছে প্রচুর সম্পদ। আবদালি গোকুলে পাঠালেন বিরাট এক বাহিনী। কিন্তু রুখে দাঁড়াল নাগা সন্ন্যাসীরা। সংখ্যায় তাঁরা চার হাজার। উভয় পক্ষে চার ঘন্টা ধরে চলে ভয়ংকর লড়াই। গোকুলনাথকে রক্ষা করতে দু'হাজার ভক্ত প্রাণ দেয়; নিহত হয় দু'হাজার দুরানী সৈন্যও। অবশেষে বাংলার সুবেদারের দূত যুগলকিশোরের সানুনয় অনুরোধে যুদ্ধ বন্ধ হয়। ফিরে যায় আবদালির সৈন্যদল। জনৈক মারাঠা ঐতিহাসিকের মন্তব্য ঃ "সকল বৈরাগীর মৃত্যু হয়, কিন্তু রক্ষা পেলেন গোকুল নাথ" (All the vairagis perished, but Gokul Nath was saved.)[2]

প্রকৃতির প্রতিশোধ

মথুরা-বৃন্দাবন ধ্বংস করে আবদালি বৃন্দাবন থেকে ১৩ মাঃ দূরে (যমুনার ভাটির দিকে) মহাবনে শিবির স্থাপন করেছেন। তখন গ্রীষ্মকাল। যমুনা ক্ষীণস্রোতা। তার জলে হাজার হাজার হিন্দু নর-নারীর গলিত শবদেহ। দুরানী সৈন্যরা সেই জলই ব্যবহার করছে। দেখা দিল কলেরা মহামারী রূপে। দৈনিক মৃত্যুর হার ১৫০। কলেরার ঔষধ তেঁতুল জল। কিন্তু তা দুষ্প্রাপ্য। ১-সের তেঁতুলের মূল্য টাঃ ১০০। আতঙ্কিত দুরানী সৈন্যরা স্বদেশে ফিরতে উদগ্রীব হয়। অনন্যোপায় আবদালি স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন।

হজরত-বেগম। পরলোকগত সম্রাট মহম্মদ শার পরমাসুন্দরী সপ্তদশী কন্যা। বৃদ্ধ, নাক ও কানে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত আবদালি তার রূপমুগ্ধ। তাকে সাদী করার জন্য

---

2. J. N. Sarkar—Fall of the Mughal Empire Vol-II, P-86-87
3. Ibid, P-85

দিল্লীর উপকণ্ঠে তাঁর তিন দিনের যাত্রাবিরতি। দিল্লীর বাদশাহী হারেমে উঠল কান্নার রোল। কিন্তু আবদালি অনড়। অবশেষে হজরত বেগমকে যেতে হল দুরানী হারেমে। নব পরিণীতা তরুণী বধূ ও অপর্যাপ্ত লুণ্ঠিত ধনসম্পদ নিয়ে আহম্মদ শা আবদালি ফিরে গেল আফগানিস্তান। এই লুণ্ঠনের পরিমাণ কত হতে পারে? তৎকালীন মূল্যে ১২ কোটি টাকা। শুধু আবদালির ব্যক্তিগত সম্পদ বহন করেছিল ২৮,০০০ হাতি-ঘোড়া-খচ্চর ও গরুর গাড়ীর এক বিশাল বাহিনী। আবদালির সঙ্গে ছিল ৮০,০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য। তারা লুটের মাল ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেশে ফিরেছিল পায়ে হেঁটে। (The Abdali's own goods were loaded on 28,000 camels, elephants, mules, bullocks and carts...... Eighty thousand horse and foot followed him. His cavalry returned on foot loading their booty on their chargers.)[1]

দিল্লীর সিংহাসন নয়—১৭৫৬ সালে আহম্মদ শা আবদালির হিন্দুস্থান অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল হীনবল, গৃহযুদ্ধে দীর্ণ মোগল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করা। প্রধান অন্তরায় অবশ্যই উদীয়মান মারাঠাশক্তি। কিন্তু সেনা শিবিরে কলেরা রোগ ছড়িয়ে পড়ায় তাঁকে দ্রুত স্বদেশে ফিরে যেতে হয়। রোহিলা নবাব নাজিব খান নিযুক্ত হয় মোগল দরবারে তাঁর প্রধান প্রতিনিধি (Supreme Agent)।

আবদালির অনুপস্থিতির সুযোগে মারাঠা নায়ক রঘুনাথ রাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠা বাহিনী পাঞ্জাব পুনর্দখল করে। এরপর রঘুনাথ রাও দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয়। উদ্দেশ্য আবদালির প্রধান প্রতিনিধি এবং দিল্লীর প্রকৃত শাসক নাজিব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা। ১১ আগস্ট ১৭৫৭ মারাঠা বাহিনী দিল্লী অবরোধ করে। নাজিব খাঁ রাজধানীর সুরক্ষায় যথাশক্তি চেষ্টা করে। কিন্তু বিশাল মারাঠা বাহিনীর তুলনায় তার সৈন্যসংখ্যা নগণ্য। অবশেষে ৩ সেপ্টেম্বর মলহার রাও ও আব্দুল আহাৎ খানের মধ্যস্থতায় সে সন্ধির শর্তাবলী আলোচনায় সম্মত হয়। এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ক্রুদ্ধ আহম্মদ শা আবদালি মারাঠা শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে মনস্থির করেন। ১৭৫৯ সালের নভেম্বরে পুনরায় এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আবদালি হিন্দুস্থান অভিযান করেন। পাঞ্জাবকে মারাঠা দখলমুক্ত করে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন।

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ

১৭৬১ সালের জানুয়ারী। দিল্লীর অদূরে পানিপথে আহম্মদ শা আবদালি ও মারাঠা সেনা নায়ক সদাশিব রাও বাহু লক্ষাধিক সৈন্য সমাবেশ করে সম্মুখ সমরের অপেক্ষায়।

1. Ibid, P-91

দূরদর্শী আবদালি আক্রমণ না করে মারাঠা বাহিনীকে করে অবরোধ। পুণা ও দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ হল বিচ্ছিন্ন। বন্ধ হল রসদ সরবরাহ। ৬ মাস ধরে অবরুদ্ধ নিরুপায় বাহু অবশেষে অযোধ্যার নবাব সুজার মাধ্যমে জানুয়ারীর (১৭৬১) প্রথম সপ্তাহে নিঃশর্ত সন্ধির প্রস্তাব করে। প্রতিশ্রুতি দেয় আবদালির সকল দাবি মেনে নেওয়া হবে। আফগান সম্রাটের বিচক্ষণ ওয়াজির শা ওয়ালি খান সাম্রাজ্যের স্বার্থে নবজাগ্রত মারাঠা শক্তির সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন। কিন্তু প্রবল বাধা এল দুরানী সেনাদের পক্ষ থেকে। তারা আসন্ন ধর্মযুদ্ধে (জেহাদ) ব্যাপক হারে কাফের হত্যা করে পুণ্য অর্জনের এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে অসম্মত হল। তাদের মুখপাত্ররূপে কাজী ইদ্রিস আবদালিকে বলে "ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর। অর্থের প্রলোভন যেন তোমার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত না করে। তাহলে জেহাদের পুরস্কার থেকে তুমি হবে বঞ্চিত। .....অনিত্য সংসার। শত্রুকে ভয় কর না। সেনাবাহিনীর ব্যয়ের কথা ভেবে অর্থচিন্তায় কাতর হয়ো না। শুধু আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (Fix your eyes on your faith; and let not any greed of money influence you in this matter, because the merit of Jihad would be lost thereby....This world is for a few days only...Fear not the enemy, fear not the lack of money for your army expenses. Fear God rather.)[1] কাজীর ভাষণ শুনে দুরানী সেনানায়কগণ সোল্লাসে সমস্বরে আবদালিকে বলে,—'কাজী সাহেব যথার্থই বলেছেন। এই ধর্মযুদ্ধে সকল অবস্থাতেই নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার আজ্ঞা পালন করব। অর্ধাহার-অনাহারেও আমাদের (রণ) উদ্যম নষ্ট হবে না।' (On hearing this speech, the Durani captains cried out with one voice–the Kazi has spoken the truth. In this holy war, we shall follow your wishes in every eventuality. Whether we are hungry or with full stomachs, we shall not lessen our exertions.)[2]

সুযোগ্য সেনাপতির ন্যায় আহম্মদ শা তার সৈন্যদের অভিমতকেই গ্রহণ করেন। ফিরে গেল মারাঠা দূত। যুদ্ধ অনিবার্য। অকারণ নরহত্যা করে পুণ্য অর্জনের জন্য শত্রুপক্ষের নিঃশর্ত সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অনুরূপ দৃষ্টান্ত যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল।

উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও উভয় পক্ষের সামরিক শক্তির বিচারে তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের ফলাফল ছিল পূর্ব-নির্ধারিত। রঘুনাথ রাওয়ের উত্তর ভারতে দীর্ঘ অভিযানে মারাঠাদের সামরিক শক্তি ক্ষয় হয়েছে। শূন্য হয়েছে পেশোয়ার কোষাগার।

1. J. N. Sarkar—Fall of the Mughal Empire, Vol-II, P-228
2. Ibid, P-228

মিত্রলাভ হয়নি —শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশী আহ্‌ম্মদ শা আবদালির বিরুদ্ধে মারাঠা সর্বাধিনায়ক উত্তর ভারতের শাসকদের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু সকল মুসলিম শক্তি আবদালির পক্ষে যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। অযোধ্যার শক্তিশালী নবাব সুজাউদ্দৌলা ছিলেন দোদুল্যমান। রোহিলা নায়ক ও আবদালির প্রধান প্রতিনিধি নাজিব খাঁ তাকে বলেন কাফের ও ইসলামের মধ্যে এই যুদ্ধে তার কর্তব্য আবদালির পক্ষে যোগ দেওয়া। (....Najib on the other hand, pressed the Nawab of Oudh to side with Ahmad Shah in this conflict between Islam and infidelity.)[1] পক্ষান্তরে হিন্দুদের মধ্যে এই ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ছিল না। পূর্ব বৈরিতার কারণে রাজপুত শক্তি ছিল নিরপেক্ষ। আবদালির ছিল এশিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম অশ্বারোহী বাহিনী। আরবের স্বাস্থ্যবান, তেজী সুশিক্ষিত অশ্বের সঙ্গে মারাঠাদের দেশী অশ্বের কোন তুলনা হয় না। আফগান দলপতিরা ছিল বর্মাচ্ছাদিত। সাধারণ দুরানী সৈন্যরাও ব্যবহার করত চামড়ার জ্যাকেট—যা আংশিক বর্মের কাজ করত। কিন্তু মারাঠা সেনাপতিদেরও কোন বর্ম (armour) ছিল না। সাধারণ সৈন্যরা পরত ধুতি ও সাধারণ পোশাক। আহ্‌ম্মদ শা দুরানীর ছিল উন্নত ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র—Swivel ও Jijali বন্দুক। মারাঠা বাহিনীর বন্দুক ছিল নীচু মানের। আবদালিকে বলা হয় এশিয়ার নেপোলিয়ন— দূরদর্শী, কৌশলী ও রণনীতি বিশারদ। অন্যদিকে সদাশিব রাও বাহু ছিলেন অসম সাহসী বীর যোদ্ধা। তার মধ্যে সুদক্ষ সেনাপতির গুণাবলীর অভাব ছিল। তদুপরি তার সৈন্যদলে অভিজ্ঞ রণদক্ষ সেনাপতি একজনও ছিল না। দুরানী বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে সংঘর্ষে দত্তাজি সিন্ধিয়ার মৃত্যু ছিল বাহুর পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। এদিক থেকে আবদালি ছিলেন ভাগ্যবান। সর্বোপরি দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ অনাহারক্লিষ্ট মারাঠা বাহিনী দুরানী সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখ সমরের উপযুক্ত ছিল না।

শান্তির শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হলে যুদ্ধ ছাড়া বাহুর অন্য কোন পথ ছিল না। ১৭৬১ সালের ১৪ জানুয়ারী শুরু হয় ঐতিহাসিক তৃতীয় পানিপথের মহা সমর। "হর হর মহাদেব" ধ্বনি দিয়ে মারাঠা সৈন্যদল বাত্যাতাড়িত এক প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দুরানী বাহিনীর উপর। তাঁদের পুরোভাগে সর্বাধিনায়ক সদাশিব রাও বাহু। আক্রমণের প্রচণ্ডতায় শ'দুয়েক রক্ষী পরিবেষ্টিত প্রধান উজীর (প্রধান সেনাপতিও) শা-ওয়ালি খান হতবিহ্বল। তিনি অশ্ব থেকে নেমে মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসেন। ধুলায় কপাল ঠুকে ভর্ৎসনা করে পলায়নপর দুরানী সৈন্যদের বলছেন ঃ 'ভাই সব! দেশ আমাদের বহু দূরে। তোমরা কোথায় পালাচ্ছ?' (...the grand wazir stood with only a

---

1. Sir J N Sarkar Fall of the Mughal Empire, Vol-II, P-193

hundred or two hundred troopers....He himself, in full armour, dismounted from his horse and sat down on the ground, beating his forehead....and cursing and haranguing his fleeing followers, "Brethren! our country is far off. Whither are you going?)[1] মারাঠা বাহিনীর অদম্য সাহস ও প্রবল আক্রমণ দেখে এরূপ মনে হয়েছিল যে জয়লক্ষ্মী তাদের কণ্ঠেই পরিয়ে দেবে জয়মাল্য (...yet from the unabated courage and wild onslaught of the Marathas it seemed likely that they would triumph in the end).[2] কিন্তু দুর্ভাগ্য—বাহুর পাশে এমন কোন সাহসী অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিলেন না—যিনি এই ঝটিকা আক্রমণে বিধ্বস্ত বিশৃঙ্খল দুরানী বাহিনীকে পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিতে পারতেন। দত্তাজি সিন্ধিয়া রণক্ষেত্রে থাকলে যুদ্ধের ফলাফল কি হত তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আবদালি সমূহ বিপদ দেখে নতুন একদল সৈন্য পাঠায় শা ওয়ালি খানের সাহায্যে। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। যা ছিল নিদারুণভাবে প্রত্যাশিত, তাই ঘটল। মারাঠারা শোচনীয় ভাবে হয় পরাজিত....অনেকটা করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে এই মনোভাব নিয়ে অসম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারাঠা নায়ক সদাশিব রাও বাহু মৃত্যু বরণ করে। গুরুতর আহত নিঃসঙ্গ বাহু মৃত্যুর পূর্বেও তিনজন দুরানীকে হত্যা করে। আক্রমণকারীরা তাঁর মুণ্ডটি আহম্মদ শাহ্ আবদালিকে উপহার দেয়। স্তূপীকৃত শবদেহের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় তার দেহ। সুজার অনুরোধে তিনদিন পরে আবদালি তাঁর মুণ্ড ফেরত দিলে বাহুর সৎকার হয়।

যুদ্ধে মারাঠা বাহিনী শুধু পরাজিতই হয়নি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। যারা আহত হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করেছিল—অথবা পালিয়ে যাচ্ছিল এবার তাঁদের হত্যা করা শুরু হল। মারাঠা বাহিনীর সঙ্গে অ-সামরিক সাহায্যকারী ছিল অর্ধ লক্ষাধিক নরনারী। পুরুষদের সকলকে হত্যা করা হয়—নারীদের বন্দী করে উপহার দেওয়া হয় দুরানী সৈন্যদের। প্রত্যক্ষদর্শী কাশিরাজ পণ্ডিতের বর্ণনা অনুসারে—"প্রত্যেক দুরানী সৈন্য শতাধিক বন্দীকে তাদের শিবিরের সামনে হত্যা করে। হত্যার পূর্বে তারা উচ্চস্বরে ঘোষণা করে যুদ্ধে আসার সময় আমার পিতা-মাতা-ভগিনী ও স্ত্রী আমাকে বলেছে, এই ধর্মযুদ্ধে যত বেশি সংখ্যক সম্ভব কাফের হত্যা করবে। যেন বিধর্মী-হত্যায় অর্জিত পুণ্যের অংশীদার তারাও হতে পারে।" (Every Durrani soldier brought away a hundred or two of prisoners and slew them in the outskirts of their camp, crying out, "when I started from our country, my mother, father, sister and

---

1. J. N. Sarkar—Fall of the Mughal Empire Vol-II, P-241
2. Ibid, P-241

wife told me to slay so many Kafirs for their sake after we had gained the victory in this holy war, so that the religious merit of this act [of infidel-slaying] might accrue to them".)[1]

হাজার বছর ধরে ভারতের বুকে মুসলিম আক্রমণের বীভৎস তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে আক্রমণকারীরা ধর্মে মুসলমান হলেও — তাঁদের মধ্যে ছিল ভয়ংকর পারস্পরিক বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতা। সুলতান মামুদ ও বাবর ছিলেন তাতার, তৈমুরলঙ মোঙ্গল, মহম্মদ ঘোরী, নাদির শাহ্ ও আহম্মদ শাহ্ আবদালি ছিলেন আফগান। এই আত্মঘাতী বিরোধ সত্ত্বেও তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন—আর তা হল হিন্দুধর্মকে নির্মূল করা। (...Muhammed of Ghazni was tartar, Mahommed Ghori was an Afgan, Taimur was Mongol, Babar was a tartar, while Nadir Shah and Ahmad shah Abdali were Afgans....They were deadly rivals of one another and their wars were often wars of mutual extermination. What is however, important to bear in mind is that with all their internecine conflict they were all united by one common objective and that was to destroy the Hindu faith.)[2]

1. Ibid, P-250
2. Dr. R. B. Ambedkar—Writings and Speeches Vol-8, P-56-57

হিন্দু প্রতিরোধ

মুসলিম ঐতিহাসিকগণ মুসলমানের বিজয় কাহিনী সগৌরবে সবিস্তার বর্ণনা করেছেন; গোপন করেছেন পরাজয়ের কলঙ্ক। হিন্দু ঐতিহাসিকরা মুসলমানের কাছে হিন্দুর পরাজয়ের উচ্ছসিত বর্ণনা দিয়েছেন— উপেক্ষিত হয়েছে হিন্দুর বিজয়গৌরব। যে শিখ-রাজপুত-মারাঠাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের অবসান হয়; স্কুল-কলেজের পাঠ্য ইতিহাসে তাকে আঞ্চলিক বা কৃষক বিদ্রোহরূপে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়। এইভাবেই ভারতে হাজার বৎসরের মুসলিম শাসনের ইতিহাস পরাধীনতার ইতিহাস নামে অভিহিত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা ছিল হিন্দু জাতির জীবন সংগ্রামের সার্থক ইতিহাস। বিখ্যাত ঐতিহাসিক W. W. Hunter তাঁর History of the Indian People গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত পোষণ করে বলেন— "মুসলমানরা খুব সহজেই ভারত জয় করেছিল" এই প্রচলিত ধারণা ইতিহাসগতভাবে সত্য নয়। ৬৩৬ খৃঃ উসমানের ভারত আক্রমণ থেকে ১৭৬১ সালে আহম্মদ শাহ্ আবদালির ভারত অভিযান। এই ১১-শ বৎসর মুসলমান ধারাবাহিকভাবে ভারত আক্রমণ করেছে এবং বিজয়ও লাভ করেছে..... কিন্তু কোন সময়েই মুসলমান সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করতে পারেনি। এক বিরাট ভূ-খণ্ড ছিল হিন্দু রাজশক্তির শাসনাধীন। ..... সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ থেকেই হিন্দুরা হৃতভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শিখ ও রাজপুতদের পর অভ্যুদয় ঘটে নবজাগ্রত দুর্দমনীয় মারাঠাশক্তির। প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী স্থাপিত হয় তাদের প্রভুত্ব। এখন প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজের আবির্ভাবেই মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে হিন্দুর চূড়ান্ত বিজয় প্রতিহত হয়। ইংরেজরা মুঘল নয়— হিন্দুর কাছ থেকে ভারত অধিকার করে (The popular notion that India fell an easy prey to the Mussulmans is opposed to the historical facts. Muhamedan rule in India consists of a series of invasions at conquests, during eleven centuries from usman's raid in 636 A.D. to Ahmed Shahs' tempests of invasion in 1761 A. D. ...At no time was Islam triumphant throughout all India. Hindu dynastics ruled over a large area .... Before the end of that

period (1678-1707) the Hindus had again begun the work of reconquest. The native chivarly of Rajputana was closing in upon Delhi from the south-east and the religions Confederation of the Sikhs was growing into a military power in the North-West. The Marthas combined the fighting power of the low castes with the statesmanship of the Brahmans and subjected the Muhamedan Kingdoms throughout India to tribute. So far as can now be estimated the advance of the English Power at the begining of the present (19th) century, alone saved the Mughal Empire from passing to the Hindus. The British won India not from the Mughals but from the Hindus.)[1]

মুসলমানের আরব বিজয় ও ভারত বিজয়ের মধ্যে রয়েছে এক মৌলিক পার্থক্য। ইরান-ইরাক-মিশর, আক্রমণকারী মুসলমানের কাছে পরাজিত হয়ে স্বীকার করে বশ্যতা। গ্রহণ করে তাদের ধর্ম ও সভ্যতা। হিন্দু ভারত ইসলামের বিজয়ী বাহিনীর নিকট সাময়িক পরাজয়কে কখনও চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়নি। স্বীকার করেনি বশ্যতা, বিসর্জন দেয়নি আপন ধর্ম-সভ্যতা ও সংস্কৃতি। যখনই সুযোগ পেয়েছে প্রতিরোধ করেছে বিদ্রোহ করেছে, মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে।

আঞ্চলিক স্তরে হলেও ধর্ম ও জাতি রক্ষাই ছিল এই প্রতিরোধ সংগ্রামের মূল অনুপ্রেরণা। জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমের অভাব ছিল না। কিন্তু প্রধানত রাজনৈতিক অনৈক্যের জন্য বিদেশী মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হয়তো গড়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে বৃহত্তর জাতীয় সংগ্রামের রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আকারের এই প্রতিরোধ চলেছে নিরন্তর, সমগ্র ভারতব্যাপী। তার মধ্যে শিখ, রাজপুত ও মারাঠাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিখ ঃ ভারতবর্ষে মুসলিম আক্রমণের প্রথম শিকার হয় পাঞ্জাব। উ. প. সীমান্ত পথ দিয়ে প্রায় ৫০০ বৎসর মুসলমান ভারত আক্রমণ করেছে। পাঞ্জাবের মধ্য দিয়েই তারা পৌঁছে যেত ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে। শত শত বৎসর ধরে পাঞ্জাবের হিন্দুদের দুর্দশার সীমা ছিল না। বলপূর্বক ধর্মান্তর, মন্দির ধ্বংস, পুরাতন মন্দির সংস্কার অথবা নতুন মন্দির নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা, জিজিয়া ও তীর্থকর—অসংখ্য নিপীড়ন মূলক বিধানের মাত্র কয়েকটি। খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন জীবনচর্যা অর্থাৎ প্রায় সকল বিষয়েই হিন্দুদের ওপর নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। এমনকি আদর্শ শাসক বলে যে আকবর-বাদশার এত খ্যাতি—তাঁর রাজত্বে লাহোরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা

1. সখারাম গণেশ দেউস্কর—শিবাজীর দীক্ষা, পৃঃ ১২

হুসেন খানের এক আদেশনামায় বলা হয়, "হিন্দুদের কাঁধে অথবা হাতের কব্জিতে বিভিন্ন রং-এর তিলক* কাটতে হবে—যাতে ভুল বশত কোন মুসলমান হিন্দুকে সম্মান প্রদর্শন করে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন না করেন। মহার্ঘ পোশাক ও অশ্বারোহণে হিন্দুর অধিকার ছিল না। ডেরা গাজী খান জেলায় হিন্দুদের শুধুমাত্র গাধার পিঠে চড়ার অনুমতি ছিল।' (Even during the reign of Akbar, Hussain Khan, governor of Lahore, had decreed that the Hindus should stick patches of different colours on their shoulders, or on the bottom of their sleeves, so that no Muslim might be put to indignity of showing them honour by mistake. Nor did he allow Hindus to saddle their horses...In general Hindus could not wear rich clothes and ride on fine horses. In Dera Ghazi Khan district a Hindu could ride only on a donkey.)[1]

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকদেব ২০ বৎসরের তরুণ। দিল্লীর সিংহাসনে সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই শাহাজাদা সিকান্দার পবিত্র থানেশ্বরে হিন্দুদের স্নান নিষিদ্ধ করেন। সুলতান হয়ে তিনি বিখ্যাত জ্বালামুখী ও কাংড়ার মন্দির ভেঙে দেন। পাথরের বিগ্রহ ভেঙে কসাইদের মধ্যে বিতরণ করেন বাটখারা রূপে ব্যবহারের জন্য। নিষিদ্ধ করেন হিন্দুদের যমুনায় স্নান। হিন্দুদের চুল-দাড়ি না কাটতে প্রামাণিকদের ওপর ফতোয়া জারী হয়। ধ্বংস হয় বহু মন্দির। বলপ্রয়োগ করে হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। হজরত মহম্মদ ও ইসলাম ধর্মের সামান্যতম সমালোচনার (Blasphemy) শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড।** বোধান নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ইসলামের সঙ্গে হিন্দুধর্মের তুলনা করার অপরাধে তার প্রাণদণ্ড হয়। নানকের খেদোক্তি ঃ ন্যায় বিচার পক্ষ বিস্তার করে পলায়ন করেছে (Justice hath taken wings and fled).

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ভারতে যে বর্বর অত্যাচার করেছেন—নানকদেব তার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি সৈয়দপুরে (বর্তমান আমিনাবাদ), লাহোর থেকে ৮০ কি. মি. দূরে। বিজয়ী বাবর গণহত্যার আদেশ দেন। বন্দী করা হয় হাজার হাজার মানুষকে। বন্দী শিবিরে হতভাগ্য বন্দী বিশেষত মহিলাদের প্রতি যে অত্যাচার করা হয় তাতে বিদীর্ণ হয় নানকের হৃদয়। বেদনাহত চিত্তে তিনি ভগবানকে অভিযুক্ত করেন ঃ

---

* একবিংশ শতাব্দীতে আফগানিস্তানের "তালিবান" শাসক গোষ্ঠীও মুষ্টিমেয় হিন্দুদের ওপর অনুরূপ ফতোয়া জারি করেছিল।

** পাকিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে এই বিধান এখনও প্রচলিত।

1. R. C. Majumder— The History And Culture of The Indian People— The Mughal Empire, P-306

নির্দোষ তুমি হে বিশ্বস্রষ্টা;
পাঠায়েছ তুমি কালান্তক যম সম
মোগল বাবর।
অত্যাচার, নির্মম হত্যা —
অম্বরে ওঠে আর্ত চীৎকার,
দয়া কি হয় না হৃদয়ে তোমার
হে ভগবান?
হে স্রষ্টা, সর্বভূতে তুমি বিরাজমান
তোমার নিকট সকলেই সমান;
সকলের লাগি করুণা তোমার।
সবল যদি সবলেরে হানে আঘাত —
নাহি তাহে দুঃখ, নাহি অভিযোগ;
কিন্তু হিংস্র ব্যাঘ্র যবে করে গোবধ, অসহায় —
রাখালকে দিতে হয় তার কৈফিয়ত।

(Thou, O Creator of all things,
Takest to Thyself no blame;
Thou has sent yama disguised as the great Moghal, Babar.
Terrible was the slaughter,
Loud were the cries of the lamenters.
Did this not awaken pity in thee, O Lord?
Thou art part and parcel of all things equally, O Creator :
Thou must feel for all men and all nations.
If a strong man attacketh who is equally strong,
Where is the grief in this, or whose is the grievance?
But when a fierce tiger preys on the helpless cattle,
The Herdsman must answer for it.)[1]

পূর্ববর্তী মুসলিম আক্রমণকারীদের ন্যায়, পৌত্তলিকতা নির্মূল করার জন্যই বাবরের হিন্দুস্থান অভিযান। তিনি সম্ভল, চান্দেরী ও অযোধ্যায় হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে সেখানে নির্মাণ করেন মসজিদ। গোয়ালিয়রের নিকট উরভে (Urva) জৈন মন্দির ভেঙে চূর্ণ

1. Ibid, P-307

করেন বিগ্রহ। (His officers demolished Hindu temples and constructed mosques in their places at Sambhal, Chandere and Ayodhya, and broke to pieces Jain idols at urva near Gwalior.)[1] শুধু মুসলিম শাসক নয়— স্থানীয় মুসলমানও হিন্দুদের ওপর যথেষ্ট নির্যাতন করেছে।

গুরু নানক শ্রীচৈতন্য ও কবীরের সমসাময়িক। চৈতন্য ও কবীরের ধর্মমতে শুধু প্রেম ও অহিংসার জয়গান। কিন্তু নানকের ধর্মমতে রাজনীতিও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। তার কারণ ঐতিহাসিক। হিন্দুদের প্রতি মুসলমানের অত্যাচার তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। পরবর্তীকালে এই অত্যাচার শতগুণ বৃদ্ধি পায়। শিখ নেতৃত্ব উপলব্ধি করেন, শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতি নয়— সামরিক শক্তি ব্যতীত মুসলিম আক্রমণ হতে হিন্দু জাতি ও হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করা যাবে না। তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে ক্ষাত্রবৃত্তি ও শস্ত্র বিদ্যার অনুশীলনে উৎসাহ দেন। এই ভাবেই সমরকুশলী শিখ জাতির উত্থান হয়।

সম্রাট আকবর ছিলেন অপেক্ষাকৃত সহনশীল। কিন্তু পুত্র জাহাঙ্গীর ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর রাজত্বকালেই মোগল সম্রাটদের সঙ্গে শিখদের সম্পর্ক তিক্ত হতে শুরু করে। অর্জুনদেব (১৫৮১-১৬০৬) শিখদের পঞ্চম গুরু। জাহাঙ্গীর তনয় খসরু গুরু অর্জুনের সঙ্গে পূর্ব হতেই পরিচিত ছিলেন। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কাবুলে পালিয়ে যাওয়ার সময় গুরু অর্জুনের সাহায্যপ্রার্থী হন। তাঁর আর্থিক দুর্দশার কথা শুনে গুরু অর্জুন তাকে সামান্য আর্থিক সাহায্য করেন। বেণী প্রসাদ তাঁর History of Jahangir গ্রন্থে লিখেছেন এই সাহায্যের পরিমাণ ছিল টাঃ ৫০০০/-। খসরুকে বন্দী করে জাহাঙ্গীর তার সমর্থকদের কঠোর শাস্তি দেন। সমর্থক তালিকায় অর্জুনেরও নাম ছিল। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ

বীয়াস নদীর তীরে গোবিন্দলে (Gobindwal) সাধু বেশে বাস করে এক হিন্দু। নাম তার অর্জুন। .....পশুপালক ও নির্বোধের দল তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে। তিন-চার পুরুষ ধরে চলছে এই ব্যবসা। এখন বেশ রমরমা। দীর্ঘদিন ধরেই ভাবছি এই ব্যবসা বন্ধ করতে হবে অথবা তাকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে হবে। তাকে দরবারে হাজির হতে আদেশ করলাম। তার শাস্তি — টাঃ ২,০০,০০০/- জরিমানা ও আদি গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক তাকে মুছে দিতে হবে। অর্জুন অস্বীকৃত হলে, তার বাড়ী, আশ্রম ও পুত্রদের অর্পণ করা হল মুরতাজা খানের হাতে; এবং নির্যাতন করে তাকে বধ করার আদেশ দেওয়া হল।

অর্জুনের সমসাময়িক মহসিন ফেনী লিখেছেন ঃ মে মাসের প্রখর রৌদ্রে তপ্ত বালুরাশির ওপর খুঁটির সঙ্গে তাকে বাঁধা হল। অতঃপর তাঁর অনাবৃত দেহে ছিটিয়ে

1. Ibid, P-307

দেওয়া হল ফুটন্ত জল, চামড়া ঝলসে সমস্ত দেহে দেখা দিল দগদগে ঘা। (Mohsin Feni writes that Guru Arjun was tied in the burning sun over hot sand and was tortured. The severest heat of May overhead, hot sand under him and boiling water thrown on his naked body caused blisters all over.)[1] ১৬০৬ খ্রিঃ ৩০ মে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে গুরু অর্জুনের মৃত্যু হয়।

গুরু অর্জুনের মৃত্যু শিখদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তারা মনে করে এ হল ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ। মৃত্যুর পূর্বে নাবালক পুত্র হরগোবিন্দের প্রতি তাঁর শেষ আদেশ—সিংহাসনে বসবে সশস্ত্র হয়ে, এবং সাধ্যমত রাখবে সেনাবাহিনী। (Let him sit fully armed on his throne and maintain an army to the best of his ability.)[2]

হরগোবিন্দ পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তিনি অমৃতসরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। নির্মাণ করেন অকাল তখ্‌ত বা ভগবানের সিংহাসন। উপহার দ্রব্যের মধ্যে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ছিল অস্ত্র ও অশ্ব। তিনি রাজার ন্যায় রাজবেশে সিংহাসনে আসীন হয়ে অন্যায়ের বিচার করতেন। তিনি অনুগামীদের নিকট দুঃসাহসী বীরদের কাহিনি গল্পের ন্যায় বলতেন। চারণ কবির দল পরিবেশন করত রাজপুতদের অমর বীরত্ব কাহিনি নিয়ে রচিত দেশাত্মবোধক গান। এসব কিছুরই এক লক্ষ্য—হিন্দুদের যুদ্ধ বিদ্যায় অনুপ্রাণিত ও পারদর্শী করা।

সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বভাবতই হরগোবিন্দের প্রতি রুষ্ট হন। তিনি তাকে গোয়ালিয়র দুর্গে ১২ বৎসর (মতান্তরে তিন বৎসর) বন্দী করে রাখেন। কারাগারে তিনি সম্ভ্রান্ত সহবন্দীদের কাছ থেকে রাজনীতি ও কূটনীতিতে জ্ঞান লাভ করেন। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন, তার কারণ কূটনীতি। ১৬২৭ খ্রিঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হলে তিনি নতুন সম্রাট শাজাহানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন। ধর্মান্ধ হিন্দু-বিদ্বেষী শাজাহান জানতে পারেন যে, রাজৌরি, ভীম্বার ও গুজরাটে বহু হিন্দু মুসলমান নারীকে বিবাহ করে তাদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করেছে। সম্রাটের আদেশে এই জাতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ হল; এবং ইতিমধ্যেই বিবাহিত প্রায়—৪৫০০ মুসলিম নারীদের সন্তান সহ হিন্দু পতিদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তিনি হিন্দু স্বামীদের আর্থিক জরিমানা করেন—অনেককে করা হয় হত্যা। পাঞ্জাবের অত্যাচারিত হিন্দুদের প্রধান ভরসা ছিল শিখ গুরুগণ। তারাই অত্যাচারী মোগল সম্রাটদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করেন। শাজাহানের অত্যাচারে সন্তান ও পত্নীহারা হিন্দুরা হরগোবিন্দের শরণাপন্ন হলে—তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন।

---

1. Ibid, P-309
2. Ibid, P-310

১৬৩৪ খ্রিঃ শাজাহান লাহোর ও অমৃতসরের মধ্যবর্তী এক অরণ্যে শিকারে যান—ঘটনাচক্রে সেই একই অরণ্যে শিকার করছিলেন গুরু হরগোবিন্দ। স্যার যদুনাথ সরকারের বিবরণীতে ঃ যেখানে শাজাহান শিকার করছিলেন গুরু সেখানে উপস্থিত হন। একটি পাখী নিয়ে শিখদের সঙ্গে মোগল সেনাদের প্রথমে তর্ক পরে হয় সংঘর্ষ। পরাজিত হয় মোগল। উদ্ধত হরগোবিন্দকে শাস্তি দিতে শাজাহান একাধিক অভিযান প্রেরণ করেও সফল হতে পারেননি। দীর্ঘ ৭ বৎসর হরগোবিন্দ মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু শক্তিশালী শত্রুব সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা সম্ভব নয় বুঝে কাশ্মীরের কিরাতপুরে তিনি তাঁর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। ১৬৪৪ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

পরবর্তী দুই গুরু হর রাই এবং হর কিষেণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৬৬৪ খ্রিঃ হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র তেগবাহাদুর (১৬৬৪-১৬৭৫) গুরু পদে অভিষিক্ত হন। দিল্লীতে সম্রাট ঔরঙ্গজেব হিন্দুস্থানে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। পাঞ্জাবে অনেক গুরুদুয়ারা ভেঙে নির্মিত হয় মসজিদ। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে হাজার হাজার হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। হিন্দুরা তেগবাহাদুরের সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি তাঁদের পরামর্শ দেন, "আপনারা সম্রাটকে জানান যে, তেগবাহাদুর ধর্মান্তরিত হলে আমরা সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব।" হিন্দুদের নেতৃত্ব দেওয়ায় রুষ্ট সম্রাট তেগবাহাদুরকে দিল্লী দরবারে তলব করেন। পাঁচজন শিষ্য নিয়ে তেগবাহাদুর দরবারে হাজির হলে, ঔরঙ্গজেব তাকে হয় অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আদেশ দেন। গুরু তেগবাহাদুর তাঁর অক্ষমতা ও অসম্মতি জানিয়ে নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দেন Sar Diya Par Sir na Diya—জীবন দেব কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করব না। সম্রাটের আদেশে তাঁর এক শিষ্যকে দুটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে করাত দিয়ে দ্বি-খণ্ডিত করা হয়। অন্য এক শিষ্যকে ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। গুরু তেগবাহাদুর অচল অটল। ১৬৭৫ খ্রিঃ ১১ নভেম্বর শৃঙ্খলিত তেগবাহাদুরের করা হয় শিরচ্ছেদ।

তেগবাহাদুরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী গুরু গোবিন্দ সিং (১৬৭৫-১৭০৮) মোগলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। পিতা ও প্র-পিতামহের নির্মম হত্যা এবং হিন্দুদের দুর্দশা দেখে তিনি উপলব্ধি করেন যে জনগণকেই এই অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় উদ্‌ভাবন করতে হবে। তিনি চেয়েছিলেন, শিবাজীর অনুকরণে মহারাষ্ট্রের ন্যায় পাঞ্জাবেও জাতীয় জাগরণ ঘটুক। (He wanted to create national awakening in the Panjab as it had been done in Maharastra by Sivaji)[1] তিনি খালসা বাহিনী গঠন করে শিখদের একটি সুশৃঙ্খল সামরিক জাতিতে

1. Ibid, P-316

রূপান্তরিত করে—মোগলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য তৈরী হন। অনেক ক্ষুব্ধ মুসলমানও তাঁর পক্ষে যোগ দিয়ে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করে। মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে ছিল। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সঙ্গে জীবন মরণ যুদ্ধে লিপ্ত। পাঞ্জাবের ভারপ্রাপ্ত সাহ্জাদা মোয়াজেম কাবুলে। শিখ শক্তির বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয় লাহোর ও কাংগ্রার শাসকদ্বয়।

উদ্বিগ্ন সম্রাট ঔরঙ্গজেব, দিল্লী হতে প্রেরিত হয় বাদশাহী সেনা। সম্রাটের নির্দেশে স্থানীয় কতিপয় মুসলিম ও হিন্দু শাসক মোগল বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করে। দুর্জয় সাহস ও অসীম বীরত্বের সঙ্গে গুরু গোবিন্দ শত্রুর মোকাবিলা করেন। জয়লাভ করেন অনেক যুদ্ধে। কিন্তু বাদশাহী ফৌজ পরাজয় স্বীকারে নারাজ। তারা পাঁচবার গুরুর প্রধান কেন্দ্র আনন্দপুর অবরোধ করে। অবশেষে চারপুত্র নিহত হলে গোবিন্দ সিংকে যেতে হয় দাক্ষিণাত্যে। সম্রাটের মৃত্যুর পর তিনি ফিরে আসেন পাঞ্জাবে। সিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বে তিনি বাহাদুর শাহকে সমর্থন করেন এবং তাঁর সঙ্গে যান দাক্ষিণাত্যে। ১৭০৮ সালে এক আফগান আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু হলে পাঞ্জাব উত্তাল হয়ে ওঠে। শিখ নায়ক বীর বান্দা ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানান। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত শিখসেনা হত্যা করে সুবেদার ওয়াজির খাঁকে; লুণ্ঠন করে শিরহিন্দ। প্রায় লুপ্ত হয় পাঞ্জাবে মোগল প্রভুত্ব।

রাজপুত ঃ খানুয়ার যুদ্ধে রাজপুত কুলতিলক, বীরকেশরী মেবারাধিপতি সংগ্রাম সিংহ পরাজিত হলে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ মসৃণ হয়—কিন্তু নিষ্কণ্টক হয় না। মেবার পরাজিত হয়েছে কিন্তু নিঃশেষ হয়নি। দূরদর্শী আকবর সাম্রাজ্যের স্বার্থে রাজপুতনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁর সফল কূটনীতি অম্বর, মাড়োয়ার প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যকে মোগলের সঙ্গে বশ্যতামূলক মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ করে। কিন্তু রাজপুতনার মধ্যমণি মেবার ছিল স্বাধীনতার অনির্বাণ দীপশিখার প্রতীক।

সংগ্রাম সিংহ পরলোক গমন করলে পুত্র উদয় সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকৃত হলে আকবর মেবার আক্রমণ করে অবরোধ করেন চিতোর। উদয় সিং দুর্গম-পর্বতে আশ্রয় নিলে জয়মল ও পাট্টার নেতৃত্বে মেবার বাহিনী চার মাস শত্রুকে প্রতিহত করে। অবশেষে জয়মল ও পাট্টার মৃত্যু হলে বেপরোয়া রাজপুত সেনা প্রাণভয় তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপর। শেষ সৈনিকটি পর্যন্ত যুদ্ধ করে অমিত বিক্রমে। নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে রাজপুত রমণীরা জহরব্রত করে দেয় আত্মাহুতি। চিতোর দুর্গ অধিকার করে আকবর নির্বিচারে হত্যা করে দুর্গবাসীদের। আবুলফজলের মতে নিহতের সংখ্যা ৩০,০০০।

রাজপুত ঃ

মহারানা প্রতাপ সিং (১৫৭২-১৫৯৭)

মহারানা উদয় সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিংহ ১৫৭২ খ্রিঃ ১ মার্চ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আকবর তখন দিল্লীর সম্রাট। মেবারের প্রতি ছিল তাঁর লোলুপ দৃষ্টি। রাজপুত শক্তি পদানত হলেই উঃ ভারতে স্থাপিত হবে নিরঙ্কুশ আধিপত্য; সুদৃঢ় হবে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি। সিংহাসনে আরোহণ করেই প্রতাপ সিং সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে দুর্ধর্ষ ভীল উপজাতি মেবারের পতাকাতলে সমবেত হয়। মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধে ভীলদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন দূরদৃষ্টি ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি শুধু যে মেবারের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করেছে তাই নয় — তরুণ রানা প্রতাপকে দিয়েছে জাতীয় নেতার মর্যাদা। (This broad imaginative policy not only served the cause of Mewars' independence, but made its young king a real national leader.)[1]

আরাবল্লী পর্বতের সানুদেশে ১৫৭৬ খ্রিঃ ২১ জুন বিখ্যাত হলদিঘাটে মেবার ও মোগল বাহিনী পরস্পর সম্মুখীন হয়। মোগল সৈন্য দলের সেনাপতি মানসিং হস্তিপৃষ্ঠে। অশ্বপৃষ্ঠে মহারানা প্রতাপ সিং। রাজপুতদের প্রবল আক্রমণে মোগল বাহিনী ছত্রভঙ্গ। মানসিং ও অন্যান্য সেনানায়করা তৎপরতার সঙ্গে সেনাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। মানসিংহের সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধে প্রতাপের বিখ্যাত অশ্ব চৈতক আহত হয়। বিদ্যুৎ গতিতে সে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে মহারানাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দিয়ে ত্যাগ করে শেষ নিঃশ্বাস। রাজপুত সৈন্যরাও মহারানার সঙ্গে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে। মনে হয় ইহা পরিকল্পিত রণকৌশলেরই অঙ্গ। রাজপুত সৈন্য বন্দী হয়েছে এরকম কোন তথ্য নেই। ঐতিহাসিক বাদাউনির মতে মোট নিহতের সংখ্যা-৫০০, এর মধ্যে ১২০ জন মুসলমান অবশিষ্ট হিন্দু। যেহেতু কতিপয় হিন্দু নৃপতিও মোগল পক্ষে যুদ্ধ করেছিল, তাই মনে হয় হতাহতের সংখ্যা উভয় পক্ষে প্রায় সমসংখ্যক।

হিন্দু রণনীতির অন্যতম প্রধান দুর্বলতা ছিল দুর্ভেদ্য দুর্গের ওপর মাত্রাধিক আত্মঘাতী নির্ভরতা। সমতলে শত্রুর মোকাবিলা না করে হিন্দু নরপতিরা আশ্রয় নিতেন সুরক্ষিত দুর্গে। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত জার্মান রণনীতি বিশারদ ক্লাউজউইটজ (Klauswitz) বলেন ঃ অবরুদ্ধ দুর্গ জলবন্দী সৈনিকের ন্যায়ই অসহায়—a besieged garrison is as

1. Ibid, P-335

helpless as a marooned man of war. রানা প্রতাপ প্রচলিত হিন্দু রণকৌশল ত্যাগ করে গেরিলা যুদ্ধের আশ্রয় নেন। হলদিঘাট যুদ্ধে চূড়ান্ত ফলাফলের অপেক্ষা না করে সদলে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে অস্থায়ী রাজধানী গোগুণ্ডায় যান। অতঃপর ধনরত্ন সহ সকলকে নিয়ে আশ্রয় নেন দুর্গম পর্বতে। অত্যধিক গরম ও সংকীর্ণ গিরিপথ—এই দ্বিবিধ কারণে মানসিংহ মেবার বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনে বিরত থেকে পরদিন জনশূন্য অস্থায়ী রাজধানী গোগুণ্ডা অধিকার করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী রানা প্রতাপ খাদ্য ও সকল দ্রব্যের সরবরাহ বন্ধ করে দেন। মুসলমান বাহিনীর দুর্দশা চরমে ওঠে। এই সংবাদ পেয়ে সম্রাট আকবর রুষ্ট হন। প্রতাপ সিংকে অনুসরণ না করার জন্য তিনি মানসিং ও আসফখানকে দরবার থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেন।

অতঃপর রানা প্রতাপকে দমন করার জন্য ১৫৭৬ খ্রিঃ ১১ অক্টোবর সম্রাট স্বয়ং এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আজমীঢ় থেকে যাত্রা করেন। আরাবল্লীর দুর্গম অভ্যন্তরে আশ্রয় নেন রানা প্রতাপ। মান সিং, কুতুবউদ্দিন খাঁ ও রাজা ভগবানদাসকে প্রতাপের অনুসরণে পাঠানো হয়। ফিরে আসে তারা ব্যর্থ হয়ে। মহারানা যতক্ষণ বন্দী অথবা নিহত না হয় ততক্ষণ আকবরের স্বস্তি নেই। ১৫৭৮ খ্রিঃ মার্চ মাসে শাহাবাজ খানের সৈনাপত্যে মোগল সেনা পুনরায় মেবার আক্রমণ করে। মহারানা তখন কুম্বলগড় দুর্গে। প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেও রাজপুত সেনা পরাজিত হয়। প্রতাপ সিং যথারীতি রণক্ষেত্র ত্যাগ করে সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন।

এইভাবে মেবারের বিরুদ্ধে মোগল আক্রমণ বারংবার ব্যর্থ হয়। মহারানার নির্দেশে মোগল সামরিক ঘাঁটিগুলিতে সকল প্রকার সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিপন্ন এই ঘাঁটিগুলি রাজপুত সেনার চকিত ঝটিকা আক্রমণে হয় বিধ্বস্ত। অবশ্য মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচনায় এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। মৃত্যুর পূর্বে মহারানা প্রতাপ সিং আজমীঢ়, চিতোর ও মণ্ডলগড় বাদে সমগ্র মেবার মোগলদের হাত থেকে উদ্ধার করেন। ১৫৯৭ খ্রিঃ ২৯ জানুয়ারী মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে এই কিংবদন্তী মহানায়কের দেহাবসান হয়।

টডের বহুল প্রচারিত রাজস্থানের ইতিহাসে বলা হয় যে হলদিঘাটে পরাজিত হয়ে রানা প্রতাপ সর্বদাই একস্থান হতে অন্যত্র পালিয়েছেন; এবং তাঁর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। এ যদি সত্য হয় তবে আকবরের উপর্যুপরি মেবার আক্রমণের প্রয়োজন হত না। এবং হলদিঘাট যুদ্ধের পর দীর্ঘ ২২ বৎসর যুদ্ধ করে প্রতাপসিং কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র মেবার পুনরধিকারে সক্ষম হতেন না। ঐতিহাসিক M. M. Ojha দেখিয়েছেন টডের এই কাহিনি অলীক ও স্বকল্পিত। শুধু মহারানাই নন, অমর সিংহেরও ১৬১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত যুদ্ধ করার মত পর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদ

ছিল। যদিও প্রথমে বাহাদুর ও পরে আকবর চিতোর অধিকার করেন—কিন্তু প্রচুর ধনরত্ন তাদের করায়ত্ত হয়েছে—এরকম উল্লেখ কোন মুসলিম ঐতিহাসিকের লেখায় পাওয়া যায় না। (M. M. Ojha has shown that these stories are myths. Not only the Maharana but Amar also had enough financial resources to continue the struggle till 1614....though Chetor was occupied by Bahadur and later by Akbar, no Muslim historian describe any treasure having fallen into their hands.)[1]

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সম্রাট এক ক্ষুদ্র নরপতিকে দমন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন; আর সেই বীরকেশরী সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন। ইতিহাসে এরকম ঘটনা নজিরবিহীন। মহারানা প্রতাপ সিংহ ছিলেন মধ্যযুগে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর; স্বাধীনতাকামী নবজাগ্রত হিন্দু জাতির আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতের এই বীরশ্রেষ্ঠ মহান সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন ঃ সম্রাটের একান্ত ইচ্ছা ছিল মহারানার মৃত্যু এবং তাঁর রাজ্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা, অন্যদিকে মহারানার কঠিন প্রতিজ্ঞা—বিদেশীর কলুষ স্পর্শ হতে শিশোদিয়া বংশের রক্তের পবিত্রতা রক্ষা ও মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তাঁর জীবন পণ। অপরিসীম দুঃখ-ক্লেশ স্বীকার করেও পরিণামে তিনি জয়ী হয়েছেন আর সম্রাট আকবর হয়েছেন ব্যর্থ। (The emperor desired the death of the Rana and the absorption of his territory in the imperial dominions. The Rana while fully prepared to sacrifice his life if necessary, was resolved that his blood should never be contaminated by intermixture with that of the foreigner, and that his country should remain a land of freemen. After much tribulation he succeeded, and Akbar failed.)[2]

অমর সিং (১৫৯৭-১৬২০)

মহারানা প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিং সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাজ্য পুনর্গঠন ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে উদ্যোগী হন। ১৬০২ খ্রিঃ আকবর যুবরাজ সেলিমের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী মেবার জয়ের জন্য প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে সেলিম বিদ্রোহ করে। পরে পিতা-পুত্রে মিলন হলে ১৬০৩ খ্রিঃ সেলিমকে পুনরায় মেবার জয়ের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। ফতেপুর সিক্রির কাছে এসে

1. Ibid, P-336
2. Ibid, P-340

সেলিম আরও সেনা ও অস্ত্র-শস্ত্র দাবি করলে অভিযান পরিত্যক্ত হয়। এরপর সম্রাট— মহারানা উদয় সিংহের এক পুত্র সগরকে চিতোরের সিংহাসনে বসাবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু সে প্রয়াস বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীর সম্রাট হয়েই পুত্র পরভেজকে মেবার যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন। টডের বিবরণ অনুযায়ী পরভেজ সগরকে চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু জনসমর্থন না থাকায় শীঘ্রই তাকে চিতোর ত্যাগ করতে হয়। ১৬০৮ খ্রিঃ মোগল সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সমরনায়ক মহব্বত খাঁ মেবাব অভিযান করেন। রাজস্থান সূত্রের তথ্য অনুযায়ী— রাজপুত বাহিনী এক রাত্রে অতর্কিতে আক্রমণ করে মোগল শিবির। মহাব্বত খাঁ পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। রাজপুত সেনা লুঠ করে শিবিরের খাদ্যভাণ্ডার ও অস্ত্রাগার। (The Rajasthan sources claim that a night attack took Mahabat Khan completely by surprise and he had to flee leaving his camp and equipment which were looted by the Mewar soldiers.)[1] মহাব্বত খাঁর ব্যর্থতার পর ১৬০৯ খ্রিঃ আবদুল্লা খাঁ ও ১৬১৩ খ্রিঃ শাহজাদা খুরমের অধীনে খান আজম মির্জা মেবার অভিযানে প্রেরিত হন। মহারানার বিরুদ্ধে খুরমের প্রাথমিক সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

সুদীর্ঘ যুদ্ধে মেবারের সেনাবাহিনীর অবস্থা খুবই শোচনীয়। মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় দেশের ব্যাবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ বন্ধ। খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষ, অস্ত্রাগার শূন্য। সর্বোপরি রাজপুত নারী ও শিশুদের ওপর খুরমের বর্বর লাঞ্ছনা অসহনীয়। অবশেষে যুবরাজ করণ সিংহের উদ্যোগে মেবার ও মোগলের মধ্যে সাময়িক শান্তি স্থাপিত হয়। অমর সিংহের মৃত্যুর পর পুত্র করণ সিং মহারানা পদে অভিষিক্ত হন। তাঁর সঙ্গে মোগল দরবারের সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ। শাহজাদা খুরম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে করণ সিং তাকে উদয়পুরে চারমাস আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু শাজাহান উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করে খুরম ভুলে যান সে কৃতজ্ঞতা।

করণ সিংহের মৃত্যু হলে পুত্র জগৎ সিং এবং পরে তাঁর পুত্র রাজ সিং সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। উভয়েই চিতোর দুর্গ মেরামত করেন। শাহজাহানের আদেশে সেনাপতি সাদুল্লা খাঁ দুর্গের মেরামতি ভেঙে দেয়। রাজসিং সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। ১৬৫৭ খ্রিঃ শাজাহান অসুস্থ হলে পুত্রগণ বিদ্রোহী হয়। রাজসিং মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ করে সংগ্রহ করেন প্রচুর অর্থ। বিদ্রোহী ঔরঙ্গজেব মহারানা রাজসিংহের সাহায্য চান, বিনিময়ে শাজাহান যে চারটি জেলা কেড়ে নিয়েছিলেন তা ফিরিয়ে দিতে সম্মত হন।

---

1. Ibid, P-341

মাড়োয়ার ঃ ভাইদের হত্যা ও পিতাকে বন্দী করে ঔরঙ্গজেব দিল্লীর মসনদে। মহারাজ যশোবন্ত সিং মাড়োয়ার অধীশ্বর। সাহসী, নির্ভীক, স্বাধীনচেতা বীর যোদ্ধা যশোবন্তের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ ছিল না। ১৬৭৮ খ্রিঃ ডিসেম্বরে মহারাজ যশোবন্ত ছিলেন পেশোয়ারের খাইবার গিরিপথে মোগল সীমান্ত বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ। সেখানেই তিনি পরলোক গমন করেন। রাজধানী প্রায় অরক্ষিত। কারণ রাঠোর সেনাপতিরা ছিলেন মহারাজার সাথেই।

ঔরঙ্গজেব প্রায় বিনা বাধায় অধিকার করেন মাড়োয়ার;লুণ্ঠন করেন রাজ কোষাগার —ভেঙে দেন সকল মন্দির। ধার্য করেন জিজিয়া কর। যশোবন্তের মৃত্যুকালে তাঁর দুই পত্নী ছিলেন অন্তঃসত্তা। তাঁরা দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। অল্পদিনের মধ্যেই একটির মৃত্যু হয়। মাড়োয়ার অধিকার সম্পূর্ণ করে ১৬৭৯ খ্রিঃ এপ্রিলে সম্রাট আজমীঢ় থেকে রাজধানী দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। দরবারের পদস্থ রাঠোর নেতৃবৃন্দ নবজাত অজিত সিংকে যশোবন্তের উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকৃতি দিতে সম্রাটকে অনুরোধ করেন। ঔরঙ্গজেব অসম্মত। ইতিমধ্যে রাঠোর সেনানীবৃন্দ অজিত সিংকে নিয়ে দিল্লী পৌঁছালে ঔরঙ্গজেব অজিত সিংকে মুসলিম হারেমে পাঠাবার আদেশ দেন। প্রতিশ্রুতি দেন প্রাপ্ত বয়স্ক হলে অজিত সিংকে মোগল অভিজাতশ্রেণীতে নিয়োগ করা হবে। সমসাময়িক এক ঐতিহাসিকের মতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে মাড়োয়ারের সিংহাসন দেওয়া হবে— সম্রাট এরূপ প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। (Aurangzeb ordered the infant Ajit to be brought up in his harem with a promise that he would be admitted to the Mughul peerage when he came of age, and according to one contemporary historian, offered the throne to Ajit on condition that he became a Muslim)[1]

রাঠোর নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ। তাদের নেতা দুর্গাদাস, রাঠোর কুলতিলক। সম্রাটের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে কালহরণের উদ্দেশ্যে কিছুদিন সময় প্রার্থনা করেন। অবশেষে অধৈর্য ঔরঙ্গজেব অজিত সিং ও রাজমাতাদের বন্দী করার আদেশ দেন। দুর্গাদাস প্রস্তুত। বন্ধ দুর্গদ্বার। অদূরে সমবেত মোগল সেনা আক্রমণের অপেক্ষায়। সহসা উন্মুক্ত হয় দুর্গদ্বার। মাত্র ১০০ সৈন্য নিয়ে রঘুনাথ ভাটি ঝঞ্ঝার বেগে আক্রমণ করে মোগলদের; এবং এই সুযোগে দুর্গাদাস, অজিত, রাজমাতাদ্বয় (পুরুষ বেশে) ও সঙ্গীদের নিয়ে যোধপুরের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেন। প্রায় দেড় ঘন্টা রঘুনাথ মোগলদের গতিরোধ করে অবশেষে নিহত হয়। মোগল সেনা দুর্গাদাসের পশ্চাদ্ধাবন করে। দিল্লী থেকে সাড়ে

---

1. Ibid, P-347

৯ মাইল দূরে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হয়। মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে রাঞ্ছোর দাস জোধা মোগলদের বাধা দেয়। তাদের হত্যা করে মোগল সৈন্য দুর্গাদাসকে অনুসরণ করে। এবার স্বয়ং দুর্গাদাস মাত্র ৫০ জন সঙ্গী নিয়ে শত্রুর গতি রোধ করে। ভয়ংকর যুদ্ধে মাত্র ৭জন বাদে দুর্গাদাসের সকল সৈন্য নিহত হয়। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। মোগলদেরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। তারা রণক্লান্ত। অন্ধকারে শত্রুভূমিতে শত্রুর অনুসরণ বিজ্ঞজনোচিত হবে না ভেবে ফিরে যায়। দুর্গাদাস অজিত সিং ও অবশিষ্টদের নিয়ে ১৬৭৯ সালের ২৩ জুলাই যোধপুর পৌঁছান।

মহারাজ যশোবন্তের মৃত্যু হলে আওরঙ্গজেব মাড়োয়ার অধিকার করে টাঃ ৩৬ লক্ষের বিনিময়ে জনৈক ইন্দ্র সিংকে যোধপুরের সিংহাসনে বসান। ধার্য করেন জিজিয়া কর। নেতৃত্বহীন মাড়োয়ারবাসীরা মোগল আগ্রাসন রোধে ব্যর্থ হয়। অজিত সিংকে নিয়ে দুর্গাদাস মাড়োয়ার উপস্থিত হলে জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য সৃষ্টি হয় অভূতপূর্ব উদ্দীপনা। মাড়োয়ার অগ্নিগর্ভ। মাড়োয়ারকে শায়েস্তা করতে সরবুলান্দ খাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট মোগল বাহিনী প্রেরিত হয়। এই যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক স্বয়ং ঔরঙ্গজেব। শিবির তাঁর আজমীঢ়ে। প্রয়োজনে পিতাকে সাহায্য করার জন্য তিন পুত্র শাহজাদা মোয়াজেম, আজম ও আকবর সসৈন্যে আজমীঢ়ে উপস্থিত। একদিকে সুসজ্জিত বিশাল মোগল বাহিনী—অপরপক্ষে স্বল্প সংখ্যক রাঠোর রাজপুত। দেশের স্বাধীনতা ও বিখ্যাত বরাহ মন্দির রক্ষার্থে তারা পুস্কর হ্রদের কাছে মোগল বাহিনীকে বাধা দেয়। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের রচনায় ঃ তিনদিন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। হিন্দু শৌর্যের সাক্ষী হয়ে রইল চারিদিকের স্তূপীকৃত মৃতদেহ। বরাহ মন্দির রক্ষার জন্য শেষ হিন্দু সৈনিকটিও করে আত্মবলিদান। (After three days of continuous fighting, mounds of dead bodies remained to proclaim the valour of the Hindu heroes who had died to the last man to save the temple.)[1]

এই যুদ্ধের পর মাড়োয়ার মোগল সাম্রাজ্যের নতুন অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব দেওয়া হয় শাহ্জাদা আকবরকে। আজমীঢ়-যোধপুর সড়কের দুপাশে রাঠোর বীরদের স্মৃতিফলক আজও পথিককে স্মরণ করিয়ে দেয়; শক্তিশালী বলদর্পী অত্যাচারীর আগ্রাসনকে তাঁরা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিরোধ করেছে। জনৈক ঐতিহাসিকের মন্তব্য ঃ কাজল মেঘ থেকে যেমন নেমে আসে অবিরল বৃষ্টিধারা—তেমনি ঔরঙ্গজেব এই হতভাগ্য দেশটির ওপর লেলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বর্বর সেনাদের। একে একে পতন হল যোধপুর, দিদওয়ানা ও রোহিত নগরীর। অবাধে

1. Ibid, P-349

চলল অত্যাচার, ধ্বংস ও লুণ্ঠন। ধর্মের পতাকা হল পদদলিত; ধ্বংস হল মন্দির, সেখানে নির্মিত হল মসজিদ। (As the cloud pours water upon the earth, so did Aurangzib pour his barbarians over the land....Jodhpur fell and was pillaged; and all the great towns in the plains of Mairta, Didwana and Rohit shared a similar fate. The emblems of religion were trampled under foot, the temples thrown down and mosques erected on their sites.)[1]

দুর্গাদাস ঃ রাঠোর শৌর্য ও বীরত্বের পারিজাত কুসুম— শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। (the flower of Rathor chivalry.) অবশিষ্ট রাঠোর সেনাদের নিয়ে তিনি আশ্রয় নেন মেবারে। মেবারের মহারানা রাজ সিং তাঁর আত্মীয়। ঔরঙ্গজেব মেবার অভিযানে উদ্যোগী হলে বিপন্ন বোধ করে মেবার। মহারানা রাজ সিং মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। গড়ে ওঠে মেবার-মাড়োয়ার (শিশোদিয়া-রাঠোর) নতুন শক্তি জোট। শিশোদিয়া-রাঠোর শক্তি জোটের মধ্য দিয়ে রাজপুত যুদ্ধ স্বাধীনতার জন্য জাতীয় অভ্যুত্থানের রূপ লাভ করে। (Through the Rathor-Sisodia alliance, the Rajput war assumed the aspect of a national rising in defence of liberty.)[2] এই নয়া মৈত্রী জোট মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে এক অশনি সংকেত। ১৬৭৯ খ্রিঃ নভেম্বরে ঔরঙ্গজেব আক্রমণ করেন মেবার। মহারানা আশ্রয় নেন আরাবল্লী পর্বতে। অধিকৃত হয় চিতোর। সম্রাট চিতোর পরিদর্শন করেন ফেব্রুয়ারী শেষ দিকে। তাঁর আদেশে ভেঙে দেওয়া হয় ৬৩টি মন্দির। শত্রু দমন করে সম্রাট ফিরে যান আজমীঢ়ে। মহারানা এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। আক্রমণ করেন বিক্ষিপ্ত মোগল সামরিক ঘাঁটিগুলি। শিশোদিয়া-রাঠোর বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে শাহ্‌জাদা আকবরের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। উদ্দীপিত বিজয়ী বাহিনী আক্রমণ করে মালয় (Malwa) ও গুজরাট; মুক্ত করে ইদর (idar). যুবরাজ ভীম সিংহের নেতৃত্বে রাজপুত সেনা আমেদাবাদ, ভাদনগর, বিশালনগর ও অন্যান্য অঞ্চল লুণ্ঠন করে সংগ্রহ করেন প্রচুর ধনরত্ন। মন্দির ভাঙার প্রতিশোধ নিতে ভীম সিং একটি বড় মসজিদ সহ ধ্বংস করেন ৩১টি ছোট মসজিদ। (In revenge for breaking the temples, Bhim Singh destroyed one big and thirty small mosques.)[3]

1. Ibid, P-349
2. R.C. Mujumder. H.C.Roychowdhury, Kali Kindar Datta—An Advanced History of India, P-495
3. R.C. Mujumder—The History And Culture of The Indian People— The Mughal Empire, P-351

ইতিমধ্যে গুজরাটের ভারপ্রাপ্ত শাহ্জাদা আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। মহারানা রাজ সিং ও দুর্গাদাস তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের কূটকৌশলে ভেঙে যায় বিলাসী শাহ্জাদার সুখস্বপ্ন। বিপন্ন শাহ্জাদা দুর্গাদাসের শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁকে পৌঁছে দেন মারাঠা অধিপতি শম্ভুজীর দরবারে। কিন্তু মারাঠাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাহায্য না পেয়ে ভগ্ন মনোরথ শাহ্জাদা ১৬৮৭ খ্রিঃ ফেব্রুঃ পারস্যে চলে যান।

দুর্গাদাসের অবর্তমানে নেতৃত্বহীন রাঠোর সর্দারগণ মোগলের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে লড়াই চালিয়ে গেছে। ১৬৮৭ খ্রিঃ দুর্গাদাস, মারওয়াড়ে ফিরে এলে মোগলের বিরুদ্ধে পূর্ণ উদ্যমে সংগ্রাম শুরু হয়। রাঠোর সেনা মাড়োয়ারের বিভিন্ন মোগল শিবির আক্রমণ করে বহু মুসলমানকে হত্যা করে; অনেকে পালিয়ে যায়। যে কোন মুহূর্তে আক্রমণের ভয়ে আতঙ্কিত মোগল সেনা শিবির। অনেক মোগল সেনাপতি "চৌথ" দিয়ে দুর্গাদাসের সঙ্গে আপস করেন। রাঠোর আক্রমণে রাজধানী দিল্লী পর্যন্ত বিপন্ন হয়। ১৬৯০ খ্রিঃ দুর্গাদাস আজমীঢ়ের সুবেদার সুজাত খাঁকে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত করলে মাড়োয়ারে মোগলের অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দেয়। ১৬৯৩ খ্রিঃ সুজাত খাঁ এই অপমানের প্রতিশোধ নেন। যুদ্ধে দুর্গাদাস পরাজিত হন। মাড়োয়ারে মোগলের এই ছিল শেষ বিজয়। দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেব মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায়—উঃ ভারতে নতুন সৈন্য পাঠানো সম্ভব ছিল না।

শাহ্জাদা আকবরের এক পুত্র ও কন্যা দুর্গাদাসের আশ্রয়ে ছিল। ঔরঙ্গজেব তাদের ফেরত পেতে ছিলেন একান্ত আগ্রহী; এবং এজন্য দুর্গাদাসের যে কোন দাবি মানতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। দুর্গাদাস শাহ্জাদী সফিয়েত উন্নিসাকে (Safiyat-un-nisa) দিল্লী দরবারে সসম্মানে পাঠিয়ে দেন। ঔরঙ্গজেব তাঁর জন্য কোরান ও ইসলামিক ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে শাহ্জাদী বলেন, দুর্গাদাস এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন। ইসলামিক শাস্ত্রে পারঙ্গম জনৈক মুসলিম মহিলাকে আমার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। এ সংবাদে সম্রাট প্রীত হন। প্রায় দুই বৎসর পরে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঈশ্বর দাস নাগরের মধ্যস্থতায় আকবর তনয় বুলন্দ আখতারকে নিয়ে দুর্গাদাস স্বয়ং দরবারে হাজির হলে, সম্রাট তাকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে অভ্যর্থনা করেন। উপহার দেন একলাখ আসরফি ও মহার্ঘ দ্রব্যসম্ভার। তাকে তিন হাজারি মনসবদারের পদে নিয়োগ করেন। ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য ছিল অর্থ ও ক্ষমতার প্রলোভনে দুর্গাদাসকে বশীভূত করা। কিন্তু রাঠোর গৌরব দুর্গাদাস এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্বন্ধে জনৈক ঐতিহাসিকের সশ্রদ্ধ মন্তব্য : মোগলের অতুল ঐশ্বর্য ও অস্ত্রের ঝনৎকার তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। রাঠোরদের মধ্যে তিনি ছিলেন এক বিরল ও বিস্ময়কর প্রতিভা। কিংবদন্তিতুল্য রাজপুত

শৌর্য ও উদ্যম এবং বিচক্ষণ মোগল ওয়াজিরের (মন্ত্রী) সাংগঠনিক ক্ষমতা ও কূটনৈতিক জ্ঞানের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। (Mughul gold could not seduce, Mughul arms could not daunt, that constant heart. Almost alone among the Rathores he displayed the rare combination of the dash and reckless valour of a Rajput soldier with the tact diplomacy and organising power of a Mughul minister of state.)[1]

দুর্গাদাস ও অজিত সিং সম্রাটের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সম্যক সচেতন ছিলেন। ১৭০১ সালে ঔরঙ্গজেব পুত্র মহম্মদ আজমকে গুজরাটের সুবেদার নিযুক্ত করেন। মাড়োয়ারকে ইতিপূর্বেই গুজরাটের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল। সম্রাটের নির্দেশে আজম দুর্গাদাসকে হত্যার উদ্দেশ্যে আমেদাবাদে আমন্ত্রণ জানান। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমেদাবাদের উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করেন। সুবেদারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট দিনটি ছিল দ্বাদশী। একাদশীর উপবাস অন্তে পারন করে দুর্গাদাস দরবারে যাবেন এরকম ছিল কর্মসূচী। কিন্তু অধৈর্য সুবেদার সত্বর দরবারে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করলে দুর্গাদাস বিপদের আশঙ্কা করে শিবির জ্বালিয়ে দিয়ে দ্রুত স্বদলে মাড়োয়ার যাত্রা করেন। পেছনে মোগল সেনা। দুর্গাদাসের পৌত্র বীরত্বের সঙ্গে মোগল বাহিনীর গতিরোধ করে। যুদ্ধে সে নিহত হয়। দুর্গাদাস মাড়োয়ার পৌঁছেই যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হন। ১৭০৬ খ্রিঃ মারাঠাদের কাছে গুজরাটের মোগল সেনার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। ১৭০৭ খ্রিঃ ৩রা মার্চ সম্রাট ঔরঙ্গজেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে দুর্গাদাস ও অজিত সিং যোধপুরের মোগল শিবির আক্রমণ করেন। পরাজিত ছত্রভঙ্গ মোগল সেনা। অনেকে হিন্দুর ছদ্মবেশে পালিয়ে যায়। গঙ্গাজল ও তুলসীপাতা দিয়ে যোধপুর দুর্গকে পবিত্র করা হয়। অজিত সিং মহাসমারোহে পিতৃ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। সার্থক হয় দুর্গাদাসের জীবন সাধনা। (The fort of Jodhpur was purified with Ganges water and tulsi leaves. Ajit Singh sat on his ancestral throne and Durga Das's life task was crowned with success.)[2]

মারাঠা ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মারাঠাদের উত্থান ভারত ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। রাষ্ট্রনীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাদের ছিল গৌরবময় ঐতিহ্য। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তারা দেবগিরির যাদব নৃপতিদের অধীনে দিল্লীর সুলতানদের বিরুদ্ধে

1. R.C.Majumder, H.C.Roychowdhury, Kali Kindar Datta—An Advanced History of India, P-495
2. R.C. Mujumder—The History And Culture of The Indian People— The Mughal Empire, P-351

সংগ্রাম করেছে। (The Marathas had brilliant tradition of political and cultural activities in the early middle of the Indian history, when they upheld the national causes under the yadavas of Devgiri.)[1] মারাঠা জাতির ইতিহাসে মহারাষ্ট্রের ভৌগলিক অবস্থানের এক বিশেষ অবদান রয়েছে। সহ্যাদ্রি-সাতপুরা-বিন্ধপর্বত বেষ্টিত, তাপ্তি-নর্মদা-বিধৌত মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা ছিল কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। স্বাবলম্বন, সাহস, অধ্যবসায়, সরলতা, সততা, সামাজিক সাম্য ও ব্যক্তি মানুষের মর্যাদায় গৌরববোধ ছিল মারাঠাজাতির উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।' (Self-reliance, courage, perseverance, a stern simplicity, a rough straightforwardness, a sense of social equality and consequently pride in the dignity of man as a man.)[2]

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "আর্যজাতির জীবন ধর্মভিত্তিতে অবস্থিত। ধর্মের মধ্য দিয়া না হইলে ভারতবর্ষে কোন ভাব চলে না।" ভারতবর্ষের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। "এদেশে ধর্ম ভিন্ন কখনও কোন জাতির বা কোন সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় নাই। শিখ জাতির উন্নতির সহিত গুরু নানকের প্রচারিত ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাণনাথ নামে জনৈক মহাপুরষ বুন্দেলখণ্ডে যে নব ধর্মভাবের প্রবর্তন করেন, তাহারই ফলে বুন্দেলাজাতি মোগল শাসনের উচ্ছেদে সমর্থ হয়"—লিখেছেন সখারাম গণেশ দেউস্কর।* অন্যদিকে রণদুর্মদ রাজপুতদের ছিল গৌরবময় সামরিক ঐতিহ্য, দুর্জয় সাহস ও জ্বলন্ত দেশপ্রেম। কিন্তু তাদের সকল শক্তি মোগলদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও পরিশেষে আত্মকলহে নিঃশেষ হয়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, রাজস্থানে কোন ধর্ম প্রচারক রাজপুতদের ধর্মভাবে উদ্দীপিত করে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন নি। কিন্তু শিবাজীর আবির্ভাবের পূর্বেই মহারাষ্ট্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন একনাথ, তুকারাম, রামদাস এবং বামন পণ্ডিত। এরা প্রচার করেন যে সকল মানুষই ভগবানের সন্তান এবং সকলেই সমান। এদের প্রচারিত ভক্তিধর্মে "শ্রমের মর্যাদা" স্বীকৃত হয়। অর্থাৎ

* দেওঘরের শিক্ষক এই মারাঠী যুবক সাহিত্যাচার্য রাজনারায়ণ বসুর সস্নেহ সান্নিধ্যে বাংলা ভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা—১২। তিনি ছিলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ "হিতবাদী" পত্রিকার সম্পাদক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনি ছিলেন বিশেষ স্নেহাস্পদ। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক ১৮৯৫ সালে মহারাষ্ট্রে "শিবাজী উৎসব" প্রবর্তন করেন। সখারামের উদ্যোগে এই উৎসব কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় তার পরের বৎসর ১৮৯৬ সালে। এর পূর্বেই তিনি রচনা করেন "শিবাজীর দীক্ষা"। কবিগুরু তাঁর অনুরোধে লেখেন "শিবাজী উৎসব"। কবিতাটি "শিবাজীর দীক্ষা" পুস্তিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

1. R.C.Majumder, H.C.Roychowdhury, Kali Kindar Datta—An Advanced History of India, P-503
2. Ibid, P-504

কোন কাজই হেয় নয়। এই সহজ সরল ভক্তিধর্মের প্রচারে মহারাষ্ট্রে নবজাগরণের প্লাবন বয়ে যায়। যাকে বলা যায় রাষ্ট্রবিপ্লবের (স্বাধীনতা সংগ্রাম) পূর্ব লক্ষণ। (..... the Marathi religious reformers–Eknath, Tukaram and Vaman Pandit preaching through successive centuries, the doctrine of devotion to God and of equality of all men before him, without any distinction of caste or position and the dignity of action, had sown in their land the seeds of a rennaissance or self awkening which is generally the presage of a political revolution in a country)[1]

শিবাজী

শিবাজীর আবির্ভাবের পূর্বে মারাঠা জাতি বিভিন্ন মুসলিম রাজ্যের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। শিবাজীই তাদের ঐক্যবদ্ধ করেন। সাধারণ একজন জায়গীরদারের পুত্র ছিলেন শিবাজী। লুণ্ঠনের প্রলোভন নয়— মাতৃভূমির পরাধীনতা, স্ব-জাতি, স্বদেশবাসী হিন্দুদের ওপর মুসলমানের বর্বর অত্যাচার তাকে ব্যথিত করে।

বিদেশীর অধীনতাপাশ থেকে দেশ-মাতৃকাকে মুক্ত করে এক স্বাধীন সার্বভৌম হিন্দু রাষ্ট্রগঠনে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। (....... "inspired by a real desire to free his country from what he considered to be a foreign tyranny and not by a mere love of plunder)[2] মহারাষ্ট্র নয়— তাঁর লক্ষ্য ছিল সমগ্র ভারত। তাই মহারাষ্ট্র পাদ পাদশাহী নয়—তাঁর উপাধি ছিল "হিন্দু পাদ পাদশাহী"।

শিবাজী সম্বন্ধে জনমানসে কিছু বিভ্রান্তি আছে— আছে স্বদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এর কারণ ভারত ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বিদেশীদের রচনা হতে আহৃত। অনেকের মনে এরূপ ধারণা আছে যে, শিবাজী ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু মোগল সেনাপতি অম্বরাধিপতি বিচক্ষণ জয়সিংহের সহিত তাঁর পত্রালাপ প্রমাণ করে যে, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ সম্বন্ধে মারাঠী পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর লিখেছেন—"হিন্দুশক্তিকে খর্ব করিবার চেষ্টা করিয়াও ভারতবর্ষে ইসলাম আপনার বিলুপ্ত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দু শক্তি শেষ পর্যন্ত তাঁহাদিগের অজেয় হইয়া রহিল। হিন্দু শক্তির এই অজেয়তার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ প্রায়ই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকে কল্পনা করিয়াছেন দস্যুজন-সুলভ দুর্নিবার ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান লুণ্ঠন প্রবৃত্তিই এই শক্তিকে অতীব ভীষণ ও অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল"।[3]

---

1. Ibid, P-504
2. Ibid, P-505
3. সখারাম গণেশ দেউস্কর-শিবাজীর দীক্ষা, পৃঃ ৯

বিদেশী ঐতিহাসিকদের এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সত্যদ্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক রচনা "শিবাজী উৎসব"।

কোন দূর শতাব্দীর কোন এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে,
হে রাজা শিবাজী,
তব 'ভাল উদ্ভাসিয়া এ 'ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল নামি—
"এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

. . . .

সেদিন কোথায় তুমি হে ভাবুক, হে বীর মারাঠী,
কোথা তব নাম!
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধুলায় হল মাটি
তুচ্ছ পরিণাম!
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরব—
তব পুণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস
এই জানে সবে।।
অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন'-পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।
যাহা মরিবার নহে— তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী?
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি।।

একদিকে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব—অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যে শক্তিশালী বিজাপুর সুলতান। নিঃস্ব সহায় সম্বলহীন শিবাজী এই দুই শক্তিকে পর্যুদস্ত করে মহারাষ্ট্রে যে স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করেছিলেন, তা তাঁর অসাধারণ সামরিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। সিংহাসনে অভিষেকের পর তিনি মাত্র ছ'বৎসর

বেঁচেছিলেন। অকাল মৃত্যু না হলে হয়তো সারা ভারতব্যাপী তিনি এক শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করে প্রাচীন ভারতের লুপ্ত গৌরব মহিমাকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। জে, এন, সরকার বলেন—৮টি বিভিন্ন ভাষায় শিবাজী সম্বন্ধে যে লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়, তা বিচার-বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকগণ অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, "শিবাজী শুধুমাত্র মারাঠাজাতিকেই ঐক্যবদ্ধ করেন নি—তিনি ছিলেন মধ্যযুগের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংগঠনিক প্রতিভা। রাষ্ট্রের পতন হয়, সাম্রাজ্য ভেঙে যায়, রাজবংশ লুপ্ত হয়—কিন্তু শিবাজীব ন্যায় "রাজবেশে এক প্রকৃত বীরের স্মৃতি সমগ্র মানবজাতির জন্য এক অবিনশ্বর ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। (Therefore, the historian of Shivaji, at the end of a careful study of all the records about him in eight different languages, is bound to admit that Shivaji was not only the maker of the Maratha nation, but also the greatest constructive genius of mediaval India. States fall, empires break up, dynasties become extinct, but the memory of a true "hero as King" like Shivaji remains an imperishable historical legacy for the entire human race —

The pillar of a people's hope,
The centre of a world's desire.[1]

ঐতিহাসিক জি, এস, সরদেশাই এ অভিমত সমর্থন করে বলেন—ভারতে সার্বভৌম হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপন ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি সফলকাম। মারাঠাদের তিনি সঞ্জীবিত করেছেন স্বাধীনতার অভিমন্ত্রে। দুর্জয় সাহস, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কূটকৌশল, সাংগঠনিক ও সামরিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সাহায্যে তিনি গঠন করেছেন এক শক্তিশালী মারাঠা সাম্রাজ্য; হিন্দু রাষ্ট্রের প্রথম সোপান। নিপীড়িত হিন্দুজাতির তিনি চিরন্তন প্রেরণা। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তাঁর উত্তরাধিকারীরা সমগ্র খৃঃ ভারতে বিস্তার করেছে অবিসম্বাদী প্রভুত্ব।

ছত্রপতি শিবাজীর দুই পুত্র শম্ভুজী ও রাজারাম। বিলাসী উশৃঙ্খল জ্যেষ্ঠ শম্ভুজী পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় শিবাজী তাকে পানহালা দুর্গে বন্দী করে রাখেন। ১৬৮০ খ্রিঃ শিবাজীর দেহাবসানে কতিপয় মন্ত্রী ও সেনাপতির সহযোগিতায় রাজারাম সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষুব্ধ হন দেশবাসী ও সেনাবাহিনীর এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তাঁরা শম্ভুজীকে কারাগার থেকে মুক্ত করে ২০ জুলাই সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। শম্ভুজী ছিলেন সন্দেহ পরায়ণ, তাঁর ব্যবহার ছিল রূঢ় ও নির্মম। তাঁর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে

---

1. Sir J. N. Sarkar—House of Shivaji—P-103-104

অনেক অভিজ্ঞ প্রশাসক ও দক্ষ সেনাপতি তাঁকে পরিত্যাগ করে। উঃ প্রদেশের জনৈক ব্রাহ্মণ কবি কলস (কবি চূড়ামণি) ছিলেন তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা।

শম্ভুজী মোগল সেনার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতেন। তাঁর রণকৌশল ছিল গেরিলা কায়দায় অতর্কিত আক্রমণ। সিংহাসনে আরোহণ করে রাজপুতনা জয়ে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করায়, মারাঠা দমনে ঔরঙ্গজেব কোন বড় ধরনের অভিযান পাঠাতে পারেননি। কিন্তু বিদ্রোহী শাহজাদা আকবর শম্ভুজীর আশ্রয়প্রার্থী হলে মারাঠা শক্তিকে খর্ব করা হল তাঁর প্রধান লক্ষ্য; তিনি স্বয়ং সেনাবাহিনী নিয়ে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে এর ফলাফল শুভ হয়নি। শম্ভুজী ও আকবর দিল্লী জয়ের জন্য অনেক রোমান্টিক পরিকল্পনা করলেও কোনটাই বাস্তবায়িত হয়নি। শত্রুদমন করে রায়গড়ে ফেরার পথে তিনি ১৬৮৯ খ্রিঃ ১লা ফেব্রুঃ সঙ্গমেশ্বরে মোগলের হাতে বন্দী হন। নির্মম অত্যাচার করে ১১ই মার্চ তাকে হত্যা করা হয়।

রাজারাম ঃ শম্ভুজীর মৃত্যুর পর শিবাজীর কনিষ্ঠ তনয় রাজারাম সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবরুদ্ধ রায়গড়। মারাঠা জাতির এই সঙ্কট মুহূর্তে শম্ভুজীর বিধবা পত্নী ইয়েসু বাঈ (Yesu Bai) জাতিকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হতমান হতোদ্যম মারাঠাদের নিকট তিনিই ছিলেন প্রেরণার উৎস। তিনি তাদের মধ্যে সাহস ও উদ্দীপনা সঞ্চার করে শত্রুর বিরুদ্ধে সংঘটিত করেন। মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর প্রধান কৌশল ছিল—

(ক) রাজা, রাজপরিবারের সদস্যগণ ও মন্ত্রীমণ্ডলী কখনও সকলে একসাথে এক জায়গায় থাকবে না। তাঁরা রাজ্যময় ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন দুর্গে অবস্থান করে শাসনকার্য নির্বাহ করবেন। এর ফলে কোন একটি ঘাঁটি বা দুর্গের পতন হলেও সরকারের পতন হবে না।

(খ) শম্ভুজীর দ্বারা অকারণে দণ্ডিত সেনানায়ক ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের কারাগার থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। তাঁদের উদ্বুদ্ধ করা হয় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে। মোগল শিবিরে অবিরাম গেরিলা আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হয় তাদের।

রাজারাম সপরিবারে রায়গড় ত্যাগ করে প্রতাপগড়, পানহালা হয়ে জিঞ্জীতে (Jinji) শিবির স্থাপন করেন ১৬৮৯ সালের নভেম্বরে।

কর্ণাটকের হিন্দু দলপতিরা রাজরামকে স্বাগত জানায়। তাদের নিকট রাজারাম ছিলেন এক অসাধারণ বীর। রাজারাম ও তাদের একই লক্ষ্য। মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে তাঁরা মারাঠা নৃপতিকে খাদ্য, অস্ত্র ও সৈন্যসহ সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন। (The Chiefs of the Karnataka lands hailed Rajaram as an uncommon hero

and made his cause their own. They brought him presents of money, provisions and materials and having been actuated with a spirit of vengeance against Muslims, offered every kind of service to the Maratha King.)[1]

পার্শ্ববর্তী তাঞ্জোরও ছিল মারাঠা শাসনাধীন। জিঞ্জী হল রাজারামের অস্থায়ী রাজধানী। শিবাজীর দুরদৃষ্টি প্রশংসনীয়। মহারাষ্ট্র হতে সুদূর তাঞ্জোর পর্যন্ত তিনি নির্মাণ করেছিলেন অনেক সুরক্ষিত দুর্গ। একটির পতন হলে যাতে অন্য দুর্গে ঘাঁটি গেড়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায়। মারাঠা সেনাপতিদের গেরিলা আক্রমণে মোগল শিবিরগুলিতে বিপর্যয় দেখা দেয়। এদের মধ্যে সান্তাজী ঘোড়পাড়ে ও ধনাজী যাদব ছিলেন মোগলের ত্রাস। এই দুই দুঃসাহসী একবার সকলের অলক্ষ্যে বাদশার শিবিরের তাঁবুর (Imperial tent) দড়ি কেটে দিলে, ভেঙে পড়ে বিশাল শিবির। পিষ্ট হয়ে মারা যায় বহু লোক। ভাগ্যজোরে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান স্বয়ং সম্রাট। সে রাত্রে তিনি ছিলেন কন্যার শিবিরে। এই দুই বীর সেনা নায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন ঃ মারাঠার গৌরব রবি অস্তাচলগামী হলে, মারাঠাদের সঙ্গে তাঁর (ঔরঙ্গজেব) সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে; এই প্রথম জনগণের মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়েছে—শম্ভুজীর প্রতি রক্তবিন্দু সৃষ্টি করেছে নব নব বিভীষিকা। সান্তাজী ঘোড়পাড়ে ও ধনাজী যাদব দুটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তাঁদের অত্যুজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় উত্তাল দাক্ষিণাত্য প্রায় একদশক আলোকিত হয়েছিল, ব্যর্থ হয়েছিল বিদেশী আক্রমণ। (In the long history of his struggle with the Marathas after the sun of Maratha royalty had set in, the red cloud of Shambhuji's blood and the peoples war had begun. Santaji Ghorepade and Dhanaji Jadhav were the two stars of dazzling brilliancy which filled the Deccan firmament for nearly a decade, and paralyzed the alien invader.)[2]

প্রত্যাশিত ভাবেই মোগল সেনা জিঞ্জী অবরোধ করে। কিন্তু মারাঠাদের প্রবল প্রতিরোধ ও পালটা আক্রমণে অবরোধ সফল হয় না। মোগল পক্ষে প্রধান সেনাপতি ছিলেন জুলফিকার; মারাঠা পক্ষে দুদ্ধর্ষ ও অসমসাহসী সেনানায়ক ধনাজী যাদব ও সান্তাজী ঘোড়পাড়ে। উভয় পক্ষে প্রায়ই খণ্ডযুদ্ধ (Skirmishes) হত। তাতে মোগল পক্ষেই ক্ষতি হয়েছে অধিক। সম্রাট অওরঙ্গজেব জুলফিকারের শক্তি বৃদ্ধির জন্য যুবরাজ

1. R. C. Majumder—The History and Culture of the Indian People (The Mughal Empire), P-367
2. Ibid, P-366

কামবক্সের অধীনে এক বিরাট সেনা বাহিনী প্রেরণ করেন। তাতেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। ১৬৯২-এর ডিসেম্বর। ধনাজী যাদব ৭/৮ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে রাজারামের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। তাকে বাধা দেন যশস্বী মোগল সেনাপতি ইসমাইল খান মাকা। মারাঠাদের প্রবল আক্রমণে মোগল সৈন্য পরাস্ত হয়। নিহত হয় অসংখ্য মুসলিম সৈন্য। আহত সেনাপতি ইসমাইল খান মাকা হন বন্দী। বিজয়ী মারাঠা সেনা ২টি হাতী, ৫০০ ঘোড়া, মোগল শিবিরের রসদ ও বন্দী মুসলিমদের নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করে। (Dec 1692...Dhanaji Jadav at the head of 7 or 8 thousand Maratha horsemen had arrived near that place...he was held up there by the trenches which the Moors had constructed...and in which they had posted good troops under Ismail Khan maka, a general of great reputation...The Maratha Commander delivered a vigorous assault...The entrenchment was forced, many of the Moors slain, and Ismail Khan wounded in two places was taken prisoner...the Marathas entered Jinji with their booty, consisting of two elephants, 500 horses the baggage and many prisoners.)[1]

ইতিমধ্যে ঘটনা ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। রাজারামের পক্ষে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে যুবরাজ কামবক্সের প্রেরিত পত্র সেনাপতি জুলফিকারের হস্তগত হয়। তিনি কামবক্সকে বন্দী করেন। মোগল শিবিরে রটনা হয় যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়েছে। (Zulfiqar arrests Kam Bakhsh, whose letters to Rajaram, giving news and saying that he was coming to join the Martha Raja, had been intercepted by zulfiqar. Rumour prevails in the camp that Aurangzeb is dead.)[2]

অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়। মারাঠা সেনাপতি সান্তাজী ঘোড়পাড়ের সঙ্গে যুদ্ধে মোগল সেনানায়ক আলি মর্দান খান বন্দী হন।...অবরুদ্ধ মোগল শিবিরে সঞ্চিত রসদভাণ্ডার নিঃশেষ হলে সেনাধ্যক্ষ জুলফিকার ও আসাদ খান—রাজারামের নিকট দূত মারফত অনুরোধ জানান যে, তাঁদের নিরাপদ স্থানে যেতে দেওয়া হোক। কিন্তু রাজারাম পত্রের কোনও উত্তর দেন না।...অবশেষে জুলফিকার রাজারামের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি করে তাকে এক লক্ষ টাকার স্বর্ণমুদ্রা ও ৬০,০০০ প্যাগোডা (pagodas) মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার

1. J.N. Sarkar– House of Shivaji, P-219
2. Ibid, P-219-220

উপঢৌকন পাঠান।...১৬৯৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী মুসলিম বাহিনী মারাঠা অশ্বারোহী সেনার প্রহরায় শিবির ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। (The Moors are unable to live before Jinji. Zulfijar has made a secret pact with Rajaram, by paying him one lakh of rupees in gold,—besides Jewels worth 60,000 pagodas to Rajaramn—in return for being allowed to return (unmolested)...

The Moors left their camp on 3 Feb. escorted by a corps of Maratha cavalry up to the place of their retreat.)[1]

এই ঘটনায় রাজারামের দুই সেনানায়ক ধনাজী ও সান্তাজী খুবই ক্ষুব্ধ হন। তাদের ক্ষোভকে অসঙ্গত বলা যায় না। কারণ মারাঠারা ইচ্ছে করলেই যুবরাজ কামবক্স, আসাদ খান ও জুলফিকারকে বন্দী করে মুক্তিপণ বাবদ প্রচুর অর্থ ও সম্রাটের সঙ্গে অনুকূল শর্তে সন্ধি করতে পারতেন। কিন্তু এও সত্য যে, অবরোধের প্রথম পর্যায়ে জুলফিকার জিঞ্জী অধিকার করতে পারতেন। রাজারাম ও জুলফিকারের মধ্যে এই পারস্পরিক বোঝাপড়ার অন্য কারণ ছিল। বৃদ্ধ সম্রাট আওরঙ্গজেবের শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনের দাবী নিয়ে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। জুলফিকার ও আসাদ খান ষড়যন্ত্র করেন যে, তারা মারাঠাদের সহায়তায় কর্ণাটক ও গোলকুণ্ডা অধিকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে; এবং রাজারামকে দেওয়া হবে বিজাপুর রাজ্য। (In view of the expected death of the aged Emperor and the inevitable war of succession among his sons, Asad Khan and Zulfiqar planned to establish themselves as independent sovereigns in that country, with Maratha help. They had in view the union of the Kingdom of Golkunda and the Karnataka [under their own sceptre], while Ramraja (Rajaram) was to get, as his share, the Kingdom of Bijapur.)[2]

এই গোপন সমঝোতা সত্ত্বেও উভয় পক্ষে বিরামহীন সংঘর্ষের জন্য জিঞ্জী নিরাপদ ছিল না। তদুপরি রাজারাম উপলব্ধি করেন, সুদূর কর্ণাটক থেকে রাজকার্য পরিচালনা রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক হবে না। ১৬৯৭-এর ডিসেম্বর তিনি সাঁতারায় স্থাপন করেন নতুন রাজধানী। অবশেষে ৮ বৎসর যুদ্ধের পর মোগল সেনা ১৬৯৮-খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে জিঞ্জী অধিকার করতে সক্ষম হয়। এই দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে মারাঠাদের

1. Ibid, P-222
2. Ibid, P-227

অনুপ্রেরণা ছিল এক মহতী উচ্চ আদর্শ। আর তা হল শুধু মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা নয়, দিল্লী অধিকার করে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। (The Maratha documents clearly state that the aim of this war was not only freedom of Maharasthra but "included even the conquest of Delhi, so as to make the whole subcontinent of India safe for the Hindu religion.)[1]

১৬৯০ সালের ২২ মার্চ রাজারাম দেশবাসীর উদ্দেশে এক আবেদনে বলেন :

কর্ণাটকে আসার পর ৪০,০০০ অশ্বারোহী ,১,২৫,০০০ পদাতিক সৈন্য সংগৃহীত হয়েছে। স্থানীয় যোদ্ধারা মারাঠার পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে....ধর্ম রক্ষার্থে চরম আত্মত্যাগের জন্য আপনারা প্রস্তুত হোন।.....ঔরঙ্গজেব ধর্মান্তরের হুমকি দিয়ে ঘোরতর অন্যায় করেছে। তিনি ইতিমধ্যেই অনেককে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছেন। আমাদের জাতির বিরুদ্ধে তাঁর আরও গভীর দুরভিসন্ধি রয়েছে, এ সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চয়ই সতর্ক। ....ভগবান আমাদের সহায়। জয় আমাদের নিশ্চিত। (We have enlisted on arrival in the Karnataka forty thousand cavalry and a lac and a quarter of infantry. The local Palegars and fighting elements are fast rallying to the Maratha standard....you must now put forth the sacrifice required on behalf of our religion. Aurangzeb has wronged you by threatening to convert you to his religion. He has already converted (names follow)....He also entertains further deep-rooted motives of a sinister nature against our nation, of which you must beware....God is helping us. We are sure to succeed.)[2] মারাঠাদের মধ্যে যে বৃহত্তর জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছে—এই জাতীয় দলিলে তাই প্রতিফলিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে ঔরঙ্গজেবকে যথার্থ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। "অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মারাঠারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গুজরাট, বাগলান (Baglan), গন্ধভান (Gondvan) ও কর্ণাটক অর্থাৎ খান্দেশ থেকে দঃ উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে মোগল সামরিক শিবিরগুলি বিধ্বস্ত করে। লুঠ করে তাদের কোষাগার ও রসদ ভাণ্ডার; আদায় করে প্রচুর অর্থ। (Many documents of this nature reflect the spirit of the people and there can not be any doubt that during the last one or two decades of the seventeenth

1. R. C. Majumder—The History and Culture of the Indian People (The Mughal Empire), P-367
2. Ibid, P-367-368

century Aurangzeb was faced with what may be truly described as a national war. Animated by a desire to avenge their wrongs, the Maratha bands spread over the vast territories from Khandesh to the south coast, over Gujrat, Baglan, Gondvan and the Karnatak, devastating Mughal stations, destroying their armies, exacting tribute, plundering Mughal treasures, animals and stocks of camp equipage.)[1]

উন্মুক্ত প্রান্তরে সম্মুখ যুদ্ধে মোগলের কাছে মারাঠা শক্তি পরাজিত হয়েছে; কিন্তু গেরিলা যুদ্ধে মোগল পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়েছে। ছত্রপতি শিবাজীর সময়ে এর প্রবর্তন —রাজারামের সময় এই রণকৌশল চরম সার্থকতা লাভ করে। প্রায় শতবর্ষ ধরে এই যুদ্ধ হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনে মারাঠাকে দিয়েছে নব নব সাফল্য। মারাঠা শক্তির মোকাবিলায় ব্যর্থ ঔরঙ্গজেব উদ্বিগ্ন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তারা যেন বাতাসের ন্যায় সর্বব্যাপী, অলীক-অদৃশ্য। দাঁড় দ্বারা বিভক্ত জলরাশি যেমন দাঁড় তুলে নিলে মুহূর্তে মিলিত হয় তেমনি মোগল সেনা চলে গেলে বিক্ষিপ্ত মারাঠা সৈন্যদল একত্র হয়ে পুনরায় শুরু করত আক্রমণ। (They seemed to be ubiquitous and illusive like the wind. When the attacking Mughal forces had gone back, the scattered Marathas, like water parted by the oar closed again and resumed their attack as before.)[2]

রাজারামের নতুন রাজধানী সাঁতরা। প্রতিভাবান কতিপয় নবীন সমর নায়কের নেতৃত্বে মারাঠা সেনার উপর্যুপরি আক্রমণে মোগল শিবিরে ত্রাহি ত্রাহি রব। ১৬৯৯ খ্রিঃ ২২শে ডিসে. রাজারাম এক পত্রে লিখেছেন ঃ সম্রাটের বিরুদ্ধে আমরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে আক্রমণ শুরু করেছি.....ভয়ংকর আক্রমণ চালিয়েছিলাম খোদ বাদশার শিবিরে; তাঁর কন্যা আমাদের বন্দী; লুণ্ঠিত তাদের বিশাল রসদভাণ্ডার। সাঁতারা দুর্গ আক্রমণ করার সাহস তাদের নেই। সম্রাট আর আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নন। ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই হবে তাঁর চূড়ান্ত পরাজয়। (In a letter dated 22 Dec.-1699. Rajaram writes : We have launched the full force of our armies against the Emperor....led a furious attack upon the imperial camp....captured the Emperor's own daughter; fell upon a convoy of ten thousand pack animals carrying supplies. ....The enemy has lost all courage, and can make no effect against fort Satara. We now take no account

1. Ibid, P-368
2. Ibid, P-369

of this powerful emperor whom, God willing, we shall soon put to rout.)[1] মৃত্যুর করালগ্রাস তাঁর স্বপ্নকে সার্থক হতে দেয়নি। মাত্র ৩০ বছর বয়সে ১৭০০ খ্রিঃ ২২ মার্চ তিনি পরলোক গমন করেন।

শম্ভুজীর পুত্র সাহু মোগল শিবিরে বন্দী থাকায় রাজারামের ৪ বঃ বয়স্ক নাবালক পুত্র ভারত গৌরব পিতামহ শিবাজীর নাম নিয়ে (তৃতীয় শিবাজী) সিংহাসনে আরোহণ করে। অভিভাবিকা মাতা তারাবাঈ। এই বীরাঙ্গনা নারীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। কাঁফী খাঁ ও অন্যান্য মুসলিম ঐতিহাসিকগণও তারা বাঈয়ের নেতৃসুলভ গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন। সকল মারাঠা সেনানায়কগণ তাঁর নেতৃত্বে নব উদ্যমে মোগল শিবিরে গেরিলা আক্রমণ শুরু করে। মোগলের বিরুদ্ধে মারাঠার সামরিক বিজয়ে তারাবাঈয়ের অবদান স্মরণীয়। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে মোগল-মারাঠা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

মারাঠা দমনে প্রায় সর্বশক্তি দিয়ে দীর্ঘকাল ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে অবস্থান মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক হয়েছে। তাঁর অনুপস্থিতিতে শিখ ও জাঠ শক্তি প্রবল হয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত মোগল অভিজাত শ্রেণী লিপ্ত হয় ষড়যন্ত্রে। চারিদিকে শত্রু। সম্রাট তাদের পরাস্ত করতে পারেন—কিন্তু পারেন না দমন করতে। ভেঙে পড়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসন। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক শাসকগণ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হন। দাক্ষিণাত্য অভিযানে মোগল সাম্রাজ্যের প্রভূত সামরিক ও আর্থিক ক্ষতি হয়। স্পেনের ক্ষত (যুদ্ধ) যেমন নেপোলিয়নের পতনের কারণ, তেমনি দক্ষিণের ক্ষত ঔরঙ্গজেবের পতনকে ত্বরান্বিত করে—The deccan ulcer ruined Aurangzeb. মোগল সাম্রাজ্যের পতন হলে এদেশে আবির্ভাব হয় ইংরেজের; মুসলিম শাসনের ঘটে অবসান।

শিখ-রাজপুত-মারাঠা শক্তির সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। সুবৃহৎ আয়তন ও অভ্যন্তরীণ কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ছিল অনিবার্য। সেক্ষেত্রে এদেশের বিভিন্ন অংশে শাসন করত হিন্দু ও মুসলিম শাসকগণ। তাদের মধ্যে চলত অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ। বিভক্ত দুর্বল দেশে পুনরায় হতে পারত বিদেশী আক্রমণ। এখানে স্মরণীয়, ১৭৬১ সালে আহম্মদ শা আবদালীর ভারত অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল উদীয়মান মারাঠা শক্তিকে খর্ব করে পতনোন্মুখ মোগল শক্তিকে সুদৃঢ় করা। তেমনি ইংরেজের অবর্তমানে বিভক্ত ভারতে মধ্য এশিয়ার মুসলিম শক্তির ভারত আক্রমণ ও ভারতে পুনরায় মুসলিম শাসনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না।

---

1. Ibid, P-369-370

পবিত্র কোরান

সুদূর অন্ধ অতীতের বিস্তৃত তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে বর্তমান যুগে আদিম নগ্ন হিংসা ও পাশবিক বর্বরতার এমন মহিমা প্রচার এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে তার নিঃশর্ত সর্বজনীন অনুমোদন বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের মধ্যে যেমনটি দেখা যায়, তা বিস্ময়কর ও বিরলদৃষ্ট। যুক্তি ও মানবতাবাদী মানুষের নিকট তা এক বিভীষিকাময় প্রহেলিকা। কিন্তু কি কারণ? এ তো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা ব্যক্তিবিশেষের বিকৃত খেয়াল মাত্র নয়। তবে কি কোন ঐশী প্রেরণা? পবিত্র কোরানে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

বলা হয়—সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরে আল্লার বাণী পৃথিবীতে তাঁর শেষ প্রতিনিধি মহম্মদের নিকট অবতীর্ণ হয়। কোরান হল সেই দিব্য-বাণীর সংকলন। কোরানে বলা হয়েছে—-ইসলাম হল একমাত্র সত্যধর্ম (অন্য সকল ধর্ম মিথ্যা?)। আল্লার কোন অংশীদার নেই। যারা আল্লা ও মহম্মদে বিশ্বাস করে না তারা হল অবিশ্বাসী, অংশীবাদী, কাফের ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী..। মুসলমান যথার্থই ধর্মনিষ্ঠ। কোরানে আল্লার নির্দেশ অলঙ্ঘনীয় এবং মুসলমানের পক্ষে অবশ্যই পালনীয়। তাই মুসলমানের সমগ্র জীবনই রাজনীতি, সমাজনীতি এমনকি দাম্পত্যজীবনও কোরানের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত। মুসলমানের যে সকল কাজ অমুসলমানের নিকট অনৈতিক, গর্হিত ও অমানবিক বলে বিবেচিত হয় তাও কোরান-অনুমোদিত।

আল্লাহ্ বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু; কিন্তু অবিশ্বাসী অ-মুসলমানদের প্রতি ভীষণ-ভয়ংকর। সারা পৃথিবীতে একমাত্র সত্যধর্ম ইসলামের অবিসংবাদী ও নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা তাঁর স্থির লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে মুসলমানদের প্রতি তাঁর কঠিন আদেশ—অবিশ্বাসী, সীমালঙ্ঘনকারী, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বিধর্মী কাফেরদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যেতে হবে অবিরাম যুদ্ধ। যুদ্ধ করেই বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আল্লাহ্‌র দীন ধর্ম; তাই একে বলা হয়—ধর্মযুদ্ধ (Holy war) আল্লাহ্‌র এ আদেশ পালনে পুরস্কার—লঙ্ঘন করলে আছে শাস্তির বিধান। ধর্মযোদ্ধা—মুজাহিদরা যুদ্ধে জয়ী অথবা নিহত হোক—আল্লাহ্ তাদের দেন মহাপুরস্কার। মৃত্যুর পর তাদের স্থান হবে জান্নাতে; আর বিধর্মী কাফেরদের পাঠাবেন নরকে। সেখানে তাদের খেতে দেওয়া হবে গরম পানি, পুঁজ-রক্ত; অনন্তকাল ধরে তাদের পোড়ানো হবে নরকের আগুনে। পবিত্র কোরানে আছে এরকম সহস্র দিব্য-বাণী প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়। পরপৃষ্ঠায় তার কয়েকটি মাত্র তুলে দেওয়া হল।

কোরানের বাণী

জেহাদ ও পুরস্কার

- অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁত পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা (অনুতাপ) করে, যথাযথ নামাজ পড়ে ও জাকাত দেয় (দান করে) তবে তাদের পথ দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সুরা-৯, আয়াত-৫)
- তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না (তাদের) ধর্মদ্রোহিতা দূর হয় এবং আল্লাহ্র দীন ধর্ম না প্রতিষ্ঠিত হয়। (২—১৯৩)
- বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং (আর) যারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় ধনপ্রাণ দ্বারা জেহাদ করে তারা সমান নয়।... যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর যারা জেহাদ করে তাদের আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (৪—৯৫)
- যারা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে না...এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিজিয়া* দেয়। (৯-২৯)
- হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসকে শ্রেয় জ্ঞান করে তবে ওদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদের অভিভাবক করে, তারাই অপরাধী। (৯-২৩)
- হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কি হল যে যখন আল্লাহ্র পথে তোমাদের অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ঘরমনা হয়ে গড়িমসি কর?...যদি তোমরা অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন...। (৯-৩৮, ৩৯)
- হে নবী! বিশ্বাসীদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল

---

* ইসলামি রাষ্ট্রে অ-মুসলমানদের নিরাপত্তার বিনিময়ে যে কর দিতে হয় তাকে জিজিয়া বলে।

থাকলে তারা দুশত জনের (অবিশ্বাসীর) উপর বিজয়ী হবে। এবং তাদের মধ্যে একশত জন থাকলে এক সহস্র অবিশ্বাসীর উপর বিজয়ী হবে। (৮-৬৫)

- তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দেবেন। ওদের লাঞ্ছিত করবেন। ওদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ী করবেন ও বিশ্বাসীদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন। ... আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (৯-১৪,১৫)
- অভিযানে বের হয়ে পড় লঘু রণসম্ভারে হোক, অথবা গুরু রণ সম্ভারে হোক এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম কর। (৯-৪১)
- তোমরা কি মনে কর তোমরা স্বর্গে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জেহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা না জানাচ্ছেন! (৩-১৪২)
- বস্তুত যে আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক্ তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করব। (৪-৭৪)
- যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তিনি কখনই তাদের কাজ বিনষ্ট হতে দেন না। ...তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা যত খুশি ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দেবে। তাদের পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরা, শুভ্র উজ্জ্বল পাত্রে। তাদের সঙ্গে থাকবে সুরক্ষিত ডিম্বের কুসুমের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ লজ্জা-নম্র-আয়তলোচন তন্বীগণ। (৪৭-৪-৬, ৩৮-৫১, ৩৭-৪৫-৪৯)
- যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করেছ, তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর ও আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়, অল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। (৮-৬৯)
- ওরা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদ আমি ধ্বংস করেছি এবং ওদের সাহায্য করার কেউ ছিল না। (৪৭-৬৩)

শাস্তি

- ফেরেশ্ তাদের বলা হবে "একত্র কর সীমালঙ্ঘনকারী ও ওদের সহচরদের এবং তাদের যাদের ওরা উপাসনা করত—আল্লাহ্র পরিবর্তে এবং ওদের জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর।" (৩৭—২২-২৩)
- ...ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। ...যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমণ্ডল উলটে-পালটে দগ্ধ করা হবে সেদিন ওরা বলবে "হায়! আমরা যদি আল্লাহ্ ও রসুলকে মান্য করতাম!" (৩৩—৬১, ৬৬)

- নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাদের উপর আল্লাহ্‌, ফেরেশ্‌তাগণ এবং সকল মানুষেরই অভিসম্পাত। তারা চিরকাল অভিসম্পাত পেতে থাকবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না। (২—১৬১-১৬২)
- (আল্লাহ্‌ ও তার রসুলে) যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব। এদের স্কন্ধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত করো। এদের জন্য রয়েছে নরক যন্ত্রণা। (৮—১২, ১৪)
- যারা আমার (কোরানের) আয়াতে অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই ওর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব—যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। (৪—৫৬)
- অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি—যাতে ওদের গায়ের চামড়া এবং উদরে যা আছে তা গলে যাবে। ওদের জন্য সেখানে থাকবে লৌহ মুদ্‌গর। যখনই ওরা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বেরুতে চাইবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে—বলা হবে —"আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা।" (২২—১৯-২২)
- তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরাই ওতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে। (২১—৯৮-৯৯)

সহবাস—তালাক

- তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শষ্যক্ষেত্র (স্বরূপ)। অতএব তোমরা তোমাদের শষ্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। (২-২২৩)
- রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। (২-১৮৭)
- দাসীগণের সঙ্গেও সহবাস বৈধ। (৪—২৪, ৩৩—৫০, ৭০—৩০)
- তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে—তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগিনী, ফুফু...ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমার অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের (কন্যাদের মাতার) সঙ্গে সহবাস না হয়ে থাকে তবে তাতে তোমাদের (বৈধভাবে সঙ্গত হওয়া) কোন দোষ নাই। (৪—২৩)

- অতঃপর উক্ত স্ত্রীকে যদি সে তালাক দেয় তবে যে পর্যন্ত না ওই স্ত্রী অন্য কোনও স্বামীকে বিবাহ্ করছে তার পক্ষে সে বৈধ নয়। (২—২৩০)
- হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীদের বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ মুখমণ্ডলের উপর টেনে দেয়। এতে এদের চেনা সহজ হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।* (৩৩—৫৯)

অন্যান্য

- তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহ্র রসুলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদের বিবাহ করা কখনও সঙ্গত নয়। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এ ঘোরতর অপরাধ। (৩৩-৫৩)
- ...এবং অংশীবাদী (বিধর্মী) রমণী যে পর্যন্ত না ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে তোমরা বিবাহ্ কর না। অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। ধর্মে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে তোমাদের কন্যার বিবাহ দিও না, অংশীবাদী পুরুষ তোমাদের চমৎকৃত করলেও ধর্মে (ইসলাম) বিশ্বাসী ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম। (২-২২১)
- হে বিশ্বাসীগণ! ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। (৫-৫১)

---

* আয়াতটি ইঙ্গিতবহ। শুধু বিধর্মী নারীদের লাঞ্ছনা করতে এই আয়াতটি মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করে। আল্লার কি পরম করুণা।

আধুনিক যুগে ইসলাম

ভাবতে হাজার বছরের মুসলিম রাজত্বের কল্পনাতীত পৈশাচিক বিভীষিকাময় রক্তাক্ত ইতিহাস কি শুধুমাত্র মধ্যযুগীয় বর্বরতার এক ব্যতিক্রমী অধ্যায় মাত্র? ইউরোপীয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণ ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা করে। অন্ধ বিশ্বাস নয়—যুক্তি, মুক্ত স্বাধীন চিন্তা ও মানবতাবাদ এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতে মুসলিম ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ইতিহাস; তা কি রেনেসাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল?

ধর্মযুদ্ধের হুঙ্কার দিয়েই মুসলমানের হিন্দুস্থান অভিযান। তারপর কম-বেশি হাজার বছরের ইসলামিক শাসন। জিহাদের উদ্দেশ্য হল সার্থক। হিন্দুস্তান হল দার-উল-ইসলাম। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে মুসলমানের ভাগ্যরবি হল অস্তমিত। এল ইংরেজ। হিন্দুস্থান আবার দার-উল-হারব। পুনরায় বেজে উঠল জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের রণদামামা।

সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট দ্বিমত রয়েছে। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের মতে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান হল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। মহাবিপ্লবী স্বনামধন্য বীর সাভারকর এই মতের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। অন্যমতে এই বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে ছিল সিপাহীদের বিদ্রোহ। তৎকালীন ইংরেজ সরকার ও অধিকাংশ ইংরেজ ঐতিহাসিক এই দ্বিতীয় মত পোষণ করেন। অবশ্য তাঁদের উদ্দেশ্য হল অভ্যুত্থানের গুরুত্বকে লঘু করে দেখানো। তবে ঘটনার বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়—জনসাধারণ ও দেশীয় রাজন্যবর্গ ব্যাপকভাবে এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেনি। বিদ্রোহ কয়েকটি অঞ্চলে এবং তাও প্রধানত সিপাহীদের একাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাহাদুর শাহ্‌কে সম্রাট ঘোষণা করায় শিখ ও রাজপুত শক্তি ঐতিহাসিক কারণেই বিদ্রোহে যোগদান করেনি —বরং ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করেছে। মারাঠারা অংশ নিয়েছে তবে স্বাধীনভাবে। বাহাদুর শাহ্‌কে তারা স্বীকার করেনি। কানপুরের সিপাহীরা মারাঠা নায়ক নানাসাহেবকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করে। নানা সাহেব সিপাহীদের দিল্লী পাঠাতে অসম্মত হন। সকল ঘোষণা তাঁর নামেই করা হত। তাদের মনে আশঙ্কা ছিল বাহাদুর শাহ্ সম্রাট হলে ভারতে আবার মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা হবে। এখন প্রশ্ন হল মুসলমান এই বিদ্রোহকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছিল। বস্তুত

তাঁদের নিকট এ ছিল ধর্মযুদ্ধ; অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ। আর তাঁদের বিচারে ইংরেজ ও হিন্দু উভয়েই কাফের। সেই সময়কার বিভিন্ন রচনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক জীবনলালের (Jiwanlal) ১৯ মে'র (১৮৫৭) দিনলিপির বিবরণ অনুযায়ী—

জুমা মসজিদে (দিল্লি) আজ ধর্মযুদ্ধের পতাকা উত্তোলিত হল।....

২০ মে। মহম্মদ সৈয়দ সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানালেন—হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত করার জন্যেই জেহাদের নিশান তোলা হয়েছে। (This day the standard of the Holy war was raised by the Mahommedans in the Jumma Masjid....

On May-20 he writes : "Mahommed Sayed demanded an audience and represented to the king that the standard of Holy war had been erected for the purpose of inflaming the minds of the Mahommedans against the Hindus).[1] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন—এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব কেবলমাত্র দিল্লিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সরকারী বিবরণ অনুযায়ী ৪ জুন বেনারসে বিদ্রোহের রাত্রে সংবাদ পাওয়া গেল যে একদল মুসলমান বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে (ইসলামের) সবুজ নিশান ওড়াতে সংকল্পবদ্ধ। ইংরেজ রাজকর্মচারী মিঃ লিণ্ড শহরের রাজপুতদের স্বধর্মের অপমান প্রতিরোধে আহ্বান জানান। তবেই মুসলমান নিবৃত্ত হয়। (But the communal spirit was not confined to Delhi. We learn from official report that on the night of mutiny (June-4) at Varanasi "news was received that some Mussulmans had determined to raise the Green Flag in the temple of Bishessur....Mr. Lind called on the Rajputs in the city to prevent the insult to their faith. So the Mussulmans retired peacefully.")[2]

এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে উত্তর প্রদেশের বহু শহরে ঘটেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ইসলামের সবুজ নিশান উড়েছে ও হিন্দু-মুসলমানে রক্তাক্ত সংগ্রাম হয়েছে সিরসা, বুদাউন, শাজাহানপুর, বেরিলি, বিজনোর, মোরাদাবাদ এবং অন্যান্য অনেক অঞ্চলে। এই সকল জায়গায় মুসলমান মুসলিম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবি করে। হিন্দুদের পুণ্য তীর্থক্ষেত্র হরিদ্বার ও কনখলে মুসলমান নির্মম অত্যাচার করে। (The communal hatred led to ugly communal riots in many parts of U.P. Green Flag

1. R. C. Majumder–History of the Freedom Movement In India, Vol-1, P-217
2. Ibid, P-217

was hoisted and bloody wars were fought between the Hindus and Muslims in sirsa, Budeon, Shahjahanpur, Bareilly, Moradabad and other places where the Muslims shouted for the revival of the Muslim kingdom. Two famous Hindu places of pilgrimage, Haridvar, and Kankhal were mercilessly sacked.)[1]

সিপাহী বিদ্রোহ কেবলমাত্র উঃ প্রদেশেই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডে মুসলিম দলপতিগণ—তাঁদের ঘোষণায় ধর্ম ও কোরানের নামে মুসলিম জনতার নিকট আবেদন জানিয়েছে। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে মৃত্যুর পরে বেহেস্তে গতি হবে। (It is a very significant fact that all the proclamations of the Muslim Chiefs in Avadh and Rohilkhand contain an appeal to the Muslims in the name of their religion and remind them on their faith in the Koran, that by fighting against the infidels, they would secure to themselves eternal bliss after death.)[2] ডঃ বি. আর. আম্বেদকরও একই অভিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, "জিজ্ঞাসু পাঠক যদি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এই বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে (অন্তত আংশিক) ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমানের জেহাদ। সৈয়দ আহ্‌মেদ যিনি বিগত কয়েক দশক প্রচার করেছেন যে ভারত ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় দার-উল-হারবে পরিণত হয়েছে এবং (ইংরেজের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহের মতবাদকে পোষণ করেছেন—১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ছিল তারই নব প্রকোপ। ভারতকে পুনরায় দার-উল-ইসলামে রুপান্তরিত করার লক্ষ্যে সিপাহী বিদ্রোহ মুসলমানের এক বলিষ্ঠ প্রয়াস। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল আফগানিস্থান কর্তৃক ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা। ব্রিটিশ-বিরোধী খিলাফত নেতৃত্বের প্ররোচনায় মুসলমানরাই ভারতকে মুক্ত করার জন্য আফগান সাহায্য প্রার্থনা করে।... মূল কথা হল—ভারত যদি সম্পূর্ণভাবে মুসলিম পদানত না হয় তবে দেশটি অবশ্যই দার-উল-হারব এবং সেক্ষেত্রে ইসলামিক অনুশাসন অনুযায়ী মুসলমান সঙ্গতভাবেই জেহাদ ঘোষণা করতে পারে।" (The curious may examine the history of the Mutiny of 1857 and if he does, he will find that, in part, at any rate, it was really a "Jihad" proclaimed by the Muslims against the British and that the

1 Ibid, P-217
2 Ibid, P-220-221

Mutiny so far as the Muslims were concerned was a recrudecsence of revolt which had been fostered by Sayyed Ahmad who preached to the Musalmans for several decades that owing to the occupation of India by the British the country had become a Dar-Ul-Harb. The Mutiny was an attempt by the Muslims to re-convert India into a Dar-Ul-Islam. A more recent instance was the invasion of India by Afganistan in 1919. It was engineered by the Musalmans of India who led by the Khilafatist's antipathy to the British Govt. sought the assistance of Afganistan to emancipate India....the fact remains that India, if not-exclusively under Muslim rule, it is a Dar-Ul-Harb and the Musalmans according to the tenets of Islam are justified in proclaiming a Jihad).[1]

প্রত্যাশিতভাবেই সিপাহী বিদ্রোহের আড়ালে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের বিরাট আয়োজন ব্যর্থ হয়। কিন্তু জেহাদের বিরাম নেই। এল ওয়াহবি আন্দোলন। যদিও সিপাহী বিদ্রোহের বহু পূর্বেই এই আন্দোলন শুরু হয়—তবে বিদ্রোহের পর তা তীব্রতর হয়।

মুসলিম ধর্মীয় আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ

ওয়াহবি আন্দোলন

রায় বেরিলির সৈয়দ আহ্‌মেদ (১৭৮৬-১৮৩১) ছিলেন এদেশে ওয়াহবি আন্দোলনের প্রবর্তক। তাঁর বক্তব্য ছিল ভারত হল দার-উল-হারব (শত্রুভূমি)। প্রতি মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য হল হিন্দুস্থানকে কাফেরদের শাসনমুক্ত করে দেশটিকে পুনরায় দার-উল-ইসলাম করা;অন্যথায় মুসলমানদের উচিত হবে কোন মুসলিম দেশে (দার-উল-ইসলাম) গিয়ে বাস করা। ধর্মযুদ্ধে সাহায্যের জন্য তিনি ভারত ও বিদেশী মুসলিম শক্তি'র নিকট আবেদন করেন। এদের মধ্যে হায়দ্রাবাদের নিজাম, হিরাটের প্রিন্স কামরান ও বুখারার আমীর নসরুল্লার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর ভারত ও হায়দ্রাবাদে তাঁর মতবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে। শুধু আন্দোলন নয়—তার সংগঠনও ছিল শক্তিশালী। তার নিযুক্ত খলিফাদের দায়িত্ব ছিল নিজ নিজ এলাকায় সংগঠনকে সম্প্রসারিত করা। ১৮৩১ সালে শিখদের সাথে যুদ্ধে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মীরাট, বেরিলি, দিল্লি, বাংলাদেশ ও বিহারের অনেক জায়গায় ওয়াহাবিদের

1.Dr. B. R. Ambedkar, Vol-8, P-295-296

শক্তিশালী সংগঠন ছিল। পাটনার খলিফা এনায়েৎ আলি ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মুসলিম যুবকদের পুরাদস্তুর সামরিক শিক্ষা দেওয়া হত। তাঁদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য জেহাদের মহিমা কীর্তন করে গাওয়া হত গান। (Regular military training was imparted to the recruits and songs were recited extolling the glory of Jihad).[1]

ওয়াহবি আন্দোলনকে দমন করতে ইংরেজ সরকারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। অনেকে এই আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দেন। কিন্তু কার স্বাধীনতা? বরেণ্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, "তা ছিল মুসলমানের দ্বারা মুসলমানের জন্য স্বাধীনতা। আন্দোলনের ভিত্তি ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক নয়। দেশপ্রেম নয় অনুপ্রেরণা ছিল সাম্প্রদায়িক। এই আন্দোলনকে ভারতের নয়—ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যেতে পারে। কিন্তু সে স্বাধীনতা সমগ্র দেশবাসীর নয়—শুধুমাত্র মুসলমানের।" (...it was a struggle for freedom of the Muslims, and by the Muslims. The basis of the movement was religious rather than political, and its inspiration came from communal and not patriotic sentiments. It may be called the first war of independence in India, but not of India independence of the Muslims in India, but not of the people of India.)[2] সঙ্গত কারণেই হিন্দুরা এই আন্দোলনে অংশ নেয়নি।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

বাংলাদেশেও ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে কতিপয় মুসলিম ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়। এঁরা সকলেই ছিলেন Pan-Islamic. তাঁরা ঘোষণা করলেন ইংরেজ শাসনাধীন বাংলা হল দার-উল-হারব। ইসলামিক রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য ইংরেজ ও হিন্দুর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা মুসলমানের পবিত্র কর্তব্য। এঁদের মধ্যে হাজী শরীয়ত উল্লার ফরাজি* ((Faraizi) আন্দোলন, মৈনুদ্দিন আহ্‌মেদ ওরফে দুঁদু মিয়াঁর খিলাফত সংগঠন ও মীর নিশার আলি ওরফে তিতুমীরের আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক K.K. Aziz-এর অভিমত হল— "এই সকল নেতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজের সংস্কার; হিন্দু জমিদারদের গোলামী হতে মুক্ত করে তাঁদের আর্থিক

---

* "ফর্জ" শব্দ থেকে ফরাজি আন্দোলনের উৎপত্তি। মুসলমানকে "ফর্জ" অর্থাৎ "প্রকৃত-কর্তব্যে" উদ্বুদ্ধ করার জন্য মক্কা থেকে নির্দেশিত ও শরীয়তউল্লা পরিচালিত আন্দোলনই ফরাজি (Faraizi) আন্দোলন।

---

1. R. C. Majumder—History of the Freedom Movement in India—Vol-1 P-248
2. Ibid P-252

উন্নতি বিধান এবং সকল শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ইসলাম-বিরোধী রীতি-নীতির দূরীকরণ। সর্বোপরি ইংরেজদের বিতাড়িত করে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা" (The principal goals of all these leaders were to effect reforms in the Muslim Community, to improve their economic position by releasing them from the slavery of the Hindu Land Lords, to eradicate unIslamic practices from the Muslims of all classes and to drive the British out of the territory so that Muslims could live in freedom in an independent state of their own.)[1] বাংলায় এই দার-উল-ইসলাম বা "পাকিস্তান" রাষ্ট্র গঠনে মুসলমান ইংরেজের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা তথা সমগ্র ভারতে দেখা দেয় ব্যাপক হিন্দু-জাগরণ। ইংরেজ প্রমাদ গুনল। লন্ডনে ইংরেজ রাজনীতিবিদরা মিলিত হলেন এক গোপন বৈঠকে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড হিউমও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হল যে নবজাগ্রত হিন্দু জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহা যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষুণ্ণ না করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনকে যদি সংস্কার আন্দোলনে পরিবর্তিত করা যায় তবে তাই হবে ইংরেজের পক্ষে সর্বাধিক নিরাপদ। তার জন্য চাই একটি রাজনৈতিক দল। প্রতিষ্ঠিত হল বিদেশী লর্ড হিউমের নেতৃত্বে কংগ্রেস দল। নামটিও নেওয়া হল বিদেশী ইংরেজী ভাষা থেকে।

লর্ড কার্জন তখন গভর্নর জেনারেল। তিনি বুঝতে পারলেন, দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হিন্দু শক্তিকে দমন করতে না পারলে ব্রিটেনের ভারত সাম্রাজ্য বিপন্ন হতে পারে। "শত্রুর শত্রু আমার মিত্র"—রাজনীতির এই ধ্রুব সত্যকে মেনে নিয়ে তিনি মুসলমানের পক্ষ নিলেন। তাঁদের দাবি মেনে নিয়ে তিনি ১৯০৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঘোষণা করেন বঙ্গ-বিভাগ।

এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদারের বিস্তারিত বিবরণ সংক্ষেপে নীচে উদ্ধৃত হল ঃ

"এই সময় হিন্দু ও কংগ্রেস বিদ্বেষী আলিগড়ের সুপ্রসিদ্ধ নেতা সৈয়দ আহ্‌মেদ* মুসলমান সম্প্রদায়কে হিন্দুর বিরোধী এবং ভিন্ন জাতিরূপে পরিচিত করিয়া সরকারি

---

* অবশ্য মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব বলেন ঃ তিনি ছিলেন "অসাধারণ প্রগতিশীল...এবং উনবিংশ শতাব্দীর এক অগ্রণী চিন্তানায়ক।" (He was a remarkably progressive man...among the 19th century Thinkers, he is perhaps, the boldest.)—The Statesman-8-11-1995.

সৈয়দ আহ্‌মেদ প্রতিষ্ঠিত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়—এদেশে "পাকিস্তান রাষ্ট্র" গড়ার কারখানা রূপে পরিচিত। বর্তমানে ইসলামি জেহাদী সংগঠন SIMI (Students Islamic Movement of India-র সৃষ্টি এই আলিগড় মুসলিম বিদ্যালয়ে।

---

1. K.K. Aziz—The Murder of History P-209-210

সাহায্যে স্বীয় সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য নানাভাবে সচেষ্ট ছিলেন এবং ইহাই ছিল তাহার শেষ জীবনের ব্রত। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা নগরীতে মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক সভা আহ্বান করেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং এই সভার মাধ্যমেই "মুসলিম লীগ" নামে কংগ্রেসের ন্যায়—কিন্তু, কেবল মুসলমান সদস্য লইয়া একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঢাকা শহরে ১৯০৬ খ্রিঃ ৩১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হইল"। "মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।"[1] বরেণ্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে—"এইভাবেই হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে হিংসা ও বিভেদের বীজ রোপিত হইল কালক্রমে তাহাই ৪০ বৎসর পরে মহামহীরূহে পরিণত হইয়া পাকিস্তান সৃষ্টি করিল।

এই বিরোধাত্মক মনোবৃত্তি গভর্ণমেন্টের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল হওয়ায় অচিরাৎ ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক কলহ ও মারামারি আরম্ভ হইল এবং সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদন ও সহানুভূতি লাভ করিল। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ তীব্র হইয়া উঠিল, নানাস্থানে মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করিল। জামাল পুর ও কুমিল্লায় যেভাবে হিন্দুর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত ও হিন্দু নর-নারীর প্রতি অত্যাচার অবাধে কয়েকদিন যাবৎ চলিয়াছিল তাহা যে-কোন গভর্নমেন্টের পক্ষে চরম কলঙ্কের কাহিনী। ১৯০৭ খ্রিঃ ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্ (মুসলিম লীগ নেতা) কুমিল্লায় গেলেন। ইহার পরে মুসলমানরা চারিদিন যাবৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের দোকান লুঠ, বাড়িঘর পোড়াইয়া দেওয়া, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রহার ও নানাবিধ অত্যাচার চালাইতে লাগিল, পুলিশ কিছুমাত্র বাধা দিল না।...হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করার জন্য মুদ্রিত ইস্তাহার বিলি করা হইল...তাহার মধ্যে "লাল ইস্তাহার" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"হে মুসলমানগণ! জাগরিত হও। তহবিল সংগ্রহ কর।...তোমাদের জ্ঞান নাই, যদি জ্ঞান লাভ করিতে পার, তবে একদিনেই হিন্দুকে জাহান্নামে পাঠাইতে পারি...।"[2]

বাংলা ভাগ হলে পূর্ব বাংলা হবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ—অর্থাৎ দার-উল-ইসলাম বা পাকিস্তান। মুসলমান তাই প্রকাশ্যে ও সক্রিয়ভাবে বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করে।

কেরালার জনৈক মার্কসবাদী সাংসদের বিশেষ উদ্যোগে এবং পঃ বঙ্গের মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রের কংগ্রেসী অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জির সক্রিয় সহযোগিতায় এ রাজ্যের মুসলিম প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলায় এই আলিগড় মুসলিম বিদ্যালয়ের একটি ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

1. Azad—India wins Freedom, P-117
2. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস—৪ খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৪

পাকিস্তানি ঐতিহাসিক K. K. Aziz ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেন—প্রধানত বাঙালি মুসলমানদের উদ্যোগেই ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় সারা ভারত মুসলিম লীগ। ১৯০৫-১৯১১ সাল—এই ছ'বছর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু ও কংগ্রেসের প্রবল বিক্ষোভ আন্দোলন বাংলার মুসলমান মোকাবিলা করেছে। সিমলায় প্রতিনিধিদল প্রেরণ ও মুসলিম লীগের উত্থানের উত্তেজনাপূর্ণ বছরগুলিতে যে বিষয়টি বাংলার মুসলমানদের হৃদয়কে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে তা হল বঙ্গ-বিভাগ। বাংলা ভাগ করে (পূর্ব বাংলায়) একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে যে তীব্র আন্দোলন হয় তার প্রতি কংগ্রেসের ছিল পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ সমর্থন। সুতরাং বঙ্গ-বিভাগের বিষয়টি প্রাদেশিকতার সীমা অতিক্রম করে সর্বভারতীয় স্তরে উন্নীত হয় যা মুসলমানকে গভীর আবেগে উত্তেজতি করে এবং সংঘটিত হয় উপর্যুপরি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। (It was mainly on the initiative of Bengali leaders that the All India Muslim League was established in Dacca in Dec. 1906. Between 1905 and 1911 the Bengali Muslims faced the Hindu and Congress agitation and anger because of the partition of Bengal....During the hectic years of the Simla deputation and the emergence of AIML the most important issue which touched the heart and life of every Bengali Muslim was the partition of Bengal. It was by no means a provincial matter. The Hindu agitation against the splitting up of Bengal and the creation of a new Muslim –majority province had the solid backing of the Congress. This raised the controversy to an all India level where it stirred deep passions and led to frequent and bloody Hindu-Muslim riots.)[1]

সমগ্র জাতি যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল তখন মুসলমান শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল না—সে ছিল ইংরেজের সহযোগী। এমনকি পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের জন্যও তাকে কার্যত কোন আন্দোলন করতে হয়নি। কংগ্রেসের কল্পনা-বিলাসী সর্বোচ্চ নেতৃত্বের একাধিক পর্বতপ্রমাণ আত্মঘাতী ভ্রান্ত পদক্ষেপ ভারত-বিভাগ অনিবার্য করে তুলেছিল। ইংরেজ উপলক্ষ মাত্র। যদিও মুসলমান দাবি করে যে তারা তাদের স্বাধীনতার (পাকিস্তান) জন্য প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করেছে। ঐতিহাসিক K. K. Aziz-এর মতে এ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। "প্রকৃত ঘটনা হল ১৮৫৮-১৮৬৯ ও ১৯২০-

1. K. K. Aziz—The Murder of History, P-211, 216

২২ সালের (খিলাফত আন্দোলন) কয়েক বছর ব্যতীত ১৮৫৭-১৯৪৭ পর্যন্ত মুসলমান স্বাধীনতার জন্য কোন দুঃখকষ্ট বরণ করেনি। একথা অনেকেই ভুলে যান যে মুসলিম লীগের আন্দোলন প্রথমে ছিল সংরক্ষণ ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধে এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য; এবং এ আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক। আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কোন মুসলিম লীগ নেতা কারাবরণ করেনি; মুসলিম জনতাকে ইংরেজ পুলিশের গুলি খেতে হয়নি। (The fact is that, apart from the brief years of 1858-1860 and 1920-22, Muslims suffered little hardship between 1857 to 1947. It is forgotten by everyone that Muslim League's search for protection and safe-guards (in the early years) and its struggle for an independent country (in the later years) were strictly constitutional efforts....No Muslim League leaders languished in prisons. No Muslim masses faced British Bullets.)[1]

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনের জন্য মুসলমান ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করলেও হিন্দুর বিরুদ্ধে সে অবিরাম লড়াই চালিয়ে গেছে। হাজার বছর ধরে নির্বিচারে গণহত্যা ও বলপূর্বক ব্যাপক ধর্মান্তর করেও মুসলমান দেশের জনসংখ্যার মাত্র এক-চতুর্থাংশ। রাষ্ট্রশক্তি তাঁর হাতছাড়া। পারস্য বা আফগানিস্তান থেকেও লক্ষ সৈন্য নিয়ে কোন মামুদ, তৈমুর বা নাদির শার ভারত অভিযানের সম্ভাবনা নেই। এই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পূর্বপুরুষদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার সংকল্প নিয়ে সে রাজনীতিতে সশস্ত্র দুর্বৃত্তায়নের পথ বেছে নিল। এক কথায় একে বলা যায় হিন্দুবিরোধী দাঙ্গা; হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও ধর্মান্তর। ১৯০৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হল। ওই দিন মুসলমান সারা বাংলায় ভয়াবহ তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল। সেদিন দাঙ্গার মাধ্যমেই মুসলমান আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের (পাকিস্তান) দাবি পেশ করে। তারপর দেশব্যাপী দাঙ্গা বাধিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট লাভ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র। মধ্যবর্তী কয়েক বছরের ইতিহাস সর্ব অর্থেই দাঙ্গার ইতিহাস। মুসলমানের এই নতুন রণকৌশলকে ডঃ বি. আর. আম্বেদকর খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেনঃ নিতান্ত সাধারণ পর্যবেক্ষকের নিকটও একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ভাব রয়েছে। হিন্দুর এই মনোভাব সাম্প্রতিক কিন্তু মুসলমানের ক্ষেত্রে তা হল জন্মগত—জাতীয়

---

1 K. K. Aziz—The Murder of History P-197

ও সুপ্রাচীন। বর্তমানে যা অবস্থা তাতে এই আগ্রাসী মনোভাব প্রদর্শনে মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা অনেক এগিয়ে। মুসলমানের এই আগ্রাসী রাজনীতির তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

(ক) তাদের দাবি-সনদের আয়তন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এর সূত্রপাত হয় ১৮৯২ সালে। ....১৯২৭ সালে শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে সাইমন কমিশন গঠিত হয়। অনতিবিলম্বে সকল মুসলিম সংগঠন যৌথভাবে একগুচ্ছ দাবি পেশ করে। ইতিহাসে ইহাই জিন্নার ১৪-দফা দাবি নামে পরিচিত। ১৯৩৮ সালে তাঁরা নতুন এক প্রস্থ দাবি করে। পরের বছরই মুসলমানদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ দাবি জানায়। মুসলমানরা এখন হিটলারের ভাষায় কথা বলা শুরু করেছে। উর্দুকে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতির দাবিও অতিরঞ্জিত। উর্দু সারা ভারত কেন সকল মুসলমানেরও ভাষা নয়। ৬ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে মাত্র ২ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান উর্দুভাষায় কথা বলে। সুতরাং উর্দুকে জাতীয় ভাষা রূপে স্বীকৃতি দাবির অর্থ হল ৩২ কোটি ২০ লক্ষ ভারতীয়ের উপর ২ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমানের ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া। (Even a superficial observer cannot fail to notice that a spirit of aggression underlies the Hindu attitude towards the Muslim and the Muslim attitude towards the Hindu. The Hindu's spirit of aggression is a new phase which he has just begun to cultivate. The Muslim's spirit of aggression is his native endowment and is ancient as compared with that of the Hindu....But as matters stand today, the Muslim in this exhibition of the spirit of aggression leaves the Hindu far behind....Three things are noticeable about this political aggression of the Muslims.

First is the ever-growing catalogue of the Muslim's political demands. Their origin goes back to the year 1892....In 1927 the British Govt. announced the appcintment of the Simon Commission to examine the working of the Indian constitution and to suggest further reforms. Immediately the Muslims came forward with further political demands. These demands were put forth from various Muslim platforms..... The demands are known as Jinnah's 14 points....A further list of new demands for safeguarding the Muslim position seems to be ready....within one year, that is between 1938 and 1939, one more demand namely 50 percent share in everything has been added to it....The Muslims are now speaking the language of

Hitler.....Their claim for the recognition of Urdu as the national language of India is equally extravagant. Urdu is not only not spoken all over India but is not even the language of all the Muslims of India. Of the 68 millions of Muslims only 28 millions speak Urdu. The proposal of making Urdu the national language means that the language of 28 millions of Muslims is to be imposed....upon 322 millions of Indians).[1]*

(খ) দ্বিতীয়ত মুসলমানদের নীতিই হল নিজ স্বার্থের জন্য হিন্দুদের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া। হিন্দু কোন বিষয়ে আপত্তি করলে মুসলমান নাছোড়বান্দা। হিন্দু যদি বিনিময়ে অন্য কোন সুবিধা দিতে সম্মত হয়—কেবল তখনই মুসলমান তাঁর (অন্যায্য) দাবি ত্যাগ করে।

উদাহরণ স্বরূপ গো-হত্যা করা এবং মসজিদের সামনে সংগীত নিষিদ্ধ করার জন্য মুসলমানের অনড় দাবির উল্লেখ করা যায়। ইসলামি আইনে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গো-হত্যা করার কোন বিধান নেই। কোন মুসলমান হজে গিয়ে মক্কা-মদিনায় গো-হত্যা করে না। কিন্তু এদেশে (ধর্মীয় অনুষ্ঠানে) অন্য কোন জীব উৎসর্গে তারা সম্মত নয়। কোন মুসলিম দেশেই মসজিদের সামনে সংগীতে কোন বাধা নেই। এমনকি আফগানিস্তান—যে দেশটি ধর্মনিরপেক্ষ নয়—সেখানেও মসজিদের সামনে সঙ্গীত নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু ভারতে মসজিদের সামনে সংগীতে মুসলমানের প্রবল আপত্তি। কারণ একটাই যেহেতু এ দাবি হিন্দুর। (The second thing that is noticeable among the Muslims is the spirit of exploiting the weaknesses of the Hindus. If the Hindus object to anything, the Muslim policy seems to be to insist upon it

* দেশভাগের পর উর্দু এখন ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃত। যদিও ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের অল্পসংখ্যকই এই ভাষায় কথা বলে। তবে উর্দুর প্রতি এই প্রবল আকর্ষণ কেন? একি মুসলমানের হৃদয়ের ভাষা? এই উর্দুভাষাই কি ইসলামের সঙ্গে তাদের প্রধান যোগসূত্র? এই ভাষার মাধ্যমেই কি তারা স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের (পাকিস্তান) কল্পনা করে? হয়তো তাই। পাকিস্তানে পাঠ্যপুস্তকে এই তত্ত্ব প্রচার করা হয় যে, "উর্দু ভাষার বিলুপ্তির অর্থ সমগ্র মুসলিম জাতির বিলুপ্তি, ভারতীয় মুসলমানরা এ সত্য ভালভাবেই উপলব্ধি করেছে। তাই তাঁদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল উর্দু ভাষার সংরক্ষণ; এই ভাবেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য দাবি উত্থাপিত হয়।" (...the elimination of Urdu was tantamount to the elimination of the entire [Muslim] nation, and the Indian Muslims realized this very well. Therefore, one of their primary objectives was the protection of urdu ; in this way, the creation of Pakistan emerged as their demand.)[2]

1. Dr B. R. Ambedkar—Writings & Speeches, Vol-8, P-249-264
2. K. K. Aziz—The Murder of History, P-102-103

and give it up only when the Hindus show themselves ready to offer a price for it by giving the Muslims some other concessions....illustration of this spirit of exploition is furnished by the Muslim insistence upon cow-slaughter and the stoppage of music before mosques. Islamic law does not insist upon the slaughter of the cow for sacrificial purposes and no Musalman, when he goes to Haj, sacrifices the cow in Mecca or Medina. But in India they will not be content with the sacrifice of any other animal. Music may be played before a mosque in al Muslim countries without any objection. Even in Afganistan, which is not a secularized country, no objection is taken to music before a mosque. But in India the Musalmans must insist upon its stoppage for no other reason except that the Hindus claim a right to it.)[1]

তৃতীয় লক্ষণীয় জিনিস হল রাজনীতিতে মুসলমানের সশস্ত্র দুর্বৃত্তায়নের পথগ্রহণ। উপর্যুপরি হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা প্রমাণ করে যে সশস্ত্র দুর্বৃত্তায়ন (gangsterism) তাদের রাজনৈতিক রণকৌশলের মূল ভিত্তি ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। তারা সচেতন ও সুপরিকল্পিত ভাবেই চেকদের বিরুদ্ধে সাডেটান জার্মানদের অনুসৃত পথ গ্রহণ করেছে। এতদিন পর্যন্ত মুসলমান ছিল আগ্রাসী—হিন্দু শান্ত, নিরীহ; দাঙ্গায় সব সময়েই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু সে অবস্থা আর নেই। হিন্দুও প্রতিশোধ নিতে শিখেছে। (The third thing that is noticeable is the adoption by the Muslims of the gangster's method in politics. The riots are a sufficient indication that gangsterism has become a settled part of their strategy in politics. They seem to be consciously and deliberately imitaing the Sudetan Germans in the means employed by them against the Czechs. So long as the Muslims were the aggressors, the Hindus were passive, and in the conflict they suffered more than the Muslims did, But this is no longer true.)[2]

হিন্দু শান্ত নিরীহ। তাই সে মুসলমানের কাছে একতরফা মার খেয়েছে। এখন আর তা সত্য নয়—অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ডঃ আম্বেদকরের এ অভিমত আংশিক

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches Vol-8, P-268-269
2. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and speeches—Vol-8 P-269

সত্য। কিন্তু জলবায়ু, পরিবেশ ও হিন্দু ধর্মের উদার বিশ্বজনীন পরমতসহিষ্ণু শিক্ষায়—হিন্দু চরিত্র ও প্রকৃতিতে মুসলমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। Theodore Morison-এর মতে ভারতের জাতিসমূহের মধ্যে মুসলমান সর্বাপেক্ষা আক্রমণাত্মক, দুর্দান্ত ও হিংস্র প্রকৃতির। পক্ষান্তরে হিন্দু স্বভাবে শান্ত, দয়ালু ও মানবতাবাদী। সকল মানুষকে সে মনে করে "অমৃতের সন্তান"। সে বিশ্বাস করে 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"। হিংসা বিদ্বেষ তাই হিন্দুর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। অবশ্য অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন সংগ্রামে এ মনোভাব কাপুরুষতা বলে গণ্য হতে পারে। এই প্রসঙ্গে ১৯২৪ সালে Young India-তে এক প্রবন্ধে গান্ধীর মন্তব্য ঃ "আমার নিজের অভিজ্ঞতা প্রচলিত মতকেই সমর্থন করে যে, মুসলমান স্বভাবতই দুর্দান্ত ও হিংস্র প্রকৃতির—আর হিন্দু হল কাপুরুষ।" (...My own experience but confirms the opinion that the Musalman as a rule is a bully, and the Hindu as a rule is a coward)[1] ১৯২১ সালের খিলাফত দাঙ্গা থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দাঙ্গা হয় সারা ভারতে—বিরামবিহীন (স্বাধীন ভারতেও অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি)। সেই দাঙ্গার ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই গান্ধীর অভিমতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। অবশ্য ভারতে অনুষ্ঠিত দাঙ্গাকে প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত হিন্দু-নিধন। কারণ দাঙ্গা বলতে বোঝায় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘাত। ভারতে যা হয়েছে তা একতরফা। দু-একটি ঘটনায় হিন্দু প্রতিরোধ করেছে মাত্র।

খিলাফৎ আন্দোলন

সুলতান আবদুল মজিদ। ইউরোপ-এশিয়ার এক বিরাট ভূ-খণ্ড ব্যাপী বিস্তৃত বিশাল অটোমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তিনি আবার মুসলিম জগতের ধর্মগুরু। যদিও তাঁর সাম্রাজ্যের বাইরে অন্যান্য দেশের মুসলমান তাঁকে সে স্বীকৃতি দেয়নি, কিন্তু ভারতের মুসলমানের নিকট বিষয়টির স্বতন্ত্র তাৎপর্য ছিল। ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী কোন দেশ যদি সম্পূর্ণ ভাবে মুসলিম শাসনাধীন না হয় তবে সে দেশ হল দার-উল-হারব (Dar-ul-Harb—Abode of war—শত্রুভূমি)। মুসলমানের কর্তব্য হবে দেশটিকে দার-উল-ইসলামে (Das-ul-Islam—Abode of peace—শান্তি ভূমি) পরিণত করা। কারণ অ-মুসলমান দেশে বাস করা মুসলমানের পক্ষে ইসলাম-বিরোধী। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলামের এই বিধান মেনেই ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে প্রায় ১৮০০০ মুসলমান দার-উল-ইসলাম আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বহু ক্লেশ-কষ্ট স্বীকার করে আফগান সীমান্তে উপস্থিত হয়ে দেখল—সীমান্ত বন্ধ। আফগানিস্তানে প্রবেশের জন্য পীড়াপিড়ি করলে আফগান সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে

1. H. V. Seshadri—The Tragic Story of Partition, P-83

অনেক মুসলমান হতাহত হয়। ব্যর্থ হয়ে দেশত্যাগী মুসলমানেরা ফিরে আসে ভারতে। ইংরেজ শাসিত ভারত দার-উল-হারব। মুসলমান উভয় সঙ্কটে। সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তারা বার করে এক অভিনব পন্থা। তুরস্কের সুলতানকে মেনে নেয় ধর্মগুরু ও সার্বভৌম সম্রাটরূপে। দার-উল-হারব ভারতে বাস করলেও সে মনকে প্রবোধ দিতে পারবে এই বলে যে, "আমার সার্বভৌম সম্রাট হলেন তুরস্কের সম্রাট। আমার আনুগত্য তাঁর প্রতি"। মুসলিম ঐতিহাসিক I.H.Qureshi মুসলমানের এই ধর্মীয় রাজনৈতিক অবস্থানের সমর্থনে বলেন—"ভারতের মুসলমান তার স্বাধীনতা হারিয়েছে। তাই সঙ্গত কারণেই তুরস্কের সুলতানের প্রতি তার প্রবল মানসিক সংহতি ও আনুগত্য থাকতে পারে; যাকে সে আক্ষরিক বা ধর্মীয় অর্থে হলেও সার্বভৌম সম্রাট বলে স্বীকার করে। বস্তুত প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই মসজিদে শুক্রবার নামাজের পর তাঁর নামে খুৎবা (Khutbah) পাঠ হত ("But now that the Indian Muslims had lost their liberty, they had reason to feel a strong emotional attachment to a Caliph whom they could claim as their own sovereign, even though only in a nominal and religious sense. Indeed, before the first world war, Prayers for the Turkish Sultan had already come to be included in the Friday Khutbah (sermon) in the mosques of India")[1]

প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক ছিল জার্মানীর মিত্র। যুদ্ধের পূর্বে ইংলন্ড-ফ্রান্স মিত্রশক্তি ইউরোপ-এশিয়ার পরাধীন দেশসমূহকে আশ্বাস দিয়েছিল যে যুদ্ধের পর তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। যুদ্ধে মিত্রশক্তির নিকট জার্মানীর পরাজয় হয়। পরাজিত হয় তুরস্ক। ভেঙে যায় তাঁর বিশাল অটোমান সাম্রাজ্য। গঠিত হল তুরস্কের অধীনতামুক্ত নতুন স্বাধীন সার্বভৌম আরব রাষ্ট্র—জর্ডান, সিরিয়া, ইরাক, সৌদি আরব, লেবানন প্রভৃতি। এই ঘটনায় এদেশের মুসলমান ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়। যদিও অন্যান্য মুসলিম দেশে ঘটনার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। পরাজিত তুরস্কের প্রতি মিত্রশক্তি যে অন্যায় শর্তাবলী আরোপ করে, ভারতের মুসলমান তাকে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল বলে মনে করে। তারা তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে এক প্রবল গণ-আন্দোলন। ইতিহাসে ইহাই খিলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত।

খিলাফৎ ও গান্ধী

দঃ আফ্রিকা থেকে ভারতে এসেই গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ৬-মাসের মধ্যে ভারতকে "স্বরাজ" (Homerule) উপহার দিতে পারেন। চমকে উঠেছিলেন

1. R. C. Majumder—History of the Freedom Movement in India, Vol-III, P-51

সকলে। তবে হ্যাঁ, একটি শর্ত আছে। আর তা হল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। খিলাফৎ আন্দোলন তাকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের সেতুবন্ধন তৈরির সুযোগ এনে দিল। গান্ধী Young India পত্রিকায় (24-5-19) লিখলেন—"খিলাফৎ কোন ব্যক্তির বিষয় নয়। এটি একটি আদর্শ—যা একই সঙ্গে জাগতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক। যদি তুর্কীরা আত্মরক্ষা করতে না পারে—যদি বিশ্বের মুসলমান সংগঠিত জনমত ও সক্রিয় সহানুভূতি নিয়ে তুরস্কের পাশে না দাঁড়াতে পারে তবে উভয়েরই (তুরস্ক ও মুসলমান) অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তা হবে বিশ্বের পক্ষে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। কারণ আমি বিশ্বাস করি জগতে যেমন খ্রিস্ট-ধর্মের প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের। বীর ধর্ম, শৌর্য ও সৌজন্য দাবি করে—তুর্কীদের এই চরম দুঃসময়ে সাহায্য করা উচিত। ("The Khilafat agitation does not centre round an individual but round an idea, which is at once temporal, spititual and political. If the Turks cannot defend, if the Mussalmans of the world do not by their power of opinion and active sympathy stand by the Turks, both, they and the Turks will suffer irretrievably, such an event will be a calamity for the world, for I believe that Islam has its place in the world, as much as christianity and every other religion. Chivarly demands the support for the Turks in the hour of their need")[1] গান্ধীর মতে খিলাফৎ আন্দোলন একটি আদর্শ। কিন্তু কি সে আদর্শ? স্বাধীনতা অথবা সাম্রাজ্যবাদ? তুরস্কের সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে; পরাধীন দেশগুলি পেয়েছে স্বাধীনতা। তবে তা বিশ্বের পক্ষে বিপর্যয়কর কেন হবে—তা বোধগম্য নয়। গান্ধীজী হিন্দুদের উদ্দেশে বলেছেন, "খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দু-মুসলিম মিলনের একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে; যা জীবনে একবারই আসে। হিন্দু যদি মুসলমানের চিরন্তন মিত্রতা কামনা করে, তবে ইসলামের সম্মান রক্ষায় তাঁদের সর্বস্ব বিসর্জন দিতে হবে। (The Khilafat question gave the two communities the opportunity of a life time to unite. If the Hindus wish to cultivate eternal friendship with Mussalmans, they must perish with them in the attempt to vindicate the honour of Islam.)[2] পরাজিত তুরস্ক তার সাম্রাজ্য হারিয়েছে। নিপীড়িত পদানত দেশগুলি পেয়েছে স্বাধীনতা। এর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক কি? কিভাবে হল তার অমর্যাদা? এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। কারণ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য তিনি

1 Quoted from H.V. Seshadri—The Tragic Story of Partition, P-63
2 Ibid, P-63

সর্বস্ব পণ করেছেন। নিঃসন্দেহে মহৎ আদর্শ। কিন্তু তা কি বাস্তবতাবর্জিত হবে? তাই ডঃ আম্বেদকরের বিস্মিত প্রশ্ন ঃ কোথায় ঐক্য? তা কি কখনও সম্ভব? ভারতে মুসলিম আক্রমণ ও তার ফলাফল সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ মুসলিম আক্রমণের উদ্দেশ্য শুধু রাজ্যজয় ও লুণ্ঠন ছিল না, হিন্দু ধর্ম ও পৌত্তলিকতাকে নির্মূল করে ভারতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ছিল এই অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য। (These Muslim invasions were not undertaken merely out of lust for loot or conquest....But, there is no doubt that striking a blow at the idolatry and polytheism of Hindus and establishing Islam in India was alos one of the aims of this expedition.)[1]

মুসলমান ভারতে জয় করেছে। হাজার বছর এদেশ শাসন করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করেছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ? হিন্দু মনে মুসলিম শাসনের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে? ডঃ আম্বেদকরের বিশ্লেষণে আক্রমণকারীরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তার পরিণাম খারাপ হয়েছে। একটি হল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক। এই বিদ্বেষ ও তিক্ততা এত গভীর যে শত বছরের (ইংরেজ শাসনে) রাজনৈতিক ঐক্যেও তা প্রশমিত হয়নি। হিন্দু তা বিস্মৃত হয়নি। এই আক্রমণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল মন্দির ধ্বংস, বলপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তর, লুণ্ঠন, হত্যা, দাসত্ব ও নর-নারী শিশু নির্বিশেষে সকলের চরম অমর্যাদা। সুতরাং বিস্ময়ের কারণ আছে কি সেই গৌরবময় স্মৃতিচারণ মুসলমানের নিকট পরম গৌরবের আর হিন্দুর চরম লজ্জার? (The methods adopted by the invaders have left behind them their aftermath. One aftermath is the bitterness between the Hindus and the Muslims which they have caused. This bitterness between the two is so deep-seated that a century of political life has neither succeeded in assuaging it nor in making people forget it. As the invasions were accompained with destruction of temples and forced conversions, with spoliation of property, with slaughter, enslavement and abasement of men, women and children, what wonder if the memory of these invasions has ever remained green, as a source of pride to the Muslims and as a source of shame to the Hindus?)[2]

---

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and speeches, Vol-8, P-55
2. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-64

এই পটভূমিকায় খিলাফৎকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য গান্ধীর মরিয়া প্রয়াস অভিনব সন্দেহ নাই। খিলাফৎ মুসলমানের আন্দোলন। Pan-Islam* আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের সমর্থক ও মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা গান্ধীর বিশেষ প্রীতিভাজন অনুজপ্রতিম মহম্মদ আলি—সৌকত আলি ছিলেন খিলাফত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ। তাঁদের প্রধান সহায় ছিলেন গান্ধী। বস্তুত গান্ধী ছিলেন খিলাফতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্ট। আন্দোলনের রূপরেখা তারই তৈরি। তিনি ভাইসরয়কে এক পত্রে লেখেন—মুসলিম দেশগুলির অধিকার, মুসলমানের আবেগ-অনুভূতির যথার্থ বিবেচনা ও ভারতের দাবি—স্বরাজের (Home Rule) সন্তোষজনক সমাধানের উপর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল (In the most scrupulous regard for the rights of those (Mohammedan) states and for the Muslim sentiment as to their places of worship and your just and timely treatment of India's claim to Home Rule lies the safety of the Empire.)[1] মুসলিম দেশগুলির অধিকার ও স্বার্থের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা বা স্বরাজের সম্পর্ক কি?

১৯১৯ সালের ২৭ অক্টোবর। সারা ভারতে পালিত হয় খিলাফৎ দিবস। ২৩ নভেম্বর (১৯১৯) দিল্লীতে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির প্রথম সম্মেলনে গান্ধী সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সম্মেলন থেকে মুসলমানের প্রতি আহ্বান জানানো হয়; যদি তুরস্ক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান না হয় তবে তারা যেন বিজয়োৎসবের (প্রথম মহাযুদ্ধে জয়) সকল সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পথ গ্রহণ করে। মুসলিম লীগের কলকাতা সম্মেলনে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। (When the All India Khilafat Conference met at Delhi on Nov-23, 1919 Gandhi was elected its president. The Conference asked the Mussalmans not to join the public celebrations for victory, and held out threats of boycott and non-co-operation if the British did not solve the problem of Turkey in a manner satisfactory to the Muslims. This decision was re-affirmed by the Muslim League in Calcutta.)[2] মুসলমান খিলাফৎ আন্দোলনে হিন্দুদের

* Pan-Islam বা বিশ্ব ইসলামিক তন্ত্রের মূল তত্ত্ব হল দেশ-কাল নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মুসলমানের ইতিহাস, ধর্ম, সভ্যতা ও কৃষ্টি এক ও অভিন্ন। তাই জাতি হল মুসলমান। অর্থাৎ মুসলমান (যে দেশেরই অধিবাসী হোক না কেন) একটি স্বতন্ত্র জাতি। তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক। আর তা হল বিশ্ব-ব্যাপী দার-উল-ইসলামের (মুসলমান বা ইসলামের শাসন) প্রতিষ্ঠা। কোন দেশ বা রাষ্ট্র নয়, অ-মুসলমান দেশের মুসলমানের আনুগত্য Pan-Islam (মুসলিম দেশসমূহ) অর্থাৎ বিশ্ব ইসলামিক তন্ত্রের প্রতি।

1 R. C. Majumder—History Of the Freedom Movement in India, Vol-III, P-46
2 Ibid, P-46-47

সমর্থন চেয়েছিল। কিন্তু হিন্দুরা ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। ডঃ আম্বেদকর বলেন মিঃ গান্ধীই একমাত্র হিন্দু যিনি মুসলমানের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি শুধু মুসলমানদের সঙ্গে যোগদানের মত দুঃসাহস-ই দেখাননি, তাদের সঙ্গে সমান তালে চলেছেন; তিনি তাদের পরিচালনা করেছেন। (The Muslims were anxious to secure the support of the Hindus in the cause of Khilafat....But the Hindus were hesitant in joining the Muslims. Mr. Gandhi was the only Hindu who joined the Muslims. Not only did he show courage to join them, but also he kept step with them, nay, led them.)[1] প্রকৃতপক্ষে গান্ধীই ছিলেন খিলাফৎ আন্দোলনের সফল রূপকার ও মূল চালিকাশক্তি। গান্ধী অদম্য অনুপ্রেরণা ও উদ্যম (Missionary Zeal) নিয়ে খিলাফৎ আন্দোলনকে সফল করতে ছিলেন কৃতসংকল্প। মুসলমানদের এই ধর্মীয় আন্দোলনে কংগ্রেস ও হিন্দুদের যুক্ত করার জন্য গান্ধী পরের বৎসর (৭-৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২০) কংগ্রেসের কলকাতা সম্মেলনে অসহযোগ আন্দোলনের Non co-operation Movement) প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। অথচ জনমানসে ভ্রান্ত ধারণা আছে যে ভারতের স্বাধীনতা বা স্বরাজের জন্য কংগ্রেস গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তার বিপরীত। তুরস্কের পরাজিত সুলতানের সমর্থনে (যেহেতু তিনি ভারতের মুসলমানদের খলিফা বা ধর্মগুরু) গান্ধীর নেতৃত্বে মুসলমানের খিলাফৎ আন্দোলন এবং খিলাফতের সমর্থনে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন। কংগ্রেসের কলকাতা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবেই বিষয়টি পরিষ্কার।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ভারতের মুসলমানদের প্রতি কর্তব্য পালনে চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মুসলমানদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছাকৃত ভাবে ভঙ্গ করেছেন। তাই মুসলমানদের এই ধর্মীয় সঙ্কটে প্রত্যেক অ-মুসলমান ভারতীয়ের কর্তব্য হল বৈধ-পদ্ধতিতে মুসলমানদের সাহায্য করা। (In view of the fact that on the Khilafat question both the Indian and Imperial Goverments have signally failed in their duty towards the Muslims of India and the Prime Minister has deliberately broken his pledged word given to them, and that it is the duty of every non-Muslim Indian in every legitimate manner to assist his Muslim brother in his attempt to remove the religious calamity that has overtaken him.)[2]

---

1. Dr B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-150
2. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-149
   R.C. Majumder—History of the Freedom Movement In India, Vol-III, P-72

২ ও ৩ নং প্রস্তাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে দোষীদের শাস্তি ও স্বরাজ দাবি গৃহীত হয়। আন্তরিকা নয়, কৌশলগত কারণেই মূল প্রস্তাবের (১ নং) সঙ্গে উপরিউক্ত দুটি প্রস্তাব পাশ করা হয়। সে রহস্য উন্মোচন করেন অ্যানি বেসান্ত ঃ "১৯২০ সালের মার্চ মাসেই গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলনের অসহযোগ কর্মসূচীর সঙ্গে অন্য কোন দাবি যুক্ত করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল হিন্দুদের কাছে খিলাফৎ আকর্ষণীয় নয়। তাই (হিন্দুদের অংশগ্রহণের জন্য) এ. আই. সি. সি.-র বেনারস অধিবেশনে (৩০ ও ৩১শে মে) পাঞ্জাবের অত্যাচার ও সংস্কার আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে প্রস্তাব পাশ করা হয় এবং কলকাতা সম্মেলনে গৃহীত হয়।" (Mr. Annie Besant says : "It will be remembered that Mr. Gandhi, in March 1920, had forbidden the mixing up of non-co-operation in defence of the Khilafat with other questions; but it was found that the Khilafat was not sufficiently attractive to Hindus". So at the meeting of the All India Congress committee held at Benares on May 30 and 31, the Punjab atrocities and the deficiencies of the Reforms Act were added to the list of provocative causes—The Future of Indian Politics P-250)*[1]

মুসলমানের হৃদয় জয় করার জন্যই গান্ধী ও কংগ্রেসের খিলাফৎ আন্দোলন। সেই উদ্দেশ্যেই ১৯১৯ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে খিলাফৎ কমিটির অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে কংগ্রেসের ১৯২০ সালের কলকাতা অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের অনুমোদন। বস্তুত ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তির পর থেকে মুসলমান ও মুসলিম তোষণ (অবশ্য হিন্দু-মুসলিম মিলনের জন্য) কংগ্রেসের রাজনীতিতে প্রাধান্য পায়। খিলাফৎ ও মুসলিম নেতারা কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন—কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁরা সাদরে আমন্ত্রিত হতেন। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে কালো গাউন ও অর্ধচন্দ্র শোভিত ফার টুপি মাথায় মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি মঞ্চে আরোহন করলে সমবেত প্রতিনিধিমন্ডলী বাঁধভাঙা উল্লাসে তাঁদের নামে দেয় জয়ধ্বনি (At the Amrisar Session of the Congress in Dec. 1919, when the Ali brothers entered

* খিলাফতের সমর্থনে অসহযোগ প্রস্তাব ১৮৮৬-৮৮৪ ভোটে গৃহীত হয়। উপস্থিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর একটি বিরাট অংশ ছিল কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভার। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের নগদ অর্থ দেওয়া হয়। পরলোকগত Tairsee ডঃ আম্বেদকরের নিকট এ তথ্য প্রকাশ করেন।[2]

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-149
2. R. C. Majumder—History of the Freedom Movement In India, Vol-III, P-686
   Dr B.R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-151

the Pandal and ascended the dias with their fur-caps with crescent and black gowns, the whole audience became transported to ecstasy and rent the sky with cheers of their names.)[1] এ কৃতিত্ব অবশ্যই গান্ধীর। ১৯২৩ সাল। ব্যর্থ খিলাফৎ আন্দোলন। কংগ্রেসের কোকোনদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মহম্মদ আলি হিন্দুর সহযোগিতার জন্য মুসলমানের জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের নিকট আবেদন না করে বলেন ঃ "মুসলমানকে বুঝতে হবে—হিন্দু ও ইংরেজ এই উভয়ের মধ্যে কার সহযোগিতা তুলনামূলক ভাবে প্যান-ইসলামিক উদ্দেশ্যের পক্ষে সহায়ক হবে।" (It is very significant that when in 1923, there was a general feeling among the Muslims against further co-operation with the Hindus, Mahammed Ali, in his Presidential address at the annual session of the Congress at Coconada in Dec. 1923, tried to combat it, not by appealing to the national feeling of the Muslims and their patriotism to India, but by pointing out the comparative advantages of co-operation with the Hindus and the British Govt. for attaining Pan-Islamic objectives.)[2]

মুসলিম চিত্ত-জয়ের উদগ্র কামনায় মুছে যায় ঔচিত্যের সীমারেখা। তখন কংগ্রেস অধিবেশনে হিন্দু অপেক্ষা মুসলিম প্রতিনিধির গুরুত্ব ছিল সমধিক। কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের জন্য তাদের প্রলুব্ধ করা হত—দেওয়া হত উপহার ও বিবিধ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা; যা উৎকোচের নামান্তর। কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশন—১৯১৬ সাল। বিশিষ্ট গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ* বলেন ঃ "আমি মঞ্চে বসে আছি। প্রথম যে জিনিসটি আমার দৃষ্টিতে আসে, তা হল ১৮৯৩ সালের লাহোর অধিবেশন অপেক্ষা মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা চারগুণ বেশি। অধিকাংশ মুসলিম প্রতিনিধি সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদের উপর পরেছে সোনা-রূপার জরির কাজ করা সিল্কের জমকালো লম্বা বহির্বাস।

---

* বিশিষ্ট গান্ধীবাদী কংগ্রেসী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন আর্যসমাজ পরিচালিত শুদ্ধি আন্দোলনের (ধর্মান্তরিত হিন্দুকে পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা) অগ্রণী নেতা। মুসলমান মনে করে Tabligh—অ-মুসলমানকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা তাদের সঙ্গত অধিকার ও ধর্মীয় কর্তব্য। এই একই অধিকার হিন্দুরও আছে—তা তারা স্বীকার করে না। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সঙ্গে এই নিয়ে তাদের তীব্র বিরোধ। মুসলমানের প্রীতিভাজন হওয়ার জন্য গান্ধী ও তাঁর অন্ধ ভক্তবৃন্দও স্বামীর "শুদ্ধি আন্দোলনের" বিরোধী ছিলেন। ১৯২৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অসুস্থ, শয্যাশায়ী। আবদুল রসিদ নামে জনৈক মুসলিম যুবক ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। পুলিশ গ্রেফতার করে আবদুল রসিদকে। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা আসফ আলি সহ সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ

---

1. H. V. Seshadri—The Tragic Story of Parition, P-74
2. R. C. Majumder—History of the Freedom Movement In India Vol. III, P-224

বাজারে গুজব এই যে "কংগ্রেস তামাশার" জন্য ধনীব্যক্তিরা এই সকল "চোগা" মুসলমান প্রতিনিধিদের উপহার দিয়েছে। ৪৪৩ জন মুসলিম প্রতিনিধির মাত্র ৩০ জন বহিরাগত। অন্য সকলেই লক্ষ্ণৌ শহরের অধিবাসী। এদের মধ্যে অধিকাংশের "ডেলিগেট ফী" মকুফ করা হয়েছে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে বিনা ব্যয়ে। (On sitting on the dias [Lucknow Congress platfrom] the first thing that I noticed was that the number of Muslim delegates was proportionately fourfold of what it was at Lahore in 1893. The majority of Muslim delegates had donned gold, silver and silk embroidered chogas over their ordinary

---

(কংগ্রেস-খিলাফৎ-মুসলীম লীগ নির্বিশেষে— রসিদকে সমর্থন করে। পক্ষান্তরে গান্ধী ও কংগ্রেস কিন্তু এই হত্যার নিন্দা করেনি। গান্ধী রসিদকে হত্যার জন্য দোষী বলেও মনে করেননি। তিনি বলেছেন—"রসিদ আমার ভাই।" শুদ্ধি আন্দোলনের জন্যই স্বামীকে প্রাণ দিতে হয়। গান্ধী "শুদ্ধি আন্দোলনের" সমালোচনা করে ঘটনার জন্য প্রকারান্তরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকেই দায়ী করেন। ইংরেজ সরকারের আইনে বিচারে রসিদের ফাঁসী হয়। পুণ্যাত্মা রসিদের স্বর্গ (জান্নাত-বেহেস্ত) কামনায় সারা ভারতে মসজিদে নামাজ পাঠ হয়। দেওবন্দ, ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান। আবদুল রসিদের আত্মার যাতে বেহেস্তে গতি হয় সেইজন্য—দেওবন্দের ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলী পাঁচ বার কোরান পাঠ সম্পূর্ণ করে। তারা আরও স্থির করে যে প্রতিদিন তারা ১,২৫,০০০ বার কোরানের আয়াত পাঠ করবে। তাদের প্রার্থনা ছিল—"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এই মরহুমকে (রসিদ) "এ"-আলা-ই-ইলীয়ীনে (সপ্তম স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থান) স্থান দিক্"। (It is reported that for earning merit for the soul of Abdul Rashid, the murderer of Swami Shradhanand, in the next world, the students and professors of the famous Theological College at Deoband finished five complete recitations of the Koran and had planned to finish daily a lakh and a quarter recitations of Koranic verses. Their prayer was "God Almighty, may give the marhoom (i.e. Rashid) a place in the 'a' ala-e-illeeyean (the summit of the seventh heaven).[1] রসিদের অন্তিম যাত্রায় যোগ দান করে ৫০,০০০ মুসলমান।

১৯২৬ সাল। কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নামে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন গান্ধী;সমর্থন করে মহম্মদ আলি। পট্টভি সীতারামইয়ার বর্ণনায়—গান্ধী প্রকৃত ধর্ম ও হত্যার কারণ ব্যাখ্যা করে সভার উদ্দেশে বলেন—"এখন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি রসিদকে কেন ভাই বলেছি। আমি পুনর্বার বলছি—"রসিদ আমার ভাই"। স্বামীকে হত্যার জন্য আমি তাকে দোষী বলেও মনে করি না। দোষী তারা যারা বিদ্বেষ-ভাবকে উদ্দীপিত করেছে" (Pattavi Sitaramayya writes : "Gandhiji expounded what true religion was and explained the causes that led to the murder : Now you will perhaps understand why; I have called Rashid a brother and I repeat it, I do not even regard him as guilty of Swami's murder. Guilty indeed are those who exited feelings of hatred against one another.)[2] সত্যিই মহানুভব! এই মহানুভব গান্ধীই কিন্তু ফাঁসীর দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ভগৎ সিং-এর দণ্ডাজ্ঞা মকুফের জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করতে অসম্মত হন এই যুক্তিতে যে, ভগৎ সিং হিংসার আশ্রয় নিয়েছেন। বর্ষীয়ান হিন্দু নেতা, মুক্তি সংগ্রামের অগ্রণী সেনানী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে ইসলাম ধর্মের জন্য হত্যা করে আবদুল রসিদ কি অহিংসা প্রেম-প্রীতি সহিষ্ণুতার অমর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন? মহাত্মার মাহাত্ম্য বিচিত্র!

---

1 Times of India—30.11.1927
Quoted from Dr. B. R.Ambedkar—Writings & Speeches, Vol-8, P-157

2 Pattavi Sitaramayya—History of Congress, P-516
Quoted from H. V. Seshadri—The Tragic Story of Partition, P-82

course suits of wearing apparel. It was rumoured that these "Chogas" had been put by Hindu moneyed men for Congress Tamasha. Of some 433 Moslem delegates only some 30 had come from outside, the rest belonging to Lucknow city. And of these majority was admitted free to delegate seats, board and lodging.)[1]

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর কলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে খিলাফতের সমর্থনে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডিসেম্বরে নাগপুর সম্মেলনে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। এ সম্পর্কে জনৈক মুসলিম নেতার তির্যক মন্তব্য ঃ "কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশন দেখে মনে হচ্ছিল এ বুঝি কংগ্রেসের মুসলিম সদস্যদের সম্মেলন। মুসলিম প্রতিনিধিদের বিরাট সংখ্যাধিক্য অধিবেশনকে পুরাপুরি মুসলিম রূপ দিয়েছে।" (A Muslim political leader says : "The Congress session in Nagpur was almost a Muslim session of the Congress for I believe the number of Muslims was so large as to give it a Muslim colour.")[2]

এই তোষণ-নীতির চরম ও সার্থক পরিণতি খিলাফৎ আন্দোলন। ১৯২০ সালের ৩১ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফৎ আন্দোলনের শুরু হয়। সর্বপ্রথম গান্ধী ফিরিয়ে দেন তাঁর পদক ও খেতাব।* (When non co-operation was started by the Khilaphatists on 31st Aug. 1920 Mr. Gandhi was the first to give a concrete shape to it by returning his medal.)[3]

গান্ধী উপলব্ধি করেন যে অহিংস উপায়ে খিলাফৎ আন্দোলন সফল করতে হলে প্রয়োজন জনগণের ব্যাপক অংশের নৈতিক সমর্থন ও আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট থেকে ১লা সেপ্টেম্বর জনমত সংগঠনের জন্য খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা প্রিয় আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে নিয়ে তিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। (with that object in view Mr. Gandhi toured the country between 1st August and 1st September 1920 in the company of the Ali brothers who were the founders of the Khilafat movement.)[4]

* জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ "নাইট" উপাধি ত্যাগ করেন। মহাত্মা গান্ধী খেতাম ফিরিয়ে দেন খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings & Speeches, Vol-8, P-151
2. R. C. Majumder—History of The Freedom Movement In India, Vo-III, P-687
3. Dr. B. R. Ambedkar—Writings & Speeches, Vol-8, P-150
4. Ibid, P-151

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বন্ধনে—সেই ঐক্যের স্বার্থে হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য হবে মুসলমানের খিলাফৎ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। এরকম অলীক ও সর্বনাশা ধারণা গান্ধীর মনে বদ্ধমূল ছিল। তাই হিন্দুর প্রতি তাঁর উপদেশঃ "আমরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বলি। এই ঐক্য অধরা হয়েই থাকবে যদি মুসলমানের এই চরম দুর্দিনে যখন তাঁদের মূল স্বার্থ বিপন্ন হিন্দু তখন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে" (...We talk of the Hindu-Mahamedan unity. It would be an empty phrase if the Hindus hold aloof from the Mohamedans when their vital interests are at stake.)[1] উচ্চ-মহতী চিন্তা, মহাত্মার পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা অবশ্যই বিবেচ্য। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তুরস্কের সম্রাট রাজ্য হারিয়েছে—তাতে আরব ও পারস্যের মুসলমান ক্ষুব্ধ হয়নি বরং তারা সন্তুষ্টই হয়েছে। খিলাফৎ নিয়ে তারা আদৌ চিন্তিত নয়। তাহলে ভারতের মুসলমানের এই তীব্র প্রতিক্রিয়া কেন? ইসলামের জন্মভূমি আরবে "খিলাফৎ" সমস্যা উপেক্ষিত। অথচ ভারতের মুসলমানের নিকট "খিলাফৎ"কেন জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে? তুরস্কের পরাজয়ে ভারতের মুসলমানের মূল স্বার্থ কেন এবং কিভাবে বিপন্ন? উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক-ই বা কি? খিলাফতের মূল কারণ Pan-Islam। ইসলাম ধর্মের অনুশাসন অনুসারে অ-মুসলমান শাসিত দেশে বসবাসকারী মুসলমানের দেশপ্রেম ও আনুগত্য সেই দেশের প্রতি নয়—তা থাকে কোন বিদেশী মুসলিম শাসিত দেশের প্রতি। ভারতের মুসলমানের আনুগত্য তুরস্কের প্রতি। তুরস্কের বিপর্যয়ে তাই তাদের মূল স্বার্থ বিপন্ন। কিন্তু তাদের এই মনোভাব কি ভারতের মূল জাতীয় স্বার্থের অনুকূল অথবা পরিপন্থী? ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের সুচিন্তিত অভিমত ঃ "গান্ধী বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে Pan-Islam অনুপ্রাণিত খিলাফৎ প্রশ্ন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলে আঘাত করেছে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কহীন ভারত থেকে বহু দূরে অবস্থিত কোন রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে যদি দেশের এক বিরাট সংখ্যক জনগণের মূল স্বার্থ ও প্রকৃত সহানুভূতি যুক্ত থাকে, তবে তারা কখনই ভারতীয় জাতির অংশ হতে পারে না। খিলাফৎ প্রশ্নটি ভারতের মুসলমানের মৌলিক সমস্যা। এ রূঢ় সত্যকে স্বীকার করে গান্ধী নিজেও প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছেন যে তারা এক স্বতন্ত্র জাতি; তারা ভারতে বাস করে—কিন্তু ভারতের নয়। (Gandhi failed to realize that the Pan-Islamic idea which inspired the Khilafat question cut at the very root of Indian nationality. If the real sympathy and "Vital interest"

---

1. R. C. Majumdar—History of the Freedom Movement In India, Vol-III, P-50

of a large section of Indians were bound up with a state and society which lay far outside the boundaries of India and had no political connection with it, they could never form a true unit of the Indian nation...By his own admission that the Khilafat question was a vital one for Indian Muslims, Gandhi himself admitted in a way that they formed a separate nation; they were in India, but not of India.)[1]

খিলাফৎ আন্দোলন যে জাতীয়তাবিরোধী—বিচক্ষণ দূরদর্শী গান্ধীর তা না বোঝার কথা নয়। তবু গান্ধী তাঁর লক্ষ্যে অচল অটল। খিলাফৎ আন্দোলন প্রায় এক বছর হতে চলল; কিন্তু সমাধানের কোন সম্ভাবনা নেই। মুসলমান ক্রুদ্ধ হল। গান্ধী লিখলেন ঃ "মুসলমান ধৈর্য হারা ক্রুদ্ধ। তারা কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটির তরফে সমস্যার দ্রুত সমাধানে বলিষ্ঠ কার্যক্রম দাবি করে। খিলাফৎ প্রশ্নের দ্রুত মীমাংসায় ভারতের শক্তি-সামর্থ্য কতখানি; স্বরাজ বলতে মুসলমান তাই বোঝে। স্বরাজের অর্থও অবশ্যই তাই। মুসলমান অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। তাদের এই মনোভাবের প্রতি সহানুভূতি না দেখানো অসম্ভব। স্বরাজের জন্য আন্দোলন বন্ধ করলে যদি খিলাফৎ সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি হয় আমি সানন্দে তা করতে প্রস্তুত।.... কিন্তু আমার বিনম্র অভিমত হল—স্বরাজ লাভ, খিলাফৎ অন্যায়ের প্রতিকারের দ্রুততম পথ।" (In their impatient anger, the Mussalmans ask for more energetic and more prompt action by the Congress and Khilafat organisations. To the Mussalmans, Swaraj means, as it must mean, India's ability to deal effectively with the Khilafat question. The Mussalmans, therefore, decline to wait if the attainment of Swaraj means indefinite delay....It is impossible not to sympathise with this attitude....I would gladly ask for postponement of Swaraj activity if thereby we could advance the interest of the Khilafat...But in my humble opinion, attainment of Swaraj is the quickest method of righting the Khilafat wrong.)[2]

ভক্তবৃন্দের নিকট গান্ধী মহাত্মা বলে খ্যাত। সাধারণের পক্ষে তাঁর মাহাত্ম্য বোঝা কষ্টকর। এই মহাত্মার বিচারে খিলাফতের স্থান সর্বাগ্রে। জাতির স্বাধীনতা অপেক্ষাও তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই খিলাফতের জন্য তিনি স্বরাজ দাবিও ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আর তা ছাড়া স্বরাজ বা দেশের স্বাধীনতার মূল্য বা সার্থকতা তো তুরস্কের সম্রাটকে

1. R. C. Majumdar–History of The Freedom Movement In India, Vol-III, P-50
2. R. C. Majumdar–History of The Freedom Movement In India, Vol-III, P-81

পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করায়। "জাতির জনক"। মন্তব্য হয়তো হবে অসমীচীন। কিন্তু তিনি কোন জাতির পিতা? মুসলমান অথবা ভারতীয়? সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়....।

মুসলমানের একটি বিশেষ গুণ আছে—যার প্রশংসা করতেই হয়। তা হল—মুসলমান অকপট স্পষ্টবাদী। খিলাফৎ Pan-Islam-এরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিশেষ;তাই সে ভারতের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী—এই সহজ বাস্তবকে গান্ধীর সম্মোহিনী (?) শক্তিতে আচ্ছন্ন হিন্দু-নেতারা বুঝতে পারেননি অথবা বুঝতে চাননি। Dr. A. Ansari বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী (?) মুসলিম নেতা। তিনি বলেন ঃ "ভারতের মুসলমানের কাছে Pan-Islam-এর মূল্য কতখানি তা অ-ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। Pan-Islam ভারতের মুসলমানের নিকট খুবই পবিত্র—তা তাঁর আবেগকে উদ্দীপিত করে।" (It is difficult for any non-Indian Moslem to realise what Pan-Islamism means to Indian Moslems....Pan-Islamic sentiment has been one of the Indian Moslem's most sacred and exalted passion.)[1] সেই দার-উল-হারব, দার-উল-ইসলাম তত্ত্ব। ভারত অমুসলমান শাসিত দেশ; দার-উল-হারব—তাই Pan-Islam-এর আবেদন ভারতের মুসলমানের নিকট এত তীব্র ও গভীর। ভারত দার-উল-হারব—তাই ভারতের হিন্দুর সঙ্গে নয়—ভারতের মুসলমানের স্বার্থ জড়িত ত্রিপোলি, আলজেরিয়ার মুসলমানের সঙ্গে। এ অকপট স্বীকারোক্তি স্বয়ং মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির। তারা প্রকাশ্যেই বলতেন ঃ "তারা সর্বপ্রথমে মুসলমান—পরে ভারতীয়। গান্ধী অবশ্য এর মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখেন না। বরং তিনি তা যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয় কারারুদ্ধ হলে Independent পত্রিকার ১৯২১ সালের ২-রা অক্টোবরের সংখ্যায় গান্ধী মুসলমানদের নিকট এক আবেদনে বলেন ঃ অসম সাহসী ভ্রাতৃদ্বয় বিশ্বস্ত দেশপ্রেমিক। কিন্তু সর্বাগ্রে তারা মুসলমান তারপর তাদের অন্য পরিচয়;এবং প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এরকম হয়ে থাকে।" In an appeal to the Musalmans of India published in the Independent, dated allahabad, 2nd Oct, 1921, after the arrest of Ali brothers, he observes : "The brave brothers are staunch lovers of their country but they are Musalmans first and everything else after and it must be so with every religiously minded man.)[2]

1. Ibid, P-682
2. R. C. Majumdar–History of The Freedom Movement In India, Vol-III, P-684

এই সময় সংবাদে প্রকাশ যে ভারতের মুসলমানদের আমন্ত্রণে আফগানিস্তানের নবাব ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। এ সম্বন্ধে মহম্মদ আলির বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ ঃ "জেহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আফগানরা যদি ভারত আক্রমণ করে, ভারতের মুসলমান তাদের পক্ষে যোগদান করতে শুধু বাধ্য নয়—যদি হিন্দুরা সহযোগিতা না করে তবে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা হবে। (If the Afgans invaded India to wage a holy war, the Indian Muhammadans are not only bound to join them but to fight the Hindus if they refuse to co-operate with them.)[1] গান্ধীর প্রিয় ভ্রাতার কণ্ঠে এ কার কণ্ঠস্বর? মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, তৈমুরলঙ....? স্বাধীনতাপূর্ব ভারতের রাজনীতিতে বিশেষত খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধীর ভূমিকার যথার্থ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কাল নিরবধি। নিষ্ঠুর বিচারক মহাকাল। সমকালে কোন ঘটনার বিচার হয় না। কারণ তখন দৃষ্টি থাকে আবেগে আচ্ছন্ন। পরবর্তী কালে আবেগশূন্য নিরাসক্ত মনে নির্ভুল বিচার সম্ভব। সম্রাট অশোক অহিংসাকে বরণ করে নিলেন রাজধর্মরূপে। দেশে উঠল জয়ধ্বনি; বিশ্বে হলেন বন্দিত। উপেক্ষিত হল সমরসজ্জা, রাষ্ট্রের সুরক্ষা। ফল? বৈদেশিক আক্রমণ ও হাজার বছরের পরাধীনতা। এই হল ইতিহাসের বিচার; অশোকের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন। ঠিক তেমনি হয়তো ভাবীকালের ইতিহাস রায় দেবে, প্রেম ও অহিংসার অবতার গান্ধীর সীমাহীন মুসলিম প্রীতি ভারতকে করেছে দ্বি-খন্ডিত। মহম্মদ আলির ঘোষণায় সকলে স্তম্ভিত। প্রকাশ্যে দেশদ্রোহিতা! কিন্তু অবিচল গান্ধী। মহম্মদ আলির সমর্থনে তিনি বলেন ঃ "ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমি অবশ্যই আফগান নবাবকে সাহায্য করব। আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়ে বলব যে সরকার জাতির আস্থা হারিয়েছে তাকে সাহায্য করা অপরাধ।" (I would, in a sense, certainly assist the Amir of Afganisthan if he wages war against the British Govt. That is to say, I would openly tell my country men that it would be a crime to help a government which had lost the confidence of the nation to remain in power.)[2] ব্রিটিশ সরকার জাতির (মুসলমান) আস্থা হারিয়েছে, কারণ সে মুসলমানের খিলাফৎ দাবি মেনে নিয়ে তুরস্কের সুলতানকে তার সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দেয়নি।

আশ্চর্যের বিষয়, কোন কংগ্রেস নেতা মহম্মদ আলির এই সদম্ভ ঘোষণা এবং তার প্রতি গান্ধীর সমর্থনের প্রতিবাদ করেননি। তারা অবশ্যই শংকিত হয়েছেন। দেশবন্ধু

1. Ibid, P-53
2. R. C. Majumder–History of the Freedom Movement In India, Vol-III, P-55
   Dr. B. R. Ambedkar—Writings & Speeches, Vol-8, P-155

চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপত রায়কে লিখলেন ঃ "...আর একটি বিষয় হল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য—যা আমাকে সম্প্রতি যথেষ্ট বিচলিত করেছে। আপনি বিষয়টি গভীর ভাবে অনুধাবন করুন।...গত ছ'মাস ধরে আমি মুসলমানের ইতিহাস ও আইন অধ্যয়ন করেছি। আমার বিশ্বাস ইহা (হিন্দু-মুসলিম) অসম্ভব ও অবাস্তব।...আমি হিন্দুস্থানের সাত কোটি মুসলমানকে ভয় পাই না। কিন্তু এই সাত কোটির সঙ্গে যদি আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, আরবিয়া, মেসোপটেমিয়া ও তুরস্কের সশস্ত্র সৈন্যদল যোগ দেয় তবে তা হবে অপ্রতিরোধ্য। আমি মুসলমান নেতাদের বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। কিন্তু কোরান ও হাদিসের অলঙ্ঘ্য নির্দেশ? মুসলিম নেতারা তা অমান্য করতে পারবেন না। তবে কি আমাদের ধ্বংস অনিবার্য? আমি আশাবাদী। জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই এই সমস্যার একটা সমাধান বের করবেন। (There is one point more which has been troubling me very much of late and one which I want you to think carefully and that is the question of Hindu-Muslim unity. I have devoted most of my time during the last 6 months to the study of Muslim history and Muslim law and I am inclined to think it is neither possible nor practicable....I am not afraid of seven crores in Hindustan but I think, the seven crores of Hindusthan plus the armed hosts of Afganisthan, central Asia, Arabia, Mesopotamia and Turkey will be irresistible....I am also fully prepared to trust the Muslim leaders, but what about the injunctions of the Quran and Hadis? The leaders can not override them. Are we then doomed? I hope not. I hope learned mind and wise head will find some way out of this difficulty.)[1] শুধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই নয়—এমনকি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একটি বাংলা দৈনিকের সম্পাদকের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর গভীর উদ্বেগ অসঙ্কোচে ব্যক্ত করেছেন—"মুসলমানের দেশপ্রেম কোন নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।" কবির মতে ইহাই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে অসম্ভব করে তুলেছে। কবি বলেন যে তিনি বহু মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে যদি কোন মুসলিম শক্তি ভারত আক্রমণ করে তবে মাতৃভূমি রক্ষায় তারা হিন্দুর সঙ্গে একযোগে লড়াই করবে কিনা। কিন্তু যে উত্তর তিনি পেয়েছেন—তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি বলেন যে এমনকি মহম্মদ আলি পর্যন্ত ঘোষণা করেছেন যে ইসলামের বিধান অনুযায়ী কোনও অবস্থাতেই মুসলমান মুসলমানের বিরোধিতা করতে

1. R.C. Majumder—History of the Freedom Movement In India, Vol-III, P-54
Dr. B. R. Ambedkar—Writings & Speeches, Vol-8, P-275-276

পারে না।" (...another very important factor which, according to the poet, was making it almost impossible for the Hindu-Mohamedan unity to become an accomplished fact was that the Mohamedans could not confine their patriotism to any one country....The poet said that he had very frankly asked many Mohamedans whether, in the event of any Mohamedan power invading India, they would stand side by side with their Hindu neighbours to defend their common land. He could not be satisfied with the reply he got from them. He said that he could definitely state that even such men as Mahomed Ali had declared that under no circumstances was it permissible for any Mohamedan, whatever his country might be, to stand against any other Mohamedan.)[1]

মুসলমান সম্পর্কে এ আশঙ্কা একশ ভাগ সত্য। মূল সমস্যা তাদের আনুগত্য নিয়ে। মুসলমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না—তাদের জাতীয়তাবাদ হল Pan-Islamism. বিশ্বের সকল মুসলমান এক জাতি। তাদের ইতিহাস, সভ্যতা-কৃষ্টি এক ও অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে নেহেরুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ যুদ্ধের সময় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বিভিন্ন কারণে তুরস্কের প্রতি ছিল সহানুভূতিশীল। মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা হল Pan-Islam-এর আদর্শ ও ধর্মের প্রতি কর্তব্য। হিন্দুর সহানুভূতির কারণ একটি বিদেশী রাষ্ট্রের চরম দুঃসময়। এই মুসলমানরা তাদের জাতীয়তা ও ঐতিহ্যের উৎস সন্ধান করে ভারতের বাইরে অন্যদেশে। যথেষ্ট না হলেও তারা ভারতে আফগান ও মোগলদের মধ্যে আংশিকভাবে এর সন্ধান পেয়েছিল। (In the troubled days of Turkey War, both Muslims and Hindus sympathised with it for different reasons : for the former it was a part of religious duty and an expression of Pan-Islamic urge, for the latter it was a sympathy for a foreign country in distress. Such Muslims searched for their national roots elsewhere. To some extent they found them in the Afgan and Moghul periods of India, but this was not quite enough to fill the vacuum.)[2]

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings & Speeches, Vol-8, P-276
2. Nehru—The Discovery of India, P-408-409
(Quoted from H. V. Seshadri—The Tragic Story of Partition, P-67

খিলাফৎ আন্দোলন এই Pan-Islam আদর্শেরই অঙ্গ। Pan-Islam তো একটি তত্ত্ব বা আদর্শ;খিলাফৎ হল তার বাস্তবায়ন এবং সন্দেহাতীতভাবে Pan-Islam ভারতের ভৌগলিক অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতার পরিপন্থী। তাই ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে—"খিলাফৎ আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রশ্নই আসে না;তার প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনও জাতীয়তা-বিরোধী বলে গণ্য হবে।" (Any support direct or indirect, to the Khilafat movement not to speak of active participation as its leader, must therefore be regarded as antinational.)[1]

"জাতির জনক" গান্ধী! ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় খিলাফৎ আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে পেরেছিলেন। পরে সে আন্দোলন রূপান্তরিত হয় ব্যাপক হিন্দু-নিধনে। কিন্তু যে দেশের জন্য এই খিলাফৎ আন্দোলন সেই তুরস্কের চিত্র কি? ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে তুরস্কে নবীন তুর্কী নেতা কামাল পাশার উত্থান এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইউরোপের ধাঁচে এক আধুনিক উন্নত ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক রাষ্ট্রের গঠন। কিন্তু প্রধান বাধা ইসলাম। তিনি উপলব্ধি করেন ঃ এক পরাজিত জাতির উপর ইসলাম ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেদিন ইসলাম তুরস্কে প্রবেশ করে, সেদিন থেকেই তুরস্কের অধঃপতন শুরু হয়। (Islam is the religion of a defeated people. Since the day it has stepped on our soil the condition of turkey has steadily detoriorated.)[2]

কামাল পাশা তাঁর নবীন তুর্কী দলের সাহায্যে সুলতানের বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। অসহায় সুলতান গণরোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ব্রিটিশ জাহাজে চড়ে মাল্টায় পালিয়ে যান। সুলতান শাহী ও খলিফাতন্ত্র (Caliphate) লুপ্ত হল। মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির নেতৃত্বে এক মুসলিম প্রতিধি দল তুরস্কে যায়। কামাল পাশার নিকট তাদের আর্জি ছিল খলিফাতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পুরষ্কার নয়—তিরস্কৃত হয়ে ফিরে আসে মুসলিম প্রতিনিধি দল ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে। কিন্তু ব্যর্থ হয় না খিলাপতের উদ্দেশ্য....

খিলাফৎ ও দাঙ্গা

ভারতে প্রায় হাজার বছরের মুসলিম আক্রমণ ও শাসনের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ডঃ আম্বেদকর যথার্থই বলেছেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য অসম্ভব—অবাস্তব। কাফের হিন্দুর বিরুদ্ধে স্থায়ী জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ইসলামের অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। ধর্মপ্রাণ মুসলমান তা কি অমান্য করতে পারে? খিলাফৎ আন্দোলনের সময়ও এই জেহাদের

1. R. C. Majumder–History of the Freedom Movement in India, Vol-III, P-54-55
2. H. V. Seshadri—The Tragic Story of Partition, P-66

বিরতি ছিল না। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তার একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন ঃ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রতি মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এক রাত্রে আমরা দুজনেই নাগপুরের এক খিলাফৎ সম্মেলনে যাই। জনৈক মৌলানা জেহাদ ও কাফের হত্যা সম্পর্কিত কোরানের আয়াত পাঠ করছিল। আমি খিলাফতের এই পর্যায়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি মৃদু হেসে বলেন, "ব্রিটিশ আমলাদের উদ্দেশেই এই সব বলছে—There was another prominent fact to which I drew the attention of Mahatma Gandhi. Both of us went together one night to the Khilafat Conference at Nagpur. The Ayats (verses) of the Quran recited by the Maulanas on that occasion, contained frequent references to Jihad and killing of the Kaffirs. But when I drew his attention to this phase of the Khilafat movement, Mahatmaji smiled and said, "they are alluding to the British Bureaucracy".[1] হিন্দু সম্বন্ধে মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি বিশিষ্ট মুসলিম নেতা মৌলানা আজাদ শোভানীর বক্তব্যে তা পরিষ্কার। জনৈক মৌলানার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ঃ যদি ভারতে এমন কোন নেতা থাকে যিনি ইংরেজকে এদেশ থেকে বিতাড়নের পক্ষে—তবে আমিই সে নেতা। তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ ও ইংরেজের মধ্যে সংঘাত আমি চাই না। আমাদের প্রকৃত সংগ্রাম সংখ্যাগরিষ্ঠ ২২ কোটি হিন্দু শত্রুর সঙ্গে।... ইংরেজ ক্রমশই দুর্বল হচ্ছে। খুব শীঘ্রই তাদের এদেশ ছেড়ে যেতে হবে। ইসলামের প্রধান শত্রু হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের যদি এখনই দুর্বল না করি—তবে তারা ভারতে শুধু রামরাজ্যই প্রতিষ্ঠা করবে না—ছড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীতে। সুতরাং প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হবে মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে যুদ্ধ (হিন্দুদের সঙ্গে) চালিয়ে যাওয়া, যাতে তারা এদেশে প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে—এবং ইংরেজ চলে গেলে এদেশে পুনরায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। (If there is any eminent leader in India who is in favour of driving out the English from this country, then I am that leader. Inspite of this I want there should be no fight with the English on behalf of the Muslim league. Our big fight is with 22 crores of our Hindu enemies, who constitute the majority....The English are gradually becoming week....they will go away from India in the near future. So if we do not fight the greatest

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings & Speeches, Vol-8, P-159

enemies of Islam, the Hindus, from now on and make them weak, then they will not only establish Ramrajya in India but also gradually spread all over the world....So it is the essential duty of every devout Muslim to fight on by joining the Muslim League so that the Hindus may not be established here and a Muslim rule may be established in India as soon as the English depart.)[1] মহম্মদ আলি, গান্ধীর প্রিয় ভ্রাতা। কংগ্রেস, খিলাফৎ ও মুসলিম লীগের প্রথম সারির নেতা। সাধারণ হিন্দু নয়—স্বয়ং "জাতির জনক" মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে তিনি বলেন "মিঃ গান্ধীর চরিত্র যত সৎ ও মহৎ হোক না কেন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি একজন চরিত্রহীন, মুসলমানেরও অধম। (However pure Mr. Gandhi's character may be, he must appear to me from the point of view of religion, inferior to any Musalman, even though he be without character.)[2]. এই বিদ্বেষ, এই জেহাদের আহ্বান কি ব্যর্থ হতে পারে?

কেরালার মালাবার অঞ্চল। বহু শতাব্দী পূর্বে আরব থেকে আগত মুসলমান এখানে বসবাস শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ। দুর্ধর্ষ, হিংস্র, চুরি-ডাকাতি-খুন রাহাজানি এদের পেশা। মোপলা নামে এরা পরিচিত। খিলাফৎ ও স্বরাজ সম্বন্ধে এদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার হয়। বিভিন্ন সূত্র হতে ইংরেজ সরকার জানতে পারে—

"১৯২১ সালের প্রথম থেকেই মসজিদে মসজিদে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে উত্তেজনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের উত্তেজক বক্তৃতা, খিলাফৎ সম্মেলনের জুলাই প্রস্তাব উত্তেজনার বারুদে করে অগ্নি সংযোগ।....তলোয়ার, ছুরি, বর্শা গোপনে তৈরি হয়; সংগঠিত করা হয় হিংস্র দুর্বৃত্তদের।" (During the early months of 1921, exitement spread speedily from mosque to mosque, from village to village. The violent speeches of the Ali brothers, the July resolutions of the Khilafat Conference—all these combined to fire the train...knives, swords and spears were secretly manufactured, bands of desperados collected....)[3] গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলিম মিলনের পক্ষে জনমত সংগঠনের উদ্দেশ্যে মহম্মদ আলি, সৌকত আলি ও অন্যান্য মুসলমান নেতাদের নিয়ে

1 Ibid, P-273
2 Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-302
3 R. C. Majumder—History of the Freedom Movement In India, Vol-III, P-157

সারা ভারত ভ্রমণ করেছেন। মালাবারের মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা হয়েছে সর্বাধিক ফলপ্রসূ।

ভারত সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন নথি হতে জানা যায়—"আবুল কালাম আজাদ* ও হাকিম আজমল খাঁ সহ খিলাফৎ নেতৃবৃন্দ চরম উত্তেজনাকর ভাষণ দেওয়ার পর আগস্ট মাসে মোপলা বিদ্রোহ শুরু হয় এরোড-এ (Erode—Madras)। এপ্রিল মাসে মজলিস-উল-উলেমা সম্মেলনের পর থেকেই খিলাফৎ সম্বন্ধে মোপলাদের মধ্যে আবেগ-উত্তেজনা তীব্রতর হয়।....ওই গোয়েন্দা সূত্রে জনৈক মোপলা নেতার বক্তৃতার অংশ বিশেষ—"আমরা শেতাঙ্গদের কাছ থেকে স্বরাজ ছিনিয়ে নিয়েছি...ইসলাম অথবা মৃত্যু—এই দুইয়ের মধ্যে হিন্দুদের একটিকে বেছে নিতে হবে। পয়গম্বরের কাছ থেকে আমরা শিখেছি আল্লার পথে হত্যা পুণ্যের ...খিলাফৎ রাজ** প্রতিষ্ঠার সময় আগত। (The Moplah rebellion broke out in August, after Khilafat agitators, including Abul Kalam Azad and Hakim Ajmal Khan, had been making violent speeches in that area. Ever since the Majlis-Ul Ulema Conference at Erode in April, the feeling of the Moplahs had been steadily growing with respect to the Khilafat....The same report gives and extract from the speech of one of the leaders of the Moplahs from which a few sentences are quoted as specimens : We have extorted Swaraj from the white men....we shall give Hindus the option of death or Islam. We have the example of the Holy Prophet that it is a good act to kill for Gods' work.)[1]

"খিলাফৎ রাজ" ঘোষণার আয়োজন সম্পূর্ণ। ২০শে আগস্ট কালিকটের জেলাশাসক কতিপয় মোপলা নেতাকে গ্রেফ্‌তারের চেষ্টা করলে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে মোপলাদের তুমুল সংঘর্ষ হয়। এ সংবাদ দ্রুত সর্বত্র পৌঁছে যায়। অবরোধ করা হয় রাস্তা, টেলিগ্রাফের

---

* আবুল কালাম আজাদ—ইসলামি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা। দেশ বিভাগের পূর্বে ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি; স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। Pan-Islamist আবুল কালাম আজাদ "জেহাদ" বা ধর্মযুদ্ধের সমর্থক ছিলেন। তাঁর মতে—ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য—জেহাদ; হিন্দুর পক্ষে তা হল দেশাত্মবোধের আহ্বান (While fighting against the Britishers was a religious duty—a Jehad for the Muslims, it was call of a patriotism for the Hindus—H. V. Seshadri—The Tragic Story of Partion—P-65
হাকিম আজমল খাঁ—বিশিষ্ট মুসলিম লীগ ও খিলাফত নেতা। ইনি কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতির আসনও অলংকৃত করেছেন।

** **খিলাফৎ রাজ**—মুসলমানের কাছে খিলাফৎ রাজের অর্থ হল এদেশে পুনরায় মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা।

---

1. R. C. Majumdar—History of the Freedom Movement In India, Vol-III, P-690

তার কেটে দেওয়া হয়; অনেক জায়গায় ধ্বংস করা হয় রেল লাইন। ভেঙ্গে পড়ে স্থানীয় প্রশাসন। বহু ইরেজকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহীরা জনৈক আলি মুসলিয়রকে রাজা নির্বাচিত করে ঘোষণা করে খিলাফৎ রাজ। ওয়ালুভানদ (Walloovanad) হল খিলাফৎ রাজ্যের রাজধানী। বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকার চার ব্যাটালিয়ন সৈন্য পাঠায়। ১৯২১ সালের শেষ দিকে বিদ্রোহ দমিত হয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী—৩০০০ মোপলা নিহত হয়; সরকার পক্ষে—২৩-৪৩, আহত-১২৬। ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণ বোঝা যায়। কিন্তু মালাবারে খিলাফতের নামে হিন্দুদের উপর যে ভয়াবহ অত্যাচার হয়েছে তা বিস্ময়কর।

ইংরেজের হাতে পরাজিত হয়ে মুসলমান আক্রমণ করে হিন্দুকে। রক্ত হিম করা ইসলামের "আল্লা-হো-আকবর"* রণধ্বনিতে দিগন্ত প্রকম্পিত হয়। তার পর মামুদ-তৈমুর লঙ-আহম্মদ শা আবদালির কীর্তির পুনরাবৃত্তি। নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নির্বিচার

---

* Young India—8.9.1920 একটি প্রবন্ধে গান্ধী বলেন—মাদ্রাজ সফরে বিজওয়াদায় একটি সভায় জাতীয় সঙ্কট সম্বন্ধে আলোচনায় আমি বলেছিলাম যে, নেতার পরিবর্তে আদর্শের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া উচিত। আমি শ্রোতৃমণ্ডলীকে বললাম, আপনারা "মাহাত্মা গান্ধী কি জয়," "মহম্মদ আলি-সৌকত আলি কি জয়ের" পরিবর্তে "হিন্দু-মুসলমান কি জয়" বলুন। ভাই সৌকত আলি আমাকে সমর্থন করে বলেন, তিনি লক্ষ্য করেছেন যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সত্ত্বেও যদি হিন্দুরা বলে "বন্দোমাতরম্," মুসলমানরা বলে "আল্লা-হো-আকবর।" এর ফলে মনে হয় যে জনগণের মধ্যে মনের মিল নাই; আর তা ছাড়া শুনতেও কর্কশ লাগে। সুতরাং তিন রকম জয়ধ্বনি স্বীকৃত হোক ঃ

হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বলবে (১) আল্লা-হো-আকবর, (২) বন্দোমাতরম্ অথবা ভারত মাতা কি জয়, (৩) হিন্দু-মুসলমান কি জয়। আমি (গান্ধী) আশা করব—সংবাদপত্র এবং নেতৃবৃন্দ মৌলানার প্রস্তাব গ্রহণ করে শুধু মাত্র এই তিনটি ধ্বনি দেবার জন্য জনমত গঠনে সচেষ্ট হবেন। (During the Madras tour, at Bezwada I had occasion to remark upon the national crisis and suggested that it would be better to have cries about ideals than men. I asked the audience to replace Mahatma Gandhi-Ki-Jai and Mahamed Ali Shoukat Ali-ki-Jai by Hindu-Musalman-Ki-jai. Brother Shoukat Ali, who followed, positively laid down the law. In spite of the Hindu-Muslim Unity, he had observed that, if Hindus shouted Bande Mataram, the Muslim sang out with Alla-Ho-Akbar and vice-versa. This, he rightly said Jarred on the ear and still showed the people did not act with one mind. There should be therefore only three cries recognised. Alla-Ho-Akbar to be Joyously sung out by Hindus and Muslims,....The second should be Bande Matram or Bharat Mata-ki-Jai. The Third should be Hindu-Musalman-ki-jai. ...I do wish that the newspapers and public men would take up the Maulana's suggestion and lead the people only to use three cries. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches—Vol-8, P-155

লক্ষণীয় ঃ প্রথমধ্বনি—"আল্লা-হো-আকবর"—ইসলামের জয়ধ্বনি ও রণধ্বনি।

দ্বিতীয়টি —বন্দে মাতরম্—দেশাত্মবোধক। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন। ইসলাম ধর্মে রাজনীতি ধর্মের সহায়ক। ধর্মের লক্ষ্য পূরণেই তার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা। মুসলিম তোষণে অদ্বিতীয় গান্ধী মুসলমানের ধর্মীয় শ্লোগান বা ধ্বনিকেই দিলেন সর্বোচ্চ স্থান। তাঁর নির্দেশে নির্বোধ হিন্দু, মুসলমানের সঙ্গে ধ্বনি দিয়েছে—"আল্লা-হো-আকবর।" নির্বুদ্ধিতার মূল্য দিতে হয়। আজ সেই মূল্য দেবার দিন। তাই-আল্লা-হো-আকবর" রণধ্বনিতে ওঠে ক্রন্দন রোল; হিন্দুরক্তে প্লাবিত হয় ভারতভূমি।

হত্যা, জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, হিন্দু-নারীদের গণধর্ষণ, নারী অপহরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তর, মন্দির ধ্বংস, বিগ্রহের লাঞ্ছনা, অগ্নি সংযোগ, লুণ্ঠন....। মালাবারের মুসলমানরা অশিক্ষিত হতে পারে—কিন্তু অবশ্যই খাঁটি মুসলমান। তারা মসজিদে মৌলভীদের কোরান পাঠ শুনেছে—শুনেছে পয়গম্বর মহম্মদের গৌরবময় জীবন কাহিনি। বিদ্বান, উদার জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যথা আলি-ভ্রাতৃদ্বয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, কবিশ্রেষ্ঠ স্যার মহম্মদ ইকবাল, আজাদ শোভানী, হাকিম আজমল খান তাদের শুনিয়েছে ভারতে ইসলামের মহান বীর যোদ্ধাদের অমর কীর্তি-কাহিনি। তাই ইসলামের চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুসারেই দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তারা মালাবারের হিন্দুর বিরুদ্ধে "জেহাদ" পরিচালনা করে । হাজার হাজার হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে। যাঁরা ধর্মান্তরে অসম্মত হয়, তাঁদের করা হয়েছে হত্যা। শংকরণ নায়ারের Gandhi and Anarchy, অ্যানি বেসান্ত সম্পাদিত New India, Times of India এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় হিন্দুর উপর মোপলা মুসলমানের বীভৎস পৈশাচিক অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। শংকরণ নায়ার দুই ধরনের লোমহর্ষক অত্যাচার বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ (১) জীবন্ত অবস্থায় পুরুষদের গায়ের চামড়া তুলে নেওয়া, (২) হত্যার পূর্বে হতভাগ্যদের নিজ-নিজ কবর খুঁড়তে বাধ্য করা (Sankaran Nair points out that in addition to those mentioned in these articles two other forms of torture were credibly reported as having been resorted to in the case of men. namely, skinning alive and making them dig their own graves before their slaughter.)[1]

কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এক স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে মোপলাদের এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে ঃ বিনা প্ররোচনায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ হয়, এরনাদ, ভালুভানদ, পোন্নানী ও কালিকট তালুকে হিন্দুদের সর্বস্ব লুঠ করা হয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে প্রথম দিকেই কয়েক স্থানে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা হয়; যারা পালাতে পারেনি পরবর্তীকালে তাদের সকলকে করা হয় ধর্মান্তরিত। "কাফের" শুধু এই অপরাধে হিন্দু নর-নারী শিশুদের ঠান্ডা মাথায় করেছে হত্যা; মন্দির ধ্বংস করেছে, অপবিত্র করেছে দেব-বিগ্রহ, হিন্দু মেয়েদের উপর হয়েছে পাশবিক অত্যাচার; ধর্মান্তরিত করে মোপলা মুসলমানরাই তাদের শাদী করেছে। (Their wanton and unprovoked attack on the Hindus; the all but wholesale looting of their houses in Ernad and parts of valluvanad Ponnani; and Calicut

1. R. C. Mujumder–History of the Freedom Movement in India, Vol-III, P-160

taluqs; the forcible conversion of Hindus in a few places in the beginning of the rebellion, and the wholesale conversion of those who stuck to their homes in later stages; the brutal murder of inoffensive Hindus, men, women and children, in cold blood without the slightest reason except that they are "Kaffirs"....the desecration and burning of Hindu temples; the outrage of Hindu women and their forcible conversion and marriage by Moplahs.)[1]

বড়লাট-পত্নী Lady Reading সমীপে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে মালাবারের মহিলাবৃন্দ যে স্মারকলিপি পেশ করেন, তা হৃদয়বিদারক ঃ ভয়ংকর নিষ্ঠুর বিদ্রোহীরা যে পৈশাচিক অত্যাচার করেছে, আপনি হয়তো সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত নন। আমাদের প্রিয়জনদের ক্ষত-বিক্ষত, ছিন্ন-ভিন্ন (মৃত বা অর্ধমৃত) দেহে কূপ ও পুকুর পরিপূর্ণ। তাঁদের একমাত্র অপরাধ, পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে তারা সম্মত হয়নি। গর্ভবতী, আসন্ন-প্রসবা নারীদের পেট চিরে তাদের রক্তাক্ত মৃতদেহ পথের পাশে ঝোপে-ঝাড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে তাদের অজাত সন্তান। আমাদের কোল থেকে নিষ্পাপ, দুগ্ধ-পোষ্য শিশুদের ছিনিয়ে নিয়ে চোখের সামনে হত্যা করা হয়েছে। পিতা ও স্বামীদের আমাদের সামনে জীবন্ত ছাল ছাড়িয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। আমাদের অসহায়-অভাগা ভগিনীদের অপহরণ করে তাদের উপর অকল্পনীয় পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। বর্বর ধ্বংসের উন্মত্ত তাণ্ডবে হাজার-হাজার বাড়ি পরিণত হয়েছে ভস্মস্তূপে। অপবিত্র, ধ্বংস করেছে মন্দির। যে দেবতার কণ্ঠে শোভা পেত পুষ্পমাল্য, তাঁর কণ্ঠে জড়িয়ে দিয়েছে গরুর নাড়ি-ভুঁড়ি অথবা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে ক্ষুধার্ত, ছিন্নবস্ত্র পরিহিত অথবা নগ্ন আমরা প্রাণ-ভয়ে বন-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়িয়েছি। (It is possible that your Ladyship is not fully appraised of all the horrors and atrocities perpetrated by the fiendish rebels; of the many wells and tanks filled up with the mutilated, but often only half-dead bodies of our nearest and dearest ones who refused to abandon the faith of our fathers; of pregnant women cut to pieces and left on the roadsides and in the jungles, with the unborn babe protruding from the mangled corpse; of our innocent and helpless children torn from our arms and done to death

1 R. C. Majumder—History of the Freedom Movement In India, Vol-III, P-159

before our eyes and of our husbands and fathers tortured, flayed and burnt alive; of our hapless sisters forcibly carried away from the midst of kith and kin and subjected to every shame and outrage which the vile and brutal imagination of these inhuman hel-hounds could conceive of ; of thousands of our homesteads reduced to cinder-mounds out of sheer savagery and a wanton spirit of destruction; of our places of worship desecrated and destroyed and of the images of deity shamefully insulted by putting the entrails of slaughtered cows where flower garlands used to lie, or else smashed to pieces....we remember how driven out of our native hamlets we wandered, starving and naked, in the jungles and forests....)[1]

Servants of India Society নিযুক্ত Enquiry Committee-র প্রতিবেদনে বলা হয়—১৫০০ হিন্দু নিহত হয়। বলপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয় ২০০০০ হিন্দুকে। নারী লাঞ্ছনা ও অপহরণের সংখ্যা অগণিত। লুণ্ঠিত হয় তিন কোটি টাকার সম্পত্তি। মুসলিম রাজত্বে রাজস্থান ও অন্যত্র হাজার হাজার হিন্দু নারী নারীত্বের মর্যাদা রক্ষায় প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়েছে। মালাবারেও ঠিক তেমনি শত শত হিন্দু-নারী শুধু সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই করেছে আত্মহত্যা। অ্যানি বেসান্ত বলেন ঃ তারা যথেচ্ছভাবে হত্যা ও লুণ্ঠন করেছে। যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অসম্মত হন, তাঁদের সকলকে হত্যা অথবা বিতাড়িত করেছে। প্রায় ১,০০,০০০ মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে একবস্ত্রে হয়েছে গৃহহারা। (They murdered and plundered abundantly, and killed or drove away all Hindus who would not apostatise. Somewhere about a lakh people were driven from their homes with nothing but the clothes they had on, stripped of everything.)[2]

খিলাফৎ আন্দোলনের তাৎপর্য ঃ খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান সমস্যার অনালোকিত দিকের প্রতি আলোকপাত করে তার স্বরূপ যথাযথ ভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে। সেই বিচারে এই আন্দোলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তুরস্কের সুলতানের পরাজয়ে ভারতের মুসলমানের কল্পিত দুঃখে গান্ধী ব্যথিত হন। কিন্তু হিন্দুর ওপর মোপলা মুসলমানের দানবীয় অত্যাচারেও স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় তিনি নির্বিকার। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তার

1. R.C. Majumder–History of the Freedom Movement In India, Vol-III, P-159-160
2. Annie Besant –The Future of Indian Politics, P-252
   Quoted from H. V. Seshadri—The Tragic Story of Partition, P-70

জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা। মালাবারের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তার ঐক্য-প্রয়াস ব্যাহত হতে পারে—এই আশঙ্কায় গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মোপলা মুসলমানের অত্যাচারকে লঘু করে দেখাবার চেষ্টা করেন। ক্রমশ সকল ঘটনা প্রকাশিত হলে গান্ধী বাক্‌চাতুরী, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অস্বীকার এবং সর্বশেষ ঘটনার জন্য মুসলমান নয়, দায়ী করেন ইংরেজ সরকারকে।* মুসলমানদের তুষ্ট করার জন্য গান্ধী মোপলাদের প্রশংসা করে বলেন—মোপলারা সাহসী, ধর্মভীরু। তারা ধর্মের জন্য ধর্ম-নির্দেশিত পথেই সংগ্রাম করেছে। (...brave God-fearing Moplas who where fighting for what they consider as religion, and in a manner which they consider as religious.)[1]

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবও খুবই সতর্কতার সঙ্গে রচিত—যাতে মুসলিম আবেগ আহত না হয়। "....মোপলাদের হিংসাত্মক কার্যের নিন্দা করেও ওয়ার্কিং কমিটি এই অভিমত পোষণ করে যে, সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে প্রমাণিত মোপলাদের সহনাতীত প্ররোচনা** দেওয়া হয়েছে। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশিত মোপলাদের অত্যাচারের বিরণ একপেশে ও অতিরঞ্জিত; অন্যদিকে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য অকারণে যে হত্যা করা হয়েছে, সে ঘটনা লঘু করে দেখানো হয়েছে।

"ওয়ার্কিং কমিটি দুঃখিত যে কতিপয় ধর্মান্ধ গোঁড়া মোপলাদের দ্বারা কয়েকটি তথাকথিত ধর্মান্তরের *** ঘটনা ঘটেছে; কিন্তু জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন অতিরঞ্জন এবং সরকারি ভাষ্যে বিশ্বাস না করে" (..."Whilst, however, condemning

* হিন্দু ও মুসলমান, এই উভয় জাতির মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গান্ধী সম্যক অবহিত ছিলেন। ধর্ম ও জাতি সম্বন্ধে মুসলমানের আবেগ -অনুভূতি প্রবল। হিন্দু এই সকল সংকীর্ণ হৃদয়-বৃত্তি পরিহার করে;অনুশীলন করে উচ্চতর আদর্শের। কাণ্ডজ্ঞান নেই, দিব্য জ্ঞান আছে ষোল আনা।

** ইংরেজ সরকার কি মোপলাদের বিদ্রোহী হতে প্ররোচনা দিয়েছে? হিন্দুরা কি অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য মোপলাদের প্ররোচনা দিয়েছে? ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে তা স্পষ্ট নয়। অবশ্য জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা মৌলানা হসরত মোহ্যানি বলেন—"তাদের (মোপলা) সন্দেহ যে, শত্রু ইংরেজের সঙ্গে হিন্দুদের যোগসাজস রয়েছে।" (They [Moplas] suspected the Hindus of collusion with the British, enemies of the Moplas. —Dr. Ambedkar—Writings & Speeches Vol-8 P-160) ওয়ার্কিং কমিটির সন্দেহের তীর কি হিন্দুর প্রতি নিবদ্ধ ?

*** ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে কয়েকটি তথাকথিত (?) ধর্মান্তরের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় আইন সভায় ১৬-১-১৯২২ তারিখে এক প্রশ্নের উত্তরে Sir William Vincent বলেন যে, মাদ্রাজ সরকার এক রিপোর্টে জানিয়েছে যে হাজার হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হয়;কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা কত—তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। In reply to a question in the central ligislature (Debates 16.1.1922) Sir William Vincent replied "The Madras Govt. reports that the number of forcible conversions probably runs to thousands but that for obvious reasons it will never be possible to obtain anything like an accurate estimate" —Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches Vol-8, P-158

1. R.C. Majumdar–History of The Freedom Movement in India, Vol.-III, P-161

violence on the part of the Moplas, the working Committee desires it to be known that the evidence in its possession shows that provocation beyond endurance, was given to the Moplas and that the reports published by and on behalf of the Govt. have given a onesided and highly exaggerated account of the wrongs done by the Moplas and an understatement of the needless destruction of life resorted to by the Govt. in the name of peace and order."

"The working Committee regrets to find that there have been instances of so-called forcible conversion by some fanatics among Moplas, but warns the public against believing in the Govt. and inspired versions.")[1]

ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বলেন—"মূল প্রস্তাবে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও বলপূর্বক ধর্মান্তরের জন্য মোপলাদের তীব্র নিন্দা করা হয়। বিতর্কে বিভিন্ন হিন্দু সদস্যের সংশোধনীতে মূল প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত মাত্র জনাকয়েক মোপলার মামুলি নিন্দায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু অনেক মুসলিম নেতা তাও মেনে নিতে পারেননি। মৌলানা ফকির এবং অন্য মৌলানারা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। আমি বিস্মিত হয়েছি—মৌলানা হসরত মোহানীর ন্যায় বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা প্রস্তাবের বিরোধিতায় বলেন ঃ মোপলাদের দেশ আর দার-উল-আমেন (দার-উল-ইসলাম) ছিল না, তা হয়েছে দার-উল-হারব। তারা (মোপলারা) সন্দেহ করে—শত্রু ইংরেজের সঙ্গে হিন্দুদের যোগসাজস রয়েছে। সুতরাং মোপলারা হিন্দুদের কোরান অথবা তরবারির (ইসলাম অথবা মৃত্যু) মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলে ঠিক কাজই করেছে এবং হিন্দুরা যদি জীবন রক্ষার জন্য মুসলমান হয়ে থাকে, তা ছিল স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর—বলপূর্বক নয়। (....The original resolution condemned the Moplas wholesale for the killing of Hindus and burning of Hindu homes and the forcible conversion to Islam. The Hindu members themselves proposed amendments till it was reduced to condemning only certain individuals who had been guilty of the above crimes. But some of the Muslim leaders, could not bear this even. Maulana Fakir and other Maulanas, of course opposed the resolution...But I was surprised an out-and-

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-158-159

out Nationalist like Maulana Hasrat Mohani opposed the resolution on the ground that the Mopla country no longer remained Dar-Ul-Aman (Dar-Ul-Islam) but became Dar-Ul-Harb and they suspected the Hindus of collusion with the British, enemies of the Moplas. Therefore, the Moplas were right in presenting the Quran or Sword to the Hindus. And if the Hindus became Mussalmans to save themselves from death, it was a voluntary change of faith and not forcible conversion.)[1]

ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মগুরু (খলিফা), তুরস্কের পরাজিত সুলতানের জন্য খিলাফৎ আন্দোলন। গান্ধীর ভাষায় "খিলাফৎ" ছিল এদেশের মুসলমানের নিকট জীবন-মরণের প্রশ্ন। মালাবারে হিন্দু-নিধন "খিলাফৎ" আন্দোলনেরই স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি। প্রত্যাশিত ভাবেই মুসলমান দল-মত-নির্বিশেষে মোপলাদের নিঃশর্ত সমর্থনে এগিয়ে এল। শুধু সমর্থন নয়, খিলাফৎ সম্মেলনে প্রস্তাব পাশ করে—"ধর্মের জন্য তারা (মোপলারা) যে অসম সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে, তার জন্য জানানো হয় অভিনন্দন"। (Congratulations to the Moplas on the brave fight they were conducting for the sake of religion.)[2] ১৯২৩ সালের কোকোনাদে অনুষ্ঠিত হয় খিলাফৎ সম্মেলন। জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা গান্ধীর স্নেহভাজন অনুজপ্রতিম সৌকত আলি সম্মেলনের সভাপতি। তিনি বলেন, "হাজার হাজার মোপলা শহীদ হয়েছে। ধর্মীয় ও মানবিক কারণেও এই মোপলাদের প্রতি তাঁদের কর্তব্য আছে।" (Thousands of Moplas, he said, had been martyred, but they owed a duty, both on religious and humanitarian grounds, to these brave Moplas.)[3]

এই সকল মোপলাদের অসহায় পরিবার ও অনাথ সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য একটি বিশেষ তহবিলে সাহায্য সংগ্রহের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। অনেকে গান্ধী ও কংগ্রেসের পক্ষ হতেও দুর্গত হিন্দুদের জন্য অনুরূপ সাহায্যের আশা করেছিল। কিন্তু সে যে নিতান্তই দুরাশা!

গান্ধী মোপলাদের প্রশংসায় বলেছেন—"তারা ধর্মভীরু, ধর্মের জন্য ধর্ম-নির্দেশিত পথেই সংগ্রাম করেছে।" নির্মম এ সত্য!...ধর্মের জন্য ধর্ম-নির্দেশিত পথেই মুসলমানের

---

1. Dr. B. R. Ambedkar– Writings and Speeches, Vol-8, P-159-160
2. R. C. Majumder—Historty of the Freedom Movement In India, Vol-III, P-161
   Dr. B. R. Ambedkar—Writings and speeches, Vol-8, P-158
3. R. C. Majumder—History of the Freedom Movement In India, Vol-III, P-164

ভারত বিজয় ও ভারত শাসন। সকল মুসলমান বিজেতা ও শাসকবৃন্দ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছে—ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্য; তাকে করেছে সমৃদ্ধ। আধুনিক যুগে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে কেরালার মালাবার অঞ্চলে খিলাফতের নামে হল তার পুনরানুষ্ঠান। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে খিলাফৎ আন্দোলন ভাবীকালের ইঙ্গিতবাহী। অ্যানি বেসান্তের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তা সুস্পষ্ট ঃ "খিলাফৎ আন্দোলনের শুরু থেকেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। খিলাফৎ ধর্মযুদ্ধ কে সমর্থন ও উৎসাহ দান ছিল ভারতের প্রতি নতুন এক আঘাত। অতীতের ন্যায় অবিশ্বাসীদের (যাঁরা আল্লা ও মহম্মদে বিশ্বাস করে না) বিরুদ্ধে মুসলমানের অন্তরের সহজাত ঘৃণা ও বিদ্বেষ জেগে ওঠে নগ্ন নির্লজ্জভাবে...মুসলিম নেতাদের ঘোষণা থেকে আমরা জেনেছি আফগানিস্তান ভারত আক্রমণ করলে তারা স্বধর্মী মুসলিম হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে; (শুধু তাই নয়) মাতৃভূমি রক্ষায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হিন্দুদের করবে হত্যা। আমরা দেখেছি তাদের মূল আনুগত্য মাতৃভূমির প্রতি নয়—তা হল বাইরের মুসলিম দেশগুলির প্রতি। আমরা জানি তাদের হৃদয়ের একান্ত বাসনা—ভারতে দার-উল-ইসলামের প্রতিষ্ঠা...দেশের আইনের ঊর্ধ্বে মহানবী প্রণীত বিধানসমূহের স্থান; মুসলমান তাকেই মান্য করবে—মুসলিম নেতাদের এই দাবি নাগরিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রে স্থায়িত্বের পক্ষে বিপদজনক।...ভারত যদি স্বাধীন হত, মুসলমান ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বিপদের সমূহ কারণ হত। তারা আফগানিস্তান, বালুচিস্তান, পারস্য, ইরাক, আরবিয়া, তুরস্ক, মিশর ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম জাতিগুলির সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতে স্থাপন করত মুসলিম রাজত্ব...মালাবার আমাদের শিখিয়েছে ইসলামিক শাসনের মাহাত্ম্য। ভারতে আমরা আর একটি "খিলাফৎ রাজ" দেখতে চাই না। মালাবারের বাইরের মুসলমান মোপলাদের প্রতি ছিল আন্তরিক সহানুভূতিশীল; তাই সারা ভারতের মুসলমান এবং গান্ধী প্রকাশ্যে তাদের পক্ষ সমর্থন করেছে। গান্ধী এরকমও বলেছেন, তাদের ধর্ম যেভাবে শিখিয়েছে তারা সেই ভাবেই কাজ করেছে। আমার আশঙ্কা—তাই হয়তো সত্যি। কিন্তু সভ্য জগতে এমন জাতির স্থান নেই, যাঁদের ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, যারা স্বধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাদের উপর চালাতে হবে ধ্বংসের তাণ্ডব—হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ ও বিতাড়ন...বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ হয় এই মধ্যযুগীয় বর্বরতায় বিশ্বাসীদের সভ্যতা শেখাবে অথবা দেশের বাইরে পাঠাবে নির্বাসনে।...স্বাধীন ভারতের চিন্তার সময় মুসলমান শাসনের এই ভয়ংকর বিপদের বিষয়টিও চিন্তা করতে হবে। (...Since the Khilafat agitation, things have changed and it has been one of the many injuries inflicted on India by the encouragement of the Khilafat crusade, that the inner Muslim feeling of hatred against "unbelievers" has sprung

up, naked and unashamed, as in the years gon by....we have heard Muslim leaders declare that if the Afgans invaded India, they would join their fellow believers, and would slay Hindus who defended their motherland against the foe : we have been forced to see that the primary allegiance of Musalmans is to Islamic countries, not to our motherland; we have learned that their dearest hope is to establish the Kingdom of God....The claim now put forward by Musalman leaders that they must obey the laws of their particular prophet above the laws of the state in which they live, is subversive of civic order and the stability of the state....If India were independent the Muslim part of the population—for the ignorant masses would follow those who appealed to them in the name of their prophet—would become an immediate peril to India's freedom. Allying themselves with Afganistan, Baluchistan, Persia, Iraq, Arabia, Turkey and Egypt and with such of the tribes of Central Asia who are Musalamans, they would rise to place India unedr the rule of Islam.... Malabar has taught us what Islamic rule still means, and we do not want to see another specimen of the Khilafat Raj in India. How much sympathy with the Moplas is felt by Muslims outside Malabar has been proved by the defence raised for them by their fellow believers, and by Mr. Gandhi himself, who stated that they had acted as they believed that religion taught them to act. I fear that is true; but there is no place in a civilised land for people who believe that their religion teaches them to murder, rob, rape, burn, or drive away out of the country those who refuse to apostatise from their ancestral faiths....and people living in the twentieth century must either educate people who hold these Middle Age views or else exile them...In thinking of an Independent India, the meance of Muhammedan rule has to be considered.)[1]

1.Dr. B. R. Ambadkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-274-275

খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধীর ভূমিকা সম্বন্ধে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সরস মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ—"কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য। কোন মিথ্যাকেই অবলম্বন করিয়া জয়ী হওয়া যায় না। এই যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এতবড় অসহযোগ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসন পাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবির বিরুদ্ধে ইংরেজ হয়তো একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাহা টিকে না। পাই বা না পাই, এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই এ কোন কথা? যে দেশের সহিত ভারতের সংশ্রব নাই, যে দেশের মানুষে কী খায়, কী পরে, কী রকম তাহাদের চেহারা কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কীর শাসনাধীন ছিল, এখন যদিও তুর্কি লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ পরাধীন ভারতীয় মুসলমান সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন্ সঙ্গত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ অতএব এস একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর। কিন্তু এদিকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্ণপাত করিল না, এবং ওদিকে যাহার জন্য খিলাফৎ সেই খলিফাকেই তুর্কিরা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপে খিলাফৎ আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার ও অর্থহীন হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্যগর্ভতায় সে শুধু নিজেই মরিল না, ভারতের স্বরাজ আন্দোলনেরও প্রাণবধ করিয়া গেল। বস্তুত এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে লোক ভর্তি করা যায়, না করিলেই বিজয় লাভ হয়? হয় না এবং কোনদিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি খাটিয়াছিলেন মহাত্মাজী নিজে। এতখানি আশাও বোধকরি কেহ করে নাই, এতবড় প্রতারিতও বোধকরি কেহ হয় নাই। সেকালের বড় বড় মুসলিম পাণ্ডাদের কেহ বা হইয়াছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, কেহ বা বাম হস্ত, কেহ বা চক্ষুকর্ণ, কেহ বা আর কিছু। হায় রে! এতবড় তামাশার ব্যাপার কি আর কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে? পরিশেষে হিন্দু-মুসলমান মিলনের শেষ চেষ্টা করিলেন তিনি দিল্লিতে (মহম্মদ আলির বাড়িতে) দীর্ঘ একুশ দিন উপবাস করিয়া। ধর্মপ্রাণ সরলচিত্ত সাধু মানুষ তিনি, বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, এতখানি যন্ত্রণা দেখিয়াও কি তাহাদের দয়া হইবে না। সে যাত্রা কোনমতে প্রাণটা তাঁহার টিকিয়া গেল। ভ্রাতার অধিক, সর্বাপেক্ষা প্রিয় মিঃ মহম্মদ আলিই বিচলিত হইলেন সব চেয়ে বেশি। তাঁহার চোখের উপরেই সমস্ত ঘটিয়াছিল—অশ্রুপাত করিয়া কহিলেন, আহা! বড় ভাল লোক এই মহাত্মাজীটি,

ইহার সত্যকার উপকার কিছু করা চাই। অতএব আগে যাই মক্কায়, গিয়া পীরে সিন্নি দিই, পরে ফিরিয়া আসিয়া কলমা পড়াইয়া কাফের ধর্ম ত্যাগ করাইয়া তবে ছাড়িব।

শুনিয়া মহাত্মা কহিলেন, পৃথিবী দ্বিধা হও। বস্তুত, মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।"১

১৯১৯ সালে আফগানিস্তানের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে মহম্মদ আলির সদম্ভ ঘোষণায় হিন্দুদের একাংশের মধ্যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার বহু পূর্বে ১৮৯৯ সালে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ Theodore Morison-এ বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে বলেন ঃ মুসলমানের (ভারতের মধ্যে সর্বাধিক আগ্রাসী ও প্রচণ্ড হিংস্র জাতি) মনোভাবই স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার পক্ষে এক বিরাট প্রতিবন্ধক। উঃ সীমান্ত দিয়ে আফগানিস্তান স্বশাসিত ভারত আক্রমণ করলে, মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধে হিন্দু-শিখের সঙ্গে যোগ দেবে না। রক্ত ও ধর্মের বন্ধনের জন্য সমবেত হবে ইসলামের পতাকাতলে। (The views held by the Mahamedans (certainly the most aggressive and truculent of the peoples of India) are alone sufficient to prevent the establishment of an independent Indian Government. Were the Afgan to descend from the north upon an autonomous India, the Mahamedans, instead of uniting with the Sikhs and the Hindus to repel him, would be drawn by all the ties of Kinship and religion to join his flag.)[1] সমস্যা শুধু আফগানিস্তান বা অসামরিক মুসলিম জনতাকে নিয়ে নয়, ব্রিটিশ ভারতের সামরিক বাহিনীতে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য। দূরদর্শী ডঃ আম্বেদকর বলেন এ বিষয়টিও হিন্দুকে ভাবতে হবে। তাঁর প্রশ্ন ঃ স্বাধীন ভারত সরকার কি তার সামরিক বাহিনীকে—(তার আনুগত্য যাঁর প্রতি থাক না কেন) আফগান হানাদারদের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবে? এ প্রসঙ্গে মুসলিম লীগের ঘোষণার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়; তা হল কোন মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে ব্যবহার করা যাবে না। (That question is : Will the Indian Government be free to use this Army, whatever it's loyalties, against the invading Afgans? In this connection, attention must be drawn to the stand taken by the Muslim League. It is to the effect that the Indian Army shall not be used against Muslim powers.)[2]

১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা—শরৎ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড-পৃঃ ৪৭৩। জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, শরৎ সমিতি।

1. Dr. B. R. Ambadkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-98
2. Ibid, P-98

মুসলিম লীগের বক্তব্যে নতুনত্ব বা বিস্ময়ের কিছু নেই। ইসলাম ধর্ম ও Pan-Islam-এর সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ। হিন্দু তা বুঝতে চায় না। তাই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গান্ধীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু ডঃ আম্বেদকরের প্রশ্ন ঃ কোথায় ঐক্য? অতীতে কখনও ছিল কি? আছে কি তার কোন সম্ভাবনা?* তার সঙ্গে সহমত পোষণ করে বিশিষ্ট মুসলিম নেতা খাজা হাসান নিজামী হিন্দু মুসলিম ঐক্য সম্বন্ধে বলেন ঃ "মুসলমান হিন্দুর থেকে স্বতন্ত্র; তারা হিন্দুর সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুসলমান জয় করে ভারত—এবং তাঁদের কাছ থেকে ইংরেজ ভারত অধিকার করে। মুসলমান এক ঐক্যবদ্ধ জাতি এবং তারাই হবে ভারতের শাসক। তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেবে না। তারা শত-শত বছর ধরে ভারত শাসন করেছে; তাই এ দেশের উপর আছে তাদের স্বত্বাধিকার। ...তারা (হিন্দু) গান্ধীভক্ত এবং গো-পূজা করে।....শাসন করায় তাদের সামর্থ্য কোথায়? মুসলমান শাসন করেছে এবং করবে। (Musalmans are separate from Hindus; they cannot unite with the Hindus. After bloody wars the Musalmans conquered India, and the English took India from them. The Musalmans are one united nation and they alone will be masters of India. They will never give up their individuality. They have ruled India for hundreds of years, and hence they have a prescriptive right over the country....They believe in Gandhi and worship the cow....what capacity have they for ruling over men? The Musalmans did rule, and The Musalmans will rule.)[1]

একথা সত্য, মুসলমান হিন্দুকে পরাজিত করে অধিকার করেছে ভারত। সে গৌরবের অংশভাগী হতে কে না চায়? জাতীয়তাবাদী বা ভারতীয় মুসলমান** বলে যাদের পরিচয়, তারাও সে গৌরব মহিমার দীপ্তিতে দীপ্যমান। মামুদ্ বাবরের গৌরবে তারাও গৌরব বোধ করে। ১৯২৬ সালে তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধের জয়পরাজয় নিয়ে এক বির্তকের সৃষ্টি হয়। মুসলমান দাবি করে, জয় হয়েছে আহম্মদ শাহ্ আবদালির; হিন্দুর দাবি পরাজিত হলেও তারাই প্রকৃতপক্ষে জয়ী হয়েছে। কারণ এই যুদ্ধই উঃ সীমান্ত দিয়ে মুসলিম

* ডঃ আম্বেদকরের মতে ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক ঐক্য কোন ঐক্য নয়। যথার্থ যা ঐক্য তা হল আধ্যাত্মিক (In short it must be spiritual)

**"জাতীয়তাবাদী" বা "ভারতীয় মুসলমান" বলতে কি বোঝানো হয় তা সুস্পষ্ট নয়। মুসলমান দাবি করে সে স্বতন্ত্র জাতি। তাহলে "জাতীয়তাবাদী" এই পদটির প্রয়োগ শুধু অর্থহীন নয়—মুসলমানের পক্ষে অপমানজনক। "ভারতীয়" বলতে তাই বোঝাবে তার ভৌগোলিক অবস্থান; জাতীয়তা নয়।

1. Ibid, P-303

আক্রমণকে বন্ধ করেছে চিরতরে। বিষয়টির মীমাংসার জন্য পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যকে চতুর্থ পাণিপথ যুদ্ধে আহ্বান করেন মৌলানা আকবর শাহ্ খান ঃ "মালব্যজী, আপনি যদি তৃতীয় পাণিপথের ফলাফলকে বিকৃত করার চেষ্টা করেন—আমি আপনাকে সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য খুব সহজ ও চমৎকার এক উপায় বলতে পারি। আপনি আপনার প্রভাব খাটিয়ে চতুর্থ পাণিপথ যুদ্ধের জন্য ইংরেজ সরকারের অনুমতি সংগ্রহ করুন। সেখানেই হিন্দু ও মুসলমানের শৌর্য ও রণদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাবে। ভারতে সাত কোটি মুসলমান ও বাইশ কোটি হিন্দু আছে। নির্দিষ্ট দিনে আমি মাত্র ৭০০ মুসলমান সহ পাণিপথে উপস্থিত হব; ২২০০ হিন্দু নিয়ে আসুন আপনি। কামান, মেশিন গান বা বোমা নয়—যুদ্ধের অস্ত্র হবে তলোয়ার, বল্লম, বর্শা, তীর-ধনুক ও ছোরা। হিন্দু বাহিনীর সৈনাপত্যের দায়িত্ব আপনি নিতে যদি সম্মত না হন, সে দায়িত্ব আপনি দিতে পারেন সদাশিব রাও অথবা ভিশ্বাসরাওয়ের কোন বংশধরকে। তারাও সুযোগ পাবে ১৭৬১ সালে তাদের পূর্বপুরুষদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার। দর্শক রূপে আপনি কিন্তু অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন।—উপসংহারে জানাই, আপনারা যাদের ভয়ে ভীত, সেই পাঠান অথবা আফগান আমার সঙ্গে একজনও থাকবে না। আমি নিয়ে আসব শরিয়তে বিশ্বাসী সদ্বংশজাত ভারতীয় মুসলমান"। (If you Malaviyaji, are making efforts to falsify the result at Panipat, I shall show you an easy and an excellent way (of testing it). Use your well-known influence and induce the British Government to permit the fourth battle of panipat...I am ready to provide....a comparative test of the valour and fighting spirit of the Hindus and the Musalmans...As there are seven crores of Musalmans in India, I shall arive on a fixed date on the plain of Panipat with 700 Musalmans...and as there are 22 crores of Hindus I allow you to come with 2200 Hindus. The proper thing is not to use canon, machine guns or bombs : only swords, and javelins and spears, bows and arrows and daggers should be used. If you cannot accept the post of generalissimo of the Hindu host, you may give to any descendant of Sadashivrao or Viswasrao so that their scions may have an opportunity to avenge the defeat of their ancestors in 1761. But any way do come as a spectator.....In conclusion I beg to add that among the 700 men that I shall bring there will be no Pathans or Afgans as you are mortally afraid of

them, so I shall bring with me only Indian Musalmans of good family who are staunch adherents of Shariat)[1]

অকপট সত্যভাষণ! মুসলিম মানসিকতার যথার্থ প্রতিফলন। কিন্তু হিন্দু বাস্তববুদ্ধি (কাণ্ডজ্ঞান) বর্জিত। মুসলমানের সঙ্গে মিলনের উদগ্র কামনায় দৃষ্টি তাঁর আচ্ছন্ন। হিন্দুকে কটাক্ষ করে V.P. Menon (সর্দার প্যাটেলের সুদক্ষ সহকারী) তাই বলেছেন ঃ যে জাতি ভুলে যায় আপন ইতিহাস ও ভূগোল—তার বিনাশ বিধি-নির্দিষ্ট—A nation that forgets its geography and history, does so at its own peril. মুসলমানের ভারত বিজয়কে Will Durant বলেছেন—ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা রক্তাক্ত অধ্যায় Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story in history. হিন্দু যদি ইতিহাস না ভুলে যেত—যদি তা থেকে শিক্ষা নিত তবে ভারতের ইতিহাস হত অন্যরূপ। হিন্দু শেখেনি। তাই মাতৃভূমি হয়েছে বিভক্ত। রক্তস্নাত হয়েছে ভারত। কিন্তু সেই কি শেষ রক্তপাত? ডঃ আম্বেদকর বলেন বাস্তববাদীদের মনে রাখতে হবে, মুসলমান হিন্দুকে বলে "কাফের"। জীবনের সুরক্ষা নয়, বিনাশ যাঁদের বিধিনির্দিষ্ট। ইসলামের ঘোষিত আদর্শ সমগ্র পৃথিবীকে দার-উল-ইসলাম করা। Pan-Islam-এর লক্ষ্যও তাই। ভারত ভাগ করে মুসলমান মাত্র এক-তৃতীয়াংশকে দার-উল-ইসলাম করেছে; অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ এখনও দার-উল-হারব। মুসলমান ধর্মপ্রাণ। ধর্মের নির্দেশ মেনে তারা কি অবশিষ্ট ভারতকে দার-উল-ইসলাম করার চেষ্টা করবে না? ডঃ আম্বেদকর তাই প্রশ্ন করেন ঃ বাইরে থেকে মুসলমানের বিরোধিতা—অথবা ভেতরে থেকে বিরোধিতা—এই দুই-এর মধ্যে কোনটি নিরাপদ? (Should these Musalmans be without and against or should they be within and against?)[2] অবশ্যই প্রথমটি।

ভারতব্যাপী দাঙ্গা

খিলাফৎরাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে সুদূর কেরালার মালাবারে; উত্তোলিত হয় খিলাফতের জয় পতাকা। সেখান থেকে খিলাফতের মহতী বাণী ছড়িয়ে পড়ে ভারতের সর্বত্র—অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। মুসলমান ঘোষণা করে জেহাদ—শুরু হয় হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা। লাহোর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মোরাদাবাদ, দিল্লি, নাগপুর, আলিগড়, কলিকাতা, হায়দ্রাবাদ, সুরাট মাদ্রাজ। প্রায় ভারতব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় হিন্দুনিধন যজ্ঞ।

1. Dr. B. R. Ambedkar–Writings and Speeches, Vol-8, P-303-304
2. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-99

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি ছোট শহর কোহাট। শহরটি মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। জনসংখ্যার মাত্র চার-পাঁচ শতাংশ হিন্দু—নিতান্তই সংখ্যালঘু। ৯ সেপ্টেম্বর সকালে মুসলমান সকল হিন্দুর দোকান লুঠ করে ও পুড়িয়ে দেয়। ১০ সেপ্টেম্বর রাত্রে মাটির দেওয়াল ভেঙ্গে ঢুকে পড়ে শহরে, শুরু হল হত্যা, লুঠতরাজ, হিন্দু-নারী ধর্ষণ, ধর্মান্তর ও অগ্নি সংযোগ, সামান্য সংখ্যক পুলিশ ও মিলিটারি দাঙ্গা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। তারা তখন হিন্দুদের সরিয়ে নেয় ক্যান্টনমেন্টে। তা না হলে একজন হিন্দুও জীবিত থাকত না। কোহাট দাঙ্গা নিয়ে কংগ্রেসের সভায় আলোচনা হয়। মোতিলাল নেহেরু বলেন, "কোহাটে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে—ভারতে দীর্ঘদিন সেরকম ঘটনা ঘটেনি।" কিন্তু কাউকে এজন্য দায়ী করা হয় না। (This is not the time for us to apportion the blame upon the parties concerned)[1] মুসলীম লীগের প্রস্তাবে বলা হয় ঃ.... হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে—তা বিনা প্ররোচনায় হয়নি। বরং প্রকাশিত তথ্য থেকে ইহা প্রমাণিত যে মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে যথেষ্ট আঘাত (প্ররোচনা) দেওয়া হয়েছে এবং হিন্দুরাই প্রথম হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে। (The All India Muslim League feels to be its duty to place on record that the sufferings of Kohat Hindus are not unprovoked, but that on the contrary the facts brought to light make it clear that gross provocation was offered to the religious sentiments of the Musalmans and the Hindus were the first to resort to violence...)[2]

গান্ধী ও সৌকত আলি একসঙ্গে ঘটনার তদন্ত করেন। হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে এ সম্বন্ধে উভয়েই একমত হন। কিন্তু সৌকত আলি দায়িত্ব হতে মুসলমানদের অব্যাহতি দেন এই যুক্তিতে যে ৯ সেপ্টেম্বর অগ্নিসংযোগ ও গুলিচালনার ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা, আকস্মিক। কিন্তু পরদিন ১০ সেপ্টেম্বর হিন্দুরাই প্ররোচনা দেয়। গান্ধী দ্বিমত পোষণ করে বলেন ঃ দাঙ্গার সময় মন্দির ও একটি গুরুদুয়ারা ধ্বংস করা হয়—ভাঙ্গা হয় বিগ্রহ। অনেক বলপূর্বক ধর্মান্তরের ঘটনাও ঘটেছে। (A joint inquiry was made by Gandhi and Shaukat Ali, and as they differed on essential Points, both issued individual statements. There was not much difference about the atrocities committed by the Muslims. Shaukat Ali exonerated them on the ground that the burning and firing

1 R C Majumder–History of The Freedom Movement In India, Vol-III, P-230
2 R C Majumder–History of The Freedom Movement In India, Vol-III, P-230

on the 9th were quite accidental and the Hindus gave the first provocation on the 10th. Gandhi did not endorse this view and observed : During these days temples including a Gurudwara were damaged and idols broken. There were numerous forced conversions...)[1]

নিজামের গুলবার্গ শহর। সেখানেও হয় ব্যাপক হিন্দুহত্যা। ৫০টির বেশি মন্দির ধ্বংস হয়—চূর্ণ হয় বিগ্রহ। হিন্দুর প্রতিটি ধর্মীয় উৎসব—রামলীলা, দুর্গাপূজা, হোলি ও গণপতি উৎসব পরিণত হয় হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গায়। মুসলমানের সেই একই অভিযোগ, মসজিদের পাশ দিয়ে বাদ্যসহকারে হিন্দুর ধর্মীয় শোভাযাত্রা ইসলাম-বিরোধী।* মসজিদগুলিও প্রধান প্রধান সড়কের পাশেই অবস্থিত। রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা (যে ধরনের হোক না কেন) তো যাবেই। মুসলমানের মহরমের মিছিল তো রাস্তা দিয়েই যায়—রাস্তার দু'পাশে থাকে মন্দির। কিন্তু হিন্দু তো বাধা দেয় না। দাঙ্গা যাদের উদ্দেশ্য—তাদের কাছে যুক্তির মূল্য কি? ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ ভগৎ সিং-এর ফাঁসী হয়। ভারতের বহু শহরে এর প্রতিবাদে হয় হরতাল। উত্তর প্রদেশের কানপুর শহরেও হরতালের ডাক দেওয়া হয়। মুসলমান বিরোধিতা করে। ২৫ তারিখে তারা আক্রমণ করে হিন্দুদের। নির্বিচারে চলে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও হিন্দুহত্যা। প্রায় ৫০০ হিন্দু পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয় নেয়। ডাঃ রামচন্দ্র দাসের ক্ষতি হয় সর্বাধিক। তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী এবং পরিবারের সকলকে হত্যা করে মৃতদেহগুলিকে ফেলে দেওয়া হয় নর্দমায়। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য হিন্দুর আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। এই মিলন-প্রয়াস কতখানি সার্থক হয়েছে দেশ-ব্যাপী দাঙ্গা এবং হিন্দুনারীর প্রতি মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা প্রমাণিত। গোবিন্দপুর গ্রামে একটি হিন্দু পরিবারের ওপর চরম নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার অভিযোগে ইংরেজ সরকার অভিযুক্ত ৪০ জন মুসলমানকে গ্রেফতার করে। বিচারের দিন সরকার পক্ষের উকিলের (Crown Counsel) সওয়ালে ঘটনার বিবরণ ঃ

"গোবিন্দপুর গ্রামে রাধাবল্লভ নামে জনৈক হিন্দুর বাস । তার পুত্রের নাম হরেন্দ্র। ওই গ্রামেই বাস করত জনৈক মুসলমান রমণী—দুধ বিক্রি তার পেশা। গ্রামের মুসলমানদের সন্দেহ হয় ওই মুসলিম রমণীর সঙ্গে হরেন্দ্রর অবৈধ সম্পর্ক আছে। মুসলমান নারী হবে হিন্দুর রক্ষিতা! এ তো ইসলাম ধর্মের অপমান। মুসলমানরা স্থির করে রাধাবল্লভের পরিবারের উপর এর প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

* কোন মুসলমান দেশে এই ধরনের শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ নয়। তবে এদেশে মুসলমানের আপত্তির কারণ?

1. Ibid P-230-231

গোবিন্দপুর গ্রামের মুসলমানদের এক সভা আহ্বান করা হয়। সেখানে তলব পাঠানো হয় হরেন্দ্রকে। হরেন্দ্র সভায় যাওয়ার পরেই শোনা যায় তার আর্ত চিৎকার। জানা যায় যে হরেন্দ্রকে যথেচ্ছভাবে মারা হয়—এবং তার অচেতন দেহ সভাস্থলেই পড়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা এত অল্পে সন্তুষ্ট হয় না। তারা রাধাবল্লভকে জানায় যে তাঁর পুত্র তাদের প্রতি যে অন্যায় করেছে তার জন্য তাকে সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। রাধাবল্লভ তার স্ত্রী ও সন্তানদের অন্যত্র পাঠাবার কথা চিন্তা করে। মুসলমানরা তা জানতে পারে। পরদিন সকালে রাধাবল্লভেব স্ত্রী কুসুম বাড়ীর উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। এই সময় একদল মুসলমান সেখানে আসে; তারা কয়েকজন রাধাবল্লভকে ধরে রাখে—অন্যরা কুসুমকে নিয়ে চলে যায়। কিছুদূর গিয়ে লাকের ও মহাজার নামে দু'জন মুসলমান তাকে ধর্ষণ করে, খুলে নেয় তার অলঙ্কার। অচেতন কুসুমের জ্ঞান ফিরে এলে সে বাড়ির দিকে দৌড়ে পালায়। মুসলমানরা তার পেছনে ধাওয়া করে। যা হোক কুসুম ঘরে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে দেয়। মুসলমানরা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে তাকে রাস্তায় নিয়ে আসে। তাদের ইচ্ছা ছিল রাস্তার ওপরই কুসুমকে আবার ধর্ষণ করে। কিন্তু রজনী নামে অন্য মহিলার সাহায্যে কুসুম পালিয়ে রজনীর ঘরে আশ্রয় নেয়। (প্রতিশোধ নিতে) মুসলমানরা রাধাবল্লভকে উলঙ্গ করে তাকে নিয়ে শোভাযাত্রা বের করে। পরদিন মুসলমানরা রাস্তায় নজরদারির ব্যবস্থা করে যাতে রাধাবল্লভ বা কুসুম থানায় খবর দিতে না পারে। (There lived in Govindpur a Hindu by name Radha Ballavh. He had a son Harendra. There lived also in Govindpur a Muslim woman whose occupation was to sell milk. The local Musalmans of the Village suspected that Harendra had illicit reltionship with this milk woman. They resented that a Muslim woman should be in the keeping of a Hindu and they decided to wreak their vengeance on the family of Radha Ballabh for this insult. A meeting of the Musalmans of Govindpur was convened and Harendra was summoned to attend this meeting. Soon after Harendra went to the meeting, cries of Harendra were heard. It was found that Harendra was assaulted and was lying senseless in the field where the meeting was held. The Musalmans of Govindpur were not satisfied with this assault. They informed Radha Ballabh that unless he, his wife and his children embraced Islam the Musalmans did not feel satisfied for the wrong his son

had done to them. Radha Ballabh was planning to send away to another place his wife and children. The Musalmans came to know this plan. Next day when Kusum, the wife of Radha Ballabh was sweeping the courtyard of her house, some Mahamedans came, held down Radha Ballabh and some spirited away Kusum. After having taken her to some distance two Mahamedans by name Laker and Mahazar raped her and removed her ornaments. After some time, she came to her senses and ran towards her home. Her assailants again persued her. She succeeded in reaching her home and locking hereself in. Her Muslim assailants broke open the door, caught hold of her and again carried her away on the road. It was suggested by her assailants that she should be again raped on the street. But with the help of another woman by name Rajani, Kusum escaped and took shelter in the house of Rajani. While she was in the house of Rajani the Musalmans of Govindpur paraded her husband Radha Ballabh in the streets in complete disgrace. Next day the Musalmans kept watch on the roads to and from Govindpur to the Police Station to prevent Radha Ballabh and kusum from giving information of the outrage to the police.)[1]. ইসলামের জন্য বলপূর্বক ধর্মান্তর, হিন্দু নারীর প্রতি বর্বর কুৎসিত লালসা, নির্দ্বিধায় নারীত্বের চরম লাঞ্ছনা—মুসলিম বিজেতা ও শাসকদের এক অক্ষয় কীর্তি। গোবিন্দপুরের সাধারণ মুসলমানও তাদের মহান পূর্বপুরুষদের এই গৌরবময় ঐতিহ্যের যোগ্য উত্তরসাধক।

সিন্দু প্রদেশের সুকুর। ১৯৩৯ সালের নভেম্বর। মুসলমান একটি সরকারি বাড়ি জোরে করে দখল করতে গেলে হিন্দুরা বাধা দেয়। উভয় পক্ষে সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত হয়। সেই দাঙ্গার তদন্তে নিযুক্ত হন Mr. E. Weston—যিনি পরবর্তীকালে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। তাঁর প্রদত্ত রিপোর্টে হতাহতের তালিকা ঃ[2]

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-185-186
1. Ibid, P-182

Taluka	Murders Committed		Persons Injured		Persons died from injuries	
	Hindus	Maha-medans	Hindus	Maha-medans	Hindus	Maha-medans
Sukkur Town	20	12	11	11	1	-
Sukkur Taluka	2	2	23	-	5	-
Shikarpur"	5	-	11	-	2	-
Garhiyasin"	24	-	4	-	-	-
Rohri "	10	-	3	-	-	-
Pano Akil "	6	-	1	-	-	-
Ghorki "	1	-	1	-	-	-
Mirpur	-	-	1	-	-	-
Mathelo "	-	-	-	-	-	-
Ubauro	4	-	3	1	1	-
	72	14	58	12	9	-

১৯২০ সাল হতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত দেশব্যাপী দাঙ্গার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ডঃ আম্বেদকর বলেন, একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে এই ২০ বছরের ইতিহাস হল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গৃহযুদ্ধের ইতিহাস। (Such is the rocord of Hindu-Muslim relationship from 1920 to 1940....It is a record of twenty years of civil war between the Hindus and the Muslims in India.)[1] এই ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট হল নারীহরণ। বাংলা সরকার* ১৯৩২ সালের ৬-ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় জানান যে, ১৯২২-১৯২৭ শুধুমাত্র এই পাঁচ বছরে ৫৬৮ জন মহিলাকে অপহরণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১০১ জন কুমারী ও ৪৬৭ জন বিবাহিতা। বিবাহিতাদের মধ্যে হিন্দু-৩৩১, মুসলমান-১২২, খ্রীস্টান-২, অন্যান্য-১২। সাধারণত এই ধরনের ঘটনার ১০% পুলিশকে জানানো হয়—বাকী ৯০% সমাজ ও লোকলজ্জার ভয়ে গোপন রাখা হয়। এই হিসাবে ১৯২২-১৯২৭ এই পাঁচ

* সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান সহজপ্রাপ্য নয়।

1 Ibid. P-184

বছরে প্রায় ৩৫০০০ নারী অপহৃত হয়। (Usually, about 10 p.c. of the cases are reported or detected and 90 P.C. go undetected, Applying this proportion....It may be said that about 35000 women were abducted in Bengal during the short period of five years between 1922-27)[1]

হিন্দু কর্তৃক মুসলিম নারী হরণ ও তাকে বিবাহ করা এক বিশেষ ব্যতিক্রম। হিন্দুর মানসিকতা ও সামাজিক অনুশাসন তার প্রধান কারণ। পক্ষান্তরে দাঙ্গা বা অন্য সময়েও মুসলমানের প্রথম লক্ষ্য হিন্দু নারী। তার চবম লাঞ্ছনায় মুসলমানের চরম তৃপ্তি ও উল্লাস। অপহৃতা অসহায়া হিন্দু-রমণীকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে সাদী করলে মুসলমান সমাজে হয় অভিনন্দিত।

দেশ বিভাগের পূর্বে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত ছিল ৪ : ১। মোট জনসংখ্যায় ১/৪ ভাগ মুসলমান। কিন্তু দাঙ্গার ইতিহাস থেকে এ সিদ্ধান্তে না এসে পারা যায় না যে সংখ্যালঘু হয়েও মুসলমান আক্রমণকারীর ভূমিকায় এবং হিন্দু আক্রান্ত। এর কারণ বোধ হয় হিংসা ও হত্যা সম্বন্ধে মুসলমান ও হিন্দুর ধারণায় মৌলিক পার্থক্য। বিধর্মীর বিরুদ্ধে জেহাদ ইসলামের স্থায়ী বিধান। দাঙ্গা যত ক্ষুদ্র আকারেই হোক না কেন—মুসলমান তাকে জেহাদ বলেই মনে করে।* বিধর্মীহত্যা তাই পূণ্যের—মৃত্যুর পর গতি হয় বেহেস্তে (স্বর্গে)। অন্যদিকে হিন্দুর ধর্ম মানুষকে ধর্মের নিরীখে বিচার করে না। সে ধর্মে নরহত্যা পাপ। শাস্তি—নরকবাস। সিন্ধু প্রদেশের সুকুরের দাঙ্গার তালিকায় দেখা যায়, মুসলমানের প্রায় পাঁচগুণ হিন্দু হতাহত হয়েছে। গোবিন্দপুরের ঘটনায় কুসুম-রাধাবল্লভের উপর যে চরম নির্যাতন হয়েছে—তাতে গ্রামবাসী হিন্দুর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। হত্যা অন্যায়—কিন্তু আত্মরক্ষা মানুষের স্বাভাবিক ও সঙ্গত অধিকার। হিন্দু সে অধিকার প্রয়োগ করার শক্তিও হারিয়েছে। Will Durant যথার্থই বলেছেন ঃ "বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব হিন্দুকে কঠিন জীবনযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় অযোগ্য করে তুলেছে।" রাষ্ট্রনীতিতে "অহিংসা-নীতি" তাকে করেছে পৌরুষহীন।

Pan-Islam ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তত্ত্বগতভাবেই পরস্পর-বিরোধী। এই বিরোধিতাই হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের অন্যতম প্রধান কারণ। খিলাফৎ আন্দোলনে মহম্মদ আলি ছিলেন গান্ধীর প্রধান ও বিশ্বস্ত সহকর্মী। তিনি ছিলেন এদেশে Pan-Islam

---

* ধর্মশিক্ষা মুসলমানের শিক্ষা ব্যবস্থার আবশ্যিক অঙ্গ। প্রধানত মাদ্রাসায় এই শিক্ষা দেওয়া হয়। মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী ঃ কোরান, ইসলামি ধর্মশাস্ত্র, মুসলিম ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়, আফগানিস্তানের "তালিবান" শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা মাদ্রাসায়। রাশিয়ার চেচেনিয়া, ভারতের কাশ্মীর এবং বিশ্বের সর্বত্র যে সকল মুসলিম জঙ্গীগোষ্ঠী সক্রিয় তারা সকলেই মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত।

---

1. Ibid, P-185

আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা। তাঁর মতে ভারতের মুসলমান Pan-Islam আদর্শের দ্বারা পরিচালিত। ১৯২৩ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন ঃ 'ভারত বহির্ভূত দেশের প্রতি সহানুভূতি ইসলামের সার তত্ত্ব। (...extra-territorial sympathies are part of the quintessence of Islam)[1] গোল টেবিল বৈঠকের সদস্যদের তিনি এই **extra-territorial** সহানুভূতি বা আনুগত্যের ব্যাখ্যা করে বলেন—"ইসলাম শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমি সম আকারের দু'টি বৃত্তের অন্তর্গত। কিন্তু বৃত্ত-দ্বয় সম বা এককেন্দ্রিক নয়। একটি হল ভারত, অন্যটি মুসলিম বিশ্ব।....আমরা জাতীয়তাবাদী নই, অতি-জাতীয়তাবাদী। (I belong, said he, to two circles of equal size but which are not concentric, one is India and the other is the Muslim world...we are not nationalists but supernationalists.)[2] তার আনুগত্য ও সহানুভূতি সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে কি? যদি থাকে তিনি তা নিরসন করেছেন। ১৯৩০ সালের বম্বে শহরে অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত মুসলিম সম্মেলন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২০,০০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন এই সম্মেলনে। সেই সম্মেলনে মহম্মদ আলির দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা ঃ আমরা গান্ধীর (আর মহাত্ম নন) সঙ্গে নেই। কারণ তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা নয়; তা হল ভারতের সাত কোটি মুসলমানকে হিন্দু মহাসভার উপর নির্ভরশীল করে রাখা। (We refuse to join Mr (No longer Mahatma?) Gandhi, because his movement is not a movement for the complete independence of India but for making the seventy millions of Indian Musalmans dependants of the Hindu Mahasabha.)[3]

মোগল সাম্রাজ্যের পতন হলে ভারতে মুসলিম রাজত্বের ঘটে অবসান। ভারত আবার দার-উল-হারব। কিন্তু মুসলমান তা মেনে নিতে পারে না। ভারতকে দার-উল-ইসলাম করা তার ধর্মীয় লক্ষ্য। "জেহাদ" তার জন্য ধর্ম নির্দেশিত পথ। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে—সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমান যুগপৎ ইংরেজ ও হিন্দুর বিরুদ্ধে ঘোষণা করে জেহাদ। পরবর্তীকালের "ফর্জ", "ওয়াহাবি" ও ১৯২০ সালের "খিলাফৎ আন্দোলনও" ছিল হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের "জেহাদ"। তারপর দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন দাঙ্গারূপে আবির্ভাব ঘটে জেহাদের। ইতিমধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল হয়। দেখা দেয় ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা। ভারতে মুসলিম শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব বুঝতে পেরে মুসলমান স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্রের দাবি করে। দাবি আদায়ের জন্য দাঙ্গা হয় তার হাতিয়ার।

1. R. C. Majumder—History of the Freedom Movement in India, Vol-III, P-451
2. Ibid, P-451
3. Ibid, P-451

মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

কলকাতা দাঙ্গা

১৯৪৬ সালের ২৭ জুলাই মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ১৬ আগস্টকে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" (Direct Action Day) রূপে পালনের আহ্বান জানায়। মুসলিম মহল্লায় ধ্বনি ওঠে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"। Direct Action-এর প্রস্তাব গ্রহণ করে মহম্মদ আলি জিন্না উল্লাস ও সংকল্প প্রকাশ করে বলেন—"What we have done today is the most historic act in our history. Never have we in the whole history of the League done anything except by constitutional methods and by constitutionalism....Today we have also forged a pistol and are in a position to use it."[1] বাংলায় তখন মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা। গান্ধীর প্রিয় ভ্রাতা সুরাবর্দী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। হিন্দু-মেধ যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ। ৫ আগস্ট ১৯৪৬—কলকাতা থেকে প্রকাশিত The Statesman পত্রিকায় সুরাবর্দি "শহীদ" এই ছদ্মনামে এক প্রবন্ধে লিখলেন ঃ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত যদি মহৎ কাজের জন্য হয় তবে তা খারাপ নয়। আজ মুসলমানের নিকট পাকিস্তান দাবি অপেক্ষা প্রিয় ও মহত্তম আর কিছু নেই (Bloodshed and disorder are not necessarily evil in themselves if resorted for a noble cause. Among Muslims today no cause is dearer or nobler than Pakistan)[2] মুসলমান দাঙ্গা-বাজদের সুরক্ষার জন্য পাঞ্জাব থেকে ৫০০ মুসলমান পুলিশ আনা হয়েছে। ১৬ আগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হল। বিভিন্ন উর্দু পত্রিকায় ছাপা হল মুসলিম লীগ নেতাদের প্ররোচনামূলক বিবৃতি। বিলি করা হয় লক্ষ লক্ষ উত্তেজনাপূর্ণ প্রচার পত্র। একটি উর্দু পত্রিকায় লেখা হয়—"এই রমজান মাসে ইসলাম ও কাফেরদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়।...এই রমজান মাসেই আমরা মক্কায় জয় লাভ করি এবং পৌত্তলিকদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দেই। এই মাসেই ইসলামের বনিয়াদ স্থাপিত হয়। আল্লার ইচ্ছায় পাকিস্তান লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদ আরম্ভ করিবার জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এই রমজান মাস ঠিক করিয়াছে"।[3] মুসলিম লীগের সেক্রেটারি ও কলকাতার মেয়র ওসমানের স্বাক্ষরে এই প্রচারপত্রটি প্রচারিত হয়।

1. R. C. Majumder–History of The Freedom Movement in India, Vol-III, P-642-643
2. Leonard Moslay–The Last Days of the British Raj, P-27
3. আর। সি। মজুমদার —বাংলা দেশের ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪০৪

"১৫ আগস্ট (১৯৪৬) রাত্রিতে মুসলিম লীগের স্বেচ্ছা-সেবকরা কুচকাওয়াজ করিল, জেহাদের কথা লরীযোগে মুসলমান পাড়াগুলিতে প্রচার করিয়া বেড়াইল—এবং সঙ্গে "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" এই ধ্বনি শোনা গেল।

"১৬ আগস্ট শুক্রবার ভোর না হতেই দলে দলে মুসলমানরা পথে বাহির হইয়া পড়িল এবং দোকানদারদের দোকান বন্ধ করিবার জন্য জিদ করিল। তার পরেই আরম্ভ হইল দোকান লুঠ এবং দোকানের লোকদের প্রহার ও ছুরিকাঘাত। ইতিমধ্যে মানিকতলা, রাজাবাজার, মেছুয়াবাজার, টেরিটিবাজার. বেলগাছিয়া প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিতে হিন্দুদের উপর আক্রমণ শুরু হয়। ...এইরূপে পথে গুণ্ডামি করিয়া নানা দিক হইতে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহারা গড়ের মাঠে সভায় যোগদান করে। তাহাদের প্রত্যেকের হাতেই লাঠি, ছোরা, তরবারি প্রভৃতি কোন না কোন অস্ত্র ছিল। ময়দানের সভায় কাফের হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়া হয়। সভার পর জেহাদের সৈনিকরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া হিন্দুদের দোকান লুণ্ঠন ও হিন্দুদের হত্যা আরম্ভ করে। ....শহরের যে সব স্থানে মূলমানেরা সংখ্যায় কম, সেই সব স্থানে লরীযোগে লোক পাঠাইয়া স্থানীয় মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার মধ্যেই শহরের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম পর্যন্ত আগুন জ্বলিয়া ওঠে। সর্বত্র মুসলমানেরা আক্রমণ চালাইতে থাকে এবং আক্রান্ত হিন্দুরা পুলিশকে টেলিফোন করিয়া ও সম্মুখে পুলিশ দেখিলে তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া একই উত্তর পাইতে থাকে—রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার হুকুম নাই। ...নরহত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি পুলিশের চক্ষের উপর ঘটিয়াছে, বাধা দেওয়া দূরের কথা, কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ এবং সার্জেন্টরা লুঠের মালের ভাগ আদায় করিয়াছে।"[1]

ইংরেজ ঐতিহাসিক Leonard Mosley-র বর্ণনায় প্রথম দিনের ঘটনা। সকাল হতেই তারা হাওড়া হতে গঙ্গা পার হয়ে কলকাতায় এল। তাদের হাতে ছিল লাঠি, ছোরা, লোহার রড...তারা দরজা বা গলিতে অপেক্ষা করছিল...। ১৬ আগস্ট বেলা দুটায় শহীদ সুরাবর্দি ময়দানের এক বিরাট জনসভায় জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি ছিলেন বেশ উত্তেজিত-উচ্ছ্বসিত। শ্রোতারা যে অধিক সংখ্যায় সভায় এসেছেন এবং পাকিস্তানের জন্য তাদের সক্রিয় ভূমিকা ও উৎসাহের জন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ দেন। (They crossed the Hooghly River from Howrah into Calcutta soon after dawn. They were armed with lathi, knives, bottles...or other kinds of iron bars...They waited in doorways and alley ways...At two o'clock on the afternoon of 16th Aug. 1946 Mr Saheed Sharawardy

1. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস—৪ খণ্ড পৃঃ ৪০৬-৪০৭

addressed a mass meeting in the Maiden, Calcutta's main square. He was in an ebullient mood and thanked his listeners for their numbers, their enthusiasm and their active work for Pakistan).[1]

প্রথম দুইদিন মুসলমান তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী অভাবনীয় সাফল্যের সঙ্গে হিন্দুমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। সেই একই ইতিহাস—হত্যা, হিন্দু নারী ধর্ষণ, অপহরণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ। এ কাজ যাতে নির্বিঘ্নে হয় সুরাবর্দি তার সুব্যবস্থা করেছিলেন। "....দাঙ্গা বেধে যাওয়ার পর সুরাবর্দি (লালবাজার) পুলিশ কন্ট্রোল রুমকেই ঘরবাড়ি করে ফেলেছিলেন এবং পুলিশ পাঠানো না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর এই হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য নাকি ছিল মুসলিমদের রক্ষার জন্য পুলিশ নিয়োগ না করা।...সুরাবর্দির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের অভিযোগ পুলিশই করেছিল।"[2]

দাঙ্গা থেমে যাওয়ার পর ভাইসরয় কলকাতা এসেছিলেন। তিনি পুলিশ কমিশনার, গভর্নর এবং আরও অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে ডায়েরিতে লিখেছেন ঃ "আমার মনে সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা এই যে (প্রধানমন্ত্রী) সুরাওয়ার্দি মুসলিম লীগের বন্ধুগণ সহ সংগ্রামের প্রথম দিনে (১৬ আগস্ট) প্রায় সর্বদাই পুলিশ অফিসের যে ঘর হইতে শহরের সর্বত্র পুলিশের গতিবিধি ও কার্যক্রম সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয় (Control Room) সেইখানে ছিলেন এবং তাঁহার সাম্প্রদায়িক মনোভাব।"[3] সুরাবর্দি সম্বন্ধে জেনারেল বুশারও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন যে, 'দাঙ্গার তৃতীয় দিনে, অর্থাৎ ১৮ আগস্ট তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দির সঙ্গে গাড়ি করে সারা শহর ঘুরে বেড়ান তখন তিনি লক্ষ্য করেন যে সুরাবর্দির মনোভাব পুরাপুরি সাম্প্রদায়িক'।[4]

ভাইসরয় দিল্লি থেকে উড়ে এসেছেন কলকাতায়। আসতে পারেননি জওহরলাল নেহেরু। তিনি দিল্লিতে মন্ত্রিসভা গঠনে ব্যস্ত। কিন্তু বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি ছিলেন খুবই সক্রিয়। "কলিকাতায় হাঙ্গামার পর বঙ্গীয় আইন পরিষদে উহা লইয়া যে আলোচনা হয় তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল যে পার্ক স্ট্রীট থানায় আনীত সাতজন অভিযুক্ত আসামীকে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী (সুরাবর্দি) আসিয়া মুক্ত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।"।[5]

কলকাতা-দাঙ্গার জন্য সকলেই সুরাবর্দিকে অভিযুক্ত করেছেন। এ দাঙ্গার পরিকল্পনাই তাঁর। সৈন্যবাহিনী ও পুলিশকে ব্যারাকে রেখে তিনি মুসলমানদের নির্ভয়ে হিন্দু-হত্যায়

1. Leonard Moslay—The Last Days of the British Raj, P-28, 30
2. শংকর ঘোষ—হস্তান্তর (৮-ম পর্ব) সাপ্তাহিক দেশ—২১-২-৯৮
3. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪১১
4. শংকর ঘোষ—হস্তান্তর (৮-ম পর্ব) সাপ্তাহিক দেশ—২১-২-৯৮
5. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪০৯

সুযোগ দিয়েছেন। Leonard Moslay লিখেছেন ঃ "যখন হিন্দু-শিখ জনতা প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হয় তখন তিনি সেনা তলব করেন।" (It was only when the Hindus and Sikhs had come out in retaliation then the chief Minister had called for military aid.)[1]

মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে বড়লাট ওয়াভেল লন্ডনে ভারত সচিবের নিকট নিম্নোক্ত বার্তা পাঠান ঃ

"১৬-১৮ আগস্টের মধ্যে কলিকাতার এই সকল দাঙ্গায় ৪৪০০ জন হত, ১৬০০০ আহত এবং এক লক্ষ লোক গৃহহীন হয়েছে"[2]। প্রবাসী পত্রিকার মতে, "ছয় হতে আট হাজার লোক নিহত হয়; পনেরো হতে কুড়ি হাজার আহত হয় এবং পাঁচ হতে সাত কোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। লুণ্ঠিত সম্পত্তির শতকরা নব্বই ভাগ হিন্দুর"।[3]

হিন্দুকে চরম শিক্ষা দিবার উদ্দেশেই কলকাতায় হিন্দু-নিধন। সুতরাং মুসলমান দাঙ্গাবাজদের মুসলমান প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি রক্ষা করবেন—ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যা অস্বাভাবিক—তা হল ঘটনার কয়েক বৎসর পরও সুরাবর্দিকে বাঁচাবার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর চেষ্টা। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বিবরণীতে—"এই ঘটনার সাত বৎসর পর এই গ্রন্থের লেখক (রমেশ চন্দ্র মজুমদার) ভারত সরকার কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রণয়নের ভারপ্রাপ্ত* হইয়া সরকারী গোপনীয় কাগজপত্র দেখিবার অনুমতি পান। দিল্লীর দপ্তরখানায় কলিকাতা ১৯৪৬ সনের দাঙ্গা সম্বন্ধে একটি ফাইলে দিল্লী হইতে বাংলায় প্রেরিত গুপ্তচর সোজাসুজি দিল্লী সরকারকে (বাংলা সরকারের অজ্ঞাতে) যে সব রিপোর্ট পাঠাইতেন তাহা রক্ষিত আছে। ইহাতে এমন সব দলিলপত্র আছে যাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে প্রধানমন্ত্রী সুরাওয়ার্দি নিজে ১৬ আগস্টের দাঙ্গার ব্যবস্থা করেন। যে গুণ্ডা এই দাঙ্গার প্রধান নায়ক ছিল তাহার নাম আছে, এবং পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে নিলে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং গিয়া তাহাকে মুক্তি দেন, ইহারও উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের লেখক এই দলিলগুলির কপি নিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু অনুমতি পান নাই—প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল

* মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। রমেশ চন্দ্র মজুমদার সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন—এই কারণ দেখিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রণয়নের দায়িত্ব দেন ডঃ তারাচাঁদকে। পরে রমেশ বাবু সুবৃহৎ তিন খণ্ডে History of The Freedom Movement in India প্রকাশ করেন। প্রামাণ্য ইতিহাসরূপে তাঁর বই আজ সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রচারিত।

1. Leonard Moslay—The Last days of the British Raj P-33
2. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস—৪ খণ্ড পৃঃ ৪১২
3. ঐ পৃঃ ৪০৮-৪০৯

নেহেরুকে অনুরোধ করিয়াও কোন ফল হয় নাই, কিন্তু তিনি কি কারণে তখনকার পরিস্থিতিতে এই সমুদয় ছাপানো উচিত নহে তাহা বর্তমান লেখককে বুঝাইয়া বলেন।"[1]

কলিকাতা-দাঙ্গার সাত বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৩ সাল। ভারত ভাগ করে গঠিত হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্র। তখন কলিকাতার হিন্দু-নিধনের গোপন দলিল প্রকাশিত হলে সুরাওয়ার্দির ভাবমূর্তি হয়তো ম্লান হত। সেই কারণেই কি নেহেরুর আপত্তি?

নোয়াখালিতে হিন্দু-নিধন

১৬ আগস্ট কলকাতায় হিন্দু-মেধ যজ্ঞে মুসলমান পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারেনি। দাঙ্গার তৃতীয় দিনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে হিন্দু-শিখ জনতা গড়ে তোলে প্রতিরোধ। সফল হয় না জেহাদের উদ্দেশ্য। ক্রুদ্ধ মুসলমান হিন্দুকে চরম শিক্ষা দিতে বেছে নেয় রাজধানী কলকাতা হতে বহুদূরে পূর্ব বাংলার নোয়াখালি জেলা। এই জেলার লোকসংখ্যার ৮২% মুসলমান; হিন্দু মাত্র ১৮%। জায়গাটা নদী-খাল ঘেরা দুর্গম। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তদানীন্তন সম্পাদক আবুল হাশিম লিখছেন, ২৯ আগস্ট নোয়াখালি জেলায় হঠাৎ আকস্মিক উত্তেজনার সৃষ্টি হল। "মৌলানা গোলাম সারওয়ারের* নেতৃত্বে ৭ সেপ্টেম্বর নোয়াখালির মৌলবীদের এক সভায় ঘোষণা করা হয় যে কলকাতা হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমানদের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। নোয়াখালি এবং কুমিল্লার সর্বত্র দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল এবং সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পূর্ববঙ্গের সমস্ত জেলাব্যাপী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ত। সুরাবর্দি আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছিলেন।"[2] সুরাবর্দির এই আপ্রাণ প্রচেষ্টার রকমটা কি তা সুচেতা কৃপালনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন। মৌলবীদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুরু হয় ব্যবস্থা গ্রহণ। হিন্দুদের পলায়ন পথ বন্ধ করতে রাস্তা কেটে দেওয়া হয়, উপড়ে ফেলা হয় রেল লাইন। নৌকা, লঞ্চ ও স্টীমার দিয়ে অবরোধ করা হয় জলপথ। অতঃপর ১০ অক্টোবর লক্ষ্মী পূজার দিন স্থানীয় বিধান সভার সদস্যের নেতৃত্বে ২৫০ বর্গ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত অঞ্চলে শুরু হয় ব্যাপকভাবে হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, শত শত হিন্দু নারী অপহরণ, ধর্ষণ ও চরম লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ মুসলমানের ঘরে আটক রাখা, বলপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তর প্রভৃতি। কোন কোন স্থানে সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের চেষ্টা করলে সেই পরিবারের সকলকে হত্যা করার ঘটনা মধ্যযুগের ব্যাপক বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কাহিনীকেও হার মানিয়েছে।

---

* দাঙ্গার পরে গান্ধী নোয়াখালি গেলে তাঁর দেখাশুনার দায়িত্ব দেওয়া হল মুসলীম লীগের M. L. A. এই গোলাম সারওয়ারের ওপর।

---

1. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস—৪ খণ্ড পৃঃ ৪০৫
2. সাংবাদিক শংকর ঘোষ—হস্তান্তর (৯ পর্ব) সাপ্তাহিক দেশ, ৭-৯-৯৮

প্রায় এক সপ্তাহকাল সুরাবর্দির মন্ত্রিসভা অথবা বাংলা সরকারের নির্দেশে এই নির্মম অত্যাচারের কাহিনী গোপন রাখা হয়েছিল, ১৭ অক্টোবর সর্বপ্রথম এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। "সংবাদপত্রের বিবরণ অনুসারে পাঁচ হাজার লোক হত ও ইহার বহুগুণ আহত এবং প্রায় দেড় লক্ষ লোকের গৃহ বিধ্বস্ত হয়।"[1] বাংলা সরকার এডওয়ার্ড স্কিনার সিম্পসন (Edward Skinner Simpson) নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ সাহেবকে ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দেন। তাহার রিপোর্টে তিনি মুসলিম লীগ দল ও মন্ত্রিসভাকে এই বীভৎস ঘটনার জন্য দায়ী করেন। সরকার এই রিপোর্ট প্রকাশ না করে চেপে রাখেন। যাহোক রিপোর্টের একটি কপি The Statesman পত্রিকার হস্তগত হয়। সম্পাদক অনেক কাঁটছাঁট করে যেটুকু ছেপেছিলেন, নিম্নে তার ভাবার্থ দেওয়া হল ঃ "নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার যেখানে যেখানে মুসলমান আক্রমন চালাইয়াছিল, তাহার প্রায় সর্বত্রই বাড়িঘর, জিনিসপত্র, দোকানপাটের এমন নির্মূল ভাবে ধ্বংস ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে যে বিরাট ধ্বংসাবশেষের পুঞ্জীভূত স্তূপ ছাড়া আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। ...ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর থানার অন্তর্গত বাইচরের দৃশ্য অবর্ণনীয়। উন্মত্ত হিংস্র জনগণের ধ্বংসাত্মক কার্যের সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করিতে হইলে এই স্থানটি দেখা দরকার।

এই রিপোর্টে ধর্ষিতা হিন্দু-নারীর সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু অনেকে এই সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় সঠিক সংখ্যা বলা যায় না। কিন্তু উক্ত কর্মচারীটির কাছে অনেকে সাধারণভাবে রিপোর্ট করিয়াছেন এবং কোন কোন বাড়ীতে বা স্কুল ঘরে হিন্দু-স্ত্রীলোকদিগকে ৩/৪ দিন আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল।

জোর করিয়া ব্যাপকভাবে দলে দলে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত (Mass Conversion) করার বিবরণ প্রত্যেক গ্রামেই পাওয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে পুরুষেরা আপত্তি করিলে তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে আটক করিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। অনেককে প্রাণবধের ভয় দেখাইয়া ধর্ম পরিবর্তন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।"* [2]

নোয়াখালি দাঙ্গার বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন বাঙালী মুসলমান ভাল (যেন শুধু অবাঙালী মুসলমানই যত অশান্তির কারণ)। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে। তাদের এক ভাষা, এক সংস্কৃতি। যদিও এই সকল ব্যক্তিরা জানেন যে মুসলমান কখনও নিজেকে বাঙালী, বিহারী বা মাদ্রাজী বলে পরিচয়

---

* ভারতে যে কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান হয়েছে, তাঁদের এইভাবেই বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। ইসলামের আধ্যাত্মিক তত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে কেহ মুসলমান হয়নি।

1. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস—৪ খণ্ড, পৃঃ ৪১৮
2. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস—৪ খণ্ড, পৃঃ ৪২০

দেয় না। "মুসলমান"—এই তার একমাত্র পরিচয়। ভারতে হাজার বছর ধরে মামুদ-বাবর-নাদির শাহরা যে অত্যাচার করেছে, কলকাতা-নোয়াখালির বাঙালী (?) মুসলমানও বাঙালী হিন্দুর ওপর সেই একই অত্যাচার করেছে। অত্যাচারের পদ্ধতি ও প্রকৃতিও এক। এটাই তো স্বাভাবিক। উভয়েরই মূল প্রেরণা তো পবিত্র ইসলাম ধর্ম। নোয়াখালিতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাষিত হয়েছে।

ইংরেজ আই. সি. এস. অফিসার এ. আই. রোম্যান (উত্তর প্রদেশে কর্মরত) উত্তর প্রদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থকে বাংলার দাঙ্গা সম্বন্ধে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি বলেন ঃ "এ সত্যটি গোপনের চেষ্টা করে লাভ নেই যে গুন্ডারা বাংলাকে ধ্বংস করছে তাদের নেতা হচ্ছেন সুরাবর্দি ও তাঁর মন্ত্রীরা।"[1]

কলকাতা থেকে শংকর ঘোষ সহ চার জন সাংবাদিক গিয়েছিলেন নোয়াখালিতে দাঙ্গার রিপোর্ট করার জন্য। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা না থাকায় তাঁরা নোয়াখালির অভ্যন্তরে ঢুকতে পারছিলেন না। সেই সুযোগ ঘটল যখন চাঁদপুর স্টেশনে হঠাৎ একদিন তদানীন্তন চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট রণজিৎ গুপ্তের সঙ্গে দেখা হয়। রণজিৎ গুপ্তকে (পরে ইনি পঃ বাংলার মুখ্য সচিব হয়েছিলেন) সুরাবর্দি সরকার নোয়াখালির দাঙ্গার তদন্তের ভার দিয়েছিলেন। 'তাঁর উপর তদন্তের ভার ছিল', লিখছেন শংকর ঘোষ, "কিন্তু নোয়াখালির অভ্যন্তরে হাজার-হাজার আটক হিন্দুদের উদ্ধার করার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়নি। অথচ তদন্তের কাজে তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই হিন্দুরা তাঁদের দুর্দশা ও লাঞ্ছনার বর্ণনা করে বন্দিদশা থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁকে বলতেন।...তাই তিনি একটি কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য একটি সশস্ত্র রক্ষিবাহিনী সর্বত্র তাঁর সঙ্গে যেত। রণজিৎ গুপ্ত তদন্তের জন্য যে গ্রামে যেতেন সেখানকার হিন্দুরা তাঁকে নিরাপদে কোনও আশ্রয়ে নিয়ে যেতে বললে তিনি তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিতেন যে তাঁর সে ক্ষমতা নেই তবে তাঁরা ইচ্ছা করলে তিনি যখন ফিরে যাবেন তখন তাঁর দলের পিছু পিছু গ্রাম ছেড়ে আসতে পারেন। এই কৌশলে তিনি কয়েক হাজার নর-নারীকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। তাতে মুসলিম আক্রোশ বাড়তেই থাকে। একদিন যখন তাঁর সশস্ত্র রক্ষীদের পিছন পিছন এরকম একটি দুর্গত নরনারীর দল গ্রাম ছেড়ে চলে আসছে তখন একটি বিরাট মুসলিম জনতা তাদের আক্রমণ করে খুন-জখম, লুঠপাট শুরু করে দেয়। রণজিৎ গুপ্ত তখন তাঁর রক্ষিদের গুলি চালাবার নির্দেশ দেন। যত দূর মনে পড়ছে, ওই গুলি চালনায় উন্মত্ত মুসলিম জনতার জন কুড়ি মারা গিয়েছিলেন। মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভা রণজিৎ গুপ্তের কৈফিয়ত তলব করেছিল।"[2]

---

1. শংকর ঘোষ—হস্তান্তর (৯ম পর্ব) সাপ্তাহিক দেশ—৭-৩-৯৮
2. শংকর ঘোষ—হস্তান্তর (৯ম পর্ব) সাপ্তাহিক দেশ—৭-৩-৯৮

নোয়াখালির হিন্দু-নিধন সম্বন্ধে সাংবাদিক শংকর ঘোষ বলেন ঃ "নোয়াখালি ও ত্রিপুরার হাঙ্গামা যে পর্যন্ত যা দেখেছিলাম এবং পরে গাঁধীজির সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে যা জেনেছিলাম তাতে কলকাতার দাঙ্গার সঙ্গে ওই দুটি জেলার হাঙ্গামার তফাতটি বেশ চোখে পড়ছিল। কলকাতায় যা ঘটেছিল সেটি দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমান দু'টি সম্প্রদায়ই তাতে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল...কিন্তু নোয়াখালি ও ত্রিপুরাতে যা হয়েছিল সবই একতরফা। এই দুই জেলায় যা ঘটেছিল তাকে দাঙ্গা বলা যায় না, হাঙ্গামা বললেও ঠিক বোঝানো যাবে না। কেননা এই দুই জেলায় কোথাও হিন্দু প্রতি-আক্রমণ তো দূরের কথা, প্রতিরোধও করতে পারেনি। বিশেষ করে নোয়াখালিতে যা হয়েছিল তা ছিল হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করার অভিযান।"[1]

আচার্য কৃপালনি, তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি। সুরাবর্দি সরকারের অসহযোগিতার জন্য দু'বারের চেষ্টায় তিনি নোয়াখালি যেতে পেরেছিলেন। তারপর গিয়েছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শরৎ বসু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। বাংলার মেয়ে সুচেতা কৃপালনি স্বামীর সফর সঙ্গিনী হয়েছিলেন। মুসলমানের যৌন লালসা হিন্দু নারীদের মধ্যে এরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল যে সুচেতা কৃপালনি সঙ্গে নিয়েছিলেন তীব্র বিষ আর্সেনিক। যদি প্রয়োজন হয়...। "তিনি প্রত্যহ সকাল বেলা বেরিয়ে পড়তেন বিধ্বস্ত এলাকা ঘুরে দেখার জন্য।...অনেকেই তাঁর সঙ্গে ত্রাণ শিবিরে চলে আসতেন, অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করে, ধর্ম ও সম্মান হারিয়ে তাঁরা গ্রামে থাকতে চাইতেন না। স্থানীয় মুসলমানরা হিন্দুদের এই চলে আসা পছন্দ করতেন না। তাঁরা বাধা দিতেন, মধ্যপথে শরণার্থীদের আক্রমণ করে তাঁদের খুন জখম করে তাদের অবশিষ্ট যা কিছু লুটপাট করে নিয়ে যেতেন। সুচেতা নিজেও বিপন্মুক্ত ছিলেন না। একদিন রাতে তাঁরা খবর পান যে একটি মুসলিম জনতা তাঁদের আক্রমণ করতে আসছে। এই জনতাকে বাধা দেওয়ার শক্তি তাঁদের ছিল না। তাঁরা মরার জন্য তৈরি হন। সুচেতা লিখেছেন "আমার সঙ্গে বিষ থাকায় গুণ্ডাদের হাতে পড়ার কোনও ভয় আমার ছিল না।" তার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী ছেলেরা তা জানত না। তারা যে কোনওরকম বিপদের জন্য তৈরি হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত এই মুসলিম জনতা তাঁদের শিবিরের কাছে এসেও কোনও কারণে ফিরে যায়।"[2]

সব কিছুরই তো একটা উদ্দেশ্য থাকে। সুচেতা কৃপালনি তাঁর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ "নোয়াখালি ও কুমিল্লায় হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মর‍্যাল এক্সটারমিনেশন। তাই নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় নরহত্যা তত হয়নি যত হয়েছে ধর্ম ও সংস্কৃতি নাশের চেষ্টা। গ্রামের পর গ্রামে হিন্দুদের ধর্ম নাশ করার

1. শংকর ঘোষ—হস্তান্তর (৯ম পর্ব) সাপ্তাহিক দেশ—৭-৩-৯৮
2. শংকর ঘোষ ঐ

চেষ্টা হয়েছে, কলমা পড়ানো হয়েছে, গরুর মাংস খেতে, লুঙ্গি পরতে, নূর রাখতে বাধ্য করা হয়েছে, হিন্দু মেয়েদের জোর করে মুসলিম ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে হিন্দু মেয়েদের মুসলিম বাড়িতে রাত্রি যাপনে বাধ্য করা হয়েছে।"[1]

নোয়াখালিতে গান্ধী

গান্ধীর নোয়াখালি সফর এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৪৬ সালের ৭ নভেম্বর তিনি নোয়াখালি পৌঁছান। প্রায় চার মাস পর ১৯৪৭ সালের ২ মার্চ তিনি নোয়াখালি ত্যাগ করেন। এই সময়ে তিনি পদব্রজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সভা-সমিতি করেছেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য স্বীকার করেছেন বহু ক্লেশ। তাঁর অনুগত ভক্ত ও সহচর ঁনির্মল কুমার বসু এর পূর্ণ বিবরণ লিখে রেখেছেন ঃ "প্রতিদিন প্রার্থনা সভার ভিতর দিয়ে ভগবানের উপর নির্ভরতার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আরও বলেন যে, জোর করে ধর্মান্তরিত করা ইসলাম ধর্ম অনুমোদন করে না। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পদব্রজে এমনকি দীর্ঘদিন খালি পায়ে হেঁটে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে প্রেম-মৈত্রী ও নির্ভীকতার বাণী প্রচার করেন...এ এক কঠোর তপস্যা"।[2] এই দুশ্চর তপস্যা নিশ্চিতভাবেই "মহাত্মার" অপার মাহাত্ম্য সুচিত করে। কিন্তু ইতিহাসের বিচার অন্যরূপ। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে—"গান্ধীজি আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখেও নির্ভীকতার আর্দশ আতঙ্কগ্রস্ত পলায়িত হিন্দুর সম্মুখে ধরিয়াছিলেন; তাহা মহাত্মার পক্ষে সম্ভব হইলেও জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায় না—লাখে নয় কোটিতেও এক মিলে কিনা সন্দেহ। জোর করিয়া ধর্মান্তরিত করা ইসলাম ধর্ম অনুমোদন করে কি করে না, সে তর্কের প্রয়োজন নাই; কিন্তু যে মুসলমানদের কাছে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ব পুরুষের শতকরা অন্তত নব্বই জনকে যে জোর করিয়া মুসলমান করা হইয়াছিল— এবং প্রায় প্রত্যেক মুসলমানই যে ইহা অনুমোদন করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে, গান্ধীজির উপদেশ যে তাহাদের কাছে উপহাসের মতই মনে হইবে এ সম্বন্ধে যাঁহারা প্রধানমন্ত্রী বা মহাত্মা নহেন—সাধারণ ব্যক্তি মাত্র, তাঁহাদের কোন সন্দেহ নাই।"[3]

নির্মল কুমার বসু গান্ধীর নোয়াখালি সফরের সুদীর্ঘ কাহিনীর উপসংহারে লিখেছেন ঃ গান্ধীজি হিন্দুদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন অহিংসা ধর্মের অনুযায়ী তাহারা আক্রান্ত হইয়াও আক্রমণকারীকে আঘাত করিবে না—নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিবে তথাপি প্রাণভয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করিবে না বা গৃহ হইতে পলাইবে না, এবং স্ত্রীলোক হইলে

1. শংকর ঘোষ— ঐ
2. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস, (৪ খণ্ড), পৃঃ ৪২৪
3. ঐ, পৃঃ ৪২৪

প্রাণ দিবে কিন্তু মান-মর্যাদা (অর্থাৎ সতীত্ব) বর্জন করিবে না। মুসলমানদিগকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাহারা হিন্দুদিগকে ভাইয়ের মত ভালবাসিবে ইত্যাদি।....হিন্দুর উপর ইহার যে প্রভাবই হইয়া থাকুক মুসলমানদের প্রতি তাহার আবেদন আরও কম হইয়াছিল"[1] গান্ধীর নোয়াখালিতে অবস্থান মুসলমানরা ভালভাবে গ্রহণ করেনি। ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ কুমিল্লাতে এক জনসভায় উদারপন্থী মুসলিম নেতা ফজলুল হক বলেন, "নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধীর অবস্থান ইসলামের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পরিবর্তে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করেছেন।"[2] গান্ধীজি যখন নোয়াখালিতে তখনও হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলেছে। ১৯৪৬ সালের ১২ নভেম্বর নোয়াখালির দত্তপাড়া থেকে পিয়ারে লাল ঘনশ্যামদাস বিড়লাকে একটি চিঠিতে জানিয়েছেন, "এখনও পর্যন্ত কয়েকটি জায়গায় মেয়েদের রাত্রিবেলা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সকালে ফেরত দেওয়া হচ্ছে।" (Even now in several places women are taken away at night and returned in the morning.)[3]

গান্ধীর নোয়াখালি সফর যে সব দিক থেকেই ব্যর্থ হয়েছে সরকারী রিপোর্টে তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সালের ১৩ মে চট্টগ্রামের কমিশনার সরকারের নিকট নোয়াখালি সম্বন্ধে যে গোপন রিপোর্ট পাঠান তার কিয়দংশ ঃ "বাহিরে নোয়াখালি শান্তমূর্তি ধারণ করিলেও হিন্দুরা এখনও আতঙ্কগ্রস্ত—বড় বড় শহরের বাহিরে গ্রামাঞ্চলে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের ছোটখাট উৎপীড়ন ও গালাগালি এই আতঙ্কের কারণ।...তাঁহাদের উপর যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলিতেছে তাহা থানায় রিপোর্ট করিতে ভরসা পায় না। কারণ মুসলমানরা ইহা জানিতে পারিলে অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইবে।...হিন্দুদের উপর অন্যান্য রকমের অত্যাচার ও লাঞ্ছনা চলিতেছে। বিগত হত্যাকাণ্ডের পর মুসলমানেরা পথেঘাটে হিন্দুদের কাফের, মালউন প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করে, টাকাপয়সা কাড়িয়া নেয়। বাজার করিয়া ফিরিবার সময় কেনা জিনিস জোর করিয়া ছিনাইয়া লওয়া, হিন্দুর বাড়ির সুপারি-নারিকেল পাড়িয়া নেওয়া, কাঠ-টিন গরু বাছুর ছিনাইয়া লওয়া, হিন্দুর ধানক্ষেত নষ্ট করা, থানায় নালিশ করিলে অভিযোগকারীর বাড়িতে আগুন লাগানো—এগুলি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা মাত্র। ...গত অগ্নিদাহ ও নিধনপর্বের পর যে সব হিন্দু নূতন করিয়া ঘর তুলিয়াছে তাহাদের শাসানো হইতেছে যে, তাহারা জিলা ছাড়িয়া না গেলে বিপদ ঘটিবে।

পুলিশ নেতৃস্থানীয় দুই আসামী আবুল কাশেম ও আলি আকবরের খোঁজ পায় না, অথচ তাহারা স্বচ্ছন্দে এই জিলার মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং প্রকাশ্যে সভা-সমিতিতে

১। রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস—৪ খণ্ড পৃঃ ৪২৫
২। ঐ পৃঃ ৪২৫
৩। শঙ্কর ঘোষ—হস্তান্তর (৯ম পর্ব) সাপ্তাহিক দেশ—৭-৩-৯৮

বক্তৃতা করিতেছে যে, গতবার সমস্ত হিন্দুকে হত্যা না করা একটা মস্ত ভুল হইয়াছে এবং আগামী সংঘর্ষে তাহারা আর এরূপ ভুল করিবে না।... পুলিশের ঔদাসীন্য, পক্ষপাতিত্ব, অত্যাচারের সঠিক খবর পাওয়া যাইতেছে না এবং গভর্নমেন্টে এরূপ প্রচার করিতেছে যে, গোলমাল থামিয়া গিয়াছে। পুলিশের এইরূপ আচরণেই গত অক্টোবর মাসের ভীষণ হত্যাকাণ্ড সম্ভবপর হইয়াছিল এবং খুব সম্ভব শীঘ্রই ইহার পুনরাবৃত্তি হইবে।"[1]

ঐক্য বিলাসী গান্ধী নোয়াখালিতে হিন্দু মুসলিম মিলনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেও ব্যর্থ হয়েছেন; এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন—"মহাত্মা গান্ধী এবং যাঁহারা তাঁর ভক্ত তাঁহারা গান্ধীজির নোয়াখালি ভ্রমণের ব্যর্থতায় কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই, কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা নহেন এবং মানুষের চিরাচরিত রীতি ও স্বভাবকেই জাগতিক ব্যাপারে প্রাধান্য দেন, তাঁহারাই সর্বদেশে সর্বকালে ঐতিহাসিক ঘটনাকে বাস্তব রূপ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাহাদের মতামতের মূল্য অনেক বেশি।" এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী যখন নোয়াখালিতে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের স্বপ্নে বিভোর হইয়া অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য করিতেছিলেন তখন নোয়াখালিতে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আর একজন যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

নোয়াখালির ঘটনায় একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী মুসলমানদের শতকরা ৯০ জন ধর্মান্তরিত মুসলমান—ইহা স্বীকার করিলেও দেখা যাইতেছে, হিন্দু-বিদ্বেষ তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে প্রবলভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। ...মুসলমান সমাজে এখন যাহারা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে দুইটি জিনিস সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়; প্রথম পরধর্মের প্রতি তাহাদের গভীর বিদ্বেষ; দ্বিতীয় ভিন্নধর্মের অপহৃতা নারীকে গৃহে আনয়ন করার আগ্রহ। ...মুসলমানেরা এদেশে আসিবার পর হইতেই হিন্দুর দেবমন্দির ও বিগ্রহের উপর আক্রমণ আরম্ভ হয়। ...নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু অধিবাসীকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং বহু 'বিশিষ্ট' মুসলমানও হিন্দু নারী অপহরণে সহায়তা করিয়াছে, নরহত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি অপেক্ষা এই দুই ঘটনাকেই আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি। পূর্ববর্ণিত ইতিহাস মনে রাখিলে ইহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করাও কঠিন হইবে না। বাংলার হিন্দুই শুধু মুসলমানকে ভাই বলিয়া মনে করিবে, তাহার সহিত রক্তের সম্পর্ক খুঁজিয়া লইয়া তাহাকে আপন করিতে চাহিবে আর মুসলমান শুধু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করিয়া স্বধর্ম বিস্তারের সুযোগ খুঁজিবে এই মনোবৃত্তি বজায় থাকিতে দুই সম্প্রদায়ের মিলনের আশা সুদূরপরাহত।"[2]

---

1. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪২৯-৪৩১
2. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩১-৪৩২

ঐক্য থাক্। হিন্দু এখন অস্তিত্বের সঙ্কটে। যেদিন ভারত ভূখণ্ডে ইসলামের শুভ আবির্ভাব হয় সেদিন থেকেই চলছে হিন্দু-নিধন বিরামবিহীন। চলছে সুপরিকল্পিত ভাবে হিন্দুর ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতি নাশের চেষ্টা। ডঃ আম্বেদকর তাই বলেছেন ঃ ভারত আক্রমণকারী মুসলমানের কণ্ঠে ছিল হিন্দু-বিদ্বেষের গান। কিন্তু তারা শুধু এই বিদ্বেষের গান গেয়ে কয়েকটি মন্দির ভেঙ্গে চলে যায়নি। যদি যেত, তা হত পরম আশীর্বাদ। এত ক্ষুদ্র তুচ্ছ সাফল্যে তারা তৃপ্ত হয়নি। একটি প্রকৃতই স্থায়ী কাজ তারা করে গেছে। বপন করেছে ইসলামের বীজ। (The Muslim invaders, no doubt came to India singing a hymn of hate against the Hindus. But they did not merely sing their hymn of hate and go back burning a few temples on the way. That would have been a blessing. They were not content with so negative a result. They did a positive act, namely to plant the seed of Islam.)[1] অবিরাম জেহাদ ও হিন্দুহত্যা এবং ধর্মান্তরের মাধ্যমে (ইসলামের) সেই বীজ এখন পরিণত হয়েছে মহীরুহে। বিংশ শতাব্দীতে খিলাফৎ-কলকাতা-নোয়াখালি সেই বৃক্ষেরই অমৃত ফল। মোপলাদের হিন্দু-নিধন সমর্থন করে গান্ধী বলেছিলেন ঃ "মোপলারা ধর্মভীরু—ধর্মের জন্য ধর্ম নির্দেশিত পথে সংগ্রাম করেছে।" মুসলমান ধর্মভীরু—ধার্মিক। কলকাতা-নোয়াখালির মুসলমান তার ব্যতিক্রম হবে কেন? হিন্দুসহ অ-মুসলমান-হত্যা ও তাদের ধর্মান্তর পরম কারুণিক আলার কঠিন নির্দেশ, ইসলামের স্থায়ী বিধান। সেই নির্দেশ পালনে আল্লা প্রীত হন, দেন মহাপুরস্কার। মৃত্যুর পর গতি হয় বেহেস্তে। অমান্য করলে হয় শাস্তি। এইজন্যই মুসলিম নেতারা কোরানের নামে হিন্দুর প্রতি মুসলমানের পাশবিক বর্বরতাকে করে সমর্থন। ডঃ আম্বেদকর তাই বলেন ঃ মুসলমানের এই মনোভাব বোঝা যায়। যা দুর্বোধ্য, তা হল গান্ধীর মতি-গতি। তিনি কখনও হিন্দুর প্রতি মুসলমানের জঘন্য অপরাধের নিন্দা করেননি। (This attitude of the Muslims is quite understandable. What is not understandable is the attitude of Mr. Gandhi. He has never called the Muslims to account even when they have been guilty of gross crimes against Hindus.)[2]

তাহলে হিন্দুর ভবিষ্যৎ কী? গান্ধীর বিশেষ স্নেহভাজন সুরাবর্দির নেতৃত্বে বাংলার মুসলিম লীগ সরকার বাংলাদেশের হিন্দুকে নিশ্চিহ্ন করতে কৃতসংকল্প। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী হিন্দুর-দুর্গতি-দুর্দশায় নিরুদ্বেগ, নির্বিকার। হিন্দু-মুসলিম মিলনের স্বপ্নে

1 Dr. B. R. Ambedkar—Writings & Speeches, Vol-8, P-65
2 Ibid, P-156-157

বিভোর। সে মহামিলনের যূপকাষ্ঠে হিন্দু যেন বলিপ্রদত্ত। এখন তবে কি একমাত্র ভরসা জওহরলাল নেহেরু —ভারতের প্রধানমন্ত্রী? নাগরিকদের জীবন-ধন-মান রক্ষার দায়িত্ব তো রাষ্ট্রের। কিন্তু তিনিও তো গান্ধী-ভক্ত। তাঁর ভূমিকা কি স্বতন্ত্র হতে পারে?

১৬ আগস্ট—১৯৪৬ সাল, মুসলমানের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) বা কলকাতা দাঙ্গা শুরু হয়। গান্ধীর একান্ত অনুগত শিষ্য, নবভারতের রূপকার, উদার প্রগতিশীল ভারতের ভাবী প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু তখন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত। কলকাতার অসহায় দাঙ্গা-কবলিত হিন্দুদের জন্য ভাবনার তাঁর সময় নেই। কলকাতার রাজপথে—হিন্দু-রক্তের স্রোত; নেহেরু তখন বম্বেতে জিন্নার মালাবার হিলের বাড়িতে যান তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য (On the morning of 16th Aug-1946. Nehru drove to Jinna's ugly sumtuous house on Malabar Hill, in Bombay, for a talk with the Muslim League leader.)[1]. ১৭ আগস্ট। গান্ধীভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শহীদ সুরাবর্দির প্রত্যক্ষ মদতে মুসলমান নিশ্চিন্তে-নির্ভয়ে করে চলেছে হিন্দু-মেধ যজ্ঞ। চারিদিকে মৃতদেহের পাহাড়—ধ্বংসের তাণ্ডব। নেহেরু ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পেশ করেন তাঁর মন্ত্রিসভার তালিকা। সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পর ২৪শে আগস্ট মন্ত্রিসভার নাম ঘোষিত হয়। (While Calcutta was the scene of an unprecedented holocaust, Nehru was busy negotiating with the viceroy about the Interim Govt. On 17the Aug 1946, the very next day after the "great killing" had begun, but not ended nor shown any sign of abating, he submitted his proposal to the viceroy, and after discussion for a week, the personnel of the Indian Govt. was announced on 24th Aug.-1946.)[2]

কলকাতার পর নোয়াখালিতে হয় ব্যাপক হিন্দুহত্যা। কলকাতার হিন্দুরা তিনদিন পরে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলে পাল্টা আক্রমণ করলে সুরাবর্দি মুসলমানদের সুরক্ষার জন্য মিলিটারি তলব করেন। দাঙ্গা বন্ধ হয়। কিন্তু নোয়াখালিতে হিন্দু নিতান্তই সংখ্যালঘু। সম্পূর্ণ অসহায়। প্রতিরোধ দূরে থাক প্রতিবাদের শক্তিও তার নেই। নেহেরু তখন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী। তিনি নোয়াখালি যান নি। হিন্দুদের প্রতি চরম অত্যাচার-নির্যাতনে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। মুসলিম লীগ সরকারের সর্বপ্রকার সহায়তায় কলকাতা ও নোয়াখালিতে হিন্দু-নিধনের প্রতিবাদে সেবার বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশে হিন্দুরা দীপাবলী উৎসব পালন করেনি। বিহারে ২৫ অক্টোবর পালিত

1. Leonard Mosley—The Last Days of The British Raj, P-23
2. R. C. Majumder—History of the Freedom Movement in India, Vol-III, P-645

হয় "নোয়াখালি দিবস"। পরিস্থিতি উত্তেজনাকর। "এই সময় মুসলিম লীগের নাম করে একটি ইস্তাহার ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে বিহারে বিলি হয়। এই ইস্তাহারে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুদের হত্যা করতে, তাদের বিষয়-সম্পত্তি লুঠ করতে এবং আরও নানা রকমের ভীষণ আপত্তিকর কাজকর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়।"[1] বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ। শুরু হয় দাঙ্গা। দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে বিহারের প্রায় সর্বত্র। উদ্বিগ্ন নেহেরু কালবিলম্ব না করে ছুটে গেলেন বিহারে, তাঁর সঙ্গে গেলেন সর্দার প্যাটেল, মুসলিম লীগের লিয়াকত আলি খান ও আবদার রব নিস্তার। দাঙ্গা দমন ব্যবস্থার তদারকির জন্য নেহেরু ও নিস্তার বিহারে ঘাঁটি গেড়ে রইলেন। নামানো হল মিলিটারি। তাদের নির্দেশ দেওয়া হল দাঙ্গাকারী দেখামাত্র গুলি করার। সমসাময়িক সাংবাদিক শংকর ঘোষ লিখছেন ঃ "একদিন খবরের কাগজে বিরাট হেডিং দিয়ে বেরুল যে নেহেরু বলেছেন, দাঙ্গা না থামলে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হবে—দে উইল বি ফায়ার্ড আপন অ্যান্ড বম্বড ফ্রম দ্য এয়ার ইফ নেসেসারি।...এই উক্তি নিয়ে গাঁধী শিবিরে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন নেহেরুর ওকথা বলা ঠিক হয়নি। ...কয়েকদিন পরে যখন খবর বেরুল যে নেহেরুর ওই ধরনের উক্তিতে ক্রুদ্ধ হয়ে পাটনার এক জনসভায় এক ছাত্র নেহেরুর গায়ে হাত তুলেছেন, নোয়াখালির লোক যেন খুশিই হয়েছিলেন।"[2]

পাটনা থেকে নেহেরু পদ্মজা নাইডুকে একটি চিঠিতে লেখেন,...শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে গ্রামাঞ্চলে সেনাবাহিনী এক কিষাণ জনতার উপর গুলি করেছে এবং তাতে প্রায় চারশ লোক মারা গেছেন। "সাধারণত এরকম ঘটনা আমায় ভীষণভাবে বিচলিত করে কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস করবে যে এই ঘটনাটি শুনে আমি খুব স্বস্তি বোধ করছি।"[3] বিহারে কড়া হাতে দাঙ্গা দমনের জন্য বড়লাট ওয়াভেল নেহেরুর খুব প্রশংসা করেন। তিনি তাঁর ডায়েরীতে লেখেন বিহারে একশ্রেণীর মানুষ, নেহেরুর সঙ্গে অত্যন্ত দুর্বিনীত আচরণ করে। ওয়াভেল যেদিনের কথা লিখেছেন "সেদিন নেহেরু নাকি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনবার পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।* ওয়াভেলের মনে হয়েছিল বিহারের ঘটনায় নেহেরু মানসিক দিক থেকে এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, যে-কোন সময় তাঁর মানসিক বৈকল্য হতে পারত।"[4] এ প্রসঙ্গে সর্দার প্যাটেলের একটি

* পদত্যাগ করলে হিন্দু ও ভারতের অশেষ কল্যাণ হত। ধর্মনিরপেক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হত ভারত।

১। সাংবাদিক শংকর ঘোষ—হস্তান্তর (১০ পর্ব) সাপ্তাহিক দেশ—২১-৩-৯৮

২। ঐ

৩। শংকর ঘোষ—হস্তান্তর (১০ পর্ব) সাপ্তাহিক দেশ—২১-৩-৯৮

৪। ঐ

মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "এদেশে একজনই জাতীয়তাবাদী মুসলিম আছেন, তাঁর নাম জওহরলাল নেহেরু।"[1]

নোয়াখালিতে হিন্দু-নিধন শুরু হয় ১০ অক্টোবর। পণ্ডিত নেহেরু ১৫ অক্টোবর ওয়াভেলকে এক দীর্ঘ চিঠিতে লেখেন ঃ "...বাংলার একটি বিস্তৃত এলাকায় কোনও সরকার কাজ করছে না, সেখানে কোন নিরাপত্তা নেই এবং সে এলাকা সমাজের নিকৃষ্টতম মানুষের অবাধ বিচরণ ভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, জীবন্ত ব্যক্তিকে আগুনে ফেলে দেওয়া ধর্ষণ, বিরাট সংখ্যায় নারী অপহরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ এবং অন্য নানা রকমের বীভৎস ঘটনা ঘটছে।...(এ অবস্থায়) আমাদের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিয়ে লাভ কি? হাজার হাজার লোক যখন নিহত হচ্ছে বা তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি ঘৃণ্যভাবে নিগৃহীত হচ্ছে তখন অসহায়ভাবে দেখে যাওয়া ছাড়া আমরা আর কি কিছু করতে পারি?"[2] বিহারে মুসলমান রক্ষায় যিনি বজ্র-কঠোর—নোয়াখালিতে নিগৃহীত হিন্দু রক্ষায় সেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই অসহায় করুণ বিলাপ কেন? কলকাতা-নোয়াখালিতে হিন্দু-নিধন ও নেতৃত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে সমসাময়িক একখানি মাসিক পত্রিকায় যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছিল ঃ "বাঙালি আজ পঞ্চাশ বৎসর স্বাধীনতা যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছে। হৃতগৌরব, হৃত-আসন, নতমস্তক লাজে যদি আজ সারা ভারতবর্ষে কেহ থাকে তবে সে বাঙালি...। এই সর্বস্বহারা, নেতৃত্বহীন, বুদ্ধি-বিবেচনা ও রাষ্ট্রগঠন প্রতিভার দৈন্যে অভিশপ্ত...হিন্দু সম্প্রদায়ের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কিছু করিবার বা বলিবার অধিকার নাই।"[3]

1. শংকর ঘোষ—হস্তান্তর (১০ পর্ব) সাপ্তাহিক দেশ—২১-৩-৯৮
2. শংকর ঘোষ—হস্তান্তর (১০ পর্ব) সাপ্তাহিক দেশ—২১-৩-৯৮
3. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৪২৬

ভারত বিভাগ

ইসলামের নির্দেশে দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মুসলমানেব ভারত বিজয়। ১৭৫৭ খ্রিঃ ইংরেজের হাতে পরাজয়ে ভারত আবার হয় দার-উল-হারব। কিন্তু মুসলমান লক্ষ্যচ্যুত হয় না। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, সিপাহী বিদ্রোহ, ওয়াহাবি, বঙ্গ ভঙ্গ সমর্থন ও খিলাফৎ আন্দোলনের লক্ষ্যও ছিল তাই। বিংশ শতাব্দীতে মুসলমানের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবির মুখ্য তাত্ত্বিক প্রবক্ত ছিলেন কবি স্যার মহম্মদ ইকবাল। তিনি বলেন, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী স্বাধীন পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ভারতে বসবাসকারী মুসলমানের সম্পূর্ণ সঙ্গত অধিকার আছে ভারতের মধ্যেই একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের (The Indian Muslim is entitled to full and free development on the lines of his own culture and tradition in his own Indian Homelend)[1] লন্ডন প্রবাসী কেমব্রিজ শিক্ষিত তরুণ রহমত আলি ইকবালের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে Now or Never শীর্ষক একটি পুস্তিকায় বলেন ঃ পাঞ্জাব, উঃ পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বালুচিস্তান নিয়ে গঠিত ভূ-খণ্ড মুসলমানের নিজস্ব বাসভূমি। ৭১২ খ্রিঃ হতে হিন্দুরা এখানে সংখ্যালঘু। হিন্দুস্থানে মুসলমান এসেছিল বিজয়ী রূপে; এবং বিগত ১২০০ বৎসর এখানে তারা একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে বাস করছে। তিনি আরও বলেন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘাত ও বৈরিতার কারণ আর্থিক বা ধর্মীয় নয়। এ হল দু'টি জাতির মধ্যে সংঘর্ষ। তাঁর মূল তত্ত্ব হল মূলত হিন্দু-মুসলমান দু'টি স্বতন্ত্র জাতি। "আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, পরম্পরা, সাহিত্য, অর্থব্যবস্থা, বিবাহ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিসমূহ হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।প্রএই পার্থক্য কতগুলি মৌলিক নীতির মধ্যেই সীমিত নয়। দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা প্রতিফলিত। হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে পানাহার করে না, স্থাপন করে না পরস্পরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক। আমাদের জাতীয় রীতি-নীতি, প্রথা, কাল-গণনা পদ্ধতি, আহার্য ও বেশ-ভূষা—সকল কিছুই হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র"(Punjab, N.W.F.P. Kashmir, Sindh and Baluchistan comprised the national home of the Muslims...This was not a part of India, for since 712 A.D. the Hindus were a minority

1. R. C. Majumder–History of the Freedom Movement in Inida, Vol-III, P-473

there. The Muslims lived there as a nation for 1200 years whereas. they came to Hindusthan only as conquerors. To him Hindu-Muslim clash was not due to religious or economic reasons—it was an international conflict between two national ambitions....His basic theory was that the Hindus and Muslims were fundamentally distinct nations...our religion, culture, history, tradition, literature, economic system, laws of inheritance, succession and marriage are fundamentally different from those of the Hindus. These differences are not confined to the broad basic principles. They extend to the minute details of our lives. We, Muslims and Hindus do not interdine; we do not intermarry. Our national customs and calendars, even our diet and dress, are different".)[1]

জিন্নার পূর্বেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন—"সুতরাং আমাদের জাতির ভাগ্যকে এক ভারতীয় জাতিত্বের (ভারতীয় জাতীয়তাবাদ) স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করার অর্থ হবে আমাদের বংশধর ও ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও মানবতার বিরুদ্ধে এক অপরাধ।" (Therefore for us to seal our national doom in the interest of one Indian nationhood would be a treachery against our Posterity, a betrayal of our history and a crime against humanity.)[2]

কোরান, মুসলিম ইতিহাস এবং ইতিপূর্ব আলোচিত মুসলিম রাজনীতির গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, 'পাকিস্তান" দাবি রাজনৈতিক নয় ধর্মীয়। হিন্দু-বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষের আত্মিক উন্নতি। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগৎ নিয়েই ধর্মের রাজ্যপাট। রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। কিন্তু ইসলামের বিধানে ধর্মের উদ্দেশ্য সাধনই হবে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। মুসলমান মাত্রেই ধর্মনিষ্ঠ। ইসলামের প্রতি তার আনুগত্য (ইসলামের একটি অর্থ হল পূর্ণ আত্মসমর্পণ, কোন প্রশ্ন নয়।) প্রশ্নাতীত। কবি ইকবাল প্রগতিশীল উদার ও জাতীয়তাবাদী—এই তাঁর পরিচয়। কিন্তু এ তাঁর বাহিরের রূপ। অন্তরের অন্তস্থলে তিনি খাঁটি মুসলমান। তিনি ইসলামের নবজাগরণে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি দাবি করেন, চীন, সমগ্র আরব ভূ-খণ্ড ও ভারতবর্ষ আমাদের। আমরা মুসলমান; সমগ্র পৃথিবী-ই আমাদের। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের কণ্ঠেও

1. Ibid, P-473-474
2. Ibid, P-474

ইকবালের প্রতিধ্বনি। ১৯৪৬ খ্রিঃ ১৫ আগস্ট মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি প্রসঙ্গে তিনি একটি লিখিত বিবৃতিতে বলেন ঃ "....ভারতবর্ষে নয় কোটি মুসলমানের বাস। সংখ্যা ও যোগ্যতায় ভারতের জনজীবনে তাদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নীতি নির্ধারণ ও শাসন ব্যবস্থায় তাদের প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রকৃতির বদান্যতায় কোন কোন অঞ্চলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান দাবির কোন যৌক্তিকতা নেই। সমগ্র ভারতবর্ষ আমার। এই দেশের রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা নির্ধারণে আমিও সম-অংশীদার। একজন মুসলমান হিসেবে আমি মুহূর্তের জন্যও আমার এ অধিকার বিসর্জন দিতে পারি না। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমগ্র ভারতবর্ষের পরিবর্তে তার একটি ক্ষুদ্র অংশ দাবি করা নিছক কাপুরুষতা বলেই আমার মনে হয়।" (...over 90 million in number, they are in quantity and quality a sufficiently important element in Indian life to influence decisively all questions of administration and policy. Nature has further helped them by concentrating them in certain areas.

In such a context, the demand for Pakistan loses all force. As a Muslim, I for one am not prepared for a moment to give up my right to treat the whole of India as my domain and to share in the shaping of its political and economic life. To me it seems a sure sign of cowardice to give up what is my patrimony and content myself with a mere fragment of it.)[1]*

ইসলামিক নবজাগরণের পথিকৃৎ ভারতের স্যার সৈয়দ আহমেদ,** রাশিয়ার মুফতি আলম জান ও আফগানিস্তানের সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানি ইকবালকে অনুপ্রাণিত করেন। কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর ইকবালের আস্থা ছিল না। তাঁর আশঙ্কা ছিল আদর্শের নামে এই মতবাদ ভারতে বসবাসকারী মুসলমানের অনন্য সাংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এই জন্যই তিনি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন ঃ "ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক ধাঁচে অথবা ভারতীয় একতার (ঐক্যবদ্ধ ভারত) ওপর ভিত্তি করে যদি কোন সংবিধান প্রণীত হয়—তবে তার দ্বারা অনিচ্ছাকৃত ভাবে

---

* মৌলানা আজাদ সহ কংগ্রেসের কোন মুসলমান নেতা রহমত আলি বা জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরোধিতা করেন নি।

** ইকবাল, রহমত আলি বা জিন্না নয়;জিন্নার অর্ধ শতবৎসর পূর্বে মুসলমান যে একটি স্বতন্ত্র জাতি—এ তত্ত্ব প্রচার করেন ভারতে ইসলামিক নব জাগরণের অগ্রদূত স্যার সৈয়দ আহমেদ।

---

1. Maulana Abul Kalam Azad—India Wins Freedom, P-150

গৃহযুদ্ধকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে (To base a constitution on the conception of a homogeneous India, or to apply to India the principles dictated by British democratic sentiments, is unwittingly to prepare her for a civil war—Edward Thomson,—Enlist India for Freedom). তাই ভারতের মধ্যে মুসলিম ভারতের দাবি তিনি সমর্থন করেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ "আমি দেখতে চাই পাঞ্জাব, উঃ-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বালুচিস্তান নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হোক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন অথবা বহির্ভূত স্ব-শাসিত উঃ-পশ্চিম ভারতে সু-সংগঠিত একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে রয়েছে ভারতের অন্তত উঃ-পশ্চিম ভারতের মুসলমানের ভবিষ্যৎ।" (I would like to see the Punjab, N-West F.P. Sindh and Baluchistan amalgamated into a single state. Self government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated N-West Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims at least of N-West India.)*[1]

ইকবালের মতে ভারতের সমস্যা জাতীয় নয়—আন্তর্জাতিক। বহুজাতির বাস এদেশে। প্রতিটি জাতি যদি তাদের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য-পরম্পরা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ না পায়—তবে শান্তি দূর অস্ত। এই উদ্দেশ্যেই তাঁর প্রস্তাব একটি সুসংহত মুসলিম রাষ্ট্র (Consolidated Muslim State); অর্থাৎ ভারতের মধ্যে মুসলিম ভারত (Muslim India within India)। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কবি মহম্মদ ইকবাল ইউরোপীয় রাষ্ট্র দর্শনের আঙ্গিকে মুসলমানের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি উপস্থাপিত করেন। অতঃপর ভারতের মুসলিম জাতি পাকিস্তান দাবিতে সোচ্চার হয়। মুসলমান প্রচার করে—পাকিস্তান হবে পবিত্র মানুষের ভূমি; মহানবী হজরত মহম্মদ ও তাঁর প্রিয় অনুচরদের সময় থেকে সর্বপ্রথম সত্যিকারের মুসলিম রাষ্ট্র (Extraordinary claims began to be made for Pakistan : it was founded as the land of the pure; it was to be the first truely Islamic state since the days of the Prophet and his close companions.)[2]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন ইয়াল্টা সম্মেলনে গৃহীত আটলান্টিক চার্টারে—মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের উদ্যোগে ভারত সহ এশিয়া আফ্রিকার উপনিবেশসমূহের

---

* লক্ষণীয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনেও মুসলমান স্ব-শাসনে সম্মত;কিন্তু অখণ্ড ভারতে হিন্দুর সঙ্গে কখনই নয়।

1. R. C. Majumder–History of the Freedom Movement in India, Vol-III, P-473
2. V. S. Naipaul–Among the Believers, P-155

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নীতিগত ভাবে স্বীকৃত হয়। কিন্তু বিজয়ী ইংরেজের সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা ছিল না। তা সত্ত্বেও ভারত যে স্বাধীনতা লাভ করে তার কারণ স্বতন্ত্র। যুদ্ধ শেষে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী প্রচারিত হলে, ভারতবর্ষে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের প্লাবন বয়ে যায়। লালকেল্লায় বন্দী আজাদ হিন্দ সেনানীদের বিচার শুরু হলে সারা দেশে দেখা দেয় তুমুল বিক্ষোভ। জনরোষের ভয়ে নেহেরুকেও প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ভুলাভাই দেশাই-এর সঙ্গে আজাদ হিন্দ সেনানীদের পক্ষে দাঁড়াতে হয়। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সেনাবাহিনীর মধ্যেও। ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি পেশাগত আনুগত্য অপেক্ষা দেশমাতৃকার বন্ধন মোচন তাদের নিকট শ্রেয় মনে হয়। ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহে তার বহিঃপ্রকাশ। যদিও বিদ্রোহ দমন করা হয়—তবু শংকিত হয় ইংরেজ। তাদের ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তি হল সেনাবাহিনী। তারা যদি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়—তবে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব আর কতদিন? তাই মহাযুদ্ধ বিজয়ী ব্রিটিশ সরকার দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ স্বীকারোক্তি যুদ্ধ পরবর্তী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ক্লিমেন্ট এ্যাটলীর।

১৯৫৬ সাল। ফণীভূষণ চক্রবর্তী (কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি) পঃ বাংলার অস্থায়ী রাজ্যপাল। ক্লিমেন্ট এ্যাটলী এসেছেন ভারত সফরে। কলকাতা এসে তিনি দু'দিন ছিলেন রাজভবনে। ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে লর্ড এ্যাটলীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়। ফণীভূষণ চক্রবর্তী বিষয়টি এইভাবে উত্থাপন করেন ঃ

গান্ধীর "ভারত ছাড়' আন্দোলন '৪৭ সালের বহু পূর্বেই শেষ হয়েছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও এমন ছিল না, যে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজন হয়। তাহলে ব্রিটিশ সরকার তা করল কেন? উত্তরে এ্যাটলী অনেক কারণের উল্লেখ করেন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল ইংরেজের বিরুদ্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সংগ্রাম; যা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতের স্থল ও নৌবাহিনীর আনুগত্যের ভিতটাকেই দুর্বল করে দিয়েছিল। আলোচনার শেষ দিকে আমি লর্ড এ্যাটলীকে জিজ্ঞাসা করি ইংরেজের ভারত ছাড়ার সিদ্ধান্ত গান্ধীর আন্দোলনের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল। প্রশ্নটি শুনে এ্যাটলীর ওষ্ঠাধর অবজ্ঞার হাসিতে কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হয়। তিনি ধীরে ধীরে প্রতিটি অক্ষরের উপর জোর দিয়ে উচ্চারণ করেন—খু-ব-ই সামান্য। আমি নেতাজী ভবনে বক্তৃতায় এ্যাটলীর সঙ্গে আমার এই আলোচনার উল্লেখ করি। কিন্তু গান্ধী প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে আকাশবাণী তা সম্প্রচার করে। (When I was acting as Governor of W.Bengal (in 1956) Lord Attlee, who gave India freedom by putting an end to British rule, visited India and stayed in the Rajbhavan, Calcutta, for two days. I had then a long talk with him about the real grounds

for the voluntary withdrawal of the British from India. I put it straight to him like this :

"The Quit India Movement of Gandhi practically died out long before 1947 and there was nothing in Indian situation at that time which made it necessary for the British to leave India in a hurry. Why did they then do so?" In reply Attlee cited several reasons, the most important of which were the activities of Netaji Subhash Chandra Bose which weakened the very foundation of the attachment of the Indian land and naval forces to the British Govt. Towards the end I asked Lord Attlee about the extent to which the British decision to quit India was influenced by Gandhi's activities. On hearing this question Attlee's lips widened in a smile of disdain and he uttered slowly, putting emphasis on each single letter,—"mi-ni-mal."

"I referred to this talk of mine with Attlee in a speech at Netaji Bhavan which was broadcast by the All-India Radio—but omitting all references to Gandhi.")[1]

১৯৪৬ খ্রিঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনজন ক্যাবিনেট মিনিস্টারের একটি প্রতিনিধিদলকে ভারতবর্ষে পাঠানো হবে। এই প্রতিনিধিদল ক্যাবিনেট মিশন নামে খ্যাত। ২৪ মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে ক্যাবিনেট মিশন দিল্লি আসে। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যগুলিকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়—A, B ও C. প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও পররাষ্ট্র ব্যতীত অন্য সকল (residual power) বিষয় অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে অর্পিত হবে। প্রতি ১০ বৎসর পর গ্রুপ-ভুক্ত যে কোন রাজ্যের সাংবিধানিক অধিকার থাকবে যুক্তরাষ্ট্র হতে বেরিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করার।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে জিন্না ও মুসলিম লীগের প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল। ১০ এপ্রিল ১৯৪৬, জিন্না দিল্লীতে নব-নির্বাচিত মুসলিম লীগ বিধায়কদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়—"পাকিস্তান দাবির স্বীকৃতি এবং অবিলম্বে তা বাস্তবায়নের শর্তেই মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করতে পারে। যদি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া হয় অথবা বাধ্য করা হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের

1. R. C. Majumder–History of the Freedom Movement In India, Vol-III, P-610

জন্য—তবে তাদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই মুসলমান জাতি সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করবে।" যাহোক অনেক আলোচনার পর, অন্য কোন বিকল্প না থাকায় জিন্না ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১০ই জুলাই কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতি জওহরলাল নেহেরু এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন ঃ তাঁর বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী প্রশ্নটি কংগ্রেস কর্তৃক কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা গ্রহণ নয়; কংগ্রেস সংবিধান সভায় (গণ-পরিষদে) অংশ-গ্রহণে সম্মত এই মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেন ঃ বর্তমানে আমরা সংবিধান সভায় যেতে প্রস্তুত—ইহা ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি আমরা দায়বদ্ধ নই* ("....that as far as he could see, it was not a question of the Congress accepting any plan, long or short. It was merely a question of their agreeing to enter the Constituent Assembly and nothing more than that...we are not bound by a single thing except that we have decided for the moment to go to the Constituent Assembly.)[1] প্রদেশসমূহকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, শেষ পর্যন্ত গ্রুপ ব্যবস্থা থাকবে না। আসাম কোন অবস্থাতেই একে মেনে নেবে না।

জিন্নার প্রতিক্রিয়া ছিল প্রত্যাশিত। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন ঃ কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ করেছে, এই আশ্বাস পেয়েই মুসলিম লীগ সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু নেহেরুর বিবৃতিতে কংগ্রেসের প্রকৃত অভিসন্ধি প্রকাশ পেয়েছে। ২৭ জুলাই ১৯৪৬ তিনি বম্বেতে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে পাকিস্তান দাবি আদায়ের জন্য Direct Action বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়—"যেহেতু ইংরেজদের সহায়তায় কংগ্রেস ভারতবর্ষে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং বর্তমানে ভারতে ন্যায় বিচার, ন্যায়নীতি নয়, ক্ষমতার রাজনীতিই সব কিছুর নিয়ামক... সুতরাং ইংরেজদের দাসত্ব ও ভবিষ্যতে উচ্চ-বর্ণের হিন্দু প্রভুত্বের হাত থেকে মুক্তি, ন্যায্য অধিকার, আত্মমর্যাদা, স্বাধিকার ও পাকিস্তান দাবি আদয়ের জন্য মুসলিম জাতির পক্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার এই উপযুক্ত সময়"

---

* সাংবাদিক সম্মেলনে নেহেরুর এই বিবৃতি নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। অনেকে মনে করেন নেহেরু এই বিবৃতি না দিলে—ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হত ও ভারত বিভাগ হত না। কিন্তু এই অভিমত যে ভ্রান্ত পরবর্তীকালে তা প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিম লীগকে নিয়ে যে কোয়ালিশন সরকার চালানো যায় না—মাত্র কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় নেহেরু ও প্যাটেল তা উপলব্ধি করেছেন। দ্বিতীয়ত ক্যাবিনেট মিশনে প্রস্তাব গৃহীত হলে ১০ বৎসর পর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করত;এবং সেক্ষেত্রে সমগ্র পাঞ্জাব ও বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হত। তৃতীয়তঃ পাকিস্তান দাবি রাজনৈতিক নয়—ধর্মীয়। শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব না থাকায় ভারত বিভাগ ছিল অনিবার্য। জিন্না অবশ্য নেহেরুর বিবৃতির পুরো সুযোগ নিয়েছেন।

---

1. Ibid P-637

(Whereas the Congress is bent upon setting up Caste Hindu Raj in India with the connivance of the British; and whereas recent events have shown that power politics and not justice and fair play are the deciding factors in Indian affairs....now the time has come for the Muslim Nation to resort to direct action to achieve Pakistan to assert their just rights, to vindicate their honour and to get rid of the present British slavery and the contemplated future Caste-Hindu domination.)[1]

প্রত্য(সংগ্রামের কর্মসূচী অনুযায়ী ১৬ আগস্ট কলকাতায় শু(হয় নির্বিচারে হিন্দুহত্যা (পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে)। নেহে(১৭ আগস্ট জিন্না ও ভাইসরয়ের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা করেন। ২৪ আগস্ট নেহে(র প্রস্তাব অনুযায়ী মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের নাম ঘোষিত হয়। সেই দিনই এক বেতার ভাষণে ভাইসরয় লীগকে মন্ত্রীসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। ব্রিটিশ সরকারের কঠোর মনোভাবের দ(ন জিন্না মন্ত্রীসভায় যোগদানে সম্মত হন।

কেন্দ্রে কংগ্রেস—লীগ মন্ত্রীসভা প্রথম থেকেই ছিল দুই শিবিরে বিভক্ত(। লীগ সদস্যরা মন্ত্রীসভার যৌথ দায়িত্ব অথবা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব—এর কোনটাই স্বীকার করে না। দেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কেরও কোন উন্নতি হয় না। নোয়াখালিতে হিন্দুহত্যা সম্বন্ধে মন্ত্রীসভার দুইজন মুসলিম লীগ সদস্য প্রকাশ্যেই উত্তেজক বিবৃতি দেয়, তারা বলে ঃ সমগ্র ভারতব্যাপী পাকিস্তান দাবি আদায়ের জন্য যে সংগ্রাম চলছে পূর্ব বাংলার ঘটনা তারই অংশ মাত্র (that the events in East Bengal were but part of the All India battle for Pakistan.)[2]

ব্রিটিশ সরকার ভারতে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দ্রুত অবসানের জন্য লর্ড ওয়াভেলকে অপসারিত করে মাউন্টব্যাটেনকে গভর্নর জেনারেল রূপে নিয়োগ করে। ২৪শে মার্চ ১৯৪৭, দঃ-পূর্ব এশিয়া রণাঙ্গনে মিত্র শক্তি(র সর্বাধিনায়ক এ্যাডমিরাল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন কার্যভার গ্রহণ করেন। ব্যক্তি(গত কারণেই জুন মাসের মধ্যে (মতা হস্তান্তর করে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রথমেই গান্ধীকে আহ্বান করেন। ৩১ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিলের মধ্যে গান্ধী-মাউন্টব্যাটেন ৫টি বৈঠক হয়। প্রথম বৈঠকেই গান্ধী এক অদ্ভুত প্রস্তাব করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গান্ধী ব্রিটিশ সরকারকে হিটলারের বি(দ্ধে যুদ্ধ না করে সত্যাগ্রহ করার পরামর্শ দেন। এবারেও তিনি মাউন্টব্যাটেনকে

1. Ibid, P-641
2. Ibid, P-649

বলেন, Executive Council ভেঙে দিয়ে জিন্নাকে তাঁর মনোনীত সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করতে দেওয়া হোক। তারা সকলে মুসলমান হলেও আপত্তি নেই। গান্ধীর এই প্রস্তাবে সমগ্র ভারত ভয়ে বিস্ময়ে চমকে ওঠে। কংগ্রেস প্রস্তাবটি সরাসরি খারিজ করে (Gandhi made a quaint proposal which is on a par with his suggestion during the second world war that Britain, instead of fighting Hitler, should offer peaceful "Satyagraha". He advised Mountbatten during his very first interview, to dismiss the existing Executive Council and give Jinnah the option of forming a government with members of his own choice who might be all Muslims. It is hardly necessary to add that the suggestion astounded the whole of India and was most unceremoniously rejected by the Congress.)[1]

গান্ধীর এই প্রস্তাব সম্বন্ধে মৌলানা আজাদ ঃ আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধী জানান যে, সে ইতিমধ্যেই প্রস্তাব রেখেছে যে, আমাদের উচিত হবে জিন্নাকে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি(দের নিয়ে সরকার গঠন করার অনুরোধ জানানো। মাউন্টব্যাটেনের নিকট বিষয়টি সে উত্থাপন করেছে এবং তিনি সাগ্রহে প্রস্তাবটি বিবেচনা করছেন (...he had already made the suggestion that we should ask Jinnah to form a governemt and choose the members of the cabinet. He said that he had mentioned this to Lord Mountbatten and Lord Mountbatten was greatly impressed by the Idea.)[2] আজাদের সঙ্গেও মাউন্টব্যাটেন গান্ধীর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন। মাউন্টব্যাটেনের বিশ্বাস ছিল কংগ্রেস গান্ধীর প্রস্তাব গ্রহণ করলে দেশবিভাগ এড়ানো যায়। আজাদ পরে আ(প করে বলেন ঃ দুর্ভাগ্যত্র(মে জহরলাল এবং সর্দার প্যাটেল, উভয়েই প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধিতা করায় গান্ধী বাধ্য হয়েই তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন। (Unfortunately this move could make no progress as both Jawaharlal and Sarder Patel opposed it vehemently. In fact they forced Gandhi to withdraw the suggestion.)[3] ইংরেজ ঐতিহাসিক Leonard Mosley-র ভাষ্য ভিন্নরূপ ঃ লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস নেতাদের বলেন, গান্ধীজির বাস্তববুদ্ধি একেবারেই নেই। দেখুন, কিরকম অর্থহীন তাঁর প্রস্তাব(সমগ্র ভারতবর্ষকেই তিনি জিন্নার হাতে সঁপে দিতে চান ("He is not a practical man, Mountbatten

1. Ibid, P-658
2. Maulana Abul Kalam Azad—India Wins Freedom, P-203
3. Ibid, P-204

said in effect to the Congress leaders. 'Look at the silly plan he produced to hand India over to Jinnah)[1]

Mosley-র বক্তব্যে আজাদের সমর্তন পাওয়া যায় না। তবে আজাদের আক্ষেপ থেকে মনে হয় গান্ধীর প্রস্তাবে তাঁর ছিল আন্তরিক সমর্থন। জাতীয়তাবাদী মুসলমান কংগ্রেস সভাপতি আজাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্রুত অবনতি মাউন্টব্যাটেনকে বিচলিত করে। বিলম্ব হলেও কংগ্রেস বুঝতে পারে, স্বাধীন অখণ্ড ভারতের সম্ভাবনা শুধুই স্বপ্ন (?) মাত্র। প্যাটেলের স্বীকারোক্তিতে সেই রূঢ় সত্যেরই প্রকাশ ঃ আমরা স্বীকার করি বা না করি, ভারতবর্ষে দুটি জাতি। হিন্দু-মুসলমান উভয়কে নিয়ে কখনও এক ঐক্যদ্ধ জাতি গঠন করা যাবে না। এই বাস্তব সত্যের স্বীকৃতি না দিয়ে কোন গত্যন্তর নেই। (Whether we liked it or not there were two nations in India. He was now convinced that Muslims and Hindus could not be united into one nation. There was no alternative except to recognise this fact.)[2]

ভারত বিভাগ নাটকের অন্তিম পর্ব। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১২ জুন ১৯৪৭, সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় ঃ কোন প্রদেশের জনগণকে তাদের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে বাধ্য করা যায় না। (it can not think in terms of compelling the people in any territorial unit to remain in an Indian union against their declared and established will.)[3] ১৪ ও ১৫ জুন দিল্লিতে এ. আই. সি. সি-র অধিবেশনে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। সমর্থন করে মৌলানা আজাদ বলেন ঃ কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ ভারতের পক্ষে; আবার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও* সমর্থন করে এবং কোন

* স্ব-বিরোধিতা ও বাক্চাতুরীর দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি গান্ধী ও তাঁর শিষ্যদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অখণ্ড ভারত ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আধিকার পরস্পর-বিরোধী। "আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার" কাদের দাবি হবে? যারা নিজেদের অবশিষ্ট ভারত ও ভারতবাসীর সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে মনে করে? সেক্ষেত্রে, সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতির এদেশের ওপর কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকতে পারে না। পৃথিবীর কোথাও কোন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব বিচ্ছিন্নতাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি।

১৯৪৭ সাল। কাশ্মীর রণাঙ্গণে পাক হানাদার বাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত। জয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর করায়ত্ত। সেই চরম মুহূর্তে নেহেরু যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করেন। কাশ্মীরী মুসলমানদের "আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের" সমর্থনে রাষ্ট্রপুঞ্জে "গণভোট" বা Plebiscite-এর প্রস্তাব পেশ করেন। তার বিষম পরিণতি অর্ধেক কাশ্মীর পাকিস্তানের অধিকারে—অবশিষ্ট কাশ্মীর হিন্দুশূন্য ও রক্তাক্ত।

1. Leonard Mosley—The Last Days of the British Raj, P-106
2. Maulana Abul Kalam Azad—India Wins Freedom, P-201
3. R. C. Majumder—History of Freedom Movement, P-669

প্রদেশকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে বাধ্য করার বিরোধী। (The Congress stood by the ideal of a united India, but it was also committed to the principle of self-determination and was against coercing any unwilling areas to join the union.)[1] নেহেরু প্রথমে বিরোধিতা করলেও পরে সম্মতি দেন। এ সম্বন্ধে আজাদের তির্যক মন্তব্য ঃ আমি প্রায়শই বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবি মাউন্টব্যাটেন কিভাবে নেহেরুকে জয় করেন? তাঁর নীতিবোধ প্রবল কিন্তু আবেগপ্রবণ এবং সহজেই ব্যক্তি-প্রভাবের বশবর্তী হন। আমার মনে হয় এই পরিবর্তনের একটি কারণ অবশ্যই লেডি মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিত্ব। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সখা-সুলভ প্রীতি ও অভিমানি স্বভাবের অধিকারিণী লেডী মাউন্টব্যাটেন ছিলেন সত্যিই মোহময়ী নারী। (I have often wondered how Jawaharlal was won over by Lord Mountbatten. He is a man of principle but he is also impulsive and very amenable to personal influences. I think one factor responsible for the change, was the personality of Lady Mountbatten. She is not only extremely intelligent but has a most attractive and friendly temperament.)[2*] গান্ধী ছিলেন দেশ বিভাগের ঘোরতর বিরোধী। আজাদকে তিনি বলেছিলেন ঃ কংগ্রেস যদি ভারত-বিভাগ মেনে নিতে চায় তবে তা হবে আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে। জীবন থাকতে আমি দেশ বিভাগে সম্মত হব না, এবং কংগ্রেসকেও এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে দেব না। (If the Congress wishes to accept partition it will be over my dead body. So long as I am alive, I will never agree to the partition of India. Nor will I, if I can help it allow Congress to accept it.)**[3] ৪ঠা জুন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রার্থনা

* এ বিষয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিক Leonard Mosley-র মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণঃ বিপত্নীক নিঃসঙ্গ নেহেরুর শূন্য হৃদয়ের অনেকখানিই পূর্ণ করেছিল লেডি মাউন্টব্যাটেনের মধুর সাহচর্য (He had long been a widower, and he was a lonely man. Lady Mountbatten filled an important gap in his life.)—Leonard Mosley—The Last Days of The British Raj—P-101-102

** ১৯৪১ সালে বিশ্বযুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়—মিত্রশক্তির জয় সুনিশ্চিত হল। মত পরিবর্তিত হল গান্ধীর। তিনি "ভারত ছাড়" দাবি ছেড়ে দিয়ে ইংরেজকে যুদ্ধে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি চেয়ে তিনি বড়লাটকে চিঠি লেখেন।

এই সময় রাজাগোপালাচারী গান্ধীর অনুমতিক্রমে "পাকিস্তান" স্বীকার করে জিন্নার সঙ্গে আপস আলোচনা করছিলেন। ইংরেজ বড়লাট গান্ধীর চিঠির উত্তরে জানালেন, প্রস্তাব গ্রহণ তো দূরের কথা, আলোচনারও যোগ্য নয়।

1 Ibid, P-670

2 Maulana Abul Kalam Azad—India Wins Freedom, P-198

3 R. C. Majumder—History of the Freedom Movement in India, P-660

সভায় তিনি বলেন ঃ দেশ বিভাগের জন্য ইংরেজ সরকার দায়ী নয়। এ ব্যাপারে ভাইসরয়ের কিছু করার নেই। প্রকৃতপক্ষে তিনিও কংগ্রেসের ন্যায় দেশ বিভাগের তীব্র বিরোধী। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান যদি কোন বিষয়েই ঐক্যমত না হতে পারে—তবে তাঁর আর কি করার আছে? (The British Government is not responsible for partition. The viceroy has no hand in it. In fact he is as opposed to division as Congress itself, but if both of us—Hindus and Muslims cannot agree on anything else, then the viceroy is left with no choice.)[1] অবশ্য গান্ধীর মনোভাব বোঝা একটু কঠিন। তাঁর মধ্যে স্ব-বিরোধিতা সুস্পষ্ট।

অধিবেশনে পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন, মৌলানা হাফিজুর রহমান ও ডঃ কিচলু প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু সর্দার প্যাটেল প্রস্তাবের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। মৌলানা আজাদ বলেছিলেন ৩রা জুনের পরিকল্পনা (ঐ দিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে পার্লামেন্টে ভারত বিভাগের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন) অপেক্ষা ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব ভারতের পক্ষে তুলনামূলক বিচারে ছিল উৎকৃষ্টতর। এই বক্তব্যের উল্লেখ করে প্যাটেল বলেন ঃ বিগত নয় মাস অন্তর্বর্তী সরকারে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলতে পারেন যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব বাতিল করার জন্য তাঁর বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। তাঁরা যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতেন তবে গোটা ভারতই হয়তো পাকিস্তানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করত।* (...that, looking at the Cabinet Mission's proposal today in the light of his experience in the Interim Government during the past nine months, he was not at all sorry that the Statement

অগত্যা, "যে পাকিস্তানের সম্ভাবনা মাত্র থাকায় ক্রীপসের প্রস্তাব কংগ্রেস অগ্রাহ্য করিয়াছিল, গান্ধী সেই পাকিস্তান দাবি স্বীকারের ভিত্তিতে জিন্নার সহিত মিটমাটের জন্য তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং জিন্নার সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিয়া লিখিলেন, "আমি চিরদিনই তোমার বন্ধু ও অনুগত ভৃত্য, আমাকে হতাশ করিও না।" (I have always been a servant and friend to you, Do not disappoint me.) এই প্রস্তাব ও কাকুতি মিনতি গান্ধীর একান্ত অনুরক্ত ভক্তগণ ছাড়া সমগ্র হিন্দু সমাজে বিষম বিক্ষোভ সৃষ্টি করিল। সাভারকর লিখিলেন যে, ভারতবর্ষ গান্ধী বা রাজাগোপালাচারীর নিজস্ব সম্পত্তি নহে যে তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছামত যাহাকে ইচ্ছা, ইহার যে কোন অংশ দাতব্য করিতে পারেন।"—রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস ৪ খণ্ড, পৃঃ-৩৯৩

* এই প্রস্তাবে বিভিন্ন গ্রুপভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতি ১০ বৎসর পর ভারত যুক্তরাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাংবিধানিক অধিকার ছিল। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলির পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে কোন অন্তরায় থাকত না। অন্যান্য অনেক রাজ্যও স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারত। সর্বোপরি বিধান সভায় মুসলিম ভোটের সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাব পাশ করে সমগ্র পাঞ্জাব ও বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা যেত। কংগ্রেস সভাপতি আজাদ ছিলেন এই প্রস্তাবের উৎসাহী সমর্থক। দূরদর্শী আজাদের এই নিশ্চি ত সম্ভাবনা না বোঝার কথা নয়। অনেকে এই প্রস্তাব সমর্থনের জন্য আজাদের সমালোচনা করেন।

1. R. C. Majumder—History of the Freedom Movement in India, P-661

of 16 May had gone. Had they accepted it, the whole of India would have gone the Pakistan way.)[1]

বিতর্কের উত্তরে গান্ধী প্রায় ৪০ মি. বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন ভারত বিভাগের বিরোধী হয়েও আজ তিনি এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশনে এসেছেন ভারত বিভাগ প্রস্তাব গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে। অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত কখনও কখনও গ্রহণ করতে হয়। (He advised the House to accept the resolution...he was one of those who had steadfastly opposed the division of India. Yet he had come before the A.I.C.C. to urge the acceptance of the resolution on India's division. Sometimes certain decision, however unpalatable they might be, had to be taken.)[2] অবশেষে দেশ বিভাগের প্রস্তাব ১৫৭-২৯ ভোটে গৃহীত হয়; ৩২ জন প্রতিনিধি ভোটদানে বিরত থাকে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলই ভারত বিভাগ প্রস্তাব গ্রহণ করে। ব্যতিক্রম হিন্দুমহাসভা। দলের পক্ষ থেকে এক প্রস্তাবে বলা হয়—ভারত এক ও অবিভাজ্য। যতদিন না বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে পুনরায় মূল ভারত ভূ-খণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়, ততদিন শান্তি অধরা হয়েই থাকবে।

সাধারণভাবে ভারত বিভাগ সংক্রান্ত চুক্তি সম্বন্ধে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতৈক্য হওয়ার পর বাংলা ও পাঞ্জাবের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। জিন্না প্রথম থেকেই বাংলা ও পাঞ্জাবকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন। ক্যাবিনেট মিশন আসার পর মুসলিম লীগ—এই দাবি পুনরায় উত্থাপন করে। হিন্দুদের মধ্যে দেখা দেয় তীব্র প্রতিক্রিয়া। বিগত সাতশ বৎসরের ইতিহাস বাংলার হিন্দুরা বিস্মৃত হয় নাই। বিস্মৃত হয় নাই মাত্র এক বৎসর পূর্বে সুরাবর্দির নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতায় Direct Action; প্রথমে কলকাতা, পরে নোয়াখালিতে ব্যাপক হিন্দু নিধনের ভয়ংকর স্মৃতি। "কলকাতা হাইকোর্টের ৫০ জন ব্যারিস্টার বঙ্গ বিভাগের দাবি জানাইয়া এবং উহার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহাদের প্রধান যুক্তি দুটি। প্রথমত তাহারা বলেন, পাকিস্তানে আমাদের বিশ্বাস নাই। আমরা এক দাসত্বের বিনিময়ে অন্য দাসত্ব চাই না। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে একটি শক্তিশালী পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হইলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষার কার্যকরী ব্যবস্থা হইবে" (ধন্য আশা কুহকিনী!)[3]

---

1 Ibid, P-671-672
2 Ibid, P-671
3 রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস ৪ খণ্ড, পৃঃ-৪৪৪

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তৃতীয় একটি—স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই অভিনব প্রস্তাবে মুসলিম লীগের পরোক্ষ সমর্থন ছিল এরকম মনে করার কারণ আছে। মুসলমান বুঝতে পারে সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু স্বতন্ত্র বাংলাকে সংখ্যাধিক্যের জোরে সহজেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে। এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা স্বয়ং সুরাবর্দি, আন্তরিক সমর্থন ছিল শরৎচন্দ্র বসুর। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও কিরণশঙ্কর রায় এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। সুরাবর্দিই এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। হিন্দুদের মন জয় করার জন্য সাংবাদিক সম্মেলনে আবেগপূর্ণ ভাষায় হিন্দুদের কাছে আবেদন করেন ঃ 'আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, ভবিষ্যৎ বর্তমানের ন্যায় হইবে না....হিন্দুগণ পূর্বের কথা ভুলিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে আমি তাহাদের আশা ও দাবি পুরাপুরি মিটাইয়া দিবার অঙ্গীকার করিতেছি...বাংলার প্রাচীন গৌরব ও ঐশ্বর্য আবার ফিরিয়া আসিবে।" কিন্তু হিন্দুরা বিভ্রান্ত হয় না। ভারত বিভাগ স্থির হওয়ার পূর্বেই হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৪৭ সালের ১৯শে মার্চ দাবি করেন বাংলাদেশকে ভাগ করে দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হোক। সুরাবর্দির স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলার তীব্র বিরোধিতা করে তিনি বাংলাদেশের হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। তিনি উদ্যোগী না হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র হয়তো ভিন্নরূপ হত।* বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ এবং হিন্দুদের মধ্যে শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও কিরণশঙ্কর রায় (বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য) বিষয়টি নিয়ে গান্ধীর মাধ্যমে দিল্লিতে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা চালান। একদিন সুরাবর্দি, শরৎচন্দ্র বসু এবং বাংলার মুসলিম লীগ সেক্রেটারি আবুল হাসেমকে নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আবুল হাসেম আবেগপূর্ণ ভাষায় গান্ধীকে বলেন ঃ "ভাষা, সংস্কৃতি ও অতীত ইতিহাস বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের চিরস্থায়ী বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সকলেই আমরা বাঙালী; সুতরাং হাজার মাইল দূর হইতে পাকিস্তান আমাদের শাসন করিবে ইহা ঘৃণার বিষয়।" খুশি হইয়া গান্ধীজি হাসেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা যদি পাকিস্তান ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য স্বাধীন বঙ্গদেশকে স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের সহিত যুক্তরাজ্য (Voluntary Federation) গঠনের জন্য আহ্বান করে তবে কি স্বাধীন বঙ্গদেশ তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে? হাসেম 'হ্যাঁ' বা 'না' কোন উত্তর দিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন। গান্ধীজি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে বাঙালির সংস্কৃতির

---

* ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে হিন্দু ছিল জনসংখ্যার ৪৪ শতাংশ—মুসলমান ৫৬ শতাংশ। বাংলাকে ভাগ করা না হলে প্রতিষ্ঠিত হবে মুসলিম রাজত্ব;হিন্দুর বিপদ নিশ্চিত। মুসলিম শাসনের ভয়ঙ্কর বিপদ হতে হিন্দুকে উদ্ধার করার জন্য ডঃ আম্বেদকর বাংলাকে ভাগ করার প্রস্তাব করেছিলেন। (..To redraw the boundaries, to have Muslims and Hindus placed under separate National States and thus rescue the 44 P.C. of the Hindus from the Horrors of the Muslim Rule? —Dr. B. R. Ambedkar, Writings & Speeches,Vol-8, P-125

কথা বলিলেন, তাহার মূল উৎস উপনিষদে এবং বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহাকে মূর্ত করিয়াছেন তাহা কেবল বঙ্গদেশের নহে, সর্বভারতীয় সংস্কৃতি—সুতরাং স্বাধীন অখণ্ড বঙ্গদেশ কি ভারতের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান গ্রহণ করিবে?* এবারেও হাসেম চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু সুরাবর্দি সম্মতি দিয়েছিলেন।"[1] হাসেমের নীরবতা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, মুসলমানের প্রকৃত উদ্দেশ্যের ইঙ্গিতবাহী; সুরাবর্দির সম্মতি ছলনায় কার্যসিদ্ধির প্রয়াসমাত্র। যা হোক শ্যামপ্রসাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা, এবং সর্দার প্যাটেল, নেহেরু ও জিন্নার আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন স্বতন্ত্র বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নাই। ক্ষমতা হস্তান্তর চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলমান যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে যোগদানের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গ্রহণ করেন। ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ নির্বাচিত হন পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী।

ইংরেজের মধ্যস্থতায় ভারত বিভাগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে লর্ড মাউন্টব্যাটেন, কংগ্রেসের জওহরলাল নেহেরু ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মহম্মদ আলি জিন্না। ৭ আগস্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত বিমানে জিন্না বম্বে থেকে করাচি এসে পৌঁছান। বিদায়ী ভাষণে তিনি ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে অতীত ভুলে যাওয়ার আবেদন জানান। ১৩ আগস্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেন করাচি যান। পরদিন ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের সংবিধান সভায় ভাষণ দেন; জিন্না গভর্নর জেনারেল রূপে শপথ গ্রহণ করেন। এই বিষয়টির পূর্ব ইতিহাস যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। ১৭ মে, ১৯৪৭। নেহেরু লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে এক চিঠিতে জানান—"আমরা এ প্রস্তাবে সম্মত যে ভারত-পাকিস্তান স্ব-শাসিত উপনিবেশ দুটির জন্য একজন অন্তর্বর্তী গভর্নর নিযুক্ত হোক। আমাদের পক্ষ থেকে জানাই, আমরা আনন্দিত হব আপনি যদি এই পদ গ্রহণ করে আপনার অভিজ্ঞতা ও উপদেশ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন। (We [Congress] agree to the proposal that during this interim period [of dominion status] the Governor of the two Dominions should be common to both states....For our part we should be happy if you would continue in this office and help us with your advice and experience.)[2]

** গান্ধী ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, বাংলার সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিরই অঙ্গ, যার উৎস হল উপনিষদ। উপনিষদ আবার হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র। তাহলে গান্ধীও স্বীকার করছেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতি সর্ব অর্থেই হিন্দু সংস্কৃতি। ইসলামিক সংস্কৃতি স্বতন্ত্র, মুসলমানের সংস্কৃতি—যার উৎস হল ইসলাম ধর্ম। এই তো যথার্থ বিশ্লেষণ। তাহলে যে বলা হয়, হিন্দু-মুসলমানের এক সংস্কৃতি; ভারত হল মিশ্র সংস্কৃতির (কখনও তা হয় না) দেশ—সে কি শুধু প্রচার, উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যাচার অথবা আত্মপ্রতারণা?

1. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস ৪ খণ্ড, পৃঃ-৪৫০
2. Leonard Mosley—The Last Days of The British Raj, P-168-169

নেহেরু না হয় স্ব-কন্যা মাউন্টব্যাটেন দম্পতির আকর্ষণীয় মনোরম ব্যক্তিত্বে মোহাবিষ্ট। কিন্তু গান্ধী? ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসের এক অপরাহ্ন। গান্ধী ধীর পদে প্রবেশ করেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পাঠকক্ষে। গভর্নর জেনারেল পদে কংগ্রেসের আমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান।* (One July afternoon....[Gandhi] walked into the viceroy's study. There Gandhi asked Mountbatten to accept congress's invitation to become the first Governor General of the nation.)[1] স্বভাবতই উৎফুল্ল মাউন্টব্যাটেন জিন্নার কাছেও অনুরূপ প্রস্তাব (common Governor General) পাঠিয়েছিলেন। মিঃ জিন্না রূঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

১৪ আগস্ট রাত্রি, খণ্ডিত ভারতের সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশন। ওই সভা লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে আমন্ত্রণের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রস্তাব অনুমোদন করে। অধিবেশন শেষে নেহেরু ও ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সরকারি বাসভবনে গিয়ে সংবিধান সভার অনুরোধ নিবেদন করেন। অভিভূত মাউন্টব্যাটেন বলেন, এ আমার মহৎ সম্মান... (on the night of 14 August the Constituent Assembly met...The Constituent Assembly endorsed the request of the Congress leaders that Lord Mountbatten should become the first Governor General. Soon after it's meeting, Rajendra Prasad and Nehru went over to Government House and conveyed to him the request of the Constituent Assembly. Lord Mountbatten feelingly replied "I am proud of the honour...)[2]

দিল্লীতে সাজ সাজ রব। নেহেরুর রাজ্যাভিষেক ! দিল্লী নগরী উৎসব সাজে সজ্জিত। প্রতিটি রাজপথ সুদৃশ্য তোরণ ও ফুলে-ফুলে শোভিত। আলোর রোশনাই। আকাশ আতসবাজির বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উদ্‌ভাষিত। ১৫ আগস্ট সকালে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে

* "জাতির জনক" মহাত্মা গান্ধী এবং নবভারতের রূপকার(?) পণ্ডিত নেহেরুর সানুনয় অনুরোধে—ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের শেষ রাজপ্রতিনিধি ভারত-বিভাগকারী লর্ড মাউন্টব্যাটেন হলেন জাতির ভাগ্যবিধাতা, রাষ্ট্রের কর্ণধার। অথচ ইতিহাসে লেখা হয়—পড়ানো হয় স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে;ইংরেজ তার সাম্রাজ্যের স্বার্থে Devide and Rule নীতি প্রয়োগ করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। যাওয়ার সময় ভাগ করে গেছে ভারতবর্ষকে। তাই যদি সত্য হয়, তবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন—যাকে এই পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য ভাইসরয় করে পাঠানো হয়েছিল, গান্ধী-নেহেরু তাকেই অনুরোধ করে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল পদে বরণ করেছিলেন কেন? অন্যদিকে পাকিস্তান প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা স্বরূপ জিন্নার উচিত ছিল লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল পদে গ্রহণ করা। কিন্তু তিনি সম্মত হন নি।

1. Collins & Lapierre—Freedom at Midnight, P-184
2. V. P. Memon—The Transfer of Power in India, P-413-414

লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে গভর্নর জেনারেল রূপে শপথ বাক্য পাঠ করান ভারতের প্রধান বিচারপতি কানাইয়া। স্বাধীন খণ্ডিত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। বৃদ্ধ রণক্লান্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আবেগে আপ্লুত, আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু কতিপয় মানুষের মন ছিল অবশ্যই বিষাদগ্রস্থ। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বিশ্লেষণে তা পরিস্ফুট ঃ "পূর্ববঙ্গের হিন্দু এবং পঃ পাকিস্তানের হিন্দু-শিখ জনগণ স্বাধীনতার আনন্দ হতে বঞ্চিত— যে স্বাধীনতার জন্য তাদের অবদান সর্বাধিক, কিন্তু রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতার কোন স্থান নেই; তাদের জন্য কেউ এক ফোঁটা অশ্রুপাত করে না। যদিও এই দুই প্রদেশের অধিবাসীদের আত্মত্যাগেই অবশিষ্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ প্রশস্ত হয়েছে। তাদের আর্ত-করুণ বিলাপ মিলিয়ে যায় স্বাধীনতা উৎসবের মত উল্লাসে।"* (....the Hindus of East Bengal and the Hindus and Sikhs of the West Punjab who were denied enjoyment of the blessings of liberty for which they had made supreme sacrifices. But gratitude has no place in politics. No tears were shed for the lands, the sacrifice of whose children paved the way for the liberty of the rest of India. If there were any wailings of their people they were drowned by the shouts of joy which heralded the liberation of the rest of India.)[1]

শুধু পাকিস্তান নয়—দাঙ্গা হয়েছে ভারতেও। তা অবশ্য পাকিস্তানের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া। তুলনায় নগণ্য। পঃ পাকিস্তানে দাঙ্গা শুরু হয় ৪৭ সালের ফেব্রু-মার্চ মাসে। স্থানীয় সরকারের সহানুভূতি ও নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। দেশ-বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে এই হিন্দু নিধন চরম আকার ধারণ করে।

লক্ষ লক্ষ হিন্দু-শিখ উদ্বাস্তু সর্বস্ব হারিয়ে এসেছে ভারতে। রাজধানী দিল্লির রাজপথ, ময়দান, স্কুল, ধরমশালা, মন্দির-মসজিদ সর্বত্রই উদ্বাস্তু, কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই।

---

* খুশবন্ত সিংহের রচনায় ঃ দিল্লিতে যখন আনন্দ উৎসব ;দ্বিধা-বিভক্ত রক্তস্নাত পাঞ্জাব ও বাংলা তখন শোকস্তব্ধ। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা সর্বহারা। (What was a day of jubilation in Delhi was a day of mourning in Punjab and Bengal which had been sliced into halves with enormous amount of bloodshed and millions rendered homeless and impoverished — Hisdustan Times, dated-28.6.2003)

---

1. R. C. Majumder—History of The Freedom Movement In India—Voll-III. P-677

১৯৪৭ সালের হিন্দু মেধ যজ্ঞ হিন্দুর (শিখরাও হিন্দু)* এক জাতীয় বিপর্যয়। অন্য কোন দেশ হলে পালিত হত সপ্তাহব্যাপী জাতীয় শোক। মন্ত্রীমণ্ডলী কালো ব্যাজ পরে শপথ নিতেন। কিন্তু এ যে ভারতবর্ষ! স্বামীহারা পুত্রহারা নারীর করুণ-ক্রন্দনে পাষাণ বিগলিত হয়। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করেন না প্রেমাবতার গান্ধী ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী নেহেরু। হিন্দুর জন্য তাদের নেই কোন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বা সমবেদনা। মুসলমানের সুরক্ষার জন্য তারা উদ্বিগ্ন, যাপন করেন নিদ্রাহীন নিশি।

নোয়াখালি তখনও অশান্ত। গান্ধী স্থির করেছিলেন যে, ১৪ আগস্ট তিনি নোয়াখালিতে থাকবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতায় পৌঁছে সোদপুর আশ্রমে গেলেন ৯ আগস্ট ১৯৪৭। সেই দিনই মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ ওসমান গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুসলমানের নিরাপত্তার জন্য নোয়াখালি না গিয়ে তাঁকে কলকাতায় থাকতে অনুরোধ করেন। গান্ধী-শিষ্য প্যারেলালের বিবরণী হতে ঃ

"...সেই দিন বৈকালে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা কেবল কলিকাতার পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করিলেন—বলিলেন, সারা দিনই মুসলমানের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনিয়াছেন, লীগ মন্ত্রীসভার আমলে হিন্দুদের ওপর কি অত্যাচার হইয়াছে তিনি তাহা অনুসন্ধান করিতে চাহেন না। ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভার আমলে যদি মুসলমানদের ভয়ে ভয়ে কলিকাতায় বাস করিতে হয় তাহলে মন্ত্রীসভার কলঙ্ক।"[1]

১৩ আগস্ট বেলিয়াঘাটার "হায়দারী ম্যানসনে" পৌঁছিয়া দেখিলেন একদল যুবক কালো পতাকা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে—কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, এবং তাহারা চিৎকার করিয়া বলিতেছে, "আপনি এখানে আসিয়াছেন কেন?" মুসলমানেরা যখন হিন্দুকে মারিতেছিল তখন আপনি আসেন নাই—এখন মুসলমানেরা বিপদে পড়িয়া আপনার কাছে নালিশ করিয়াছে, আপনি অমনি আসিয়া এই সব ন্যাকামি আরম্ভ করিয়াছেন।...ইতিমধ্যে সুরাবর্দির গাড়ি আসিয়া পৌঁছিল এবং উত্তেজিত জনতা তাঁর গাড়ি ঘেরাও করিল...অনবরত চিৎকার হইতে লাগিল "গান্ধী ফিরিয়া যাও"।[2]

---

* বাংলার শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের ন্যায় গুরুনানকদেব প্রবর্তিত শিখ ধর্মও হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত একটি সম্প্রদায়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে গুরু অর্জুন দেবকে হত্যা করা হয়। পুত্র হরগোবিন্দের প্রতি তাঁর শেষ নির্দেশ ঃ সে যেন সশস্ত্র হয়ে গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং সাধ্যানুসারে সৈন্যদল গঠন করে। শুরু হয় তাঁর অনুগামীদের মধ্যে সমর বিদ্যার চর্চা। ১৬৭৫ খ্রিঃ গুরু তেগবাহাদুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অসম্মত হলে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আদেশে নির্মমভাবে নিহত হন। পুত্র গুরু গোবিন্দ সিং উপলব্ধি করেন—হিন্দু জাতি ও তার ধর্মকে রক্ষা করতে প্রয়োজন সামরিক শক্তির। তিনি ধর্ম ও জাতি রক্ষার্থে শিখদের সমর বিদ্যায় কুশলী একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় রূপে গড়ে তোলেন।
হিন্দু জাতিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে কোন কোন মহল থেকে প্রচার করা হয় যে শিখ সম্প্রদায় হিন্দু নয়— একটি স্বতন্ত্র জাতি। মূল জাতীয় স্রোত হতে বিচ্ছিন্ন হতে শিখদের প্ররোচিত করা হয়।

---

1. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস—৪ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৩
2. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস—৪ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৪-৪৫৫

বিদেশী ঐতিহাসিকের বর্ণনায় ঃ At the approach of his car, they began to shriek Gandhi's name....faces contorted with rage and hate, they shouted, "Go save the Hindus in Noakhali". Save Hindus, not Moslems and "Traitors to the Hindus". Then, as Gandhi's car stopped... They showered the car with stones and bottles".[1]

শঙ্কিত হয়ে গান্ধী যুবকদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে আলোচনার জন্য আহ্বান করেন। ..."তাহারা প্রথমেই প্রশ্ন করিল, "গত বৎসর মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় আপনি হিন্দুদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন নাই। আর আজ মুসলমান পাড়ায় ছোটখাট হাঙ্গামার খবর শুনিয়াই আপনি তাহাদের সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিয়াছেন। আপনি এখানে থাকিবেন ইহা আমরা চাই না।" গান্ধী তাঁর স্বভাবসুলভ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির বন্ধন সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলে যুবকেরা উত্তর করিল "আমরা অহিংসার ওপর ধর্মাত্মক বক্তৃতা শুনিতে চাই না। আপনি চলিয়া যান—আমরা এখানে মুসলমানদের বাস করিতে দিব না"।...এই সময় ১৮ বছরের একটি যুবক বলিয়া উঠিল, "ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সদ্ভাব থাকিতে পারে না।" গান্ধী উত্তর দিলেন, "তোমাদের সকলের চেয়ে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার অনেক বেশি। আমি জানি হিন্দুরা মুসলমানদের "চাচা" বলে এবং হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের ধর্ম-উৎসবে ও বিবাহাদি শুভকার্যে যোগ দেয়।*[2]

৩১ আগস্টের ঘটনা গান্ধীর ভাষায় ঃ "রাত্রি প্রায় ১০টার সময় নানা স্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা একটি যুবককে লইয়া একদল লোক শোভাযাত্রা করিয়া বাড়িতে ঢোকে এবং চিৎকার করিতে আরম্ভ করে। আমার নিদ্রা ভাঙিয়া গেল, কিন্তু আমি চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম। যুবকদল পাথর ছুঁড়িয়া এবং হকি খেলার লাঠি দিয়া আসবাব, বাসনপত্র ও ছবির ফ্রেম এবং বাতির ঝাড় ভাঙিতে লাগিল। আভা ও মানু (গান্ধীর সঙ্গিনী) পাছে গান্ধীর ঘুম ভাঙে এই আশঙ্কায় সাহস করিয়া বাহির হইয়া যুবকদিগকে শান্ত হইতে মিনতি করিল...মেয়েদের কাকুতি-মিনতিতে কোন ফল হইল না...জানালা-দরজা ভাঙার শব্দ ক্রমশই বাড়িল"[3] ৭ই সেপ্টেম্বর গান্ধী গোপনে কলকাতা ত্যাগ করেন।

* "যুবকটি কি উত্তর দিয়াছিল প্যারেলাল তাহা লেখেন নাই। কিন্তু এই গ্রন্থের লেখকের (রমেশচন্দ্র মজুমদার) নিকট একাধিক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, প্রতিবেশী এইসব চাচারাই প্রতিবেশী হিন্দুদের হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও নারী ধর্ষণের ব্যাপারে সানন্দে যোগ দিয়াছে। ১৮ বৎসরের যুবকের মুখ দিয়া যে ঐতিহাসিক সত্যের কথা বাহির হইয়াছিল—ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস যাঁহারা অপক্ষপাত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই তাহার সমর্থন করিবেন।"—রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৬

1. Collins & Lapierre—Freedom at Midnight— P-233
2. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস—৪ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৫-৪৫৬
3. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস—৪ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৯

"জাতির জনক" গান্ধী মুসলিম তোষণ নীতির দ্বারা ভারত বিভাগের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। মুসলিম তোষণেই তাহা সমাপ্ত হল। ভারত হল খণ্ডিত।

প্রকৃত সাধু-সন্ত, ফকির-মহাত্মার স্থান অরণ্য-পর্বত; রাজনীতির কুটিল অঙ্গন নয়। রাজধর্ম ও ব্যক্তির ধর্ম এক নয়। রাজধর্মে প্রজার কল্যাণই সর্বাগ্রে বিবেচ্য; রাজার আপন ধ্যান-ধারণা গৌণ। রাজধর্মে দেশ ও জাতির ভাগ্য নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলে না—অন্তঃসারশূন্য কোন আদর্শের সেখানে স্থান নেই।* ভারতের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব রাজধর্ম ও রাষ্ট্রনীতির এই মূল সত্যকে অস্বীকার করেছে। তাই লক্ষ মানুষের তপ্তরক্তে, কোটি মানুষের অশ্রুজলে খণ্ডিত-ভারতের স্বাধীনতা হয়েছে অভিষিক্ত।

* রাষ্ট্র পরিচালনায়—দূরদর্শিতা ও বাস্তব বিচার বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে যদি কোন উচ্চাভিলাষী রাষ্ট্রনায়ক নিজের ভাবমূর্তি গড়ার জন্য ভাব-বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেয়, তবে তার কি ভয়ঙ্কর পরিণাম হতে পারে—১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ তার দৃষ্টান্ত। "পঞ্চশীল" নীতির জয়গান ও "হিন্দী চিনী ভাই ভাই" স্লোগান দিয়ে খণ্ডিত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতির বাণীপ্রচার করেছেন। কম্যুনিস্ট চীন তার জবাব দিয়েছে, প্রথমে তিব্বত ও পরে অতর্কিত আক্রমণে ভারতের প্রায় ৫০০০০ হাজার বর্গ মাইল ভূ-খণ্ড দখল করে। বিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতি বিশারদ Brahma Chellaney তাই বলেছেন ঃ বাস্তব পরিস্থিতি, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিবর্তে আশাবাদের দ্বারা যদি পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয় তবে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে তদাপেক্ষা ক্ষতিকারক আর কিছু হতে পারে না। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে এই "আশা" যদি অভিশাপরূপে আবির্ভূত না হত তবে অতীতের অনেক ভুল (যার জন্য দেশকে অনেক কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে) হয়তো ঘটত না। (Nothing can damage national interests more than a foreign policy driven not by level-headed assessments and calculations, but by hope. Had undying hope not been the curse of Indian foreign policy, many of the past blunders could not have occurred.—Hindustan Times, 23-1-2002

ভারত বিভাগ কেন? কে দায়ী?

বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ। পায় হাজার বৎসর ছিল মুসলিম শাসনাধীন। তারপর এল ইংরেজ রাজত্ব; প্রায় ২০০ বৎসর। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ চলে গেল; কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত হল ভারতবর্ষ। এ যেন ইন্দ্রপতন! পৃথিবীতে অভূতপূর্ব, নজিরবিহীন। ছয় দশক অতিক্রান্ত হল। অথচ আজও এ ঘটনার তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক কোন বিশ্লেষণ হল না—কেন এ বিভাগ, কে দায়ী? বিষয়টিকে যেন স্পর্শকাতরতার মোড়কে আড়ালে রাখার প্রয়াস। কেন? কোন ব্যক্তির ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবে? প্রচার মাহাত্ম্যে মহীয়ান কোন আদর্শের অসাড়ত্ব প্রমাণিত হবে? কিন্তু ব্যক্তিপূজা অথবা কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মহিমা কীর্তন তো ইতিহাসের উদ্দেশ্য নয়। (History is no respecter of persons or communities.) প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সত্য উদ্‌ঘাটন তার একমাত্র লক্ষ্য।

এই প্রসঙ্গে ১৯৩৭ সালের ২২ নভেম্বর স্বনামধন্য ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারকে লেখা ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের (স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি) চিঠিখানি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চিঠির একাংশে ডঃ প্রসাদ লিখছেন ঃ আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, যে ইতিহাস ঘটনা বা তথ্যকে গোপন অথবা বিকৃত করে তা ইতিহাস বলে গণ্য নয়। যদি কোন ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই কাজ করেন যে, এর দ্বারা তাঁর দেশের কল্যাণ হবে—তবে পরিণামে অকল্যাণই হয়। একথা আমাদের মত দেশ, যারা জাতীয় দুর্বলতা ও ত্রুটির জন্য অনেক অত্যাচার সয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সমধিক প্রযোজ্য। আমাদের উচিত হবে অতীতকে ভাল করে জানা ও বোঝা যাতে প্রতিকার ও অতীতের ভুলের সংশোধন করা যায়। (In his reply, dated 22 Nov-1937, Dr. Rajendra Prasad wrote : "I entirely agree with you that no history is worth the name which suppresses or distorts facts. A historian who purposely does so under the impression that he thereby does good to his native country really harms it in the end. Much more so in the case of country like ours which has suffered much on account of it's national defects, and which must know and understand them to be able to remedy them).[1]

1. R. C. Majumder—The History and Culture of the Indian People (The Mughal Empire) Preface—XIV

হিন্দুস্থানের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবে হিন্দুর মানসিকতা গঠিত। উদার পরমতসহিষ্ণু। তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত, বিশ্বজনীন। পৃথিবীর সকল অধিবাসী-ই আমার আত্মীয়—এরকম একটা ধারণা তার মধ্যে সতত ক্রিয়াশীল। বেদান্ত ধর্মের প্রভাবে ঐহিক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সাধনাই তার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু তাই জাগতিক ব্যাপারে কিঞ্চিৎ নিস্পৃহ, উদাসীন। ভারতবর্ষে বৈদেশিক আক্রমণের সাফল্যের জন্য হিন্দুর এই মানসিকতা অবশ্যই অংশত দায়ী। তা সত্ত্বেও, তার মাতৃভূমি বিদেশী শক্তির পদানত। হিন্দু জাতির অস্তিত্ব হয়েছিল বিপন্ন; তার সভ্যতা-সংস্কৃতি হয়েছিল বিধ্বস্ত। নিশীথের দুঃস্বপ্নের ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি ছিল পীড়াদায়ক ও মর্মবিদারী। রাজনৈতিক ঐক্য ও সচেতনতার অভাবে সে ছিল অসহায়। ইংরেজ শাসনে ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। সুপ্ত জাতির মধ্যে দেখা যায় নবজাগরণের লক্ষণ। রাজা রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, দয়ানন্দ সরস্বতী এবং স্বামী বিবেকানন্দের অনলস প্রয়াসে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের বিকাশ হয়। এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ রূপান্তরিত হয় ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে। সমগ্র হিন্দু জাতির নিঃশর্ত সমর্থনপুষ্ট কংগ্রেস ছিল এই সংগ্রামের পুরোভাগে। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রণীত দেশভাগের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিল ভারতে মুসলিম জাতির প্রতিনিধি মুসলিম লীগ ও অ-মুসলমান ("হিন্দু" এই শব্দটি সকল সরকারি দলিলে বর্জিত) ভারতীয়দের প্রতিনিধি কংগ্রেস। সুতরাং দেশভাগের দায়িত্ব কংগ্রেস অস্বীকার করতে পারে না।

ভারতবর্ষে দু'টি জাতি; হিন্দু ও মুসলমান। বিজিত ও বিজয়ী। পৃথিবীর কোথাও অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, বিজয়ী ও পরাধীন জাতির মধ্যে একাত্মবোধ, সহমর্মিতা ও প্রীতির সম্পর্ক থাকে না। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক এর ব্যতিক্রম হবে এরূপ মনে করা এক মহাভ্রান্তি। মাতৃভূমিকে ইংরেজদের অধীনতা-পাশ মুক্ত করার লক্ষ্যে হিন্দুর যে ঐকান্তিক আগ্রহ, মুসলমানের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না। একদিন তারা এদেশে এসেছিল বিজয়ীর বেশে। পরে ইংরেজের হাতে পরাজিত হয়ে হয় রাজ্যহারা। সুতরাং ইংরেজের ওপর তাদের সঙ্গত ক্ষোভ ছিল। কিন্তু ইংরেজকে তাড়িয়ে তারা হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে পারবে না। পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রাধান্য। এই উপলব্ধি থেকেই ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলমান দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তবুও বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুসলমানের সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সহজ পথ বেছে নেয় হিন্দুরা। অতীতকে ভুলে যেতে হবে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তীব্র বিদ্বেষ ও বৈরিতার পরিবর্তে কল্পনায় আঁকতে হবে প্রীতি ও মিলনের ছবি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যযুগের ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে হবে। তবেই উভয় জাতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা

সম্ভব। বিখ্যাত হিন্দু নেতারা প্রচার শুরু করলেন যে, মুসলিম রাজত্বে হিন্দুরা পরাধীন ছিল না। এবং এইভাবেই ইতিহাস লেখা শুরু হল। সেই ধারা এখনও প্রবহমান। কিন্তু অসত্য ও অজ্ঞানতা কখনই কল্যাণকর হয় না।

দঃ আফ্রিকা থেকে ১৯১৫ সালে গান্ধী এলেন ভারতে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য তরণীর তিনিই হলেন প্রধান কাণ্ডারী। তিনি সকলকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে ঘোষণা করলেন, "হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপিত হলে তিনি ৬ মাসের মধ্যে দেশবাসীকে স্বরাজ উপহার দিতে পারেন।" দেশের মুক্তি অপেক্ষাও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে দিলেন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। কিন্তু যা অনৈতিহাসিক, অসত্য ও অবাস্তব, তাকে সত্য বলে চালাতে হলে প্রয়োজন আত্মপ্রবঞ্চনা, কপটতা, অজ্ঞতার ভান ও সর্বোপরি তোয়াজ বা তোষণ। গান্ধী মনে করেন হিন্দু-মুসলমানের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে হিন্দুকে অজ্ঞ রেখে এবং মুসলমানকে তোয়াজ করলেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গড়ে উঠবে মিলন সেতু। কিন্তু কোথায় ঐক্য? হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য কোনদিন ছিল না—এ অভিমত ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের। পূর্বে তার উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমান ঐতিহাসিক গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে যে, পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মকে নির্মূল করে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যই মুসলমান ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে, প্রতিষ্ঠা করেছে শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য।

সকল মুসলমানই জেহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ৭১২ খ্রিঃ হতে ভারতবর্ষে এই জেহাদ চলছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। খিলাফৎ আন্দোলনে কেরালার মালাবারে নির্বিচারে হিন্দুহত্যা, Direct Action-এর সূচী অনুযায়ী কলকাতা ও নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন ছিল কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ। ১৯৪৭ থেকে কাশ্মীরে আজও চলছে জেহাদ ও হিন্দু জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পিত প্রয়াস। বসনিয়া, কসভো, চেচনিয়া (রাশিয়া) জিংজিয়াং (চীন) ও ফিলিপাইনস্ সহ বিশ্বাব্যাপী জেহাদের রণধ্বনি। জেহাদে অংশগ্রহণ মুসলমান মাত্রেরই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। (exert himself in the path of God) এ হল পরম কারুণিক সর্বশক্তিমান আল্লার অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ।* পয়গম্বর মহম্মদ জেহাদের প্রথম সার্থক রূপকার।

কিন্তু গান্ধী ও তাঁর ভক্তবৃন্দ নতুন ইতিহাস রচনা করতে চান। লালা লাজপত রায় রাজনীতিবিদ্ থেকে ঐতিহাসিক। তিনি লিখলেন ঃ "এ্যাঞ্জেলস্ স্যাকসনস্, জিউটস,

---

* "জেহাদ" যেহেতু আল্লাহ্‌র নির্দেশ—তাই দেশ কাল ভেদেও তা অলঙ্ঘনীয় ও অপরিবর্তনীয়। সম্প্রতি, বর্তমান মুসলিম দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ "জেহাদী" ওসামা বিন্ লাদেনের সমর্থনে দিল্লির জামা মসজিদের শাহী ইমাম আবদুল্লা বুখারী বলেন ঃ যদি কোন মুসলিম দেশ জেহাদ ঘোষণা করে—তবে পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমানের সেই জেহাদকে নৈতিক ও প্রকাশ্যে সমর্থন করা বাধ্যতামূলক। (If any Islamic Country announces Jehad, it is obligatory for each and every Muslim in the World to support it morally and express it openly.— Hisdustan Times, 11-11-2001)

ডেনস্ ও নরমান জাতিগোষ্ঠীর মিলনে যেমন বর্তমান ইংরেজ জাতির উদ্ভব হয়েছে; তেমনি হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই লীন হয়েছে ভারতীয় জাতি সত্ত্বায়"। (The Hindus and Muslims have coalesced into an Indian people very much in the same way as the Angles, Saxons, Jutes, Danes and Normans formed the English people of today)[1] রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে চমৎকার। কিন্তু এর ঐতিহাসিক মূল্য কি?

বর্তমান সুসভ্য ইওরোপবাসীরা যখন অরণ্যচারী—তখন ভারতবর্ষে সভ্যতার চরম বিকাশ হয়েছিল। বেদের রচনাকাল 'যীশুখ্রিস্টের জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্বে নির্ধারিত হয়েছে। সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয় অষ্টাদশ পুরাণ সহ আর্য সাহিত্য—যা বিশ্বের প্রাচীনতম ও বিশালতম। সেই ভাষা, সাহিত্য আজও সজীব ও প্রাণবন্ত—ইওরোপের ভাষাসমূহের উৎস ল্যাটিন ভাষার ন্যায় লুপ্তপ্রায় নয়। আর এ সকলই হিন্দু জাতির অবিনশ্বর কীর্তি। অন্যদিকে...."Anglo, Saxons and Jutes হল জার্মান উপজাতি। খ্রিঃ ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে এরা বর্তমান ইংল্যান্ড জয় করে স্থাপন করে উপনিবেশ। পরে আসে Danes ও Normans. এদের মধ্যে Anglo Saxons -রাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ট। পরবর্তীকালে তাদের নাম অনুসারেই দেশটির নামকরণ হয়—Anglalong—Englelond—England. খ্রীস্টান ধর্ম ইংল্যান্ডে আসে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। তখন ইংল্যান্ডের অধিবাসীরা ছিল পৌত্তলিক—বহু দেব-দেবতায় বিশ্বাসী। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রায় ৪০০ বৎসর সময় লেগেছিল সকল অধিবাসীদের এই নব ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে। খ্রিস্টান যাজক সম্প্রদায় স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসে কখনও আঘাত দেননি। বর্তমান ইংরেজ জাতির প্রথম মহাকাব্য হল Beowulf– রচনাকাল ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ।"[2]

বিভিন্ন বহিরাগত উপজাতিদের নিয়ে বর্তমান ইংরেজ জাতি গঠিত হয়েছে। ইহা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে এই সকল উপজাতি ছিল বিকাশের আদিম স্তরে। যে সকল মৌলিক উপাদান নিয়ে একটি জাতি গঠিত হয় তাহা তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে নাই। পক্ষান্তরে খ্রিস্টের জন্মের কয়েক হাজার বৎসর পূর্বেই একটি সুসংহত পূর্ণাঙ্গ জাতিরূপে হিন্দু জাতির প্রতিষ্ঠা। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির সকল বিষয়েই তার চরম উৎকর্ষ আজও জগতের বিস্ময়। দ্বিতীয়ত মুসলমান বয়সে নবীন। কোন আঞ্চলিক বা ভৌগোলিকজাতীয়তাবাদের বা সভ্যতার গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। সে ইসলামিক সভ্যতা সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। তার জাতীয়তাবাদ হল ইসলামিক জাতীয়তাবাদ। বিশ্বের

1. Ibid, Preface—XIII
2. William J. Long—English Literature—It's History and It's Significance.

সকল মুসলমানই এই জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। একেই বলা হয় Pan-Islamism. সকল অ-মুসলমানকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত (অথবা বিনাশ) করে বিশ্বব্যাপী মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করাই হল ইসলামের প্রধান লক্ষ্য। এই হল Dar-ul-Islam, Dar-ul-Harb ও জেহাদের মূল তত্ত্ব।

এই হিন্দু-মুসলমান মিলন তত্ত্বের প্রচার যে কতবড় অসত্য তা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন;সাধারণ মানুষ তাদের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা দিয়ে তা মর্মে মর্মে নিত্য উপলব্ধি করে। তবু এই সর্বনাশা মিথ্যা প্রচারের বিরাম নেই। "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তাতে মুসলিম শাসকরা হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে" এই অভিযোগ নস্যাৎ করে দাবি করা হয় যে ধর্ম বিষয়ে মুসলিম শাসকরা ছিলেন খুবই সহনশীল। ইতিহাস লেখায় কংগ্রেসের এই নীতি নির্দেশিকা অনুসরণ করে একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক সুলতান মামুদ ও ঔরঙ্গজেবকে উগ্র ধর্মান্ধতার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। (A history written under the auspices of the Indian National Congress sought to repudiate the charge that the Muslim rulers broke Hindu temples, and asserted that they were the most tolerant in matters of religion. Following in its footsteps a noted historian has sought to exonerate Mahamud of Ghazni and Aurangzib of bigotry and fanaticism.)[1] পরবর্তীকালে অন্য ইতিহাস লেখকগণ অনুরূপ ভাবে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে আনীত ধর্মান্ধতার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। লালা লাজপত রায় একধাপ অগ্রসর হয়ে লিখলেন—"ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনকে বিদেশী শাসন বলা যায় না।" (His (Lala Lajpat Rai) further assertion that the Muslim rule in India was not a foreign rule.[2]

ভারতে বহু বিদেশী জাতি এসেছে—কালক্রমে তারা হিন্দু বা ভারতীয় জাতি সত্ত্বায় লীন হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম মুসলমান। শুধু ভারত নয় পৃথিবীর কোথাও তারা মূল জাতিস্রোতের (National mainstream) সঙ্গে মিশে যায়নি—বজায় রেখেছে আপন ইসলামি স্বাতন্ত্র্য। রাশিয়া ও চীনে মুসলমানদের সম্বন্ধে Akbar S. Ahmad লিখছেন ঃ এ সিদ্ধান্তে না এসে পারা যায় না যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও চীনে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন করা যায়নি; তারা (মূল জাতিস্রোতে) মিশে না গিয়ে স্বীয় আত্মপরিচিতি বজায় রেখেছে। (The conclusion can't be escaped that

1. R. C. Majumder–The History and Culture of the Indian People–The Mughal Empire–Preface. XII
2. Ibid. Preface—XIII

Muslims in the U.S.S.R. and China have neither been crushed out of existence nor assimilated beyond recognition)[1] কম্যুনিস্ট রাশিয়া ও চীনের একনায়কতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থায় সমাজ ও ব্যক্তি জীবনও কঠোর সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন। সেখানেও তারা মুসলমানকে মূল জাতীয় স্রোতের সঙ্গে মেশাতে ব্যর্থ হয়েছে। আর ভারতবর্ষে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের মিলন! একি শুধুই কল্পনা বিলাস অথবা আছে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য? এ সকল তত্ত্ব ও তথ্য গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অজানা নয়। প্রচার কৌশল পরিবর্তন করে তাঁরা বলেন, হ্যাঁ এ কথা ঠিক যে বহু শতাব্দী পূর্বে বিদেশী মুসলমান ভারত জয় করেছে। কিন্তু বর্তমান ভারতীয় মুসলমানদের প্রায় সকলেই হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। তারা ভারতেরই সন্তান। ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতিতে রয়েছে তাদেরও উত্তরাধিকার। কিন্তু সত্য হল ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথেই তার মনোজগতে ঘটে আমূল পরিবর্তন। অতীত হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ত্রিনিদাদ নাগরিক নোবেলজয়ী স্বনামধন্য V.S.Naipal বিষয়টিকে সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ "উৎস বিচারে ইসলাম একটি আরব ধর্ম, যে মুসলমান আরব নন সে ধর্মান্তরিত। ইসলাম ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা বিবেকের বিষয় নয়। সার্বভৌম সম্রাটের ন্যায় সে দাবি করে সর্বস্ব। পরিবর্তিত হয় বিশ্ব সম্বন্ধে ধর্মান্তরিতের দৃষ্টিভঙ্গি। তার পূণ্য তীর্থস্থানসমূহ আরবে;আরবী তার দেব (পবিত্র) ভাষা। পরিবর্তিত হয় তার ঐতিহাসিক ধ্যান ধারণা। নিজস্ব সত্ত্বা বিসর্জন দিয়ে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সে আরবীয় কাহিনির অংশ বিশেষে পরিণত হয়।* নিজের বলতে যা

---

* আরবের সাথে যে কোন ভাবে যুক্ত হতে পারা ধর্মান্তরিত মুসলমান কৌলিন্যের পরিচায়ক বলে মনে করে। পাকিস্তানী ঐতিহাসিক K. K. Aziz কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টির আলোচনায় বলেন ঃ ভারত ও পাকিস্তানের মুসলমানের সমাজ বিদ্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেক মুসলমান তার আত্মজীবনী, আত্মপরিচিতি, স্মৃতিকথায় দাবি করে যে তার পূর্বপুরুষ ইয়েমেন হিজাজ, ইরান, গজনী অথবা মধ্য এশিয়ার কোন (মুসলিম) দেশ থেকে একদা ভারতে এসেছিল। অর্থাৎ সে প্রকৃতপক্ষে আরব বংশোদ্ভূত! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ দাবি অসত্য। কারণ বিরাট সংখ্যক হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছে। মুসলমানের মিথ্যা দাবি এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে। এই সকল ভণ্ড মুসলমান এদেশেরই ভূমিপুত্র, শতশত বৎসর এই দেশে বাস করেছে;এবং সম্ভবত (তাহাদের পূর্বপুরুষ) স্মরণাতীত কাল থেকে এই দেশেরই অধিবাসী। এই ঘোষণার দ্বারা অতীতের সঙ্গে সকল যোগসূত্র সে ছিন্ন করতে চায়। (Here I may add an interesting footnote to the sociological history of modern Muslim in India and Pakistan. Almost every Muslim of any importance claimed [and still claims to-day] in his autobiography, reminiscences, memoirs, Journal and biodata that his ancestors had come from Yemen, Hijaj, Central Asia, Iran, Ghazni or some other foreign territory. In most cases this is a false claim for its arithmetic reduces the hordes of local converts to an insignificant number...It is also a declaration of disaffiliation from the soil on which these shammers have lived for centuries and to which, in all probability, they have belonged since history began.)[1] K. K. Aziz–The Murder of History–P-98.

1. Akbar S. Ahmad—Discovering Islam P–116

কিছু বোঝায় তার থেকে তাকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। সমাজে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড বিক্ষোভ-আলোড়নের; সহস্র বৎসরেও যার সমাধান না হতে পারে। তারা কে, কি তাদের পরিচয় এ সম্বন্ধে তারা রচনা করে উদ্ভট কল্প-কাহিনি। ধর্মান্তরিত দেশগুলিতে ইসলামের মধ্যে দেখা দেয় স্নায়ুরোগ জাত অবিশ্বাস ও সব কিছু ধ্বংস করার এক কঠিন সংকল্প। (যেন তপ্ত কটাহের উপর স্থাপিত) এই সকল দেশে সহজেই ঘটানো যায় বিস্ফোরণ।" (Islam in it's origin an Arab religion. Every one not an Arab who is a Muslim is a convert. Islam is not simply a matter of conscience or private belief. It makes imperial demands. A convert's world view alters. His holy places are in Arab lands; his sacred language is Arabic. His idea of history alters. He rejects his own; he becomes whether he likes it or not a part of the Arab story. The convert has to turn away from everything that is his. The disturbance for societies is immense and even after a thousand years can remain unresolved. People develop fantasies about who and what they are; and in the Islam of converted countries there is an element of neurosis and nihilism. These countries can be easily set on boil.)[1] ইসলামের মহিমায় অতীতের বিরুদ্ধে তার মধ্যে সৃষ্ট হয় অন্ধ বিদ্বেষ ও তীব্র ক্ষোভ। মত্ত হয় সে ধ্বংসের তাণ্ডব নর্তনে। কালা পাহাড় ও আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতি মালিক কাফুর এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।*

মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি; অনন্য তার বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্য কোন জাতির সঙ্গে তার মিল নেই। মুসলিম ঐতিহাসিক আয়েসা জালালের বিশ্লেষণে ঃ বিশ্বের সকল মুসলমান বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ হলেন বিশ্বের একমাত্র সার্বভৌম সম্রাট এবং আল্লাহ

* এরকম ভাবার কোন কারণ নেই যে এধরনের দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগে পাওয়া যাবে না। রিচার্ড রেড (Richard Reid) ইংলন্ডের নাগরিক। ধর্মে খ্রিস্টান; পুলিশের কাছে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। হঠাৎ-ই সে স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়। ব্রিকস্‌টনে স্থানীয় মসজিদে নিয়মিত যায়; দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ে। মসজিদের ইমামের কাছ থেকে নেয় কোরানের পাঠ। ইসলামের লক্ষ্য ও আদর্শ অনুযায়ী তার মধ্যে অলক্ষে ঘটে যায় প্রত্যাশিত পরিবর্তন। উদ্বুদ্ধ হয় জেহাদের আহ্বানে। আমেরিকান এয়ার লাইনসের প্যারিস—মিয়ামীগামী বিমানে সে ওঠে যাত্রীর ছদ্মবেশে। তার জুতোর মধ্যে মারাত্মক বিস্ফোরক। মধ্য আকাশে জুতো খুলে বিস্ফোরণ ঘটাতে গেলে যাত্রী ও নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতায় সে ধরা পড়ে। বেঁচে যান কয়েক শ যাত্রীর মূল্যবান প্রাণ। ব্যর্থ হয় জেহাদের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্ত আরও আছে। জনৈক আমেরিকান খ্রিস্টান যুবক, ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে ওসামা বিন লাদেনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আফগানিস্তান যায় জেহাদে যোগ দিতে। বন্দী হয়ে সে এখন আমেরিকান কারাগারে। —The Statesman. Jan. 3/2002

1 V.S. Naipaul—Beyond Belief (Prolouge)

এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরিক নেই। এই দুটি বিশ্বাস (Hakimiyat and unity of God or Tauhid) হল ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্বরূপ। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি অভিন্ন এবং মুসলমান যে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ স্বীকার করে না* তার তাত্ত্বিক ভিত্তি হল এই বিশ্বাস। (All Muslims subscribe to the hakimiyat or sovereignty of Allah over the entire world. Together with the belief in the unity of God or Tauhid, the notoin of divine sovereignty lies at the heart of the Islamic view of universal brotherhood. It offers ideological justification for rejecting territorial nationalism and the separation of religion from politics)[1] কবি দার্শনিক ইকবাল তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ "ইসলাম শুধুমাত্র আদর্শ নীতিশাস্ত্র নয়—ইহা একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাও বটে। মুসলমানের নিকট ধর্ম বিবেক বা ব্যক্তিগত বিষয় নয়।....সে কারণেই ইসলাম তার সৃষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে সুসংবদ্ধ ভাবে যুক্ত। তাই ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ বা সংহতিকে বাদ দিয়ে জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ মুসলমানের নিকট অচিন্তনীয়।" (Islam is not only an ethical ideal; it is also 'a certain kind of polity'. Religion for a Muslim is not a matter of private conscience or private practice. ...The religious ideal of Islam, therefore, is organically related to the social order which it has created....Therefore the construction of a polity on national lines, if it means a displacement of the Islamic principle of solidarity, is simply unthinkable to a Muslim)[2]

ইকবাল ও আয়েষা জালাল ইসলামের সংহতি ও সর্বজনীন ভাতৃত্বের আদর্শের উল্লেখ করেছেন। ডঃ আম্বেদকরের ভাষায় তার যথার্থ স্বরূপ ঃ ইসলামের ভ্রাতৃত্ব হল মুসলিম ভ্রাতৃত্ব। সার্বজনীন নয়। অর্থাৎ মুসলমানের জন্য মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব।** যারা মুসলিম দুনিয়ার বাহিরে তাদের জন্য আছে শুধু ঘৃণা ও বিদ্বেষ। আর জাতীয়তাবোধ, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য? মুসলমান শাসিত দেশকেই মুসলমান নিজের দেশ বলে মনে করে—

* এই ধর্মীয় বিধানের জন্যই মুসলমান হাজার বৎসর ভারতে বাস করেও ভারতীয় হতে পারল না। ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি মনে করে না—স্বীকার করে না ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে।

** বর্তমান প্যালেস্টাইন ও ইজরাইল ভূ-খণ্ড ছিল ইহুদিদের বাসভূমি। কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে মিশরের সম্রাট তাদের মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করেন। ইহুদিরা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। ভারত ব্যতীত প্রায় সর্বত্রই হয় নির্যাতিত। যা চরম আকার ধারণ করে নাৎসী জার্মানীতে। হিটলারের নির্দেশে প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদি নিহত হয়।

1. Ayesha Jalal—Self and Sovereignty P-188
2. V. S. Naipaul—Among the Believers P-153

সে দেশটির অবস্থান পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই হোক না কেন। অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুসলমান যেমন কখনও ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলে ভাবতে পারে না, তেমনি হিন্দুকে ভাবতে পারে না আত্মীয় বলে। এই কারণেই মহম্মদ আলি, একজন স্বনামধন্য ভারতীয়—কিন্তু খাঁটি মুসলমান; তাই তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতে নয় তাকে যেন কবর দেওয়া হয় জেরুজালেমে*। (The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is brotherhood of Muslims for Muslims only...those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity....the allegiance of a Muslim does not rest on his domicile in the country which is his but on the faith to which he belongs...wherever there is the rule of Islam, there is his own country. In other words, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin. This is probably the reason why Moulana Mohommed Ali, a great

---

বিচলিত হয় বিশ্ব-বিবেক। ইতিমধ্যে আরব ভূ-খণ্ডে ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমান অধিকার করে প্যালেস্টাইন। ১৯৪৮ সালের ৫ই মে রাশিয়া সহ নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্যের সমর্থনে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাব অনুসারে প্যালেস্টাইন বিভক্ত হয়ে গঠিতহয় ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইন। কিন্তু মুসলমান ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েলের অস্তিত্ব মেনে নেয় না। ৬ মে মুসলমান আক্রমণ করে ইজরায়েল। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ইহুদিরা সে আক্রমণ প্রতিহত করে। কিন্তু সম্মুখ অথবা ছায়াযুদ্ধ বন্ধ হয় না। ১৯৬৭ ও ১৯৭১ সালে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী ইজরায়েলের কাছে পরাজিত হয়। বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলমান প্যালেস্টাইনের সমর্থক ও ইজরায়েল বিরোধী।

গত ১৪ ডিসেম্বর (২০০১) ইরানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আকবর হাসেমী রফসানজানি রাজধানী তেহরানে এক ভাষণে বলেন ঃ মুসলিম দুনিয়া যেদিন আণবিক বোমার অধিকারী হবে—সেদিন পশ্চিমী জগতের সকল রণকৌশল হবে ব্যর্থ। কারণ, একটিমাত্র আণবিক বোমাই ইজরায়েলকে নিশ্চিহ্ন করার পক্ষে যথেষ্ট। (...when the Islamic world acquires atomic weapons, the strategy of the west will hit a dead-end since the use of a single atomic bomb has the power to destroy Israel completely...The Stateman, 30/12/2001) রফসানজানি বিশ্বের সকল মুসলমানের মনের কথাটিই বলেছেন। মুসলমানের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের ইহা এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মুসলমান প্রায় সকল আলোচনাতেই "মুসলিম দুনিয়ার" উল্লেখ করে। মুসলমান Pan-Islam-এর আদর্শে বিশ্বাসী। এই Pan-Islam আবর্তিত হত মুসলিম ধর্মগুরু খলিফাকে কেন্দ্র করে। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ে উচ্ছেদ হয় খলিফাতন্ত্র। কিন্তু মুসলমান জাতি ও Pan-Islam-এর স্বার্থে প্রয়োজন হয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা সংগঠনের। তাই স্থাপিত হয় Organisation of Islamic Countries বা ইসলামিক রাষ্ট্রজোট। "মুসলিম দুনিয়া" ও OIC হল Pan-Islam ও খলিফাতন্ত্রের সর্বাধুনিক সংস্করণ। Muslim Brotherhood এই Pan-Islam- এর অঙ্গস্বরূপ।

---

* রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাব মত তখনও ইজরাইল রাষ্ট্রের পত্তন হয়নি। জেরুজালেম নগরী ছিল মুসলিম অধ্যুষিত প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত, অতএব দার-উল-ইসলাম। বিখ্যাত আল্‌আকসা মসজিদ এখানেই অবস্থিত। পাশেই ইহুদিদের Wailing Wall—যেখানে বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে ইহুদিরা এসে অশ্রুপাতে পালন করে জাতীয় শোক দিবস।

Indian but a true Muslim, preferred to be burried in Jerusalem rather than in India.)[1]

মুসলমানের এই সুস্পষ্ট আদর্শগত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয় ভারত বিভাগের পটভূমি। গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই হতাশাব্যঞ্জক। তারা ইসলামিক বা মুসলিম জাতীয়তাবাদ স্বীকার করেন না। কিন্তু স্বীকার না করলেই তো আর কোন বিষয়ের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয় না। লক্ষ্য যদি হয় দুর্জ্ঞেয়, পথ রহস্যময় তবে শুভবুদ্ধি ও যুক্তি হারিয়ে যায় মিথ্যা আদর্শের কৃত্রিম ভাবাবেগে। এক্ষেত্রেও তাই হল। গান্ধী হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। ঘটনাচক্রে এই সময় (১৯১৯ সাল) "খিলাফৎ" প্রশ্নে ভারতে মুসলিম জাতির মধ্যে সৃষ্টি হয় তুমুল বিক্ষোভ ও আলোড়ন (পূর্বে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।) গান্ধী যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। হিন্দুদের সমর্থনের ব্যাপারে তিনি আশ্বস্ত করেন মুসলমানদের। হিন্দুদের উদ্দেশে তাঁর বাণী ঃ "খিলাফৎ হল ন্যায়সম্মত ও যথার্থই ধর্মীয়। অতীতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা মুছে ফেলে মুসলমানদের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেওয়ার এক সুবর্ণসুযোগ হিন্দুদের এনে দিয়েছে এই খিলাফৎ আন্দোলন।" (Gandhi insisted that the Khilafat was a "righteous" and "sincere religious cause." It was an opportunity for...Hindus to prove faithful to the Muhammedans and to bridge the gap that once existed between the two communities.)[2*]

গান্ধীর এই ভূমিকায় হিন্দুদের একাংশ ক্ষুব্ধ হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিশ্লেষণ করে আয়েষা জালাল লিখেছেন ঃ অভিযোগ ওঠে যে, খিলাফৎপন্থীদের সঙ্গে গান্ধীর সুবিধাবাদী আঁতাত ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে বিপন্ন করেছে। কিন্তু এত নৈতিকতার প্রশ্ন! গান্ধী ভ্রুক্ষেপহীন। এলাহাবাদ সম্মেলনে খিলাফৎ আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে তাঁর আবির্ভাব তাৎপর্যপূর্ণ। ডিক্টেটর গান্ধী (খিলাফতের সমর্থনে) অসহযোগ আন্দোলনে অবিসংবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ছিলেন বদ্ধপরিকর। স্বধর্মাবলম্বীদের প্রশংসার আশায় এ সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। (This left the Mahatma acutely vulnerable to the charge of giving a moral face to his opportunistic alliance with the khilaphatists and endangering the

---

* যুগ যুগ ধরে হিন্দু মুসলমানের নৃশংশ বর্বরতার শিকার। সেই নিগৃহীত হিন্দুকে অত্যাচারী মুসলমানের কাছে "বিশ্বস্ততার" প্রমাণ দিতে হবে! গান্ধীর কি সীমাহীন ধৃষ্টতা......!

---

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeched, Vol-8, P-330-331
2. Ayesha Jalal—Self and Sovereignty, P-221

cause of Indian nationalism. But if Gandhi the moralist had not abandoned his will to persuasion, Gandhi the dictator was determined to stamp his personal authority on the non-co-operation movement. He had emerged from the Allahabad session as the undisputed leader of the Khilafatists and was not ready to throw away the advantage in the vain hope of winning accolades from his co-religionists.)[1] খিলাফতের সমর্থনে জনমত সংগঠনের জন্য গান্ধী মৌলানা আজাদ*, মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি সমভিব্যাহারে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। ১৯২০ সালে মহামতি গোখলের মৃত্যু হয়। গান্ধীর ভারত পরিক্রমার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তি তৈরি করে কংগ্রেস দলে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর দুটি উদ্দেশ্যই সফল হয়েছিল। খিলাফতের সমর্থনে তাঁর প্রচারে হিন্দুদের মধ্যে একাংশ হয়েছিল বিভ্রান্ত। পাঞ্জাবের জনৈক কংগ্রেস নেতা দাবি করেন ঃ ভ্রাতৃ-বৎসল রাম-লক্ষ্মণের ন্যায় হিন্দু-মুসলমানও দুই ভাই। রাম-লক্ষ্মণ যে ভাবে লঙ্কা থেকে সীতাদেবীকে উদ্ধার করেছিলেন—হিন্দু মুসলমানও তেমনি ভাবে স্বরাজ অর্জন করবে। (....a local Congress leader added that Hindus and Muslims were like Ram and Lakshman and should bring home swaraj in the same way as the two brothers brought Sita back from Lanka.)[2] অন্যদিকে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনাও তীব্র হয়। ১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের প্রাক্কালে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত INDEPENDENT পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বিপিন চন্দ্র পাল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রধান অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ খিলাফতের জন্য মুসলমানের রয়েছে প্রবল ধর্মীয় আবেগ, কিন্তু হিন্দুর সমর্থনের কারণ রাজনৈতিক। বিপদ হল মুসলমানের দাবি অনুযায়ী সন্তোষজনক ভাবে খিলাফৎ সমস্যার সমাধান হলে, তারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনে অংশ নেবে না। কংগ্রেসের ওপর খিলাফৎ চাপিয়ে দেওয়া গান্ধীর শুধু অন্যায় নয়, ভারতের সংহতি ও স্বাধীনতার পক্ষেও বিপদজনক।** (Writing in the Independent of Allahabad on the eve of

---

* গান্ধী ছিলেন সারাভারত খিলাফৎ কমিটির প্রেসিডেন্ট। সৌকত আলি গ্রেপ্তার হলে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ হন সেক্রেটারি।

** গান্ধী সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডসের মূল্যায়ন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ঃ গল্পের প্রাচীন নাবিকের কণ্ঠদেশ জড়িয়ে থাকা এক বৃহদাকার সামুদ্রিক শ্বেত পক্ষীর ন্যায় গান্ধীও কংগ্রেসের গলদেশ বেষ্টন করে তাকে করেছে পঙ্গু, লক্ষ্যভ্রষ্ট। প্রকৃত বিপ্লবীদের বিভ্রান্ত করে নিশ্চিত করেছে ভারত বিভাগ (He

---

1. Ibid, P-222

2. Ayesha Jalal—Self and Sovereignty, P-226

the special Congress session at Calcutta, Bipin Chandra Paul identified the main obstacle of Hindu Muslim unity... while Muslims were moved by profound religious feelings, Hindu backing for the agitation was actuated by no less strong political motives. The danger was that if the Khilafat issue could be setteld to the satisfaction of the Muslims, they would not continue the movement simply for the sake of winning India's freedom...For Gandhi to force the hand of the Congress on non-co-operetion was not only unjust but fatal to the cause of Indian unity and Indian freedom.)[1]

ইতিমধ্যে তুরস্কে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। নবীন তুর্কী আন্দোলনের নেতা কামাল পাশা ক্ষমতা দখল করলে সুলতান আব্দুল মজিদ দেশত্যাগ করেন। অতঃপর কেরালায় মালাবার অঞ্চলে নির্বিচারে হিন্দু-নিধনে খিলাফৎ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। খিলাফতের সমর্থনে শুরু হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন। খিলাফৎ ব্যর্থ হলে স্বরাজ লাভ হল অসহযোগের প্রধান উদ্দেশ্য। ক্ষুব্ধ হয় মুসলমান। তারা খিলাফতের জন্যই অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল, ভারতের স্বাধীনতার জন্য নয়। জনৈক মৌলভি, আব্দুল হাকিম অভিযোগ করেন; গান্ধী মুসলমানের শুভাকাঙ্ক্ষী নন, খিলাফতের জন্য গান্ধী ও হিন্দুদের কোন মাথাব্যাথা নেই। তারা স্বরাজ লাভের জন্য মুসলমানকে ব্যবহার করেছে; এই স্বরাজ হল হিন্দু রাজত্বের অপর নাম। (One Maulavi Abdul Hakim set about proving that Gandhi was not a wellwisher of the Muslims..unconcerned about the Khilafat, Gandhi and the Hindus were using Muslims to promote Swaraj—a code word for undiluted Hindu raj.)[2] এমনকি মহম্মদ আলি, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি এবং খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধীর প্রধান পার্শ্বচর; ১৯৩০ সালের দ্বিতীয় পর্যায়ের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানে অসম্মত হন।

---

remained rouund its (congress) neck like the ancient mariner's albatross inhibiting its action, dividing its purpose, confusing the genuine revolutionaries and ultimately ensuring the partition of India–The Last Years of British India.—বর্তমান, ৯-১-২০০৪)

নেহেরু ও কংগ্রেসের তথাকথিত বিশাল মাপের নেতৃবৃন্দ ছিলেন গান্ধীর আবিষ্কার। গান্ধীর আলোকে আলোকিত। বিদ্রূপ করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এফ. কে. নরিম্যান এদের বলতেন Spring doll.

---

1. Idid, P-224-225
2. Ibid, P-230-231

বিপিন চন্দ্র পালের আশঙ্কাই সত্য হয়। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য গান্ধীর স্বপ্ন তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। কিন্তু গান্ধীর মুসলিম তোষণ নীতির পরিবর্তন হয় না। তোষণ নীতি যে কল্যাণকর হয় না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তার দৃষ্টান্ত। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিজোটের হিটলার তোষণ এবং ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে স্বাক্ষরিত কুখ্যাত "মিউনিক প্যাক্ট" (এই চুক্তিতে চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানীর অধিকারভুক্ত হয়) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ বলে গণ্য হয়। ডিকটেটর গান্ধী গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বা সহমত হয়ে নীতি নির্ধারণে অভ্যস্ত নন। তাঁর নীতি ও কার্যধারা স্থির হয় বিবেকের নির্দেশে; (Inner light) যা বাস্তব বুদ্ধি ও যুক্তির অগম্য। তাঁর তোষণ নীতি মুসলমানের আগ্রাসী মনোভাবকে আরও শক্তিশালী করে। মুসলিম রাজনীতি স্থির লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। অবশেষে ১৯৪০ সালের ২৪ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে "পাকিস্তান" প্রস্তাব গৃহীত হয়। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন বাংলার উদারচেতা প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক। মুসলমান নেতাদের মধ্যে প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ ও হিন্দুর প্রতি সহানুভূতিশীল বলে যিনি ছিলেন খ্যাতিমান।

এই অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্তান দাবির সমর্থনে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ "হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি। হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক ধর্ম, দর্শন, সামাজিক প্রথা ও সাহিত্য। তাঁহারা পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হন না বা একসঙ্গে আহারও করেন না। জীবন সম্পর্কে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক। হিন্দু ও মুসলমানেরা সাহিত্য ও ইতিহাসের দিক হইতে বিভিন্ন প্রকারের অনুপ্রেরণা লাভ করে। তাঁহাদের একের কাছে যাঁহারা বীর ও পূজনীয়, অন্যের কাছে তাঁহারা ঘৃণ্য শত্রু। সুতরাং এই দুই জাতি এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে কখনও মিলিয়া মিশিয়া সুখে ও সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিতে পারিবে না। বিগত বারো শত বৎসরের ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই দুই জাতির* মধ্যে জাতীয় ঐক্য কখনও গড়িয়া উঠে নাই। ইংরেজের ভয়ে একটি যে কৃত্রিম ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইংরেজ রাজত্ব অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারও অবসান হইবে। তখন ভারতের শাসনতন্ত্রে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকিবে। আমি আশা করি, ইংরেজ জোর করিয়া কখনও মুসলমানদের হিন্দুরাজ্যে বাস

---

* Now or Never—পুস্তিকার রচয়িতা রহমত আলির দ্বি-জাতি তত্ত্বের সহিত জিন্নার কোন প্রভেদ নাই। ১৯৩০ সালে ইক্‌বাল ভারতের মধ্যে মুসলিম ভারত গঠনের কথা বলেছেন; ১০ বৎসর পর ১৯৪০ সালে জিন্নার কণ্ঠেও সেই একই দাবি। জিন্না হিন্দু ও মুসলমানকে দুটি পৃথক জাতি বলেছেন; সম্প্রদায় নয়। জাতি হল সম্পূর্ণ (Whole), সম্প্রদায় হল তার অংশ (Part) মাত্র। কতিপয় সম্প্রদায় (ধর্মীয় বা ভাষাগত) নিয়ে গঠিত হয় জাতি, অথচ এদেশে এখনও হিন্দু-মুসলমানকে সম্প্রদায় বলা হয়। এই অসত্য প্রচার ভারত বিভাগের অন্যতম কারণ।

করিতে বাধ্য করিবে না। কারণ মুসলিম ভারত এমন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না যেখানে হিন্দুর প্রাধান্য থাকিবে।"[1]

জিন্না আরও বলেন, ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তদপেক্ষা ভারতবর্ষে (হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে) পার্থক্য ব্যাপকতর ও মৌলিক প্রকৃতির। মৌলিক ঐক্যের উপাদান ব্যতীত জাতি গঠন সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ "জিন্নার এই উক্তি যে ভারতের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রই তাহা স্বীকার করিবেন। ভারতের ইতিহাস জানা থাকিলে জিন্না তাঁহার সপক্ষে অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতেন। মুসলমানেরা যে হিন্দুরাজার অধীন হইয়া কখনও থাকিতে ইচ্ছুক ছিল না বাংলাদেশের রাজা গণেশের পরিণাম তাহার চরম দৃষ্টান্ত।"[2]

ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য কেহ কেহ মহম্মদ আলি জিন্নাকে দায়ী করেন। জিন্নাকে দোষারোপ করা অর্থহীন,—এর দ্বারা সমস্যা ও তার মূল কারণের ওপর কোন আলোকপাত হয় না। জিন্না মুসলমান জাতির মুখপাত্র বা প্রতিনিধিরূপে পাকিস্তান দাবি করেছেন। ইতিপূর্বে মুসলিম ধর্মীয় নেতারা ধর্মের মোড়কে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি করছিলেন—জিন্না সেই দাবিকেই পেশ করেন আধুনিক রাষ্ট্রনীতির ভাষায়। পিতৃত্ব স্বীকার না করে কেহ কি পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবি করতে পারে? পাকিস্তান দাবিও অনুরূপ। আরবের মুসলমান ভারত অধিকার করে। রাজত্ব করে প্রায় হাজার বৎসর। তবু ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি মনে করে না। ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও আরবের সংস্কৃতি—তার ধমনীতে—প্রতি রক্তকণায়। ধর্মের নির্দেশে সে দাবি করে ভারত ও ভারতবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। স্বতন্ত্র জাতি—স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। মুসলমান যে একটি স্বতন্ত্র জাতি—এ তো ইসলামের বিধান। মুসলমান যে অ-মুসলমান কাফেরদের শাসনে বাস করতে পারে না,—তাও তো এই ইসলাম ধর্মেরই নির্দেশ। এই সমস্যা সমাধানের জন্যেই তো দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হারব তত্ত্ব। এই কারণেই তো তুরস্কের খলিফার সমর্থনে ভারতে হয় খিলাফৎ আন্দোলন।। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবে মুসলমানের যে আন্তরিক ও সক্রিয় সমর্থন ছিল তারও এই একই কারণ। বঙ্গদেশ ভাগ হলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ হত পাকিস্তান (দার-উল-ইসলাম) রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ। পাকিস্তানের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক K.K.Aziz স্বীকার করেছেন যে, মুসলমানের সকল ধর্মীয় আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ সমর্থন ও খিলাফৎ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

---

1. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস ৪ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৪
2. ঐ, পৃঃ ৪৩৪

কিন্তু স্বীকার করেন না ইসলামিক পণ্ডিত ও প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ রফিক জাকারিয়া। তিনি তাঁর সদ্য প্রকাশিত—"The Man who divided India (Popular Prakashan) গ্রন্থে দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও ভারত ভাগের জন্য মহম্মদ আলি জিন্নাকে দায়ী করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ জিন্নার যে সর্বনাশা দ্বি-জাতি তত্ত্বের ওপর পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা—তাহা দক্ষিণ এশিয়ার (মুসলমানের) প্রভূত চিরস্থায়ী ক্ষতিসাধন করেছে। (I have diagnosed the permanent damage done to South Asia by Jinnah's perricious two-nation theory on which Pakistan is based Hindusthan Times 13-1-2002). Sayeda Saiyidain Hamead—খ্যাতনামা মুসলিম ঐতিহাসিক উপরিউক্ত বইয়ের সমীক্ষায় (Hindustan Times—6-1-2002) বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মিঃ জাকারিয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন। তাঁর জিজ্ঞাসা, আবুল কালাম আজাদ সহ ভারতে অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছিলেন—তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে জিন্না একাকী কিভাবে সফল হলেন? তিনি বলেছেন ঃ শক্তিশালী ভারতীয় জাতি, যার সভ্যতা হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন; কোন এক ব্যক্তি যতই ক্ষমতাবান হোন না কেন, তাঁর একার পক্ষে এই জাতির ঐক্য ধ্বংস করা সম্ভব নয়। (Zakaria's book suggests that it was Jinnah and only Jinnah, who brought about the partition. This is much too simplistic a view. No man could have been powerful enough to break a nation like India, which had taken thousands of years to evolve a civilisation of its own.)

পাকিস্তানী ঐতিহাসিক K.K.Aziz ভারত-বিভাগের সমস্যাটিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ আইন ও সাংবিধানিক বিচারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ সালের জুলাই-এ ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম লীগ, ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে ত্রি-পাক্ষিক আলোচনায়;ভারতের মুসলমানের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনপুষ্ট মুসলিম লীগের দাবী অনুযায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। নীতি ও তাত্ত্বিক দিক থেকে—একটি নিজস্ব রাষ্ট্র যেখানে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর অধীনে বাস করতে হবে না; মুসলমানের এই যে অন্তরের একান্ত বাসনা—পাকিস্তান সৃষ্টি তারই সফল রূপায়ণ। (Legally and constitutionally, Pakistan was created by the British Parliament which passed the Indian Independence Act of July-1947. Politically, it was created by the popular support given to the All India Muslim League by the Muslims of India and by the tripartite negotiations among the Muslim League, the Congress and the British. Morally, it was created by an urge among the Muslims

to have a country of their own where they would not be subject to a permanent and unalterable Hindu majority.)[1]

তবু সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে সত্য উদ্‌ঘাটন নয়—বিভ্রান্তি সৃষ্টিই যাদের উদ্দেশ্য তারা জিন্নাকে দায়ী করেন। তারা প্রচার করেন যে টি. বি. রোগাক্রান্ত জিন্নার যদি মৃত্যু হত তবে আর দেশ বিভাগ হত না। তাদের উদ্দেশে K.K. Aziz বলেন ঃ (দীর্ঘদিন ধরে লালিত ও প্রশ্রয়পুষ্ট) পাকিস্তান দাবি ১৯৪৫-৪৬ সালে মুসলমানের মধ্যে এমন তীব্র উৎসাহ. আবেগ, উত্তেজনা ও সাফল্য সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে যে জিন্নাব অকাল বিয়োগেও তা কিছুমাত্র প্রশমিত হত না। হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান এতই গভীর ও বিরাট যে সেতুবন্ধন অসম্ভব। জিন্নার প্রশ্ন অবান্তর। দেশ বিভাগ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই মুসলমানকে সন্তুষ্ট করত না। (....that by 1945 or 1946 the Pakistan demand had reached a pitch of excitement, enthusiasm and conviction which even Jinnahs' demise could not have lowered by a hairbreadth. The impetus was too great to be reversed. The gulf between Hindus and Muslims had become too deep and wide to be bridged over. Jinnah or no Jinnah, nothing less than a partition would have satisfied the Muslims.)[2] স্বচ্ছ দৃষ্টি, যুক্তিপূর্ণ যথার্থ বিশ্লেষণ। কিন্তু বিতর্কের শেষ নেই। কেহ কেহ এরূপ অভিমত পোষণ করেন যে নেহেরু ও কংগ্রেস যদি জিন্নার সঙ্গে আপস-মীমাংসা করতেন তবে হয়তো দেশ বিভাগ রদ করা যেত। এ অভিমতও সেই একই ভ্রান্তিপ্রসূত। পাকিস্তান দাবির ক্ষেত্রে—জিন্না-নেহেরু কংগ্রেস সকলেই অপ্রাসঙ্গিক। দাবি মুসলমান জাতির। প্রেরণা ইসলাম ধর্মের। ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান ইসলামের সৃষ্টি। একমাত্র যোগ্য নেতৃত্বে হিন্দু জাতির সংঘবদ্ধ শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলনের দ্বারাই ভারত বিভাগ রদ করা সম্ভব ছিল।

দৃষ্টান্ত—ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা।

মুসলমানের একটি বিশেষ গুণকে স্বীকার করতেই হয়। আর তা হল তাঁর অকপট সরল সত্যভাষ। তারা শতকণ্ঠে ঘোষণা করছে যে;তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি, ভাষা-ইতিহাস ও পরম্পরা সম্পূর্ণ পৃথক। তারা ভারতীয় নয়। মৌলানা আজাদও এ বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে বলেন ঃ এই সকল অঞ্চলে (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে) তারা প্রায় হাজার বৎসর ধরে স্বাধীনভাবে বসবাস করেছে এবং নির্মাণ করেছে মুসলিম সংস্কৃতির বহু বিখ্যাত কেন্দ্র। (They have had their homelands in these regions for

1. K. K. Aziz—The Murder of History, P-4
2. Idid, P-5

almost a thousand years and built up well-known centers of Muslim culture and civilisation there...)[1] মুসলমানের দাবির যৌক্তিকতা ও সত্যতা স্বীকার না করে উপায় নেই। এর বিরুদ্ধে গান্ধী নেহেরু ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বক্তব্য দুর্বল, যুক্তিহীন, অন্তঃসারশূন্য ও হাস্যকর। অর্থহীন অলীক আদর্শের আবেগে কঠিন বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা চরম নির্বুদ্ধিতা! আসলে আদর্শগত ভিত্তি সুদৃঢ় না হলে বিপক্ষের তাত্ত্বিক যুক্তিকে খণ্ডন করা যায় না।

জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে এদেশের কম্যুনিস্টরা বলত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। রাশিয়া আক্রান্ত হলে সেই যুদ্ধ সহসা রূপান্তরিত হল "জনযুদ্ধে"। রাশিয়াকে বলা শুরু হল Fatherland; এবং সেই যুদ্ধকে Patriotic war. স্ট্যালিন Fatherland রক্ষার জন্য দেশবাসীর নিকট চরম আত্মত্যাগের আহ্বান জানালেন। অর্থাৎ দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদই* হল শত্রুর বিরুদ্ধে প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু এদেশে হল তার বিপরীত। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে শুধু অস্বীকার করা নয় তাকে খর্ব করার পরিকল্পিত চেষ্টা হল। এই উদ্দেশ্যেই প্রচার করা হল ভারত বহুজাতিক দেশ; মিশ্র তার সংস্কৃতি। এ প্রচার এখনও চলছে। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন ধর্মের অনুগামী বিভিন্ন ভাষাভাষি বিভিন্ন জাতির লোক বাস করে। যেমন আমেরিকা, ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মান ইত্যাদি। কিন্তু ওই সকল দেশকে তো কখনও মিশ্র সংস্কৃতির (Composite culture) বহুজাতিক (multinational) দেশ বলা হয় না। ভারতে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ, তারপরই অত্যন্ত সংখ্যালঘু মুসলমান জাতি; তারা নিজেদের কখনও ভারতীয় বলে স্বীকার করে না। তবে কাকে নিয়ে ভারত বহুজাতিক দেশ? সংস্কৃতি কখনও মিশ্র হয় না। শতশত নদীর জল ধারণ করেই অনন্ত মহাসাগর। কিন্তু সাগরে একবার মিশে গেলে নদীর জলকে আর পৃথক করে চেনা যায় না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাই। মুসলমান কখনও হিন্দু বা ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার দাবি করে না। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ইসলামি— যার উৎস আরবে। মৌলানা আজাদের মতে সেই ইসলামি সংস্কৃতির বহু কেন্দ্র তারা স্থাপন করেছে ভারতের একটা বিশেষ অঞ্চলে, যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রক্ষা ও বিকাশের জন্যই মুসলমানের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি।

কিন্তু তবুও মুসলমানের ভারতীয়করণ (Indianisation) চেষ্টার বিরাম নেই। মুসলিম তোষণ অতিক্রম করে লক্ষ্মণ রেখা। "হিন্দু" এই শব্দটি রাজনৈতিক আলোচনা ও দলিলে

* কম্যুনিস্ট চীনে "দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ" স্কুল পাঠ্যসূচীর অন্যতম বিষয়। শুধু মাত্র ভারতেই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের নামোচ্চারণ করাও নিন্দনীয়।

1. Maulana Abul Kalam Azad—India Wins Freedom P-151

হয় বর্জিত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র রচিত "বন্দেমাতরম্" ভারতের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত। কোটি কোটি ভারতসন্তান এই গান গেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তি সংগ্রামে। ফাঁসীর মঞ্চে উঠেও বিপ্লবী বীরের কণ্ঠে মাতৃবন্দনা— বন্দেমাতরম্। কিন্তু মুসলমানের মনে হল এ হিন্দু-সঙ্গীত। দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এ যে পৌত্তলিকতা! তারা আপত্তি জানায়। তাদের প্রীতি লাভে গানটির মূল অংশ বাদ দিয়ে শুধু প্রথম ৭ পংক্তি (মোট পঙ্ক্তি-২৬) গাওয়া হয়। আজও সরকারি অনুষ্ঠানে "বন্দেমাতরম্" গাওয়া হয় না।

সাধারণ মানুষ কোরান, ইসলামের ধর্মতত্ত্ব ও মুসলিম ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক অবহিত না থাকতে পারে। কিন্তু গান্ধী-নেহেরু সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। ইংরেজ ঐতিহাসিক Leonard Mosley-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেহেরু বলেন ঃ আমি মুসলমানদের চিনি, আমি কোরান পড়েছি, আমার অনেক মুসলমান আত্মীয় ও বন্ধু আছে। (I know Muslims; I know the Koran. I have Muslim relatives and friends)[1] এই নেহেরুই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেন ঃ এদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা হল প্রধানত সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাবি ও পাল্টা দাবির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সংখ্যালঘুদের জন্য যথোপযুক্ত রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা। ভারতে সংখ্যালঘু সমস্যার বৈশিষ্ট্য হল ইহা ধর্মীয়, ইউরোপের ন্যায় জাতিগত নয়। ধর্মীয় ব্যবধান স্পষ্টতই সাময়িক, স্থায়ী নয়। কারণ এক ধর্ম হতে অন্য ধর্মে ধর্মান্তর সব সময়-ই হতে পারে; ধর্মান্তরের দ্বারা কোন ব্যক্তি তার জাতি, ভাষা ও সাংস্কৃতির উত্তরাধিকার হারায় না। (The communal problem as, it was called, was one of adjusting the claims of the minorities and giving them sufficient protection from majority action. Minorities in India, it must be remembered, are not racial or national minorities as in Europe; they are religious minorities. Religious barriers are obviously not permanent, as conversions can take place from one religion to another, and a person changing his religion dose not thereby lose his racial back-ground or his cultural and linguistic inheritance)[2] ভারতে ৯০ শতাংশ মুসলমান ধর্মান্তরিত। তারা যদি নিজেদের ভারতীয় ও অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলেই মনে করে তবে আর এদেশে মুসলিম জাতির অস্তিত্ব কোথায়? তবে মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবির প্রতি সকল মুসলমানের এই নিঃশর্ত ও আন্তরিক সমর্থন

1. R.C. Majumder–History of the Freedom Movement In India, Vol-III, P-701
2. Ibid, P-466

কেন? বাস্তব চিত্র ও ঐতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত নেহেরুর এই বিশ্লেষণ কি শুধুই কল্পনা-বিলাস?

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য গান্ধী ও কংগ্রেস সর্বস্ব পণ করেছে। তাঁদের দৃষ্টিতে সকলেই ভারতীয়। অথচ ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তি অনুযায়ী মুসলমানের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা (separate electorate) মেনে নেওয়া হয়। স্বীকৃতি দেওয়া হয় মুসলমানকে স্বতন্ত্র জাতিরূপে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে খিলাফত আন্দোলন তত্ত্বগত ও কার্যত ছিল ভারতের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী। সেই আন্দোলনকে নেতৃত্ব ও সর্বপ্রকার সমর্থন দিয়ে গান্ধী ও কংগ্রেস পুনরায় স্বীকার করে নিলেন যে, মুসলমান এক স্বতন্ত্র জাতি; তার আনুগত্য ভারত নয়, ভারতের বাইরে কোন মুসলিম দেশের প্রতি। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে বির্সজন দিয়ে আদর্শভ্রষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কি ক্ষমতার মোহে দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিলেন? অবশ্য প্রথম থেকেই যে পথ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তা ভারতের ঐক্য ও সংহতি বিরোধী ও মুসলমানের পাকিস্তান দাবির সহায়ক। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক Mosley-র বিবরণী হতে জানা যায় যে নেহেরু তাঁর জীবনীকার Michael Brecher -কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন ঃ ঘটনা হল, আমরা ছিলাম রণক্লান্ত; বয়সও হয়েছিল। আমরা যদি অখণ্ড ভারতের দাবিতে দৃঢ় ও অবিচল থাকতাম, তবে নিশ্চিত ভাবেই আমাদের স্থান হত কারাগারে। আমাদের মধ্যে কেহই পুনরায় কারাবাসের সম্ভাবনা ভাবতেও পারতেন না। (The truth is that we were tired men, and we were getting on in years too. Few of us could stand the prospect of going to prison again—and if we had stood out for a united India as we wished it, prison obviously awaited us.)[1]

শুধু গান্ধী ও কংগ্রেস নয়—কম্যুনিস্টরাও দেশভাগের জন্য সমভাবে দায়ী। "পাকিস্তান" দাবির প্রতি তাদের ছিল তাত্ত্বিক ও প্রত্যক্ষ সমর্থন। তাদের পরিকল্পনা ছিল ভারতবর্ষকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত (Bakanisation) করা। কম্যুনিস্টদের ইতিহাস সুবিদিত; তবু তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

১৯২৯ সাল। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দের বিচার চলেছে। এই সময় স্ট্যালিনের নেতৃত্বে কমিন্টার্ন (Comintern) ভারতের কম্যুনিস্টদের জন্য আন্দোলনের কর্মসূচী স্থির করে দেয়। ১৯৩০ সালে তাহা Draft Platform of action of the C.P.of India নামে প্রকাশিত হয়। এই ইস্তাহারে কংগ্রেসকে বলা হয়—

1. R. C. Majumder–History of the Freedom Movement in India, Vol-III, P-659-660

"মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের একটি শ্রেণী সংগঠন (Class organization of the Capitalists working against the fundamental interests of the toiling masses of our country.)[1] কমিন্টার্নের এই নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৩০-৩৩ সালে দেশব্যাপী প্রবল অসহযোগে আন্দোলনে কম্যুনিস্টরা তো যোগদান করেই নি, বরং এই আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য অন্তর্ঘাতের (sabotage) পথ নিয়েছিল। পরে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রণকৌশল পরিবর্তন করে সদ্যগঠিত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান করে। উদ্দেশ্য ছিল Trojan Horse-এর ন্যায় কংগ্রেসকে ভেতর থেকে দুর্বল করা। জয়প্রকাশ নারায়ণ কম্যুনিস্টদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে ১৯৪০ সালে তাদের বহিষ্কার করেন। এর পর তারা জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত AISF-এ অনুপ্রবেশ করলে সংগঠন দ্বিধা-বিভক্ত হয়। ১৯৪০ সালে হীরেন মুখার্জী ও কে. এম. আসরফের নেতৃত্বে SFI'র সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয় ঃ আগামী দিনে ভারত হবে পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে (অর্থাৎ কোন অঙ্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করে স্বাধীন সত্ত্বা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে) স্বেচ্ছায় যোগদানে আগ্রহী অঙ্গরাজ্যগুলি নিয়ে গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্র। সুতরাং "এক অখণ্ড জাতি নয়—ভারত হল বহুজাতিক একটি দেশ,"এ তত্ত্ব কম্যুনিস্টরা প্রচার করে। এই প্রচারের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানের পাকিস্তান দাবির স্বীকৃতি। (The conference of the communist students, in Dec-1940, led by Hiren Mukherjee and K.M.Ashraf, ...passed a resolution declaring "that the future India should be a voluntary federation of regional States based on mutual confidence." Thus instead of a single nation comprising the people of India as a whole, the communists upheld the ideal of India as a multinational State. This resolution was a clear bid to enlist the support of the Muslims by conceding the claim of Pakistan)[2]

১৯৪২ সাল। গান্ধীর নেতৃত্বে ৯ আগস্ট শুরু হয় "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন। কমুনিস্টরা তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী এই আন্দোলন ব্যর্থ করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। C.P.I.-র (বর্তমানের C.P.I.(M) তখন অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির [C.P.I.] অন্তর্ভুক্ত ছিল) তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারি P.C.Joshi ও ব্রিটিশ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব Sir Reginald Maxwell-এর মধ্যে এই বিষয়ে গোপন পত্র বিনিময় হয়। ১৯৪৬ সালের ২২ ফেব্রুঃ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য S.S.Batlivala এক সাংবাদিক

1. Ibid, P-565
2. R. C. Majumder—History of the Freedom Movement in India, Vol-III, P-567

সম্মেলনে তা প্রকাশ করেন। এই গোপন পত্রাবলী থেকে জানা যায় যে, পলিটব্যুরো ও ইংরেজ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত গোপন আঁতাতের শর্ত অনুযায়ী P.C. Joshi তাঁর দলকে ইংরেজ সরকারের সেবায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে রাখার বন্দোবস্ত করেন। ("an alliance existed between the Politbureau of the C.P.I. and the Home Deptt. of the Govt of India, by which Mr. Joshi was placing at the disposal of the Govt. of India the services of his party members...")[1]

১৯৪৬ সালের ১৭ মার্চ, Bombay Chronicle-এ প্রকাশিত S. S. Batlivala-র পত্রে জানা যায় যে মিঃ যোশী এক পত্র মারফত ইংরেজ সরকার ও সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরকে গুপ্ত আন্দোলন ও নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সদস্যদের পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া সহ সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতার নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি দেন। যোশীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণে "ভারত ছাড়ো আন্দোলনকারিগণ", আজাদ হিন্দ বাহিনীর সমর্থক ও সেনানীবৃন্দ ছিল "বিশ্বাসঘাতক" ও "পঞ্চম বাহিনী"। এই পত্রে আরও প্রকাশ যে, C.P.I. এই সহযোগিতার বিনিময়ে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে পায় প্রচুর অর্থ সাহায্য। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মুসলিম লীগেরও ছিল গোপন চুক্তি। (In a letter, published in the Bombay Chronicle on 17 March, 1946, Batlivala added further that Joshi had, as General Secretary of the party, written a letter in which he offered "unconditional help" to the then Government of India and the Army GHQ to fight the 1942 underground workers and the Azad Hind Fauz of Subhash Chandra Bose...These men were Characterised by Joshi in his letter as '"traitors" and "fifth columnists." Joshis' letter also revealed that the CPI was receiving financial aid from the Government, had a secret pact whith the Muslim League.)[2]

পৃথিবীতে ভারতই একমাত্র দেশ—যে দেশটাকে ভাগ করেছে সেই দেশেরই সংখ্যালঘু মুসলমান জাতি। তাদের এই দাবির প্রতি কম্যুনিস্টদের ছিল নৈতিক ও সক্রিয় সমর্থন। পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনের জন্য তারা মুসলিম লীগের সঙ্গে একযোগে আন্দোলন করেছে। গান্ধী "ভারত ছাড়" আন্দোলনের ডাক দেন, কম্যুনিস্টরা স্লোগান দিল— "আগে দেশ ভাগ হবে, তারপর দেশ স্বাধীন হবে; Divide & quit । পার্টির ইস্তাহারে তারা সগর্বে

1. R. C. Majumder–History of the Freedom Movement in India, Vol-III, P-569
2. Ibid, P-570

ঘোষণা করে— "একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টি মুসলমানের পাকিস্তান দাবিকে সঙ্গত বলে মনে করে; এবং দাবি আদায়ের জন্য কংগ্রেস কম্যুনিস্ট-মুসলিম লীগের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানায়।" (The Communist party is the only party that recognises Muslim's demand for Pakistan as just and calls the league to achieve the fundamental goal of Pakistan through united struggle of the Congress, Muslim League and the communists.)[1]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুসলমান দেশের স্বাধীনতা সংগামে অংশ নেয়নি। পাকিস্তানী ঐতিহাসিক K.K. Aziz ইতিহাসের এই সাক্ষ্য সমর্থন করেন। স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশ নেয়নি কম্যুনিস্টরাও। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা করেছে অন্তর্ঘাত। কিন্তু কম্যুনিস্টরা তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ভারতকে খণ্ড খণ্ড (Balkanisation) করার জন্য তারা সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছে। দেশ ও জাতি দুর্বল না হলে সর্বহারা বিপ্লব যে সফল হয় না। শুধু পাকিস্তান দাবি সমর্থন নয়—এক ধাপ এগিয়ে কম্যুনিস্টরা ঘোষণা করে যে "ভারতে প্রত্যেক ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী-ই একটি স্বতন্ত্র জাতি। তাদের প্রত্যেকের অধিকার আছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করার; যেমন আছে রাশিয়ায়"। (The communists did not rest satisfied with sabotaging the national movement for freedom. They sought to destroy the unity of India. "Not only did the communists support the demand for Pakistan but went much further by saying that every linguistic group in India had a distinct nationality and was therefore entitled, as they claimed was the case in the U.S.S.R. to the right to secede.)[2]

রাশিয়ার সঙ্গে তুলনা অর্থহীন ও হাস্যকর। রুশ সম্রাটগণ এশিয়া ও ইউরোপের অনেক দুর্বল রাজ্য অধিকার করেন। মধ্য এশিয়ায় রুশ সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্বন্ধে আকবর এস আহমেদ লিখছেন ঃ জার আইভান দি টেরিব্‌ল (Ivan the terrible) এর রাজত্বকালে মুসলিম রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সফল অভিযান সমসাময়িক পৃথিবীকে আলোড়িত করেছিল। এই বিজয়ের স্মারক চিহ্ন রূপেই ১৫৫৫-১৫৬০ সালের মধ্যে ক্রেমলিনের পাশেই নির্মিত হয়েছিল মস্কোর অন্যতম দর্শনীয় সেন্ট ব্যাসিল্‌স ক্যাথেড্রেল।

1. Bhawani Sen—Muktir Pathe Bangla
   Secy. CPI Bengal Committee, Published by Kanai Roy, on behalf of the CPI — Bengal Committee.
2. R. C. Majumder–History of the Freedom Movement in India, Vol-III, P-570

রোমানভদের তিনশ বৎসরের রাজত্বকালে মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলি,—উজবেক, টাজিক ও কাজাকিস্তানকে রুশ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত করা হয়। বিগত শতাব্দীর ৮০-র দশকে (কম্যুনিস্ট) রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তান অধিকার সেই ঐতিহাসিক ধারারই স্বাভাবিক পরিণতি। (Under Ivan the Terrible the Russians launched a successful offensive against the Muslims which would have reverberations for contemporary society. Between 1555 and 1560 st Basils Cathedral, a popular symbol of Moscow adjacent to the Kremlin, was built to commemorate victory over the Muslims. The rule of the Romanovs, lasting for over 300 years, until the Socialist Revolution of 1917, would see the slow, piecemeal incorporation of the Central Asian Muslim states and groups into Russia. One by one they fell, Uzbeg, Tajik and Kazakh. In one sense, the contemporary Soviet presence in Afganistan is a continuation of the same historical momentum.)[1]

নভেম্বর বিপ্লবের পর নব্য রাশিয়ার রূপকার মহান স্ট্যালিন রুশ সাম্রাজ্যের সীমা আরও প্রসারিত ও সংহত করেন। এই সকল অধিকৃত রাজ্য কখনই মূল রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সোভিয়েত রাশিয়ার সংবিধানে যে, "Right to secede"-এর উল্লেখ করা হয়েছে—তা নেহাতই কম্যুনিস্ট প্রচার কৌশল। যে ভয়ংকর কম্যুনিস্ট একনায়কতন্ত্রে নাগরিকদের ন্যূনতম বাক-স্বাধীনতা পর্যন্ত ছিল না, সেখানে কোন অঙ্গরাজ্যের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করার দুঃসাহস অকল্পনীয়। রাশিয়ায় কম্যুনিজমের পতনের সঙ্গে-সঙ্গেই এই সকল অধিকৃত রাজ্য ঘোষণা করে স্বাধীনতা। ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ।

১৯২৭ সালে রাশিয়ার তাসখন্দে C.P.I. গঠিত হয়। জন্ম বিদেশে, তত্ত্বও বিদেশী। তাই তারা ভারতীয় হতে পারল না। মুসলমানের ন্যায় তারও বাস করে ভারতে—কিন্তু ভারতের নয়। (They live in India but not of India.)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীতে ৪টি রাষ্ট্র বিভক্ত হয়। জার্মানী, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম ও ভারতবর্ষ। লক্ষণীয়, প্রথমোক্ত তিনটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিভক্ত দেশটির কোন অংশই মাতৃভূমির নাম বর্জন করেনি। যেমন পূর্ব জার্মান-পঃ জার্মান, উঃ কোরিয়া-দঃ কোরিয়া ও উঃ ভিয়েতনাম-দঃ ভিয়েতৎনাম। এর কারণ হল এই দেশগুলি বিভক্ত হয়েছিল যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল আবর্তে। কিন্তু ভারত ভাগ করেছে এদেশেরই

1 Akbar S Ahmad—Discovering Islam, P-111-112

সংখ্যালঘু মুসলিম জাতি।* তারা ভারতে বাস করে এই মাত্র। ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই; তাদের শেকড় বহু দূরে—আরবে। তারা আরবের সংস্কৃতির উত্তরসাধক। "পাকিস্তান" (Land of the pure—পবিত্র মানুষের দেশ) নামকরণের মধ্য দিয়ে তারা সন্দেহাতীত (যদি কারও সন্দেহ থাকে) ভাবে প্রমাণ করেছে যে, তারা ভারতীয় নয়।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অবশ্য দেশভাগের জন্য দায়ী করেন হিন্দুদের। তিনি বলেন ঃ প্রশ্ন হতে পারে "পাকিস্তান" যদি সত্যি সত্যিই মুসলিম স্বার্থ-বিরোধী (আজাদের মতে) তবে এক বিরাট সংখ্যক মুসলমানের "পাকিস্তানের" প্রতি কেন এই তীব্র আকর্ষণ? এর উত্তরে বলতে হয়, এর জন্য দায়ী হিন্দুমৌলবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি। মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবি পেশ করলে এই মৌলবাদী গোষ্ঠী তার মধ্যে প্যান-ইসলামিক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। ইসলামিক দেশসমূহের সঙ্গে ভারতের মুসলিম জাতি যাতে জোটবদ্ধ** না হতে পারে—সেই উদ্দেশ্যেই মৌলবাদীরা পাকিস্তান দাবির বিরোধিতা শুরু করে। এই বিরোধিতা লীগ-সমর্থকদের অনুপ্রাণিত করে, সংকল্পকে করে দৃঢ়। (It may be argued that if Pakistan is so much against the interests of the Muslims themselves, why should such a large section of Muslims be swept away by its lure? The answer is to be found in the attitude of certain communal extremists among the Hindus. When the Muslim League began to speak of Pakistan, they read into the scheme a sinister pan-Islamic 'conspiracy and began to opose it out of fear that it foreshadowed a combination of Indian Muslim with trans-Indian

---

* মুসলমানের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবির নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি কি? কোন দেশের জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশ (যারা বহিরাগত ও দেশের সঙ্গে কোন আত্মিক বন্ধন স্বীকার করে না) দাবী করলেই দেশভাগের নজীর ইতিহাসে নেই। উদাহরণ স্বরূপ দঃ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার (জিম্বাবোয়ে) উল্লেখ করা যায়। কয়েক শ বৎসর পূর্বে ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ জাতি এই দুটি দেশে স্থাপন করে তাদের উপনিবেশ। বর্তমান শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী এই দেশদুটিরই ভূমিপুত্র (son of the soil)। কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে ধর্ম ব্যতীত (খ্রিস্টান মিশনারীদের কল্যাণে) অন্য কোন বিষয়ে তাদের কোন মিল নেই। ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি সকল বিষয়ই স্বতন্ত্র। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে দেশ দুটি শ্বেতাঙ্গ অধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। তখন যদি শ্বেতাঙ্গরা রোডেশিয়া ও দঃ আফ্রিকা ভাগ করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি করত (এদেশে মুসলমানেরা যেভাবে পাকিস্তান দাবি উত্থাপন করেছিল) ঃ আন্তর্জাতিক আইন, বিশ্বজনমত এবং সর্বোপরি সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ জাতি তা মেনে নিত কি? প্রয়োজনে শ্বেতাঙ্গদের বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবির বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ জনতা বল প্রয়োগেও দ্বিধা করত না; তবু মাতৃভূমি দ্বি-খণ্ডিত হতে দিত না। আপস করত না দেশের অখণ্ডতার প্রশ্নে। বিভ্রান্ত হত না অলীক আদর্শবাদের দ্বারা।

** আরবের মুসলিম দেশগুলির সঙ্গে ভারতের মুসলমান জোটবদ্ধ হোক। আজাদও কি তাই চেয়েছিলেন?

Muslim states. The opposition acted as an incentive to the adherents of the League.)[1] মুসলিম লীগের জন্ম ১৯০৬ সালে। প্রায় দুই দশক পরে হিন্দু মহাসভা গঠিত হয় ১৯২৬ সালে। ভারতে বসবাসকারী প্রায় সকল মুসলমানের আন্তরিক ও সক্রিয় সমর্থন ছিল মুসলিম লীগের প্রতি—তাই ভারত হয়েছে বিভক্ত। অনুরূপভাবে হিন্দু জাতি যদি সমর্থন করত হিন্দু মহাসভাকে তাহলে নিঃসন্দেহে প্রতিরোধ করা যেত ভারত বিভাগের চক্রান্ত। কংগ্রেস সভাপতি আজাদের দৃষ্টিতে মুসলমান নয়, হিন্দু হল সাম্প্রদায়িক। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি কেন—তার উত্তর নেই, দোষারোপ করেন হিন্দুদের। গান্ধী নেহেরুর সীমাহীন মুসলিম প্রীতি সত্ত্বেও, মুসলিম লীগের দৃষ্টিতে কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিনিধি। কিন্তু কংগ্রেস যে সকলের বিশেস করে মুসলমানেরও প্রতিনিধি—তা প্রমাণ করার জন্য মৌলানা আজাদকে করা হয়েছিল কংগ্রেসের সভাপতি ও মুখপাত্র।

এখানে একটি মূল প্রশ্নের আলোচনা করা যেতে পারে। গান্ধী এবং তাঁর অনুগামীরা মুসলমানের সঙ্গে মিলনের জন্য সর্বস্ব পণ করলেন কেন? Man is a rational animal. মানুষ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণী ও যুক্তিবাদী। অনন্তলোকের সাধনায় ভক্তিবাদের একটি বিশেষ স্থান অঅছে। কিন্তু ইহলোক অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে বাস্তব বোধ ও যুক্তিই মানুষের সকল কাজের প্রধান নিয়ামক। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রধান অন্তরায় অতীতের ভয়ংকর স্মৃতি ও মুসলমানের বর্তমান ভূমিকা। গান্ধীবাদীরা হিন্দুদের অতীতকে ভুলে যেতে আহ্বান জানালেন।* সেই ভাবে ইতিহাস লেখা শুরু হল। যে সকল মুসলিম বিজেতা অথবা শাসকের হাত লক্ষ হিন্দু-রক্তে রঞ্জিত তাদের মহানুভব প্রজানুরঞ্জক শাসক রূপে চিহ্নিত করা হয়। মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের এই সকল মহান পুরুষ সম্বন্ধে

এ সম্বন্ধে The Times of India-র (25-11-2009) প্রথম সম্পাদকীয়টি Art of Forgetting খুবই প্রাসঙ্গিক। বঙ্গানুবাদ সহ তা নীচে উদ্ধৃত হল।

নেতিবাচক ঘটনাবলী সম্বন্ধে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি যেমন ২৬/১১; বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নেতিবাচক ঘটনা সমূহের বার্ষিকী পালন করার একটা ঐতিহ্য পাশ্চাত্যের আছে। ইহার উৎস সম্ভবত ইহুদিদের জীবনচর্যার নীতি— "পাছে আমরা ভুলে যাই" এই তত্ত্বে নিহিত। এইজন্যই HOLOCAUST ইহুদিদের ব্যক্তিগত পরিচয় ও অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের ক্যালেন্ডারে এই জাতীয় ঘটনা যেমন ৯/১১'র একটি বিশেষ স্থান আছে। অন্যদিকে "পাছে আমরা স্মরণ করি"—এই নীতি বাক্যের উপর ভারতীয় জীবনচর্যা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে।

অতীতে সংঘটিত কুকর্ম ও হিংসাশ্রয়ী ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের সামাজিক স্মৃতিশক্তি খুবই ক্ষীণ। এরকম বিশ্বাস করতে আমরা ভালবাসি যে আমাদের অতীত ছিল অহিংসা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক স্বর্ণযুগ; যদিও স্পষ্টতই ইহা সত্য নয়। পূর্বে শাসকগণ যে অত্যাচার ও জবরদস্তি করেছে ও তাঁদের চরিত্রের কলঙ্কিত দিকগুলি আমাদের ঐতিহাসিকরা সযত্নে পরিহার করেন। কিন্তু পাশ্চাত্যে এই অভিশপ্ত অতীতকে সাগ্রহে পর্যালোচনা করা হয়।

---

1. Abul Kalam Azad—India Wins Freedom, P-151

বিদেশী ঐতিহাসিক Elliot বলেন ঃ যে সকল চরিত্র জাঁকজমক ও বহু যুদ্ধ জয়ের নায়ক রূপে বিখ্যাত, সালংকার বাগ্মিতা বর্জন ও স্তাবকতার আবরণ উন্মোচন করে তাদের যদি সত্যের আলোকে উপস্থাপিত করা হয় তবে তারা মানবজাতির ঘৃণ্য অভিশাপ বলে গণ্য হবে। (Characters now renowned only for the splendour of their achievements, and a succession of victories, would, when we withdraw the veil of flattery, and divest them of rhetorical flourishes, be set forth in a truer light and probably be held up to the execration of mankind.)[1]

প্রশ্ন হল হিন্দুরা অতীতকে ভুলবে কেন? পৃথিবীর আর কোন জাতি কি তার ওপর অন্য জাতির অত্যাচারকে ভুলেছে বা ভুলতে চায়? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান দখল করে চীনের (মাঞ্চুরিয়া) কিছু অংশ। স্থানীয় চীনাদের ওপর অত্যাচার করে; চীনা মেয়েদের Comfort Girl রূপে জাপানী সৈন্যরা ব্যবহার করে। এই জন্য চীনের কম্যুনিস্ট সরকারের দাবি, জাপানকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে; ক্ষতিপূরণ দিতে হবে Comfort Girl-দের। যুদ্ধোত্তর জাপান সরকার, যুদ্ধকালীন এই ঘটনার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছে। এই কলঙ্কিত অধ্যায় যেন আগামী দিনও দুই জাতির মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি না করে—সেই উদ্দেশ্যে তারা পাঠ্য-পুস্তক থেকে এই কাহিনি বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। চীনা সরকার এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে জানিয়েছে তীব্র প্রতিবাদ। চীনের দাবি সম্পূর্ণ সঙ্গত ও বৈধ। যে কোন শক্তিশালী আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন জাতির প্রতিক্রিয়া

এর ফলে বিস্মৃতি ও ক্ষমাশীলতাকে শিল্পের স্তরে উন্নীত করা আমাদের পক্ষে সহজতর হয়েছে। এই মনোভাব অন্যদের হতবুদ্ধি ও বিহ্বল করে; বিশেষত ইওরোপীয়ানদের; যাদের অতি তুচ্ছ কিংবা অসাধারণ, সকল বিষয়কেই নথীভুক্ত করার একটা ঐতিহ্য আছে।

Art of Forgetting

Arguably the Indian perspective on negative events, such as 26/11 is quite different from the rest of the world. The West has a long tradition of observing negative anniversaries. This could be traced to the Jewish philosophy best summed up by the phrase, "Lest we forget". Thus the Holocaust is such a central part of Jewish identity and being. There are many such negative events, including 9/11, which have a special place in the Western calender. In contrast, Indian philosophy lays a far greater emphasis on the dictum, "Lest we remember". That is why Indians have a low social memory when it comes to dark deeds and violence. We like to believe that our part has been one of non-violence and peaceful co-existence even though this is palpably untrue. Our histories tend to elide over the violence perpetrated by kings or negative aspects of their character, whereas revisionism is such a rage in the West.

This makes the art of forgetting and indeed forgiving, easier for us. This attitude has perplexed outsiders, particularly Europeans steeped in tradition of recording events from the mundane to the extraordinary.

---

1. Sir H. M. Elliot and Dowson—The History of India As Told By Its Own Historians, Vol-I, Preface-XXII

এইরূপ হয়। তবে হিন্দুর প্রতিক্রিয়া কেন হবে ভিন্নতর? লক্ষণীয় ঃ চীনের কম্যুনিস্ট সরকার অন্য দেশের ইতিহাসের পুনর্লিখন বিরোধিতা করেছে—আর ভারত স্বেচ্ছায় উদ্যোগী হয়েছে এদেশের মধ্যযুগে মুসলিম বর্বরতাকে বাদ দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনায়। যে ইতিহাসে উগ্র, ধর্মান্ধ, হিন্দু-বিদ্বেষী সম্রাটকে চিত্রিত করা হয়েছে উদার, পরমসহিষ্ণু, প্রগতিশীল সমদর্শী প্রজাহিতৈষী শাসকরূপে। ঐতিহাসিক Elliot-এর রচনায় সে প্রজাহিতৈষণার স্বরূপ ঃ এই গ্রন্থের ক্ষুদ্র পরিসরে হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অত্যাচারের যে চিত্রের আভাসমাত্র দেওয়া হয়েছে—তাতে দেখা যায়, হিন্দু-মুসলমান বিবাদে হিন্দুকে হত্যা করা হত। হিন্দুর পূজা-অর্চনা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা ছিল নিষিদ্ধ। চরম অসহিষ্ণুতা, বলপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তর, হিন্দু মেয়েদের বিবাহ করা, মন্দির ধ্বংস, বিগ্রহের লাঞ্ছনা, নির্বিচারে ব্যাপক হত্যা—এ সকলই ছিল মুসলিম যুগের দৈনন্দিন ঘটনা, এই চিত্রের মধ্যে অতিরঞ্জন কিছুমাত্র নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সকল (মুসলিম) ঐতিহাসিকের রচনায় এই তথ্য পাওয়া যায় তারা গুণগ্রাহী নন—নিন্দা করেন না বর্বরতার। অত্যাচার যে অন্য দেশ বা জাতি করেনি—তা নয়। কিন্তু সেখানে অন্তত জনতার এক অংশের দ্বারা তা হয়েছে নিন্দিত ও ধিকৃত। (The few glimpses we have, even among the short Extracts in this single volume, of Hindus slain for disputing with Muhammadans, of general prohibitions against processions, worship and abulations and of other intolerant measures, of idols mutilated, of temples razed, of forcible conversion and marriages, of proscriptions and confiscations, of murders and massacres,....show us that this picture is not overcharged, and it is much to be regretted that we are left to draw it for ourselves from out the mass of ordinary occurrances, recorded by writers who seem to sympathise with no virtues, and to abhor no vices. Other nations exhibit the same atrocities, but they are at least spoken of, by some, with indignation and disgust.)[1]

জনৈক ঐতিহাসিক বলেন ঃ হিন্দুরা এই সকল অপকর্মকে তার ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে জঘন্যতম ও চরম নিষ্ঠুরতা বলেই বিবেচনা করবে। ইসলামের নামে অনুষ্ঠিত এই বর্বর অত্যাচারকে তারা ভুলে যাবে অথবা মার্জনা করবে এমন আশা বাতুলতা। তারা যদি তাই করে, তবে বুঝতে হবে তারা হয় অতিমানব অথবা মনুষ্যেতর (অমানুষ) জীব। (The Hindus, who must have looked upon such misdeeds as

1. Ibid, Preface XXI

the most heinous crime and the greatest outrage on their religion and society, could hardly be expected to forget or forgive the sacrileges perpetrated in the name of Islam. They would be either more or less human beings if they could do so.)[1]

জাপান বা জার্মানী যে অত্যাচার করেছে (৬০ লক্ষ ইহুদি নিধন) ভারতবর্ষে মুসলিম অত্যাচার তদপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক। রণক্ষেত্রে শত্রু নিধন স্বীকৃত। কিন্তু যুদ্ধ শেষে নির্বিচারে সাধারণ নাগরিক হত্যা, লুণ্ঠন ও সর্বগ্রাসী ধ্বংসের তাণ্ডব আইন ও নিয়ম-নীতি বিরুদ্ধ। আলেকজান্ডার, হানবল, এ্যাটিলা দিগ্‌বিজয়ী বীর, স্বনামধন্য। অর্ধেক ভূ-মণ্ডল তারা জয় করেছে; যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করেছে অসংখ্য শত্রু—কিন্তু বিজিত দেশ ও জাতির ওপর ধ্বংসের ভৈরব নর্তন করেননি। পক্ষান্তরে প্রায় প্রত্যেক মুসলিম বিজেতা ও শাসক লক্ষ লক্ষ সাধারণ হিন্দুকে হত্যা করেছে—উল্লাসে আল্লাহর নাম করে তাথৈ তাথৈ নৃত্য করেছে শোণিত সাগরে। ভারতবর্ষের ধর্ম, সংস্কৃতি ও হিন্দু জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছে। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বিশ্লেষণে ঃ মুসলিম আক্রমণে হিন্দু রাজবংশসমূহের পতন হলে দেশব্যাপী মঠ-মন্দির ব্যাপকভাবে ধ্বংস করা হয়। হিন্দুর সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাণসুধা আহৃত হত এই মঠ-মন্দির থেকে। মুসলমান সেই উৎসমুখ ধ্বংস করে প্রায় নির্মূল করেছিল হিন্দু-সংস্কৃতিকে। রুদ্ধ হল তার অগ্রগতি; নেমে আসে হতাশা ও বিষাদের ছায়া। (The end of Hindu ruling dynasties, followed by almost wholesale destruction of temples and monasteries by the Muslim invaders and rulers, very nearly extinguished the Hindu culture by destroying the sources which fed and nourised it. Its further growth was arrested and an almost impenetrable gloom settled over it.)[2]

পৃথিবীর সর্বত্র সংগঠিত অত্যাচারকে যদি একত্র করা হয়—তবু তা ভারতবর্ষে মুসলমানের পৈশাচিক বর্বরতার কাছে তুচ্ছ মনে হবে। Will Durant যথার্থই বলেছেন, মুসলমানের ভারত বিজয় মানব ইতিহাসের সর্বাধিক রক্তাক্ত অধ্যায়। তা সত্ত্বেও ভারত-সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল দীপশিখা যে অম্লান তার কারণ অদম্য অফুরন্ত প্রাণ-শক্তি। ম্যাক্স মুলার বলেন ঃ ভারতের জনগণের প্রতি রয়েছে আমার সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি....ভারত ইতিহাসে আমি ১০০০ খ্রিস্টাব্দকে যুগসন্ধিক্ষণ বলে মনে করি। সেই সময় থেকে ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ পর্যন্ত মুসলিম বিজেতারা ভারতবর্ষে যে

1. R. C. Majumder–The History & Culture of the Indian People–The Delhi Sultanate, P-626
2. R. C. Majumder—The History & Culture of the Indian People —The Delhi Sultanate — Preface-XXXI

ভয়াবহ অত্যাচার করেছে তা আপনারা সম্যক অবহিত। আমি অপার বিস্ময়ে ভাবি, সেই নরককুণ্ডে ভয়ংকর অত্যাচারেও হীন পাষণ্ডে পরিণত না হয়ে একটি জাতি কিভাবে স্বীয় অস্তিত্ব অটুট রাখতে পারে! ঈর্ষাকাতর বিরুদ্ধবাদীরা যাই বলুক না কেন, মনুষ্যত্বের মূল সত্যগুলি ভারতবর্ষে আজও সমাদৃত ও সম্মানিত। (My interest lies altogether with the people of India....historically I should like to draw a line after the year one thousnad after Christ. When you read the atrocities committed by the Mohammadan Conquerors of India from that time to the time when England stepped in and whatever may be said by her envious critics, made at all events, the broad principles of our common humanity respected once more in India, the wonder to my mind, is how any nation could have survived such an Inferno, without being turned into devils themselves.)[1]

তেজো জাপানের গর্ব নয়—লজ্জা। সুসভ্য জার্মান জাতি। হিটলারের নৃশংস বর্বরতায় তারা লজ্জিত, অনুতপ্ত। ইজরায়েল ও ইহুদি জাতির নিকট তারা শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। কিন্তু মুসলমান জাতি এক বিরল ব্যতিক্রম। লজ্জা নয়—মামুদ, নাদির, বাবর, আওরঙ্গজেব মুসলমান জাতির পরম গৌরব। ভারতের মুসলমানের নিকট তারা ইসলামের শ্রেষ্ঠ বীর রূপে সম্মানিত। মুসলমানের সকল কাজ ধর্ম-অনুপ্রাণিত ও নির্দেশিত। তার অতীত ও বর্তমান তাই এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও নোয়াখালিতে হিন্দু নিধনে দেখা যায় অতীতের নিখুঁত পুনরাবৃত্তি!

মুসলমানের পাকিস্তান দাবির আদর্শগত ভিত্তি হল ইসলাম ও ইসলামিক জাতীয়তাবাদ। বিদেশী মুসলমান একদা ভারতের রাষ্ট্রীয় অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। কিন্তু হাজার বৎসর এদেশে বাস করেও যদি ভারতের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারে—তবে এদেশে তাদের কোন সঙ্গত অধিকার থাকতে পারে না। ইংলন্ডের এক মন্ত্রী Enoch Powel ব্রিটেনে বসবাসকারী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে যথার্থই বলেছিলেন ঃ Integrate or Migrate—হয় দেশের সঙ্গে একাত্ম হও অথবা দেশান্তরী হও।* ব্রিটেনের Enoch powel-এর ন্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ই ভারতে হিন্দুদের

* আধুনিক যুগে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ জেহাদী সৌদী ধনকুবের Osama-bin Laden-এর নির্দেশে তার নিজস্ব জেহাদী গোষ্ঠী Al-Quaida-গত ১১ই সেপ্টেম্বর-২০০১ আমেরিকার World Trade Centre ও Pentagon-এর ওপর তিনটি ছিনতাই করা যাত্রী-বিমান নিয়ে আত্মঘাতী হামলা চালায়। মৃত্যু হয় ৩০০০ নিরীহ মানুষের। আমেরিকা লাদেন ও তার আশ্রয়দাতা তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ব্রিটেন, বিশ্বের প্রায় সকল অ-মুসলিম

1. F. Max Muller-India-What can it teach us? P-50

পক্ষ থেকে এ দাবি উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। হিন্দুরা যদি মিথ্যা আত্মঘাতী আদর্শের মোহজাল ছিন্ন করে, সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-জড়তা কাটিয়ে—সে দাবি করতে পারত তবে আর ভারত বিভাগ হয় না। দাবি করলেই অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করা যাবে না। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে এ রকম দাবির কোন নৈতিক, আদর্শগত ও আইনি ভিত্তি নেই।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃত্বে প্রথম থেকেই আপস ও তোষণ নীতি গ্রহণ করে; মুসলমানের বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবিকে দেয় De-facto স্বীকৃতি। নেতৃত্বের এই নির্বুদ্ধিতায় পরবর্তীকালে 'পাকিস্তান" দাবি সাধারণ দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ বৈধতা লাভ করে। কংগ্রেসের নীতি বিশ্লেষণ করে ডঃ আম্বেদকর বলেছেন ঃ কংগ্রেস বুঝতে পারছে না যে আপস নীতি মুসলমানকে আরও আগ্রাসী করে তুলেছে। (The second thing the congress has failed to realise is that the policy of concession has increased Muslim aggressiveness.)[1]

অলীক আদর্শের ভ্রান্তি বিলাস, যুক্তি ও বাস্তববুদ্ধির অভাব ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কঠিন মূল্য দিতে হল দেশ ও দেশবাসীকে। মাতৃভূমি হল খণ্ডিত। অন্তিম পর্বে চুক্তিপত্র রচনায়ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চরম ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছেন। যে হিন্দু-মুসলিম মিলনের মরীচিকা ভারতবর্ষকে করল দ্বি-খণ্ডিত—তার প্রেতাত্মা তখনও গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃত্বকে ত্যাগ করেনি। ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনায় ইংরেজ সরকারের তরফে স্বাভাবিক ভাবেই প্রস্তাব করা হয়েছিল; খণ্ডিত ভারতের এক অংশের নাম যদি হয় পাকিস্তান, তবে অন্য অংশের নাম হোক হিন্দুস্থান। খুব সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত এ প্রস্তাব। কিন্তু তীব্র আপত্তি জানায় কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য—দেশের নাম হিন্দুস্তান* হলে হিন্দুর প্রাধান্য সূচিত হয়। কিন্তু ভারত যে সকলের দেশ; এবং তারা হিন্দু-মুসলমান

রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপুঞ্জ এই যুদ্ধে আমেরিকার পক্ষ সমর্থন করে। অন্যদিকে বিশ্ব মুসলিম জনমত সমর্থন করে লাদেনকে। ব্রিটেনে এক সমীক্ষায় প্রকাশ ঃ ব্রিটেনে বসবাসকারী মুসলমানের 91% মনে করে খ্রিস্টান পশ্চিমী দুনিয়া ও ইসলামের মধ্যে এ হল জেহাদ। 9?% বলে তারা ব্রিটেনের হয়ে যুদ্ধ করবে না; 48% লাদেনের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক।—Hindustan Times. 31-1-0-2001. শুধু ইংল্যান্ড নয়—বিশ্বের সকল অ-মুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলমানের একই অভিমত। Enoch Powel যে আশঙ্কা করে মুসলমানদের উদ্দেশে Integrate or Migrate-এর দাবি তুলেছিলেন তা যে বড় নির্মম সত্য উপরিউক্ত সমীক্ষা তার প্রমাণ।

সলমন রুশদি এ সম্পর্কে বলেন ঃ যদি সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করতে হয়, তবে আধুনিক পৃথিবী যে ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম জগৎকে তাকেই গ্রহণ করতে হবে।" (If terrorism is to be defeated, the world of Islam must adopt the secularist principles the modern world is based on—

---

* সকল মুসলিম আক্রমণকারী ও শাসকবর্গ এ দেশকে বলতেন "হিন্দুস্থান"। কবি ইকবাল গীত রচনা করেছেন—"সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা"। আজও পাকিস্তানের সাধারণ মুসলমান ও রাষ্ট্রনায়ক, সকলের কাছেই এ দেশ ভারত নয়—হিন্দুস্থান। কিন্তু কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দের "হিন্দুস্থান" নামে প্রবল আপত্তি।

---

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-270

সহ সকলের প্রতিনিধি। নির্মম এ পরিহাস! প্রকৃতপক্ষে হিন্দুজাতিকে দুর্বল করা ও হিন্দু বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার এ এক কুটিল চক্রান্ত। এই চক্রান্তের প্রথম শর্ত হল "হিন্দু"-শব্দটিকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বর্জন করতে হবে। গণপরিষদের গঠনতন্ত্র এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

(ক) জনগণ নয়—প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যরাই গণ পরিষদের (Constituent Assembly) সদস্যদের নির্বাচিত করেন। মাত্র ১৪ শতাংশ জনগণের ভোটে এই আইন সভার সদস্যরা নির্বাচিত হতেন।

(খ) গণ পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ডঃ বি, আর, আম্বেদকর ছিলেন খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান। সংবিধান রচনায় প্রধান ভূমিকা ছিল নেহেরু, প্যাটেল, আজাদ ও রাজেন্দ্র প্রসাদের—আম্বেদকরের নয়। গণপরিষদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ছিল ৮টি। এরকম প্রতিটি কমিটির সভাপতি পদে নেহেরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে কোন-না-কোন একজন আসীন ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শই ভারতীয় সংবিধানের আদর্শ, লক্ষ্য ও দর্শনে পরিণত হয়েছে। কারণ গণপরিষদে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য ছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে কোন আলোচনা সমালোচনা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ (Whip) জারি করত। মহাবীর ত্যাগীর মতে খসড়া কমিটির সদস্যদের হাত অন্যত্র বাঁধা ছিল। ক্ষোভের সঙ্গে আম্বেদকর বলেছেন—"সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমাদের অন্যত্র যেতে হত...।" (We had to go to another place to obtain a decision and then come to the Assembly.)

একটি উদাহরণ দিলে ডঃ আম্বেদকর ও খসড়া কমিটির অসহায়তা পরিস্ফুট হবে। Preamble সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নেহেরুর নির্দেশে V. K. Krishnamenon.** এই Preamble রচনা করেন। নেহেরু তাতে সামান্য পরিবর্তন করে গণপরিষদে পেশ করেন এবং তা গৃহীত হয়। (At Nehru's instance the Preamble to the Constitution was drafted by Krishna Menon. Nehru made a few verbal changes and presented it to the Constituent

---

Hisdustan Times—3-11-2001) জনৈক আমেরিকান চিন্তাবিদ যথার্থই বলেছেনঃ এ হল সভ্যতার লড়াই—Clash of Civilizations. ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই এ লড়াই চলছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে;এবং সর্বাধিক মূল্য দিয়েছে ভারতবর্ষ।

** কম্যুনিষ্ট নেহেরুর প্রিয় বন্ধু ছিলেন কম্যুনিষ্ট কৃষ্ণ মেনন। ইউরোপে ছিলেন তাঁর প্রতিনিধি। ইনি লন্ডনে India League-এর অর্থ আত্মসাৎ করেন। "জীপ" কেলেঙ্কারীসহ বহু কেলেঙ্কারীর নায়ক এই কৃষ্ণ মেনন। মাদকাসক্ত ভ্রষ্ট চরিত্র কৃষ্ণ মেনন ইউরোপ ও রাষ্ট্রসংঘে যৌন কেলেঙ্কারীতে জড়িত ছিলেন। সকলের আপত্তি উপেক্ষা করে নেহেরু কৃষ্ণ মেননকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। '৬২ সালে চীনা আক্রমণে ভারতের শোচনীয় পরাজয়ের পর কৃষ্ণমেনন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সূত্র—M.O.Mathai—Reminiscences of the Nehru Age.

Assembly which passed it.)[1] অধ্যাপক J. C. Johari বলেন ঃ...both the Assembly and its Drafting Committee were the formal centres of work; the real place of work was the premises where congress leaders used to meet and take important decisions. The Congress working Committee became the real architect of our Constitution.

বিশিষ্ট সংবিধান বিশারদ K.V. Rao তাঁর Parliamentary Democracy of India গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—My reading of the constitution makes me feel that it is inappropriate to call Dr. Ambedkar, the father of the constitution. If any people are entitled to be called so, they are Nehru and Patel.

সর্বোপরি রচিত সংবিধানটিকে গণভোটে পেশ করা হয়নি। তাই এই সংবিধানকে জনগণের সংবিধান বলা যায় না। "We, the people of India" in the Preamble is high sounding but empty; the people were niether directly nor indirectly connected with the framing of the Constitution either at the begining or at the end. বলেন—K.V. Rao.

গণপরিষদের সকল আসন সাধারণ (অ-মুসলমান, অ-শিখ), "মুসলমান" ও "শিখ" এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানুপাতিক হারে ভাগ করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের জন্য নির্দিষ্ট মোট আসন ২৯২টির মধ্যে সাধারণ—২১০, মুসলমান—৭৮, শিখ—৪। প্রাদেশিক আইন সভার ভোটে কংগ্রেস লাভ করে ২০৮টি আসন, মুসলিম লীগ—৭৩। যে মুসলিম লীগ সমগ্র ভারতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে সশস্ত্র দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে প্রায় বলপূর্বক ভারতবর্ষকে দ্বি-খণ্ডিত করে—খণ্ডিত ভারতের গণপরিষদে তারও ২৯ জন প্রতিনিধি ছিল। ছিল না হিন্দুর কোন প্রতিনিধি—যারা ভারতের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ; এবং যে হিন্দু জাতির অপরিসীম ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়েই ভারত সহস্র বৎসরের পরাধীনতার অভিশাপ মুক্ত হয়।

দেশভাগের পূর্বে মুসলিম লীগ সদস্যরা গণপরিষদ বয়কট করে। দেশভাগের পর পাকিস্তান রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে লিয়াকত আলি খাঁন লীগ সদস্যদের উদ্দেশে বলেন ঃ তারা যেন সংবিধানে প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচের মাধ্যমে মুসলিম স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতের সংবিধান রচনায় গণপরিষদের অধিবেশনে যোগদান করে। (Liaqat Ali Khan issused an appeal to such league members to attend the constituent Assembly and play their part in the framing of the future constitution

1. M.O.Mathai—Reminiscences of the Nehru Age, P-156.

of the Union of India, with a view to securing the right of Musalmans by means of adequate and effective safeguards in the constitution.)[1]

মুসলমান নীতি-চ্যুত হয় না, হয় না লক্ষ্যভ্রষ্ট। ভারত নয়, আপামর ভারতবাসী নয়, শুধুমাত্র যে মুসলমান ভারতে থেকে গেল তাদের স্বার্থরক্ষাই হবে গণপরিষদে মুসলিম লীগ সদস্যদের কর্তব্য! স্ব-বিরোধিতা ও অসংলগ্নতা গান্ধী-রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য; সাধারণ মানুষের নিকট যা দুর্বোধ্য। হিন্দু-মুসলিম মিলন কামনায় ভারতের অখণ্ডতাকে তিনি বিসর্জন দেন। "হরিজন" পত্রিকায় তিনিই আবার লিখেছেন ঃ (আলোচনায়) অগ্রগতির প্রথম শর্ত হল সকলের সঙ্গে ঐক্যমত, এ অবাস্তব অলীক বিশ্বাস আমরাই তৈরি করেছি। (It is an illusion created by ourselves that we must come to an agreement with all parties before we can make any progress.)[2] একি স্বপ্ন না সত্যি! তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে লিখলেন ঃ মুসলিম লীগ সত্যিই সাম্প্রদায়িক। তারা দেশকে ভাগ করতে চায়। (The Muslim League is frankly communal and wants to divide India into two parts)[3] সন্দেহ হয়, একি অকপট সত্য ভাষণ অথবা অভিনয়। জিন্না ও লিয়াকত আলির পরামর্শে লীগ সদস্যরা গণপরিষদের ৪র্থ অধিবেশনে যোগদান করে দেশের প্রতি "আনুগত্যের শপথ" নেয়। গান্ধীর কথায় মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক; শুধুমাত্র যে সদস্য সমর্থকবৃন্দ ভারতে থেকে গেল তারা হল অ-সাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী? একি ইন্দ্রজাল! বিশ্ব-রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এরকম সর্বনাশা তামাশা ও নগ্ন ভণ্ডামি বিরল-দৃষ্ট।

V.P.Menon-এর মতে কংগ্রেস কর্তৃক ভারতবিভাগ মেনে নেওয়ার কারণ দ্বিবিধ ঃ প্রথমত, মুসলিম লীগের অনমনীয় মনোভাবের দরুন অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি বিলম্বিত হবে— অথবা গৃহযুদ্ধের মাধ্যমেই তা অর্জন করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, আশা ছিল, স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। (The Congress had accepted the division of the country on two considerations. In the first place, it was clear from the unyielding attitude of the Muslim league that a united India would either be delayed or could only be won at the cost of a Civil war. Secondly, it was hoped that the establishment of a separate Muslim state would finally settle the communal problem...)[4] ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের বিরুদ্ধে দার্শনিক কবি ইকবালও গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়েছিলেন।

---

1. V.P. Menon—The Transfer of Power In India, P-412
2. R. C. Majumder—History of Freedom Movement in India, Vol-III, P-499
3. Ibid, P-499
4. V.P. Menon—The Transfer of Power In India, P-440

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এক সময়ে ঐক্য ও সংহতির সংকট দেখা দিয়েছিল। আব্রাহাম লিঙ্কন তখন রাষ্ট্রপতি। প্রধানত, দাসপ্রথা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন ছিলেন খাঁটি দেশপ্রেমিক। তিনি দক্ষিণী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে আপস করেন না। যুদ্ধ করে রক্ষা করেন স্বদেশের অখণ্ডতা। তাই আমেরিকা আজ বিশ্বের সমৃদ্ধতম ও মহাশক্তিধর রাষ্ট্র। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, লিঙ্কনের তুল্য সৎ বলিষ্ঠ দেশপ্রেমিক নেতা কংগ্রেসে ছিল না; বরং কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পাকিস্তান গঠনে ছিল কার্যত মুসলমানের সহযোগী। দ্বিতীয়ত, দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হলে তাকে গৃহযুদ্ধ বলা হবে কেন? মুসলমান নিজেকে ভারতীয় মনে করে না; ভারত তার স্বদেশ, তা সে স্বীকার করে না। দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার জন্য বিদেশীর সঙ্গে স্বদেশবাসীর যুদ্ধ কখনও গৃহযুদ্ধ বলে আখ্যাত হতে পারে না।

দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ দেশ ও জাতির মূল শক্তি। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই দুটি শক্তিকেই ব্যবহার করা হয়েছে। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করে যদি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়, তবে সেই শক্তির দ্বারাই মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষার জন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে কেন সংগ্রাম করা যাবে না? হিন্দুরা গান্ধী ও কংগ্রেসের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যথার্থ স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে জনগণকে অজ্ঞ রাখা হয়। এই উদ্দেশ্যে বিকৃত করা হয় ইতিহাস। অজ্ঞতা হল অভিশাপ—আশীর্বাদ নয়। যদি আগে থেকেই প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য ও কৌশল সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়, তবে পরিস্থিতির মোকাবিলায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়। (Foreknowledge is strength and "to be fore-warned is to be well armed") দেশ ও জাতির মূল স্বার্থের বিরুদ্ধে, গান্ধীর সীমাহীন মুসলিম তোষণ যে দেশকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে—হিন্দু তা বুঝতে পারেনি। হিন্দু-মুসলমান মিলন স্বপ্নে তারা ছিল মোহাবিষ্ট। ঐতিহাসিক R.C.Majumder তাই বলেছেন ঃ সুদীর্ঘ ইতিহাসের আলোকে হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে (হিন্দুদের) অজ্ঞ রাখা হয়। স্বার্থান্বেষী মহল থেকে এই অজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই অজ্ঞতাই পরিণামে দেশ বিভাগের জন্য প্রধানত দায়ী। (...ignorance of the actual relation between the Hindus and the Muslims through the course of history,—an ignorance deliberately encouraged by some,—may ultimately be found to have been the most important single factor which led to the partition of India.)[1]

---

1. R. C. Majumder–The History & Culture of the Indian People–Preface-XXIX —The Delhi Sultanate

তিনি বলেন, গান্ধী-নেহেরু কর্তৃক দেশবিভাগ মেনে নেওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে দুর্বোধ্য ও অমার্জনীয় বলে গণ্য হয়। আবার কেহ কেহ মনে করেন, এই সিদ্ধান্ত একেবারে শেষমুহূর্তে অপ্রত্যাশিত ভাবে সহসাই নেওয়া হয়েছিল। এইরূপ অভিমতের কারণ হল যে ঃ ওই সকল নেতৃবৃন্দ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ—হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। তাঁরা জনগণকে কঠোর বাস্তবকে অস্বীকার করে এই মিথ্যা ধারণা পোষণে উৎসাহিত করেছিলেন। (Such an opinion is due to the fact that those leaders were always guided by a false notion of Indian nationality based on Hindu-Muslim unity, and persuaded the people to ignore the reality and cherish the ideal.)[1] বলা বাহুল্য, সংবিধানের ধারা, রাজনৈতিক দলের ইস্তাহার, ন্যায়ালয় অথবা আইন সভার কক্ষে 'জাতি' (Nation) তৈরি হয় না। সুদীর্ঘকাল ব্যাপী, নানাবিধ জটিল উপাদানের সূক্ষ্ম বিন্যাসে গঠিত হয় জাতি। রাজনৈতিক সততা নয়—কপটতা ও চাতুর্যই গান্ধী রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা (separate electorate) স্বীকার করে নিয়ে কংগ্রেস, স্যার সৈয়দ আহমেদ ও জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বকে বহু পূর্বেই কার্যত স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৪২ সাল। "হরিজন" পত্রিকায় গান্ধী লিখলেন ঃ মুসলমানদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি ভারত বিভাগ দাবি করে তবে ভারত বিভাগ হবেই। (In 1942, Gandhi wrote in the "Harijan", if the vast majority of Muslims want to partition India, they must have the partition.)[2] সুতরাং নেতৃত্ব অজ্ঞ ছিলেন না—সত্য সম্বন্ধে তাঁদের ছিল না কোন সংশয়; কিন্তু বিভ্রান্ত করেছেন দেশবাসীকে। মুসলমানের ধর্ম ও ইতিহাস মুসলমানকে একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে তৈরি করেছে। উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মুসলমান প্রকাশ্যে এই দাবি করে যে, তারা মুসলমান—ভারতীয় নয়। তা সত্ত্বেও মুসলমানকে নিয়ে ভারতীয় জাতির রূপ-কল্পনার কি কারণ তা সাধারণ যুক্তি ও বুদ্ধির অগম্য। পূর্বে আলোচিত হয়েছে, ভারতবর্ষে মুসলমান হিন্দুর প্রতি ব্যবহারের যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তা বিচার করলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য শুধু অসম্ভব নয়—অনভিপ্রেত ও অবাঞ্ছিত। মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ ধর্ম অনুমোদিত, তাই তা অপরিবর্তনীয়, ভারত-বিভাগের পরবর্তী ৫০-বৎসরের ইতিহাস তার সাক্ষ্য। অতীত ও বর্তমান ভুলে মুসলমানের সঙ্গে মিত্রতা করার কোন কারণ হিন্দুর তরফে অন্তত ঘটেনি। তবে দূরদর্শী, বিদগ্ধ-বিচক্ষণ গান্ধী-নেহেরুর হিন্দুকে বিভ্রান্ত করে ও অজ্ঞ রেখে দেশ ও জাতির এতবড় সর্বনাশ করার কি কারণ?

---

1. R. C. Majumder–History of the Freedom Movement in India, Vol-III, P-662
2. Ibid, P-663

জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি। গ্যারিবল্ডি-ম্যাৎসিনি বহুধা-বিভক্ত ইতালীর ঐক্য আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। কায়েদ আজম জিন্নাকে অবশ্যই পাকিস্তানের স্রষ্টা বলা যায়। এদের কেহই জাতির জনক* আখ্যায় ভূষিত হননি।

কিন্তু তিন দশকের নিরলস প্রচেষ্টায় ভারত ভাগ করে গান্ধী হলেন "জাতির জনক"! লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হিন্দু জাতির কাছে এ উপাধি যেমন নিষ্ঠুর পরিহাস তেমনি তার তাৎপর্যও সুদূর প্রসারী। জাতি কি ভাবে, কি কি উপাদানে গঠিত হয়, তার সর্বজন স্বীকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ Lord Bryce. জনক তো তাকেই বলা যায় যিনি সৃষ্টি করেন। হিন্দু বা ভারতীয় জাতি বিশ্বের প্রাচীনতম। গান্ধীকে "জাতির জনক" আখ্যা দেওয়ার অর্থ হল—১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট গান্ধী এ "জাতিকে" সৃষ্টি করেছেন। এ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই অতীতের সঙ্গে সকল বন্ধন ছিন্ন করে "জাতীয়তাবাদের" কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ করা যাবে। এ পরিকল্পনা সফল হয়েছে। মাত্র কয়েক লক্ষ মানুষ নিয়ে ক্ষুদ্রতম যে জাতি, তারও আছে একটি রাষ্ট্র। কিন্তু বিশ্বের প্রাচীনতম জাতি শতকোটি হিন্দুর কোন রাষ্ট্র নেই। বর্তমান পৃথিবীতে জাতীয়তাবাদহীন যদি কোন রাষ্ট্র থাকে, তবে তা এই ভারত যুক্তরাষ্ট্র।

---

* পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনে যার অবদান সর্বাধিক—তিনি হলেন গান্ধী। প্রকৃতপক্ষে "পাকিস্তানের জনক" এই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান তাঁরই প্রাপ্য।

গণহত্যা—পশ্চিম পাকিস্তান

কলকাতা ও নোয়াখালিতে মুসলমান নাটকের মহড়া (Reharsal) দিয়েছে মাত্র। নাটক মঞ্চস্থ করেছে দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে—পঃ পাঞ্জাবে। বিশ্বের ইতিহাসে এত বড় নরমেধ যজ্ঞ ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত হয়নি। ধর্মোন্মাদ সশস্ত্র মুসলমান। পাকিস্তানকে কাফেরশূন্য করে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা তাদের একমাত্র লক্ষ্য। আল্লাহ্‌র জয়ধ্বনি দিয়ে আল্লাহ্‌র নামে মত্ত উল্লাসে তারা মেতে ওঠে হত্যার মহোৎসবে। মানুষের অভিধানে এমন শব্দ আজও আবিষ্কৃত হয়নি যার দ্বারা সেই তাণ্ডবের পৈশাচিক দানবীয় বীভৎসতা আংশিক ভাবেও প্রকাশ করা যায়। অন্তিম পর্বের এই দাঙ্গার শুরু পঃ পাঞ্জাবের লাহোর শহরে। মার্চ-১৯৪৭। জনৈক শিখ মুসলিম লীগের পতাকা ছিঁড়ে ফেলে। ধ্বনি দেয় পাকিস্তান মুর্দাবাদ, পাকিস্তান ধ্বংস হোক। মুসলমান এইরকম একটি উপলক্ষের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। হিংস্র নেকড়ের ন্যায় তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে শিখ মহল্লার ওপর। সমগ্র এলাকা পরিণত হয় এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে। নিহত হয় ৩০০০ মানুষ। অধিকাংশই শিখ। যতদূর দৃষ্টি যায়—সারি সারি মৃতদেহ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর নর্দান কমান্ডের সৈন্যধ্যক্ষ Lt. General Frank Messervy হেলিকপ্টারে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন কালে সে দৃশ্য দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলেন।" (A first wave of violence had erupted early in March after a Sikh leader had hacked down a pole flying the Muslim League banner with a cry of "Pakistan Murdabad"—"Death to Pakistan". The Moslems had given his challenge a swift and bloody reply. Over 3000 people, most of them Sikhs, had died in the clashes that had followed. Flying over a series of Sikh villages devastated by Moslem vigilantes, Lt. Gen. Frank Messervy, commander-in-chief of the Indian Army's Northern Command, had been horrified by the rows upon rows of murdered Sikhs.)[1]

---

1. Collins and Lapierre—Freedom at Midnight, P-188

সমগ্র পঃ পাঞ্জাব পরিণত হল এক বিরাট কসাইখানায়। হিন্দু-শিখ, যারা পালাতে পেরেছে তারাই পাড়ি দিয়েছে হিন্দুস্থানে। পায়ে হেঁটে অথবা ট্রেনে। ইংরেজ ঐতিহাসিক Leonard Mosley-র বর্ণনায় মানব ইতিহাসের বৃহত্তম দেশান্তর যাত্রা। লক্ষ লক্ষ মানুষ হেঁটে চলেছে। মাইলের পর মাইল শুধু মানুষের অন্তহীন সারি। এই রকম একটি দলে ছিল ৮,০০,০০০ উদ্বাস্তু। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পবন্ত সিং তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন—"চারিদিকে গ্রামগুলি জ্বলছে। পিঁপড়ের সারির মত চলেছে মানুষের স্রোত।" অন্য এক পাইলটের অভিজ্ঞতা ঃ "ঘণ্টায় ২৫০ মাঃ গতিতে হেলিকপ্টার ১৫ মিঃ চালিয়েও দলের শেষ প্রান্ত দেখতে পেলাম না।" (One pilot Flight-Lt. Patwant Singh, would always remember "Whole ant-like herds of human beings walking over open country spread out like cattle in the cattle drives of the Westerns I'd seen, slipping in droves past the fires of the villages burning all around them". Another remembered flying for over fifteen breathtaking minutes at 200 m.p.h. without reaching the end of one column.)[1] ব্রিটিশ ঐতিহাসিক Leonard Mosley 74 মাঃ দীর্ঘ এইরকম একটি হিন্দু-শিখ উদ্বাস্তু দলের উল্লেখ করেছেন। (One convoy of Sikhs and Hindus from West Punjab was 74 miles long...)[2] সর্বস্ব হারিয়ে তারা চলেছে। অসহায় ভীত, সন্ত্রস্ত, ক্ষুধার্ত, আহত, মুমূর্ষু—মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। প্রিয়জন হারিয়ে শোকে-দুঃখে মুহ্যমান, বুকে জমাট বাঁধা ব্যথা—কিন্তু শুকিয়ে গেছে অশ্রুর উৎস! সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য..."বৃদ্ধা মা ছেলের কাঁধে—স্বামীর কাঁধে পঙ্গু রুগ্ন স্ত্রী, শিশু মায়ের কোলে। গর্ভবতী স্ত্রী স্বামীর কাঁধে ভর দিয়ে চলেছে। দিনের পর দিন। বড় দীর্ঘ পথ—শতাধিক মাইল। এই দীর্ঘ দুর্গম পথের পাথেয়? ক্ষুধায় একখানি চাপাটি—তৃষ্ণায় এক চুমুক জল—অনেকের ভাগ্যে তাও জোটেনি, লাহোর থেকে অমৃতসর ৪৫ মাঃ দীর্ঘ এই পথের দুপাশে যেন কবরখানা, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি মৃতদেহ। তারা হয় নিহত অথবা রোগে মৃত। চলছে শকুনি-গৃধিনী, শিয়াল-কুকুরের মহোৎসব। কুকুরের তো নরমাংসে অরুচি হয়েছে—লিভার ছাড়া অন্য কিছু খায় না। (Men carried invalid wives and mothers on their shoulders, women their infants, they had to endure their burden not for a mile or two but for a hundred, two hundred miles for days on end with nothing to nourish their strength but a chapati and a few sips of water...The

1. Collins and Lapierre—Freedom at Midnight, P-320
2. Leonard Mosley—The Last Days of The British Raj, P-280

forty five miles of road side from Lahore to Amritsar, along which so many passed...every yard of the way, there was a body, some butchered, some died of cholera. The vultures had become so bloated by their feasts—they could no longer fly, and the wild dogs so demanding in their taste they ate only the livers of the corpses littering the road.)[1] ওই রাস্তার পাকিস্তান অংশে মুসলমান লুটেরা ও জল্লাদের দল ওঁৎ পেতে আছে রাস্তার ধারে। সুযোগ পেলেই দলবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে হতভাগ্যদের ওপর। হত্যা করে লুট করছে তাদের শেষ সম্বলটুকু।

হাজার হাজার মানুষ পালিয়ে এসেছে ট্রেনে। পঃ পাঞ্জাবের প্রতিটি স্টেশন তখন জনারণ্য। "কিন্তু হিন্দু স্কুল মাস্টার ভগবির আর সে সৌভাগ্য হল না। স্ত্রী ও দুটি সন্তান নিয়ে ছ'ঘণ্টা ধরে ট্রেনে বসে আছে। ট্রেন ছাড়ছে না। অবশেষে শুধু ইঞ্জিনটি চলে গেল। হতভাগ্যদের নিয়ে কয়েকটি বগি পড়ে রইল প্ল্যাটফর্মে। তারা শঙ্কিত। চারিদিকে এক অস্বাভাবিক নীরবতা। সহসা এক উন্মত্ত সশস্ত্র মুসলিম জনতা আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি দিয়ে আক্রমণ করে ট্রেনটি। নির্বিচারে চলে হত্যা। কাউকে বা ছুঁড়ে ফেলে দেয় প্ল্যাটফরমে। ঘাতকরা তো প্রস্তুত হয়েই আছে। অনেকে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সবুজ সার্ট পরা মুসলিম বাহিনী তাদের ধরে হত্যা করে। তারপর সেই মৃত-অর্ধমৃতদের ফেলে দেয় স্টেশনের সামনেই একটি কুয়োয়। স্কুল মাস্টার , তার স্ত্রী ও সন্তানগণ একে অপরকে জাপটে ধরে আছে। গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে জল্লাদ বাহিনী। আমার স্বামী ও একমাত্র পুত্র গুলিবদ্ধ হল—বলছেন তার স্ত্রী। ছেলে জল জল বলে কাঁদছে, আমি চিৎকার করে সাহায্যের আবেদন করলাম—কিন্তু কেউ এল না। ধীরে-ধীরে তার চোখ বুজে এল। চিরতরে বন্ধ হল কান্না। স্বামী যেন বোবা হয়ে গেছে—মাথা দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। হঠাৎ জোরে দু পায়ে ঝাঁকি দিলেন—তারপর লুটিয়ে পড়লেন—নীরব-নীথর। মেয়েরা আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে। আক্রমণকারীরা আমাদের বাইরে ফেলে দেয়। তুলে নেয় বড় তিন মেয়েকে। বড় মেয়েটির মাথায় আঘাত করা হল। সে 'মা মা' বলে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়...। কিছুক্ষণ পরে ওরা আমার স্বামী ও ছেলের মৃতদেহ ওই কূয়োয় ফেলে দিল। সেই ট্রেনের প্রায় ২০০০ যাত্রীর মধ্যে মাত্র ১০০ জন কোনক্রমে বেঁচেছিল।"[২]

"কাশ্মীরী লাল ট্রেনে চেপে আসছিল ভারতে। সীমান্ত তখনও ১৪ মাঃ দূরে। ট্রেনটি চলছিল খুব ধীরে। এক বগীতে অনেক হিন্দু নারী দেখে একদল মুসলমান লাফিয়ে

1 Collins and Lapierre—Freedon at Midnight, P-320-322
2 Collins and Lapierre—Freedon at Midnight, P-298-299

ট্রেনে ওঠে। ছিনিয়ে নেয় তাদের গহনা। ৬/৭ জন মুসলমান যুবতী মেয়েদের ফেলে দেয় ট্রেন থেকে—তারপর লাফিয়ে পড়ে তাদের উপর। ভয়ে অন্য যাত্রীরা চলে এল কাশ্মীরী লালের কামরায়। পেছন পেছন এল ঘাতকের দল। এবার হত্যা পর্ব। দু'খানি ছোরা কাশ্মীরী লালের পেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। লুটিয়ে পড়ে সে মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গায়ের ওপর পড়ল আর কয়েকটি দেহ। জ্ঞান হারাবার আগে তিনি অনুভব করেন কেউ তাঁর পা থেকে জুতো খুলে নিচ্ছে। পাশের কামরায় ছিল ধনীরাম। তাঁর স্ত্রী ও চাব সন্তান। আক্রমণের টের পেয়েই তাঁরা ঝাঁপ দেয় মেঝেতে। পলকের মধ্যে চাপা পড়ে তারা মৃত-অর্ধমৃতদের স্তূপে। রক্তের স্রোত বইছে। ধনীরাম আঁচলা ভরে সেই রক্ত মাখিয়ে নেয় নিজেদের মুখে জামা-কাপড়ে। জল্লাদরা তাদের মৃত মনে করে চলে যায়।"[1]

পেশোয়ার। উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী। এক ব্যাটালিয়ন হিন্দু-শিখ সৈন্য ভারতে আসার অপেক্ষায়। ব্যারাকে একজন শিখ সৈনিক তার রাইফেল পরিষ্কার করছিল। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল মুসলিম সৈন্য নিয়ে মিলিটারি লরী। হঠাৎই শিখ সৈনিকটির রাইফেল থেকে একটি গুলি বেরিয়ে যায়। লাগে মিলিটারি লরীর গায়ে। মুসলিম সৈন্যরা ভাবল তাঁদের লক্ষ্য করেই গুলি ছোঁড়া হয়েছে। তারা গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে পাল্টা গুলি বর্ষণ শুরু করে। খবর গেল Brig. G.R.Morris-এর কাছে। ছুটে এলেন তিনি। বন্ধ হল গোলা-গুলি। "কিন্তু বন্ধ হয় না গুজব। রটে গেল যে শিখ-সৈন্যরা মুসলমানদের হত্যা করছে। হাজার হাজার বন্দুকধারী পাঠান বাসে, ট্রাকে, টোঙ্গা ও ঘোড়ায় চেপে এল পেশোয়ার। মাত্র ৭দিনে নিহত হয় ১০ হাজার হিন্দু-শিখ। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে গোটা রাজ্য জুড়ে।" (...the rumour that Sikh soldiers were killing their Moslem Comrades swept the tribal areas...Pathan tribesmen swept into the city in trucks, buses, tonga carts, on horseback. This time, however, they came not to demonstrate but to murder.

And murder they did. Ten thousands lives would be lost in barely a week...Inevitably, in its wake similar outbursts swept the frontier province.)[2]

অমৃতসর রেল স্টেশন। পঃ পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের দখলে। গোটা স্টেশন চত্বর জুড়ে মানুষ থিক্ থিক্ করছে। দাঙ্গায় সব বিচ্ছিন্ন। স্বামী-স্ত্রী, মা-ছেলে, ভাই-বোন যে যেমন ভাবে পেরেছে—চলে এসেছে ভারতে। তাই পাকিস্তান থেকে

1. Ibid, P-299-300
2. Ibid, P-329

ট্রেন এলেই শুরু হত হুড়োহুড়ি, চিৎকার—কোলাহল। চিৎকার করে হারানো আপন জনকে ডাকছে—খুঁজছে তন্ন-তন্ন করে প্রতিটি কামরা।

১৫ আগস্ট—৪৭। সারা ভারতে উদ্‌যাপিত হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস। নেহেরুর অভিষেক। সকলে ব্যস্ত তার আয়োজনে। সেই ঐতিহাসিক দিনের-ই অন্য এক দৃশ্য। অমৃতসর রেল স্টেশন। পাকিস্তান থেকে ডাউন ১০নং এক্সপ্রেস ট্রেন আসছে। স্টেশন মাস্টার চানি সিং অনেক কসরৎ করে মানুষের ভিড় ঠেলে প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন ইঞ্জিনে ড্রাইভারের পাশে ৪ জন সশস্ত্র প্রহরী। তিনি শঙ্কিত হলেন। নিশ্চয়ই ভয়ংকর কিছু একটা ঘটেছে। একটা ভীতিজনক অথচ রহস্যময় ভূতুড়ে নীরবতা। সহস্র উৎকণ্ঠিত জনতা যেন ভয়ে পাথর হয়ে গেছে। স্টেশন মাস্টার গাড়ির ৮-টি কামরার দিকে একবার তাকালেন। সমস্ত কামরার দরজা বন্ধ—জানালা খোলা। একজন লোকও নামছে না। তবে কি...। "চানি সিং প্রথম কামরার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। আঁতকে উঠলেন। একি! এ যে শুধু শবদেহ। কামরার মেঝেতে খণ্ড-বিখণ্ড মানুষের দেহ। গলা কাটা, মাথার খুলি থেঁতলানো, হাত, পা, ধড় ইতস্তত ছড়ানো। হঠাৎ এক কোণ থেকে গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন "তোমরা এখন অমৃতসরে। আমরা হিন্দু-শিখ। পুলিশ আছে। ভয় কর না।" তার কথা শুনে দুই একটি শব যেন নড়ে উঠল। কিন্তু তার পর যা দেখলেন, নিশীথের বিভীষিকার মত চিরদিন তাঁর অন্তরে গাঁথা হয়ে থাকবে। চাপ চাপ জমাটবাঁধা রক্ত। এক মহিলা তার মধ্য হতে তাঁর স্বামীর ছিন্ন মুণ্ডটি নিয়ে উন্মাদের ন্যায় চিৎকার করে উঠল। শিশুরা মৃত মা বাবার দেহ জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদছে। স্টেশন মাস্টার সেই রাশিকৃত মৃতদেহের মধ্য দিয়েই পেছনের দিকে চললেন। প্রতিটি কামরায় এই দৃশ্য...। শেষ কামরায় সাদা রঙে বড় বড় হরফে লেখা—"নেহেরু ও প্যাটেলকে আমাদের স্বাধীনতার উপহার এই ট্রেনটি।" (...The Station Master strode to the first carriage, snatched open the door and stepped inside. In one horrible instant he understood why no one was getting off the 10-Dn Express in Amritsar that night. It was not a train full of phantoms they'd brought to him, it was a train full of corpses. The floor of the compartment before him was a tangled jumble of human bodies, throats cut, skulls smashed, bowls eviscerated. Arms, legs, trunks of bodies were strewn along the corridors of compartments. From somewhere in that ghastly human junk-heap at his feet, Singh heard a sound of strangled—gargling. Realizing that there might be

a few survivors, Singh called out : "You are in Amritsar, we are Hindus and Sikhs here. The police are present. Do not be afraid."

At his words a few of the dead began to stir. The stark horror of the scenes that followed would be forever a night mare engraved upon the Station Master's mind. One woman picked her husband's severed head from the coagulating pool of blood by her side. She clutched it in her arms shrieking her grief. He saw weeping children clinging to the bodies of their slaughtered mothers,...

Numb, the Station Master made his way down the line of bodies. In every compartment of every carriage the sight was the same....He turned to look back at the train. As he did, he saw in great white washed letters on the flank of the last car, the assassins calling card, "This train is our independence gift to Nehru and Patel it reads.)[1] তাঁদের সৃষ্ট পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতার এই উপহার পেয়ে নেহেরু প্যাটেলদের রাতের ঘুম বিঘ্নিত হয়েছিল কিনা—ইতিহাস সে সম্বন্ধে নীরব!

৭১২ খ্রীঃ সিন্ধু-রাজ দাহির মহিষী রাণী বাই পুর-ললনাদের নিয়ে প্রথম "জহরব্রত" অনুষ্ঠান করেন। সেইদিন থেকে নারীত্বের মর্যাদা রক্ষায় "জহর ব্রতই" হল ভারতীয় নারীর শেষ অস্ত্র। পঃ পাকিস্তানে হিন্দু-শিখ বিরোধী জেহাদে হাজার হাজার হিন্দু-শিখ নারী পালন করে জহরব্রত। সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আত্মহুতি দেয় প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে। অথবা অন্যভাবে করে আত্মহত্যা।

কুলদীপ সিং। বয়স ১৪। বাড়ি লাহোরের উত্তরে একটি গ্রামে। গ্রামে ৬০০ মুসলমান ও মাত্র ৫০ জন হিন্দু-শিখের বাস। একদিন প্রতিবেশী মুসলমানেরা তাদের পাড়ায় এসে স্লোগান দেয়—"যদি বাঁচতে চাও, পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাও।" আত্মরক্ষার জন্য তারা প্রতিপত্তিশালী এক শিখের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। "মুসলমান বাড়ি আক্রমণ করে। তাদের হাতে তলোয়ার, ছোরা, লম্বা লোহার রড—তার মাথায় কেরোসিনে ভেজানো কাপড় বাঁধা। আমরা উপর থেকে ইট ও পাথর ছুঁড়ে মারি। ওরা বাড়ি ঘিরে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। একজন শিখকে ধরে তার দাড়িতে দেয় আগুন লাগিয়ে। সেই অবস্থায়ও সে একজন মুসলমানকে মেরে গুরু নানকদেবের নাম নিয়ে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। ওরা বাড়িতে ঢোকে; এক এক জনকে বাইরে নিয়ে এসে হত্যা করে। ভয়ে আমি ছাদে উঠে যাই। মহিলারা সব সেখানে জড়ো হয়েছে। তারা সব দেখছিল। তারা

1. Collins & Lapierre–Freedom At Midnight, P-272

জানে এরপর তাদের পালা—ঘটবে চরম লাঞ্ছনা। অনেকের কোলে ছিল শিশু সন্তান। ছাদে তারা জ্বালায় বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড। শেষবারের মত শিশুকে খাওয়ায় মাতৃস্তন্য। প্রথমে সেই অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে দেয় আপন সন্তানে—তারপর নিজেরা ঝাঁপ দিয়ে পালন করে "জহরব্রত" (...Kuldip Singh was a 14 year old boy,....one of fifty Hindus and Sikhs in a village of six hundred Moslems north of Lahore...one day their Moslem neighbours surrounded their quarter shouthing "Leave Pakistan or we will kill you."They fled to the home of the most important Sikh in the village. "The Moslems came with swords, knives, long irom pikes with kerosene clothes tied on them to burn us. We threw bricks and stones at them, but they were able to set fire to our house. They caught hold of one Sikh and set fire to his beard. Even though his beard was burning, he still killed one Moslem by throwing a big brick at his head. Then he fell down dead uttering the name of the Sikh Guru. They dragged the men outside and killed them in the streets. I ran to the roof. The women were there watching. They knew they would be captured and raped. Some of them had babies in their arms. They made a big fire on the roof. They fed their babies their breast milk, crying of the fate overtaking them. Then they threw the babies in the fire and jumpd in after them.)[1]

১৯৪৭ সালের দাঙ্গায় পঃ পাকিস্তানে যেমন লক্ষ লক্ষ হিন্দু নিহত হয়, তেমনি লক্ষ লক্ষ হিন্দু-নারী হয় অপহৃতা ও ধর্ষিতা (এদের পরে ইসলামে দীক্ষা দেওয়া হয়) , লক্ষ হিন্দুকে করা হয় ধর্মান্তরিত। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী ঃ লায়ালপুরের বাঘ দাস। পেশায় কৃষক। তিনশ হিন্দুর সঙ্গে তাকে নিয়ে যাওয়া হল মসজিদে। পাশেই পুকুর। সকলে হাত-পা ধুয়ে নিল। মসজিদের ভেতরে তাদের বসতে বলা হল। এলেন মৌলবী। কোরান থেকে পাঠ করলেন কয়েকটি আয়াত। তারপর তিনি বললেন—"এবার তোমাদের সামনে দুটি পথ আছে। হয় মুসলমান হয়ে জীবনকে উপভোগ কর অথবা নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।" আমরা ইসলামকেই বরণ করলাম—বাঘ দাসের অকপট স্বীকৃতি। অতঃপর প্রত্যেকের একটি করে ইসলামিক নাম দেওয়া হল। পাঠ করানো হল কোরানের একটি আয়াত। মসজিদ চত্বরে বিশাল কড়াইতে রান্না হচ্ছিল গো-মাংস। সকলকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল—খেতে দেওয়া হল এক টুকরো করে

1. Ibid, P-289

গো-মাংস। বাঘ দাস নিরামিশাসী। পেট গুলিয়ে তাঁর বমি আসে। চেপে রাখে অনেক কষ্টে। কারণ তা না হলে মৃত্যু অবধারিত। তাঁর পাশেই ছিল এক ব্রাহ্মণ। তিনি মুসলমানদের বললেন—"এ বড় শুভ উৎসব। আপনারা অনুমতি দিন, স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে বাড়ি গিয়ে বিয়েতে যৌতুক পাওয়া সুন্দর প্লেট ও কাঁটাচামচ নিয়ে আসি। মুসলমানরা খুশি হয়ে সম্মত হল। ব্রাহ্মণের বাড়িতে একখানি ছোরা ছিল। সে প্রথমে স্ত্রী, পরে তিন সন্তানের এবং সর্বশেষে আপন বক্ষে আমূল বিঁধিয়ে দিল শাণিত ছুরিকা। (Bagh Das, a Hindu farmer in a hamlet west of Lyallpur, was marched with three hundred fellow Hindus to a mosque set by a small pond in a neighbouring village. Their feet were washed in the pond, then they were herded into the mosque and ordered to sit cross-legged on the floor. The maulavi read a few verses of the Koran. "Now" he told them, "You have the choice of becoming Moslems and living happily or being killed."

"We preferred the former" acknowledged Das. Each convert was given a new Moslem name and made to recite a verse from the Koran. Then they were herded into the mosque's courtyard where a cow was roasting. One by one the Hindus were made to eat a piece of its flesh. Das, a vegetarian until that instant "had a vomiting sensation," but he controlled it because, he thought 'I will be killd if I do not obey their command."

His neighbour, a Brahmin, asked permission to take his wife and three children back to his hut to get his special wedding plates and forks in view of the importance of the moment. Flattered, his Moslem captors agreed. The brahmin had a knife hidden in his house, Das remembered. When he got home, he took it from his hiding place. He cut his wife's throat, then the throat of his three children. Then he stabbed his own heart.[1] পঃ পাকিস্তান জুড়ে এই হিন্দু-হত্যায় পাক-পুলিশ ও সেনাবাহিনী শুধু সহায়তাই করেনি—তারা প্রত্যক্ষভাবে অংশও নিয়েছে।

শেকপুরা। লাহোরের উত্তরে একটি বাণিজ্য শহর। সেখানে ছিল ব্যাঙ্কার্সদের এক বিরাট Go-down। শহরের সকল হিন্দু-শিখকে সেই গোডাউনে জড়ো করা হয়।

1. Collins and Lapierre—Freedon at Midnight, P-287-288

গোডাউনের দরওয়াজা তো একটিই। সেই পথে প্রবেশ করে পাক-পুলিশ ও প্রাক্তন ফৌজিদের একটি দল। হাতে তাদের মেসিনগান। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে সকলকে হত্যা করা হয়। জীবিত একজনও ছিল না। (In Sheikhpura, a trading town north of Lahore, the entire Sikh and Hindu community was herded into an enormous Go-down...once inside, the helpless Hindus were machine gunned by Muslim police and army deserters. There were no survivors.)[1]

মাউন্টব্যাটেন ও নেহেরু

ভারত ভাগ করে নেহেরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী। জলস্রোতের মত আসছে উদ্বাস্তু স্রোত—বিরামবিহীন। পাকিস্তানের পৈশাচিক দাঙ্গার কাহিনি প্রকাশিত হয়। দেখা দেয় দিল্লিতে উত্তেজনা। নেহেরু ভীত হলেন। প্রমাদ গুনলেন। গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন সিমলায়। নেহেরুর কাতর অনুনয়ে তিনি রাজধানীতে ফিরে এলেন। ছুটে গেলেন নেহেরু ও প্যাটেল। একান্ত বাধ্য ছাত্রের ন্যায় তাকালেন মাউন্টব্যাটেনের দিকে। (...like a pair of chastened school boys) বড় অসহায় দৃষ্টি...। নেহেরু বললেন, অবস্থা অগ্নিগর্ভ। "আমরা জানি না কীভাবে সামলাব।" মাউন্টব্যাটেন বললেন, "তোমাদেরই সামলাতে হবে।" নেহেরু মাউন্টব্যাটেনের গুণমুগ্ধ! তিনি মিনতি করে বললেন, 'আমাদের অভিজ্ঞতা নেই।...আপনি অভিজ্ঞ দক্ষ প্রশাসক, রণক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ সৈন্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা আপনার আছে। তাছাড়া আপনারা ইংরেজ, সারাজীবন আমাদের শাসন করেছেন—আজ এভাবে ছেড়ে যেতে পারেন না। গভীর সংকট। আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। আপনি কি দায়িত্ব নিতে পারেন না?"

মাউন্টব্যাটেন বললেন, "যদি কেউ কখনও জানতে পারে যে দেশের শাসন ক্ষমতা তোমরা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছ—তবে তোমাদের রাজনৈতিক জীবনের সেখানেই ইতি..."। নেহেরু বললেন, "সে ব্যাপারটি আমরা দেখছি...কিন্তু আপনি দায়িত্ব না নিলে আমরা নিরুপায়।"...অতঃপর মাউন্টব্যাটেন সম্মত হলেন। তিনি বললেন, ইমারজেন্সি কমিটি আমার মনোনীত লোকদের নিয়ে গঠিত হবে। নেহেরু বাধা দিয়ে বলেন, (শুধু কমিটি কেন) গোটা মন্ত্রিসভাই তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে পুনর্গঠিত করতে পারেন। স্থির হয় কমিটির সভায় প্রধানমন্ত্রী নেহেরু মাউন্টব্যাটেনের ডানে ও উপ-প্রধানমন্ত্রী মিঃ প্যাটেল বাঁ পাশে বসবেন। মাউন্টব্যাটেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনার ভান করবেন। তাঁরা বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানাবেন।...("We don't know

1. Ibid, P-287

how to hold it" Nehru admitted. "You have to grip it"—Mountbatten told him—"Ho can we grip it? Nehru replied. "We have no experience."..."You are a professional high level administrator. You've commanded millions of men...you English can't just turn this country over to us after being here all our lives and simply walk away. We're in an emergency and we need help. Will you run the country?"

"But this is terrible." Mountbatten said, "If any one ever finds out you've turned the contry back to my hands, you'll be finished politically..."Well, said Nehru, We'll have to find a way to disguise it, but if you don't do it, we can't manage"....'The Emergency committee', Mountbatten continued, must consist of the people I nominate, 'Oh, Protested Nehru, you can have the whole cabinet!'

'At the meetings Mountbatten continued', the Prime Minister will sit on my right and the Dy. Prime Minister on my left. I'll always go through the motions of consulting you, but whatever I say you're not to argue with me. We have't got time. I'll say : "I'm sure you'd wish me to do this, " and you will say "Yes please do.")[1] কি অসহায় আত্মসমর্পণ। আর জাতির সঙ্গে কি নির্লজ্জ প্রতারণা!

এখানেই শেষ নয়। মাত্র দিন-কয়েকের মধ্যেই মুসলমানদের সুরক্ষার জন্য ইংরেজের হাতেই ফিরিয়ে দেওয়া হল দেশের শাসনক্ষমতা (Executive Power). Collins এবং Lapierre- এর তাই তির্যক মন্তব্য—"তিন দশকের সংগ্রাম—কত ধর্মঘট-হরতাল, গণ আন্দোলন, বিলেতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব; সর্বোপরি মাত্র তিন সপ্তাহের স্বাধীনতার পর, ভারত-পুনরায় শাসন করছে একজন ইংরেজ" (After three decades of struggle, after years of strikes, mass movements, after all the bonfires of British clothes/ above all, after barely three weeks of independence, India was once again for one last moment being run by an Englishman.)[2]

শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেই মাউন্টব্যাটেন গঠন করেন Emergency Committee. কমিটির প্রথম অধিবেশন। মাউন্টব্যাটেন জারি করেন কঠোর নির্দেশ। ভারত থেকে মুসলমানদের নিয়ে পাকিস্তানগামী প্রতিটি ট্রেনে থাকবে সশস্ত্র প্রহরী। তা সত্ত্বেও যদি

1. Collins and Lapierre—Freedon at Midnight, P-314-316
2. Collins and Lapierre—Freedon at Midnight, P-316

কোন ট্রেন আক্রান্ত হয়—নিহত হয় মুসলমান যাত্রী—তবে ওই গাড়ীর রক্ষীদের গ্রেফতার করে (আহতদের বাদ দিয়ে) সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ কোর্টমার্শাল করে তাদের হত্যা করতে হবে। (...If the security guards on trains failed to open fire on their assailants, he had a solution to propose. Any time a train was successfully attacked, Mountbatten said, round up it's security guards. Sort out those that were wounded. Then court-Martial and shoot the rest on the spot.)[1]

মুসলমানের নিরাপত্তার জন্য সর্বপ্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হল। তবু পঃ পাকিস্তানে ব্যাপক ও নৃশংস নরহত্যার প্রতিক্রিয়ায় পূঃ পাঞ্জাবে দাঙ্গা ঠেকানো যায়নি। বহু মুসলমান নিহত হয় বর্বর নৃশংস আক্রমণে। দেশ ত্যাগ করে লক্ষ মুসলমান। কিন্তু এ দাঙ্গা পূঃ পাঞ্জাবেই সীমাবদ্ধ থাকে। হিন্দুর মানসিকতা ও কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য দিল্লি বা অন্যত্র তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। যদিও দিল্লিতে মুসলমানের আগ্রাসী মনোভাব ও প্রকাশ্য প্ররোচনা উত্তেজনা সৃষ্টি করে। পুরাতন দিল্লিতে মুসলমান শ্লোগান দেয়—"হাঁসকে লিয়া পাকিস্তান—লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান"। মসজিদে নামাজের সময় জনৈক মোল্লা মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয়—"মুসলমান শতশত বৎসর দিল্লি শাসন করেছে; আল্লার দোয়ায়, তারাই আবার শাসন করবে (...In their neighbourhoods in old Delhi, many Moslems were whispering a new slogan put out by the fanatics of the Muslim League : We got Pakistan by right—We 'll take Hindusthan by force. That morning, a Mullah in an Old Delhi mosque had reminded his faithful at prayers, that Moslems had ruled Delhi for centuries and 'Insha—Allah'-God willing, they would again.)[2]

১৯৪৭ সালে পঃ পাকিস্তানে দাঙ্গায় কত লোক নিহত হয়েছিল? সঠিক সংখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। দাঙ্গা হয়েছে গোটা পাকিস্তান জুড়ে—মার্চ মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মুসলমান নির্ভয়ে দাঙ্গা করেছে। পাকিস্তান সরকার হিন্দু-শিখদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থাই করেনি। প্রত্যাশিতভাবেই মুসলিম পুলিশ-মিলিটারি ছিল নীরব দর্শকের ভূমিকায়; কখনও বা সক্রিয়ভাবে অংশও নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে পঃ পাকিস্তানের ইংরেজ গভর্ণর Francis Mudie-র ৫ সেপ্টেম্বর জিন্নাকে লেখা চিঠিখানি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। "আমি সকলকেই বলছি শিখরা কিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যাবে—সে বিষয়ে আমি

1. Ibid, P-318
2. Ibid, P-254

বিন্দুমাত্র চিন্তিত নই। মূল সমস্যা হল কত শীঘ্র পাকিস্তান শিখদের হাত থেকে মুক্ত হতে পারে।" I am telling everyone that I don't care how the Sikhs get across the border; the great thing is to get rid of them as soon as possible.)[1] দাঙ্গায় হতাহত সম্পর্কে ভারত সরকার আশ্চর্যজনকভাবে নীরব! বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা ২৫-৩০ লক্ষ। দাঙ্গার ব্যাপকতা, ভয়াবহতা, পাক সরকারের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা (পরোক্ষ সহযোগিতা) ও ১৫০,০০,০০০ হিন্দু-শিখের দেশত্যাগের বিচারে এ সংখ্যা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয় না। বিচারপতি G.D. Klosla র মতে নিহত হয়েছে ৫,০০,০০০। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক Leonard Mosley তাঁর বিখ্যাত The Last Days of The British Raj গ্রন্থে লিখেছেন, "নিহত ৬,০০,০০০, অপহৃতা নারী ১,০০,০০০ (উভয় দেশ)। পঃ পাকিস্তান থেকে ১৪০,০০,০০০ হিন্দু-শিখ ভারতে আশ্রয় নেয়। পূর্ব পাকিস্তান (পূব বঙ্গ) থেকে আসে ১০,০০,০০০। ৫০ সালের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে আরও এক কোটিরও বেশি হিন্দু ভারতে আসে। পাকিস্তান কার্যতঃ হিন্দুশূন্য হয়। পক্ষান্তরে সাড়ে তিন কোটি মুসলমান ভারতে থেকে যায়। এই পরিসংখ্যান থেকেই উভয় সরকারের ভূমিকা ও দাঙ্গার হতাহত (হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির) সম্পর্কে একটি সম্যক চিত্র পাওয়া যায়। "

১৯৪৭ সালে পঃ পাকিস্তানে এবং তার পরে পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে তা দাঙ্গা নয়—নয় গণহত্যা (Genocide). Holocaust বললেও হয়তো সব বলা হল না। আকারে জার্মানীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনুষ্ঠিত Holocaust অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র হলেও প্রকৃতিতে শতগুণ ভয়ংকর।

---

1. Leonard Mosley—The Last Day of the British Raj, P-281

এই গণহত্যা কি অনিবার্য ছিল?

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের সৃষ্টি, মুসলিম লীগ গঠিত হয় ১৯০৬ সালে। ১৯২৪-২৫ সাল পর্যন্ত এই দুইদলের মধ্যে ছিল নিবিড় ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক* মনে হত দুটি দলেরই আদর্শ ও লক্ষ্য বোধ হয় এক। দুই দলের মধ্যে কার্যত কোন পার্থক্য ছিল না। খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা অথবা মুসলিম লীগ সভাপতি কংগ্রেসের সভাপতি রূপে নির্বাচিত হতেন। ১৯১৯ সালে মিঃ জিন্না কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই উভয় দলেরই সদস্য ছিলেন।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের নামে গান্ধীর মুসলিম তোষণ নীতি মুসলমানের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিকে ক্রমশ অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ছিলেন দুবর্লচিত্ত, দোদুল্যমান ও গান্ধীর বশংবদ। এরা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় নিজ নিজ কারণে গান্ধীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ১৯৩১ সালের ৮ আগস্ট এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত U.P.Muslim Conference এ মিঃ জিন্না বলেন ঃ গান্ধী মুসলমানের যে কোন দাবি মানতে প্রস্তুত। আমার অপরাধ হল, আমি হিন্দুদের বলি —Blank Cheque আমি চাই না। শুধু মুসলমানের ১৪ দফা দাবি মেনে নাও। (After all, Mr. Gandhi himself says that he is willing to give the Muslims whatever they want, and my only sin is that, I say to the Hindus give to the Muslims only 14 points, which is much less than the 'blank chaque' which Mr. Gandhi is willing to give.)[1]

মুসলিম লীগের অনমনীয় মনোভাব, ১৯৪৬ সালে কলকাতা—নোয়াখালিতে হিন্দুহত্যা, দেশের অন্যান্য অংশে সাম্প্রদায়িক অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি ভারত বিভাগকে অনিবার্য করে তোলে। কংগ্রেস নেতৃত্ব অসহায় দর্শকের ভূমিকায়। কিন্তু যে মূল প্রশ্নের সমাধান হয় না তা হল সংখ্যালঘু সমস্যা, পাকিস্তানের উভয় অংশ পরিত্যক্ত কয়েক

* কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দল। গান্ধী এক সময় বলেছিলেন—মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সব সময়ই ছিল;আজও আছে। স্বাধীনতার পর থেকে কেরালা ও সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের মিত্র দল।

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-321

কোটি হিন্দু-শিখের ভবিষ্যৎ; এবং ভারতে যে প্রায় ৩½ কোটি মুসলমান রয়ে গেল তাদের জাতীয়তা ও আনুগত্য।

একসময় ইওরোপে সংখ্যালঘু সমস্যা ছিল। অবশ্য ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সাংবিধানিক রক্ষাকবচের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হয়নি। বিভিন্ন রাষ্ট্র তখন এই সিদ্ধান্তে আসে যে, সংখ্যালঘু জনগণের বিনিময়ের মাধ্যমেই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। ভারত বিভক্ত হয়ে "পাকিস্তান" গঠিত হলে, যে কোটি কোটি হিন্দু পাকিস্তানের উভয় অংশে থেকে যাবে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে অনেকের ন্যায় ডঃ আম্বেদকরও ছিলেন খুব উদ্বিগ্ন। মুসলিম শাসনের ভয়াবহতা হতে হিন্দু-শিখদের রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি লোক বিনিময়ের প্রস্তাব করেন। কিন্তু কংগ্রেসের কাণ্ডজ্ঞানহীন নেতৃবৃন্দ বিদ্রূপের সঙ্গে সে প্রস্তাব বাতিল করেন। জবাবে ডঃ আম্বেদকর বলেন, যাঁরা উপহাস করছেন; তাঁদের তুরস্ক-গ্রীস-বুলগেরিয়ার সংখ্যালঘু সমস্যার ইতিহাস পড়া উচিত। এই সকল দেশ লোক বিনিময়ের মাধ্যমেই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে পেয়েছিল। কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। মোট ২ কোটি মানুষকে একদেশ হতে অন্যদেশে স্থানান্তরিত করতে হয়। (Those, who scoff at the idea of transfer of population, will do well to study the history of the minority problem, as it arose between Turkey, Greece and Bulgaria. If they do, they will find that these countries found that the only effective way of solving the minorities problem lay in exchange of population. The task undertaken by the three countries was by no means a minor operation. It involved the transfer of some 20 million people from one habitat to another.)[1]

তুরস্ক, গ্রীক ও বুলগেরিয়া—অতি ক্ষুদ্র দেশ। এদের মোট জনসংখ্যা হয়তো কয়েক কোটি মাত্র হবে। তারা যদি ২ কোটি মানুষকে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করতে পারে, তবে বিশাল ভারতবর্ষের পক্ষে মাত্র কয়েক কোটি হিন্দু-মুসলমানের বিনিময় কঠিন নয়।

লোক বিনিময় প্রসঙ্গে গান্ধীর প্রতিক্রিয়া ছিল প্রত্যাশিত। তিনি বলেন, "লোক বিনিময়ের কথা আমি ভাবতেই পারি না। আমি মনে করি উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব প্রস্তাব। যিনি যে প্রদেশেই থাকুন না কেন, হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন, অথবা অন্য কোন ধর্মে বিশ্বাসী হউন, তিনি ভারতবাসী'।[2] মুসলমান সহস্র কণ্ঠে সহস্রবার প্রকাশ্যে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, সে মুসলমান, ভারতীয় নয়। তার আনুগত্য ভারত নয়—

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches-Vol-8, P-115
2. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৭

পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান দেশগুলির প্রতি। এর পরও কেহ যদি বলেন যে, মুসলমান ভারতীয়, তবে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের ভাষায় "তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ আছে।"[1] মুসলমান যদি ভারতীয়-ই হবে তবে ভারত ভাগ করতে সে কৃতসংকল্প কেন? কিন্তু স্বৈরাচারী গান্ধী যুক্তি মানেন না—স্বীকার করেন না বাস্তব অবস্থা। গান্ধীর এই সিদ্ধান্ত যে কত অবাস্তব ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে —ভারত বিভাগের অর্ধ শতাব্দী পরেও ভারতে বসবাসকারী মুসলমানের আচরণ তাহাব চূড়ান্ত প্রমাণ। ডঃ আম্বেদকর এরূপ আশঙ্কাই করেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন ঃ যতক্ষণ তা (লোক বিনিময়) না হয়, ইহা স্বীকার করতেই হবে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু সমস্যা থেকে যাবে—এবং হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সৃষ্টি করবে অনৈক্য। (Until that is done, it must be admitted that even with the creation of Pakistan, the problem of majority vs minority will remain in Hindusthan, as before, and will continue to produce disharmony in the body polity of Hindusthan.)[2]

অনুরূপ আশঙ্কা ছিল মৌলানা আবুল কালাম আজাদেরও। তিনি বলেন, কংগ্রেস কিভাবে হিন্দু মুসলমান দুই জাতি—এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে দেশ বিভাগে সম্মত হতে পারে? সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকেই চিরস্থায়ী করবে। ঘৃণা-বিদ্বেষের ওপর ভিত্তি করে একবার দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলে, পরিস্থিতি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কিন্তু কেউ জানে না। (How could Congress ever agree to divide the country on the basis of Hindus and Muslims? Instead of removing communal fears, partition would perpetuate them by creating two States based on communal hatred. Once States based on hatred came into existence, nobody knew where the situation would lead.)[3]

পঃ পাঞ্জাবে দাঙ্গার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪৭ সালের ৮ মার্চ পাঞ্জাবকে বিভক্ত করার প্রস্তাব করে। কিন্তু ভাগ করলেই কি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে? মুসলমানের হিন্দু বিদ্বেষ ধর্ম অনুমোদিত ও অনুপ্রাণিত। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় কেরালার মালাবারে হিন্দুর ওপর মুসলমান যে নৃশংস অত্যাচার করে—গান্ধী তার সমর্থনে বলেন ঃ মোপলারা সাহসী, ধর্মভীরু, তারা ধর্মের জন্য ধর্ম নির্দেশিত পথেই

1. রমেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার ৪ খণ্ড পৃ. ৪৩৭
2. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches-Vol-8, P-117
3. Maulana Abul Kalam Azad—India Freedon, P-201

সংগ্রাম করেছে। বিষয়টির ব্যাখ্যা করে ডঃ আম্বেদকর বলেন ঃ বাস্তববাদীরা অবশ্যই স্মরণ রাখবেন, মুসলমানের দৃষ্টিতে হিন্দু কাফের। জীবনের সুরক্ষা নয়—বিনাশ যাদের বিধিলিপি। The realist must take note of the fact that the Musalmans look upon the Hindus as Kaffirs, who deserve more to be exterminated than protected.)[1]

মৌলানা আজাদের সঙ্গে আলোচনায় সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলেছেন, হিন্দু ও মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি। এ রূঢ় সত্যকে আমাদের স্বীকার করা উচিত। প্যাটেল বাস্তব সত্যকেই অসঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সমস্যা নির্ণয় করেও সমাধান সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভারত বিভক্ত হল—তবে লোক বিনিময় কেন হবে না? কেন ও কোন অধিকারে মুসলমান এদেশে থাকবে? এই মুসলমানরাই তো ছিল পাকিস্তান দাবির উগ্র সমর্থক। নির্বাচনে এদের ভোটেই তো মুসলীম লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিল। ১৯২৩ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে Pan-Islam-এর মুখ্য প্রবক্তা, খিলাফৎ আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক, গান্ধীর প্রিয় ভ্রাতা ও পার্শ্বচর মহম্মদ আলি বলেছিলেন ঃ ভারত বহির্ভূত (মুসলিম) দেশের প্রতি সহানুভূতি ও আনুগত্য ইসলামের সার তত্ত্বের অঙ্গ। (Extra Territorial loyalty is part of the quint essence of Islam)-এই আনুগত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, আফ্‌গানিস্তানের আমীর ভারত আক্রমণ করলে মুসলমান শুধু তাকে সমর্থন করতেই দায়বদ্ধ নয়—হিন্দুরা বিরোধিতা করলে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। মুসলমান যদি (মুসলিম দেশ বলে) তুরস্ক ও আফগাস্তিানের প্রতি অনুগত হয়—তবে পাকিস্তান সম্বন্ধে তার মনোভাব কী হবে? যে পাকিস্তান তার সৃষ্টি, তার স্বপ্নভূমি? এ প্রশ্ন কি আদর্শবাদীরা একবারও ভেবে দেখেছেন?

১৯৪৬ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বেই পাঞ্জাবে হিন্দু হত্যায় কংগ্রেসের অনেক নেতা হিন্দু-মুসলমান মিলনের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ হতাশ হয়েছিলেন, হয়তো বা ভীতও। মাউন্টব্যাটেন তাদের বোঝালেন—একবার ভাবুন তো কী সে শান্তি! মুসলমানদের যদি চিরতরে তাদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। (Think of the peace if the Muslims could be banished once and for all to their own country.)[2] সর্দার প্যাটেল এই যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত "মুসলমানদের হাত থেকে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি পেতে হবে। (Sarder Patel's determination to be rid of the Muslim once and for all)[3] দেশ

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches-Vol-8, P-97
2. Leonard Mosley—The Last Days of the British Raj, P-110
3. Ibid, P-114

বিভাগের পক্ষে এই সকল যুক্তি প্যাটেল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের ওপর হয়তো প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন কোথায়? দেশ বিভাগের পর ভারতে মুসলমানের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন কোটি। (In the Hindusthan State there will remain three and a half crores Muslims scattered in small minorities all over the land)[1] চীনের পর ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ। লোকসংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। চীন জন্ম হার নিয়ন্ত্রণ করেছে। ভারত পারেনি। তা সত্ত্বেও মুসলমানের দাবি মেনে তাদের পরিবার পরিকল্পনার বাইরে রাখা হয়েছে। দ্রুত বংশবৃদ্ধি ও বাংলা দেশ হতে ২ কোটি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান, সব মিলিয়ে ভারতে মুসলমানের সংখ্যা ১৫/২০ কোটি*। খুব সঙ্গত ভাবেই তাদের আনুগত্য পাকিস্তানের প্রতি। হিন্দুর কাছে মনে হবে এ দেশদ্রোহিতা। কিন্তু মুসলমান তা মনে করে না। সে বিশ্বাস করে না ভৌগোলিক/আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদে। তার জাতীয়তাবাদ হল মুসলিম জাতীয়তাবাদ। সে বিশ্বাস করে Pan-Islam-এ। তার স্বদেশ হল যে কোন মুসলমান দেশ।

মাউন্টব্যাটেনের পিতা Louis Attenberg ছিলেন জার্মান বংশোদ্ভূত। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ রয়াল নেভীর সুপ্রীম কমান্ডার। (First Lord of the Admiralty) কিন্তু জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে তাঁকে রাখা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়। তিনি হন পদচ্যুত।** (Mount Batten's father, Prince Louis Battenberg, was forced to resign as first Lord of the Admiralty during the great war because of his name and German Parentage.)[2] এই জন্যই Lord Mount Batten দ্রুত

* সঠিক সংখ্যা ভারত সরকার কখনও প্রকাশ করে না।

** দেশ বিভাগের সঙ্গে শুধু সংখ্যালঘু সমস্যা নয়—জড়িত আছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার জাপ-আমেরিকান (জাপানী বংশোদ্ভূত) নাগরিকের বাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পাল-হারবারে মার্কিন নৌ-ঘাঁটি আক্রমণ করে। যুদ্ধ ঘোষণা করে মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে। মার্কিন সরকার সকল জাপ-আমেরিকান নাগরিকদের অন্তরীণ অবস্থায় রাখে। তাদের ওপর গোয়েন্দাদের ছিল তীক্ষ্ণ নজরদারি।

শতবর্ষপূর্বে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের রাজত্বকালে জার্মানীর এক জনগোষ্ঠী রাশিয়ার ইউক্রেন অঞ্চলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ভল্গা জার্মান নামে পরিচিত এরা সকলেই গ্রহণ করে রাশিয়ার নাগরিকত্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করলে এদের কেহ কেহ হয়তো নাৎসী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেই অপরাধে স্ট্যালিন সকলকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করেন।

রাষ্ট্রীয় বিষয়ে (রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যে) নাগরিকত্ব নয়—জাতীয়তা বোধই মূল নিয়ামক। যে কেহ ইংল্যান্ডের নাগরিক হতে পারে—পারে না ইংরেজ হতে।

1. Maulana A. K. Azad—India Wins Freedom, P-151
2. Leonard Mosley—The Last Days of the British Raj, P-117

ক্ষমতা হস্তান্তর করে স্বদেশে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্য তাঁর রয়াল নেভীর সর্বোচ্চ পদ। ভারতের ১৫/২০ কোটি মুসলমান কি জাতীয় নিরাপত্তার সহায়ক? আজ সারা ভারতবর্ষ I.S.I'র (Inter Service Intelligence—পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ) অবাধ লীলাভূমি ও পৃথিবীর বিভিন্ন জেহাদী গোষ্ঠীর নিরাপদ স্বর্গ। হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা—ভারতের সর্বত্র হিন্দু আজ ইসলামিক বোমার আতঙ্কে ত্রস্ত শঙ্কিত। হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলমানের পাকিস্তান দাবি। কিন্তু দাবি করেনি লোক বিনিময়। তারা দূরদর্শী, বিচক্ষণ। ৩½ কোটি মুসলমান ভারতে থেকে গেলে যে আর একটি "পাকিস্তান" পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল—তারা তা বুঝতে পেরেছিল। হিংসা-বিদ্বেষ মুসলমান রাজনীতির অঙ্গ। কাশ্মীরে বিগত ৬০ বৎসর ধরে চলছে জেহাদ। কাশ্মীর উপত্যকা আজ হিন্দুশূন্য। তিনলক্ষ হিন্দু স্বদেশে পরবাসী; উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ত্রাণ শিবিরে। বিশ্ব ইতিহাসে এও এক নতুন নজির।

গান্ধী-নেহেরু বাস্তববাদী নন—আদর্শবাদী। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ অপেক্ষাও উচ্চতর সে আদর্শ। তাই ভারত বিভাগকারী মুসলমানকে ভারতীয় বলতে তাঁদের দ্বিধা হয় না। মুসলমানের প্রীতিভাজন হওয়ার আশায় হিন্দুকে হেয়, অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করতে তাদের কোন সঙ্কোচ বোধ হয় না। স্বাধীনতার পর মুসলিম তোষণ ও হিন্দু বিরোধিতা নতুন মাত্রা পায়। ইতিহাসের বিকৃতি পূর্বেই শুরু হয়েছিল, এবার তাহা সর্বাত্মক রূপ ধারণ করে। ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদ* (ICHR-Indian Council of Historical Research) মার্কসবাদীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্কুলপাঠ্য বইয়ে লেখা হল—২০০ বৎসরের পরাধীনতার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। এর নির্গলিতার্থ হল মুসলিম শাসনে ভারত পরাধীন ছিল না। মুসলিম বিদেশী নয়—তারাও ভারতীয়। মার্কসবাদী ইতিহাস লেখকগণ মুসলিম শাসনে অত্যাচারিত হিন্দুর ছিদ্রান্বেষণে তৎপর; কিন্তু অত্যাচারী মুসলিম শাসকের নিন্দায় রুদ্ধ কণ্ঠ।

---

* মার্কসবাদীরা আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী। আদর্শগতভাবে তারা জাতীয়তা-বিরোধী। বিজাতীয় ভাবধারায় দীক্ষিত; দেশের সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি তাদের নেই কোন শ্রদ্ধা। লক্ষণীয় ঃ ভারত বিভাগ থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত মুসলীম লীগ ও কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কংগ্রেসের রয়েছে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্ক। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কম্যুনিস্টদের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ কম্যুনিস্ট নেতা হীরেন মুখার্জীকে রাষ্ট্রীয় সম্মান পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই কম্যুনিস্টদের ওপর-ই অর্পিত হয় ভারতের জাতীয় ইতিহাস লেখার গুরু দায়িত্ব। গান্ধীবাদী নেহেরুকে অনেকেই মনে করেন ছদ্ম কম্যুনিস্ট। কম্যুনিস্টদের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। নেহেরু ও তাঁর পরবর্তী কংগ্রেস হাইকমান্ড ও মন্ত্রীসভায় কম্যুনিস্টদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও সাংস্কৃতিক নীতি প্রকৃত পক্ষে কম্যুনিস্টদের দ্বারা নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জোটনিরপেক্ষ ভারত-রুশ জোটভুক্ত হয় এই কম্যুনিস্টদের প্রভাবেই।

হিন্দুর বিরুদ্ধে নেহেরু কংগ্রেসের নতুন এক অস্ত্র হল Secularism*, ভারতীয় ভাষায় যার নাম ধর্মনিরপেক্ষতা। ইংরেজ আমলের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের নবতর সংস্করণ। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে ধর্ম নিরপেক্ষতা হল জাতির বেদমন্ত্র, রাষ্ট্রের আদর্শ। জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারঘাত করে শুরু হয় জাতীয় সংহতির জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ।

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যদি হয় সর্বধর্ম সমভাব অথবা পরমতের (রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয়) প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা, তবে সকল সভ্য গণতান্ত্রিক দেশই ধর্মনিরপেক্ষ। আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে এশিয়া-আফ্রিকার, লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস—যাদের ধর্ম ও জাতি বিভিন্ন। স্বাধীনভাবে তারা নিজ নিজ ধর্মাচরণ করে। ভারতের ন্যায় পাশ্চাত্যে রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কদের ধর্মনিরপেক্ষতার নামে প্রত্যহ শপথ নিতে

* Secularism-এর অর্থ হল—পার্থিব, জাগতিক, পবিত্র কিছু নয়; ধর্ম শিক্ষা ও বিশ্বাসের বিরোধী, এক কথায় নাস্তিক্যবাদ —wordly, not sacred, not eccleciastical, temporal, sceptical of religious truth, opposed to religious education. এই অর্থে একমাত্র কম্যুনিস্টরাই যথার্থ Secular. কারণ তারা ধর্ম বা ভগবানে বিশ্বাস করে না। ইংরেজী Secularism-এর যথার্থ ভাষান্তর ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। এখানেও বিকৃতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস। এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বারা ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বা বিরূপতা বোঝানো হয় না। ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে নিরপেক্ষ—এই মাত্র। কম্যুনিস্ট নেতা V. K. Krishna Menon ছিলেন নেহেরুর বিশেষ প্রীতিভাজন। মেননের প্রতিরক্ষা মন্ত্রিত্বের সময়ই কম্যুনিস্ট চীন ভারত আক্রমণ করে। সম্ভবত মেননের পরামর্শেই নেহেরু ধর্মনিরপেক্ষতাকে ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করেন।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা মানব সভ্যতার ভিত্তি স্বরূপ। এই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা (secularism) সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সম্বন্ধে মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের প্রতিনিধি স্থানীয় সর্বভারতীয় সংগঠন Jammat-I-Islami Hind সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকে স্বাগত জানায়...কিন্তু কেহ যদি এই নেহাত প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও কোন গভীরতর তাৎপর্য মনে পোষণ করেন তবে আমরা সহমত হতে পারছি না। (ধর্ম নিরপেক্ষতার) এই দার্শনিক তাৎপর্যের উৎপত্তি পাশ্চাত্যে। ইহার দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিহাস আমাদের মানসিকতা ও প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সংগতিহীন।...রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার দায়বদ্ধতা বা কর্তব্য হতে মুসলমানদের দিতে হবে অব্যাহতি। (The Jammat has categorically stated that in the present circumstances it wants the secular form of Govt. to continue...But if beyond this utilitarian expediency some people have the deeper connotation in mind, we beg to differ. These philosophical connotations are essentially western in origin, and carry a spirit and history which are totally foreign to our temper and needs-. The state must remain secular but the Muslims should be saved from secularism.)[1]

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। আমি স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করব—এ আমার অধিকার। অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ আমার ধর্মমতের প্রতি হবে সহিষ্ণু। তেমনি অন্যধর্মের মানুষও স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করবে। তাদের প্রতি আমিও হব সহিষ্ণু—এ আমার কর্তব্য। কিন্তু মুসলমানের মনোভাব সুবিধাবাদের চরম নিদর্শন। মুসলমান আপন অধিকার সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন—কিন্তু অপরের অধিকারের প্রতি ততোধিক বিরূপ। সে অধিকার দাবি করবে—কিন্তু কর্তব্য পালন করবে না। এর কারণ হল পরধর্মসহিষ্ণুতা ইসলাম-বিরোধী। হাজার বছরের মুসলিম রাজত্বে হিন্দুমেধ যজ্ঞ ও তৎপরবর্তী সকল দাঙ্গার মূল কারণ ইসলামের এই পরধর্ম অসহিষ্ণুতা।

1. Musir-ul-Haq—Islam in Secular India, P-117

হয় না। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে সংবিধান সংশোধন করে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার স্থান সর্বাগ্রে ও সর্বোচ্চে নির্ধারিত হল। দেশ ও জাতির মূল স্বার্থ বিপন্ন হলেও ধর্মনিরপেক্ষতার মহিমা ক্ষুণ্ণ করা যাবে না। মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে না। ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী। তবে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই ঢক্কা নিনাদ কী উদ্দেশ্যে? উদ্দেশ্য প্রধানত দুটি। প্রথমত লোক বিনিময় না হওয়ায় ভারতে থেকে গেল ৩½ কোটি মুসলমান; পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অনুকূল পরিবেশে তাদের অবাধে নির্ধারিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মসূচী রূপায়ণে সহায়তা করা। দ্বিতীয়ত হিন্দু জাতির কণ্ঠরোধ করা। সুপরিকল্পিত প্রচারের ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, "মুসলমান" এই পরিচয় গৌরবের; অন্যদিকে "হিন্দু" পরিচয় হল কলঙ্কের। প্রচার মাহাত্ম্যে "হিন্দু ও সাম্প্রদায়িকতা" এক ও অভিন্ন বলে চিত্রিত হল। রাষ্ট্রীয় উৎসব অনুষ্ঠানে বর্জিত হল হিন্দু সংস্কৃতির চিরাচরিত রীতি-নীতি। যদিও এ সকল-ই সংস্কৃতির অঙ্গ। ইংলন্ডে ক্যান্টারবেরির আর্চ বিশপের (Church of England) পরামর্শ মেনেই পার্লামেন্টে রাজা/রাণীর ভাষণের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাথলিক খ্রীস্টান না হলে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনের যোগ্য বলে বিবেচিত হন না। দেবভূমি ভারতবর্ষ। ধর্মই ভারতের আত্মা, জাতির প্রাণশক্তি। সেই ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন থেকে ধর্মকে নির্বাসনে পাঠানোর সকল ব্যবস্থা হল।* এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা অনুযায়ী মুসলমান আবেগ-অনুভূতিপ্রবণ; হিন্দু-আবেগশূন্য। মুসলমানের সূক্ষ্ম অনুভূতি আহত হতে পারে এমন কোন কাজ সাম্প্রদায়িক বলে গণ্য হয়। এমনকি বিষয়টির সঙ্গে যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্নও যুক্ত থাকে।

---

* বিবেকানন্দ বলেছেন—Man making is my mission. শিক্ষার উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে বলা হয়, দেহ-মন-আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য। অন্যভাবে বলা হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে সহজাত দেবত্বের বিকাশ ঘটানো। কিন্তু নীতি ও মূল্যবোধ গড়ে না উঠলে স্বামীজির মানুষ তৈরি অথবা শিক্ষার উদ্দেশ্য সকলই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কোন রাজনৈতিক মতবাদে নৈতিকতা বা মূল্যবোধের শিক্ষা নেই। আছে ধর্মে, ধর্মগ্রন্থে। অনেক শিক্ষাব্রতীই তাই স্কুল পাঠ্য-ক্রমে ধর্মশিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী। কিন্তু প্রবল আপত্তি secular বুদ্ধিজীবীদের। আপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করে মৈত্রেয়ী কলেজের (দিল্লী) ইতিহাসের অধ্যাপিকা গার্গী চক্রবর্তী বলেন ঃ আজ যাঁরা স্কুলে ধর্মশিক্ষা প্রচলন করতে চান, তাঁরা যতই বলুন সব ধর্মগ্রন্থ থেকেই পাঠ হবে, কিন্তু বাস্তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মতবাদ, তাঁদের ধর্মচিন্তা প্রাধান্য পাবে। সেটা কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের বিরোধী। (আনন্দবাজার পত্রিকা— ১৭-২-২০০২)

ভারত বিভক্ত হয়ে "পাকিস্তান" গঠিত হলে অবশিষ্ট ভারতের নামকরণ "হিন্দুস্থান" হবে ইহাই ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু তাহলে হিন্দুর প্রাধান্য সূচিত হয় এই কারণে কংগ্রেস সে প্রস্তাব খারিজ করেন। এক্ষেত্রেও "সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মতবাদ, তাদের ধর্মচিন্তা প্রাধান্য পাবে" এই যুক্তিতে যুক্তিবাদী গার্গী দেবী স্কুলে ধর্মশিক্ষার বিরোধী। রাষ্ট্র, সমাজ এবং পারিবারিক ব্যবস্থায়ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মত-ই প্রাধান্য পায়। ইহাই গণতন্ত্র। সর্বকালে সর্বদেশে স্বীকৃত। তবে ধর্মের ব্যাপারে ভিন্ন-মানদণ্ড কোন যুক্তিতে? যুক্তি একটাই, আর তা হল ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের নামে হিন্দুধর্মের চর্চা ও প্রচার যতটা সম্ভব সীমিত করা। ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করার প্রকৃত কারণ তাই।

ফেব্রু-মার্চ, ১৯৪৭। পঃ পাঞ্জাব, মুলতান, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ, সর্বত্র শুরু হয়েছে হিন্দু-শিখ বিরোধী দাঙ্গা। যেমনভাবে মুসলমান কলকাতা-নোয়াখালিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করেছিল। পাঞ্জাবে হল তার পুনরাভিনয়। (Shocking atrocities that outraged humanity and a heavy toll of life and property marked the Direct Action in the punjab as in Bengal.)[1] দাঙ্গার পর নেহেরু রাওয়ালপিণ্ডি পরিদর্শন করে মন্তব্য করেছেন ঃ ভয়াবহ দৃশ্য আমি দেখেছি, শুনেছি মানুষের হিংস্র আচরণ—যা বন্য বর্বরদেরও লজ্জা দেয়। (I have seen ghastly sights and I have heard of behaviour by human beings which would degrade brutes.)[2] সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাত্র ১৫ দিনেই ২০৪৯ মানুষ নিহত, আহত ১০০০। মাউন্টব্যাটেনের প্রেস এ্যাটাচে দাঙ্গা বিধ্বস্ত রাওয়ালপিণ্ডি ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছেন ঃ যুদ্ধের সময় বোমা বর্ষণে যেমন হয়, ঠিক তেমনি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে হিন্দু-শিখ মহল্লা। এলাকার মুসলমান খুবই খুশি। (Mount Batten's Press Attache, visiting Rawalpindi, stated that the destruction in the Hindu and Sikh quarters was as thorough as any produced by fire bomb raids in the war...the Muslims of the areas were quite pleased with themselves.)[3]

এরূপ ভয়ঙ্কর মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা শুধু নেহেরু এবং মাউন্টব্যাটেনের প্রেস এ্যাটাচে'র নয়, কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দেরও হয়েছিল। AICC অধিবেশনে ভারত বিভাগ প্রস্তাব সমর্থন করে আচার্য কৃপালনি বলেন ঃ পাশব হিংসায় হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মত্ত। আমি দেখেছি একটি কূপে ১০৭টি মহিলা ও শিশুর মৃতদেহ। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য রমণীরা কোলের শিশুদের নিয়ে করেছে আত্মহত্যা। পাছে লাঞ্ছিত হতে হয়—এই আশঙ্কায় পরিবারের পুরুষেরা ৫০ জন নারীকে একটি উপাসনা স্থানে হত্যা করেছে। একটি ঘরের মধ্যে ৩০৭ জন্য নারী ও শিশুকে হিংস্রজনতা জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে। সেই অর্ধদগ্ধ হাড়ের স্তূপ আমি দেখেছি। এই বীভৎস অভিজ্ঞতা বিষয়টির (ভারত বিভাগ) প্রাতি আমার দৃষ্টি-ভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে। (The Hindu and Moslem communities have vied with each other in the worst orgies of violence...I have seen a well where women with their children, 107 in all, threw themselves to save their honour. In another place, a place of worship, fifty women were killed by their men folk for the same reason. I have seen heaps of bones in a house where

1 R. C. Majumder—History of The Freedom Movement in India, P-655
2 Ibid, P-655
3 Ibid, P-655-56

307 persons, mainly women and children were driven. locked up and then burnt alive by the invading mob. These ghastly experiences have no doubt affected my approach to the question.)[1]

সুতরাং গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন না এমন কথা বলা যাবে না। ইংরেজ রাজত্বেই যদি মুসলমান হিন্দুর ওপর হেন নৃশংস অত্যাচার করতে পারে—তবে মুসলিম রাজত্বে হিন্দু নিরাপদে পরম সুখ-শান্তিতে বাস করবে এরকম মনে করার কোন সঙ্গত কারণ আছে কি? কোরানের শিক্ষা, ইসলামের ধর্মতত্ত্ব, সহস্র বৎসরের ইতিহাস, ১৯২০-২১ সালে খিলাফৎ আন্দোলন, ১৯৪৬ সালের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও ১৯৪৭ সালে পঃ পাঞ্জাবে ব্যাপক হিন্দু-শিখ নিধনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা কি সেই সাক্ষ্য দেয়? স্বাধীনতা সংগ্রামী অ্যানি বেসান্ত ১৯২২ সালেই দেশবাসীকে সতর্ক করে বলেছিলেন, স্বাধীন ভারতে আর একটি "খিলাফৎ রাজ" আমরা দেখতে চাই না। মুসলমানের প্রতি স্নেহান্ধ গান্ধী-নেহেরু-কংগ্রেস। ইতিহাসের শিক্ষা, ব্যক্তিগত ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তাদের নিকট মূল্যহীন। হিন্দুর সুরক্ষায় তারা উদ্বেগহীন। তত্ত্বজ্ঞানীয় ন্যায় পাকিস্তানের কসাইখানায় অবরুদ্ধ হিন্দুর প্রতি গান্ধীর উপদেশ ঃ তোমরা নিজ নিজ ঘর ছেড়ে পালাবে না। সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে। (Gandhiji and the Congress leaders had appealed to the Hindu and Sikh minorities in Pakistan areas not to run away but to stay in their homes and face the situation bravely.)[2] গান্ধীর মুসলিম তোষণের মূল্য দিল হিন্দু জাতি; অর্ধ কোটি হিন্দু শিখের বক্ষরক্তে, ধর্ষিতা লক্ষ নারীর অশ্রুপাতে।

পঃ পাকিস্তানের এই নরহত্যার পর নেহেরু বলেন ঃ আমরা যখন দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন আমাদের মধ্যে কেহই ভাবতে পারেনি যে, দেশভাগের পর এইরকম পারস্পরিক* হত্যার সন্ত্রাস সৃষ্টি হবে। বরং এই ঘটনা এড়ানোর জন্যই দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। (when we decided on partition I do not think any one of us ever thought that there would be this terror of mutual killing after partition. It was in a sense to avoid that we decided on partition. The Man Who Divided India—Rafiq zakaria-Hindustan

---

* "পারস্পরিক হত্যার সন্ত্রাস" (Terror of Mutual Killing) হিন্দু-মুসলমান উভয়কে সমভাবে অভিযুক্ত করে। মুসলমানের অপরাধকে লঘু করে দেখানোর এ এক অপপ্রয়াস। প্রকৃত ঘটনা হল পঃ পাঞ্জাব ও অন্যত্র ভয়াবহ হিন্দু-হত্যার প্রতিবাদেই পূর্ব পাঞ্জাবেও তার সামান্য প্রতিক্রিয়া হয়। (The holocaust in Western Pakistan had its repercussions in East Panjab.)—V.P.Menon—The Transfer of Power in India P-419

---

1. Ibid, P-672
2. V. P. Menon—The Transfer of Power in India, P-418

Times-13-1-2002.) দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে পঃ পাঞ্জাবে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড হয় তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়েও নেহেরু এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা বুঝতে পারেননি যে দেশ ভাগের পর অবস্থা কী চরম আকার ধারণ করতে পারে—একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? প্রথমতঃ নেহেরু ও কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝতে পারেন নি। কিন্তু ইংরেজ সরকারের গভীর আশঙ্কা ছিল যে, পাঞ্জাবে অশান্তি হবেই। তার মোকবিলায় তাদের প্রস্তাব ছিল যে ইংরেজ সেনা ও গোর্খাদের নিয়ে একটি বিশেষ বাহিনী গঠিত হোক। পাকিস্তান সম্মত ছিল, কিন্তু প্রবল আপত্তি ছিল নেহেরুর।

এই ব্যাপারে Gen. Tuker (Second most senior general) এক বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী করেন। ....A central impartial force must be formed to step in and stop the inevitable row which would blow up in the Sikh–Hindu–Muslim areas...consisting of a small number of British troops, plus the forty Ghurkha battalions serving in the Indian Army.

লর্ড মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তান ও ভারতের মতামত জানতে চাইলে—লিয়াকত আলি সম্মতি জ্ঞাপন করেন, কিন্তু নেহেরু বলেন—ভারতব্যাপী যদি ধ্বংসের দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়—তবুও ১৫ই আগষ্টের পর ব্রিটিশ সেনা এদেশে থাকবে না। —I would soon have every village in India put to the flames than keep the British Army here after Aug, 15.

Tuker-এর সতর্কবাণী ঃ পাঞ্জাব হবে রক্তাক্ত—Tuker fumed with frustration and forecast–"a bloody massacre in Punjab" (The Last Days of The British Raj, P-154, 155, 159, 164)

ইংরেজ ও গোর্খা সেনার বিশেষ বাহিনী থাকলে পঃ পাঞ্জাবে গণহত্যা সংঘটিত হতে পারত না।

দ্বিতীয়তঃ ১৯১৪ খ্রীঃ ২৮শে জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ড বসনিয়া সফরে গেলে আততায়ীর হাতে নিহত হন। অস্ট্রিয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে অভিযুক্ত করে—সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ২৮শে জুলাই। শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

একটিমাত্র হত্যাকাণ্ড নিয়ে একটা বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল—আর পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ হিন্দু শিখ নিহত হল; কিন্তু ভারত সরকার নীরব দর্শক!....

জাগতিক সকল ঘটনাই কার্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা সংঘটিত হয়। লোক বিনিময়ে আপত্তির কারণ যে মুসলিম প্রীতি, তা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু এক তরফা ভাবে পাকিস্তান থেকে হিন্দু-শিখদের ভারতে নিয়ে এলে তো নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় না।

তা কেন করা হল না—নবীন ইতিহাস গবেষকরা সে রহস্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হবেন এমন নিশ্চয়ই আশা করা যায়। প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে একথা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলা যায় যে, ১৯৪৭ সালে পঃ পাকিস্তান এবং ১৯৫০ সাল ও পরবর্তীকালে পূঃ পাকিস্তানে যে অভূতপূর্ব গণহত্যা হয় তা অনিবার্য ছিল না। হিন্দুর প্রতি যদি সামান্যতম মায়ামমতা থাকত, তবে এই ব্যাপক বর্বর হত্যাকাণ্ড খুব সহজেই এড়ানো যেত।

গান্ধী মহাত্মা অথবা পরাজ্ঞানী সত্য-দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, তাহা রাজনৈতিক ইতিহাসের বিচার্য নয়; ভারতবর্ষে তাঁহার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই প্রধান বিবেচ্য। ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে গান্ধী ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন ঃ গান্ধীর একদিন মৃত্যু হবে কিন্তু গান্ধীবাদ অমর। (Gandhi may die but Gandhism will live for ever.)[1] গান্ধীবাদ যদি হয় অহিংসা প্রেম ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, তবে আসমুদ্র হিমাচল হিন্দুরক্তে প্লাবিত করে ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে তার চির সমাধি হয়েছে গান্ধীর জীবদ্দশাতেই। কিন্তু অকারণ অসঙ্গত মুসলিম প্রীতি ও হিন্দু-বিদ্বেষ যদি গান্ধীবাদের সার তত্ত্ব—তবে তাহা অবশ্যই অমরত্বের দাবি করতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষতার ছত্র-ছায়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে মুসলিম তোষণ আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ।* দূরদর্শী গান্ধীর ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা হবার নয়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, যতদিন হতভাগ্য "ভারত" পৃথিবীর মানচিত্র হতে লুপ্ত না হয়—ততদিন গান্ধীবাদের বিনাশ নেই।

ভারত বিভাগ যদি দেশ ও জাতির প্রতি প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা, তবে লোক বিনিময় না করা অসহায় হিন্দুর প্রতি দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য হবে। হিন্দু আজ পৌরুষহীন অধঃপতিত। যদি কোনদিন ক্ষাত্র ভারতের গৌরব রবি পৃথীরাজ, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ, বিবেকানন্দ—অরবিন্দের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে জগতের জাতিসমূহের মধ্যে হিন্দু পুনরায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিন সে এই বিশ্বাসঘাতকতা ও জাতিদ্রোহিতার জবাবদিহি দাবি করবে।

---

* ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১, আমেরিকা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে (WTC) ওসামা-বিন্‌-লাদেনের আল-কায়দা জেহাদী সংগঠনের আত্মঘাতী বাহিনীর বিধ্বংসী বিমান হানার পর ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ (জেহাদ) অ-মুসলমান বিশ্বে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। আল্‌-কায়দা, আফগানিস্তানের তালিবান, কাশ্মীরের লস্কর-ই-তৈবা, জৈশ-এ-মহম্মদ, আল্‌বদর্‌ প্রভৃতি জেহাদী সংগঠনের সকলেই মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। এদের প্রধান লক্ষ্য ভারত। সীমান্ত রাজ্য পঃ বঙ্গ। এখানে মাদ্রাসা (বিশেষত অননুমোদিত) ও বেআইনি মসজিদের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি উদ্বেগের কারণ, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে। এই সকল মাদ্রাসা ও মসজিদের সঙ্গে ISI ও বিভিন্ন জেহাদী গোষ্ঠীর যে প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে সরকার তা অবহিত। আন্তর্জাতিক বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশারফ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছেন পাকিস্তানের মাদ্রাসার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ জারি করতে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ ভারত অসহায় দর্শক। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তার আদর্শ। সম্প্রতি পঃ বঙ্গে CPI (M) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের কিছু মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বিদেশী অর্থগ্রহণ ও দেশ-বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগকে কেন্দ্র করে নিজ দলের মধ্যেই তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

---

1. R. C. Majumder—History of the Freedom Movement In India. Vol-III, P-313

প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ

দিল্লীতে মোগল শক্তির পতন হলে কাশ্মীরে মোগল শাসন দুর্বল হয়। এই সুযোগে ১৭৫২ খ্রিঃ আহম্মদ শাহ্ আবদালি দখল করে কাশ্মীর। পরবর্তী প্রায় ৬০ বৎসর কাশ্মীর ছিল পাঠানের অধিকারে। ১৮১৯ খ্রিঃ মহারাজা রণজিৎ সিং কাশ্মীর অধিকার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ডোগরা বংশীয় রাজপুত রণজিৎ দেও ছিলেন জম্মুর শাসক। ১৭৮০ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু হলে সিংহাসনের দাবি নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে মহারাজা রনজিৎ সিং জম্মু ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করেন। রনজিৎ দেওর তিন প্রপৌত্র যোগদান করে মহারাজার সেনাবাহিনীতে। তাঁদের আনুগত্য, সাহস, বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় রণজিৎ সিং মুগ্ধ। তিনি তিনভ্রাতাকেই "রাজা" উপাধি প্রদান করে জম্মুর তিন অঞ্চলের শাসনভার অর্পন করেন।

গুলাব সিং—জম্মু

ধ্যান সিং—ভিম্বার (ভিম্‌বার), চিবল ও পুঞ্চ

সুচেত সিং—রামনগর

১৮৩৯ সালে পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হলে অখিল শিখ সাম্রাজ্যের স্বপ্ন চিরতরে ধূলিসাৎ হয়। ইংরেজ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। শতদ্রু নদীর উপকূলে সীমান্তবর্তী দুর্গগুলিতে ইংরেজ সেনা মোতায়েন করলে শিখ নেতারা শঙ্কিত হয়। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র খড়গ সিং সিংহাসনে আরোহণ করেন। এক বৎসরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হলে অপর পুত্র শের সিং সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে গুপ্ত ঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। রণাজিৎ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র দলীপ সিং অধিষ্ঠিত হন সিংহাসনে। রাণীমাতা ঝিন্দল নিযুক্ত হন অভিভাবিকা। এই সময় লাল সিং ও তেজ সিংহের নেতৃত্বে "খালসাবাহিনী" খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই ছিলেন শিখ রাজ্যের সর্বময় কর্তা। তাঁদের স্বেচ্ছাচারিতায় শিখ সর্দার ও জনগণের মধ্যে দেখা দেয় প্রবল অসন্তোষ। ইংরেজ শিবিরে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। নতুন সৈন্য আমদানি করে সেনা নিবাসের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। ইংরেজের অভিসন্ধি ব্যর্থ করতে ১৮৪৫ খ্রিঃ শিখরা ইংরেজদের আক্রমণ করে। প্রবল বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও বিশ্বাসঘাতকতার দরুন তারা পরাজিত হয়। বিজয়ী ইংরেজ সেনা শতদ্রু অতিক্রম করে লাহোর অধিকার করলে শিখরা সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

গুলাব সিং উভয়ের মধ্যে আপস-মীমাংসার চেষ্টা করেন। মীমাংসার শর্ত স্বরূপ ইংরেজ এক কোটি মুদ্রা ও পাঞ্জাবের এক বিরাট ভূ-খণ্ড দাবি করে। লাহোর (শিখ রাজ্যের রাজধানী) দরবারের কোষাগার শূন্য। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দেওয়া শিখদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। বিনিময়ে তাঁরা জম্মু-কাশ্মীর ও বিয়াস থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত সকল অঞ্চল ইংরেজকে হস্তান্তর করতে চায়। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ। কারণ প্রধাণত সামরিক ও রাজনৈতিক। এই বিশাল অঞ্চলের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখতে হলে যে সমর শক্তির প্রয়োজন; ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির তা ছিল না। কাশ্মীর উপত্যকা বাদ দিলে অবশিষ্ট অঞ্চল অনুর্বর ও অনুৎপাদক। সর্বোপরি গুলাব সিং উত্তরাধিকার সূত্রে উল্লিখিত অঞ্চলের একজন প্রধান দাবিদার। অবশেষে গুলাব সিং ইংরেজের দাবি পূরণে সম্মত হন। শর্ত হল তাকে জম্মু-কাশ্মীরের স্বাধীন নৃপতিরূপে স্বীকৃতি দিতে হবে।

অমৃতসর চুক্তির (১৮৪৬ খ্রীঃ) শর্ত অনুযায়ী ছাম্ব (ছাম্‌ব), কুলু প্রভৃতি অঞ্চল বাদ দিয়ে গুলাব সিং জম্মু-কাশ্মীরের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন। বিনিময়ে তিনি স্বীকার করে নেন ইংরেজের প্রাধান্য (supremacy)। ১৮৫২ খ্রিঃ officer on special duty-র পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন ইংরেজকে কাশ্মীরে পাঠানো হয়। ১৮৫৭ খ্রিঃ গুলাব সিংহের তিরোভাবে তার পুত্র রাজ সিং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৫ খ্রিং তাঁর মৃত্যু হলে সিংহাসনে আরোহণ করেন পুত্র রণবীর সিং। এই সময় থেকে officer on special duty-র নতুন নামকরণ হয় Resident in Kashmir.

লেঃ জেনারেল মহারাজা শ্রীহরি সিং ১৯২৫ খিঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর, কাশ্মীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যটি চারটি অঞ্চলে বিভক্ত। দক্ষিণে জম্মু, মাঝখানে কাশ্মীর উপত্যকা; উত্তরে গিলগিট এবং কাশ্মীর ও তিব্বতের মাঝখানে লাদাখ। কাশ্মীর উপত্যকায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, জম্মুতে হিন্দু ও লাদাখে বৌদ্ধ। মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় ১৯৩২ খ্রিঃ স্থাপিত হয় জম্মু-কাশ্মীর মুসলিম সম্মেলন। (সম্ভবত পণ্ডিত নেহেরুর পরামর্শে) সংগঠনের নতুন নামকরণ হয় National Conference বা জাতীয় সম্মেলন। ১৯৩৮ খ্রিঃ ২৮শে জুন শেখ আবদুল্লা মহারাজা হরি সিংহের বিরুদ্ধে "কাশ্মীর ছাড়" (Quit Kashmir) আন্দোলনের ডাক দেন। এজন্য শেখ সাহেবকে কারারুদ্ধ করা হয়। ক্ষমতা হস্তান্তর আসন্ন বুঝে শেখ আবদুল্লা ১৯৪৬ খ্রিঃ নবোদ্যমে "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর আন্দোলনের সমর্থক ছিল শুধু কাশ্মীর উপত্যকার মুসলমান। জম্মু ও লাদাখের জনগণ এই আন্দোলনে যোগ দেয় নি। কাশ্মীর নরেশ মহারাজা হরি সিংহের প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থা ছিল। শেখ আবদুল্লার সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরুর খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক। শেখ সাহেবের আন্দোলনের তিনি ছিলেন এক প্রধান সমর্থক। তাঁর দৃষ্টিতে এ হল স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন। শুধু নৈতিক সমর্থন নয়—"কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি

একবার কারাবরণও করেন। এই ঘটনা মহারাজার প্রতি নেহেরুর বিরূপতার অন্যতম কারণ—যা পরবর্তী কালে কাশ্মীরের ভারত ভূক্তিতে অকারণ জটিলতার সৃষ্টি করে। কাশ্মীরের মহারাজার বিরুদ্ধে উপত্যকার মুসলিম জনতার আন্দোলনকে নেহেরু সমর্থন করেছেন; কিন্তু হায়দরাবাদ ও জুনাগড়ের মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণের আন্দোলনের তিনি ছিলেন নীরব দর্শক।

মহারাজার সঙ্গে শেখ আবদুল্লার বিরোধের মূল কারণটি সর্দরা বল্লভ ভাই প্যাটেল বুঝতে পেরেছিলেন। I.B.-র Dy. Director Mr. Mullick-কে তিনি বলেন ঃ মহারাজার প্রতি শেখ সাহেবের বিরোধিতাকে যেন শাসকের প্রতি শাসিতের বিরোধিতা বলে গণ্য করা না হয়। তিনি ডোগরা সম্প্রদায়ের বিরোধী। শেখ আবদুল্লার বিচারে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতি ও ডোগরা অভিন্ন। অর্থাৎ কার্যত তিনি হিন্দু-বিরোধী। (...his antipathy to the Maharaja was not really an antipathy to a ruler as such but to the Dogras he identified the rest of the majority Community in India—(The Telegraph-Dt. 23.03.91 quoted from "Kashmir : Behind the Vale" by M.J.Akbar.)

দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতকে স্বাধীনতা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চূড়ান্ত আলোচনার জন্য ক্যাবিনেট মিশন সার্কুলারে বলা হয় ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বাধীন বলে গণ্য করা হবে। ৪৭ সালের ২৫ জুলাই গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশীয় নৃপতিমণ্ডলীর সভায় (Chamber of Princes) বলেন, যদিও আইনের দৃষ্টিতে তাঁরা স্বাধীন, তবু ভৌগোলিক সংলগ্নতা, যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয় বিচার করে তাঁদের ভারত অথবা পাকিস্তান যে কোন একটি দেশের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। Instrument of Accession-এ বলা হয় এ বিষয়ে শাসকের অধিকার ও বিবেচনা চূড়ান্ত ও প্রশ্নাতীত। সুতরাং ইহা পরিষ্কার যে British Paramountcy-র (ব্রিটিশ সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা) অবসানে দেশীয় রাজ্যসমূহ তাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতা ফিরে পাবে। যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়েছে—দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। (...The decision on whether to accede or not and to which dominion were in the exclusive right and discretion of the ruler...Thus it would be seen that on the withdrawal of Paramountcy, the princely states were to become independent and the communal basis of division of British India was not to apply ipso-facto to the states.)[1]

---

1. A. S. Anand (Formerly Chief Justice of India) -The Statesman, Dt. 2-3-2002

কিন্তু মহারাজা হরি সিংহের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। ভারতে যোগদান মুসলমানের মনঃপূত হবে না। পাকিস্তানে যোগদানের যে কোন সম্ভাবনা জম্মু-লাদাখের হিন্দু-বৌদ্ধরা বাধা দেবে। কাশ্মীরের স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্বও বাস্তবোচিত নয়। উভয় সঙ্কটে মহারাজা ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে stand still (স্থিতাবস্থা) চুক্তির প্রস্তাব করেন। পাকিস্তান এ প্রস্তাবে সম্মতি দেয়। জিন্নার একান্ত সচিব মহারাজা হরি সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জানান "তিনি স্বাধীন সার্বভৌম নৃপতি। কোন রাষ্ট্রে যোগদানের ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। এ ব্যাপারে শেখ আবদুল্লা, জাতীয় সম্মেলন অথবা কারও সঙ্গে তাঁর আলোচনারও প্রয়োজন নেই।* প্রয়োজন নেই রাজ্যের প্রজাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণের (Delegate) অথবা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের; এবং তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে যে, তিনি যদি পাকিস্তানে যোগদান করেন তবে তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ অথবা ক্ষমতা বিন্দুমাত্র হরণ করা হবে না। ("His highness was told that he was an independent sovereign, that he alone had the power to give accession, that he need consult nobody, that he should not care for the National Conference or Sheikh Abdulla....that he need not delegate any of his powers to the people of the state and that Pakistan would not touch a hair of his head or take away an iota of his power" if he acceded to Pakistan.)[1]

এ যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি অচিরেই তা প্রমাণিত হয়। ১৫ আগস্টের পূর্বে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রামকৃষ্ণ কাক। মহারাজা তাঁর স্থলে মেজর জেনারেল জনক সিংকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। মহারাজা প্রস্তাবিত standstill চুক্তিতে পাকিস্তান স্বাক্ষর করে, বিরত থাকে ভারত। পাকিস্তানে যোগদানে বাধ্য করতে জিন্না ৪৫০ মাইল বিস্তৃত পাক-কাশ্মীর সীমান্ত বরাবর সশস্ত্র হামলা শুরু করে। ট্রাক ধর্মঘটের অজুহাতে বন্ধ করে দেয় খাদ্যশস্য, পেট্রোল ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ। ২৫ আগস্ট (১৯৪৭ খ্রিঃ) Dawn পত্রিকায় লেখা হল ঃ কাশ্মীর-নরেশকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে যে, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে পাকিস্তানে যোগদান করতে হবে। আর তা না করার পরিণাম হবে ভয়াবহ। (The time has come to tell the Maharaja of Kashmir that he must make his choice and choose Pakistan. Should

---

* জিন্নার একান্ত সচিবের এই অভিমত আইন ও Instrument of Accession-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

1. A. S. Anand-Former Chief Justice of India- quoted from "Accession of Kashmir to India"-M. C. Mahajan. The Statesman, Dt. 2-3-2002

Kashmir fail to join Pakistan the gravest possible trouble would inevitably ensue.)[1]

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পাক-প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁ একান্ত বিশ্বাসভাজনদের সঙ্গে লাহোরে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। আলোচ্য বিষয়—কাশ্মীর অভিযান। প্রধানত দুটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। কর্নেল আকবর খাঁ প্রস্তাব করেন যে, অস্ত্র ও অর্থসরবরাহ করে কাশ্মীরের মুসলমানদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করতে হবে। পরিকল্পনাটি সময় সাপেক্ষ। সঠিক ভাবে রূপায়িত হলে খুব শীঘ্রই ৪০/৫০ হাজার মুসলামান শ্রীনগর অবরোধ করে পাকিস্তানে যোগ দিতে মহারাজাকে বাধ্য করবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবের উত্থাপক উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। পাঠান উপজাতিরা দুর্দান্ত ও হিংস্র প্রকৃতির। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বলে তাদের খ্যাতি আছে। তাদের শ্রীনগর পাঠালে মহারাজার পরাজয় ও কাশ্মীরের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি দ্রুততর হবে। (The second alternative was even more intriguing. Its's sponsor was the Chief Minister of the Frontier province, and it involved the most troublesome and feared population on the sub-continent, the Pathan tribesmen of the N.W.Frontier. ....Sending those dangerous hordes to Srinagar had considerable appeal. It would force the swift fall of the Maharaja and the annexation of his state to Pakistan.)[2]

প্রস্তাবটি আকর্ষণীয় বিবেচিত হওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। লিয়াকত আলি সকলকে সতর্ক করে বলেন, কাশ্মীর সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে।

তিনদিন পরে দেওয়াল ঘেরা পেশোয়ার শহরের একটি পুরানো বাড়িতে পাঠান উপজাতি সর্দারদের এক গোপন জমায়েত। আবেগপূর্ণ জ্বালাময়ী ভাষণ দিচ্ছেন মেজর খুরশীদ আনোয়ার। তিনি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেন, কাশ্মীরের কাফের হিন্দু মহারাজা ভারতে যোগদানে প্রস্তুত। যদি এখনই কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয়—তবে ভারত কাশ্মীর দখল করে নেবে। মুসলিম ভাইদের বাস করতে হবে হিন্দুর অধীনে। সর্দারদের প্রতি তার আহ্বান ঃ উপজাতি ভাইদের সংগ্রহ করে জেহাদের জন্য প্রস্তুত হন। They must assemble their tribal levies to begin a Holy War for their brothers in Kashmir.)[3] এই ধর্মযুদ্ধের আহ্বান কয়েকঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল প্রতি মহল্লায়—ঘরে ঘরে।

---

1. A. S. Anand (Former Chief Justice of India),The Statesman, 2-3-2002
2. Collins and Lapierre—Freedom at Midnight, P-348-349
3. Ibid, P-349

Lt. Gen. Sir Frank Messervy ও Lt. Gen. Sir Rob Lockhurt যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারতের সেনাধ্যক্ষ। জিন্নার কাশ্মীর আক্রমণের পরিকল্পনায় পাক সেনাধ্যক্ষের সমর্থন নেই। পাক সরকার তাঁর অগোচরে কাশ্মীর অভিযান সম্পন্ন করতে চান। অস্ত্র কেনার দায়িত্ব দিয়ে তাকে পাঠানো হয় লন্ডনে। কিন্তু করাচী ত্যাগের পূর্বমুহূর্তে অন্য সূত্র হতে তিনি এ সম্বন্ধে অবহিত হন। Sir George Cunningham উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর। টেলিফোনে তিনি জেনারেল Messervy-কে জানান ঃ মনে হয় কোন অঘটন ঘটতে চলেছে। কয়েকদিন ধরেই ট্রাক ভর্তি উপজাতীয়রা শহরেব (পেশোয়ার) রাজপথ দিয়ে যাচ্ছে। কণ্ঠে তাদের আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি। তুমি কি নিশ্চিত যে সরকার কাশ্মীর আক্রমণের বিরোধী? কানিংহাম জিজ্ঞাসা করেন মেসারভিকে। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমি এর সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং আমাকে বলেছেন, তিনিও বিরোধী। জানান লেঃ জেঃ মেসারভি। (..."that something strange is going on here", Cunningham told Messervy, "For days, he said, "trucks crowded with tribesmen chanting "Allah-O-Akbar" had been pouring through Peshawar"..."Are you absolutely certain" he asked Messervy, that the governement is still opposed to a tribal invasion of Kashmir"?...

I Can assure you, I am opposed to any such idea, Messervy told his colleague, 'and the Prime Minister has personally given me his assurance he is too.')[1]

পাকিস্তানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মহারাজা হরিসিং সন্দিহান। মীরপুর সেকটরে ৮-ই অক্টোবর আজাদ কাশ্মীর ব্যাটালিয়ন আক্রমণ করে। সীমান্ত জুড়ে শুরু হয় পাকিস্তানি হানাদারি। মহারাজা উদ্বিগ্ন। ক্ষুদ্র তাঁর সেনাবাহিনী—অর্ধেকই মুসলমান। লেঃ কর্নেল নারায়ণ সিং মুজাফ্ফরাবাদ সেনানিবাসের commanding officer. মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, মুসলিম সৈন্যদের ওপর তাঁর আস্থা আছে কিনা। দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি বলেন ঃ ডোগরাদের অপেক্ষা বেশি। (...Lt. Colonel Narain Singh had been asked by the Maharajah whether he could rely on the loyalty of the Muslim half of his battalion. He unhesitatingly answered. "More than on the Dogras")[2]

২২ অক্টোবর, নিশুতি রাত। ছল্ ছল্ কল্ কল্ শব্দে বয়ে চলেছে ঝিলাম নদী। এক পারে কাশ্মীর, অপর পারে পাকিস্তান। যোগাযোগের জন্য রয়েছে একটি সেতু।

1. Ibid, P-350
2. V.P.Menon-The Story of the Intergration of the Indian States, P-378

ওপারে অন্ধকারে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটি পুরানো মডেলের স্টেশন ওয়াগন। পেছনে ট্রাকের সারি, কয়েকশ হবে। মুসলিম লীগ গ্রীন সার্টের সরাব হায়াৎ খাঁন স্টেশন ওয়াগনে অধৈর্য প্রতীক্ষায়। তাঁর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ সেতুর অপর পারে; কখন দেখা যাবে আলোর সঙ্কেত। ওই সঙ্কেত তাকে জানাবে, যে হরি সিংহের সেনাবাহিনীর মুসলিম সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছে; হত্যা করেছে হিন্দু সেনা অফিসারদের, বিচ্ছিন্ন করেছে রাজধানী শ্রীনগরের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ এবং সেতুর অপর পারে প্রহরীরা বন্দী। সহসা সে দেখল ঘন তমসার বুক চিরে আকাশে অর্ধ বৃত্তাকারে আলোর বিচ্ছুরণ। সরাব খান গাড়ি চালিয়ে সেতু পার হল। শুরু হল প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ। (Eyes fixed to that bridge, he watched for the flare which would tell him that the Muslim troops of Hari Singh's army on the other side had mutinied, killed their Hindu officers, cut the telephone line to Srinagar and seized the guards at their end of the bridge. Suddenly he saw its roseate tail cut an arc against the black night sky. Sarab Khan started his station-wagn and lurched accross the bridge. The war for Kashmir had begun.)[1] এই দৃষ্টান্তমূলক চমকপ্রদ ঘটনাটি V.P. Menon-এর বর্ণনায় ঃ কাশ্মীরের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর।...মুজাফ্ফরাবাদে মুসলিম ও ডোগরাদের নিয়ে গঠিত কাশ্মীরি সেনা ব্যাটালিয়নের কমান্ডার ছিলেন, লেঃ কর্নেল নারায়ণ সিং। মুসলিম সৈন্যরা কমান্ডার ও তাঁর এ্যাডজুটান্টকে হত্যা করে অস্ত্র-শস্ত্র সহ যোগদান করে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। অগ্রবর্তী বাহিনী রূপে তারা হানাদার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যায়। (The all out invasion of Kashmir started on 22nd October, 1947...The State battalion, consisting of Muslims and Dogras stationed at Muzaffarabad, was commanded by Lt. Colonel Narain Singh. All the Muslims in the battalion deserted, shot the commanding officer and his adjutant;* joined the raiders and acted as advance guard to the raiders column.)[2]

* দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বিভক্ত হয় ভারত। ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতেই সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী দুই দেশের মধ্যে বিভক্ত হয়। (on 15th Aug. when the country was partitioned, the Indian Army, the Royal Navy and Royal Indian Air Force were summarily partitioned mainly on a religious basis between the two dominions. (V.P.Memon-The Story Of the Integration of the Indian States - P-379.)

ইসলামের বিধান—মুসলমান কখনও মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারে না। মহম্মদ আলি একথা

1. Collins and Lapierre—Freedom at Midnight, P-351

2. V.P. Menon—The Story of the Integration of the Indian States, P-378

সরাব হায়াত খাঁন উল্লসিত। কাশ্মীর পাকিস্তানের! শ্রীনগর আর মাত্র ১৩৫ মা'ঃ, রাজধানী অরক্ষিত। ভোরের আলো ফোটার পূর্বেই তাঁরা পৌঁছে যাবে শ্রীনগর....সহসা ভেঙে যায় তাঁর সুখস্বপ্ন। সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে। সৈন্য নেই একজনও। তারা গেছে মুজাফ্‌ফরবাদের হিন্দু বাজার লুঠ করতে। বেপরোয়া সরাব খাঁন। অফিসারদের নিয়ে ছুটল বাজারে। পাঠানদের হাতে ধরে বলছে, কি করছ তোমরা? আমাদের শ্রীনগর পৌঁছতে হবে। ধর্ষণ ও লুণ্ঠনে রত পাঠানদের কানে সে কথা পৌঁছায় না...।

কাশ্মীর আক্রমণেব সংবাদ ভাবত সবকার পায় ৪৮ ঘণ্টা পরে। পাক সেনাধ্যক্ষ লে. জে. মেসারভি লন্ডনে। তাঁর স্থলাভিসিক্ত হয়েছেন মে. জে. Doglus Gracy, ২৪ অক্টোবর শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় কয়েক মিনিট পূর্বে Gracy গোয়েন্দা সূত্রে জানতে পারেন যে উপজাতীয় বাহিনী ২২ অক্টোবর কাশ্মীর আক্রমণ করেছে। তিনি হটলাইনে সে সংবাদ তৎক্ষণাত জানিয়ে দেন ভারতের সেনা প্রধান Lt. Gen. Sir Rob. Lockhurt-কে। সেনাপতি যথারীতি সে বার্তা পৌঁছে দেন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও ফিল্ড মার্শাল অচিন লেকের কাছে।

ওইদিনই মহারাজা হরিসিং ভারত সরকারের নিকট অবিলম্বে সৈন্য সাহায্য চেয়ে SOS পাঠান। ২৫ অক্টোবর সকালে মন্ত্রিসভার Defence Committe-র সভায় মহারাজার আবেদন বিবেচিত হয়। সিদ্ধান্ত হয় কাশ্মীর ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করলেই সামরিক সাহায্য পাঠানো হবে। মহারাজার সঙ্গে আলোচনার জন্য স্থল ও বিমান বাহিনীর অফিসারদের নিয়ে V.P. Menon শ্রীনগর যান।

সামরিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। মহারাজা হরি সিং অসহায়। তিনি কখনও কল্পনা করেননি যে তাঁর সেনা বাহিনীর মুসলিম সৈন্যরা হিন্দু সেনাদের হত্যা করে

একাধিকবার সদম্ভে ঘোষণা করেছেন। ভারত বিভাগ প্রসঙ্গে ডঃ আম্বেদকর বলেছেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কোন মুসলিম রাষ্ট্র যদি ভারত আক্রমণ করে—ভারতের সৈন্যবাহিনীর মুসলিম সৈন্যরা আক্রমণকারীর পক্ষে যোগদান করবে। মহারাজা হারি সিংহের মুসলিম সৈন্যরা এই ধর্মীয় অনুশাসন মেনেই পাকবাহিনীর পক্ষে যোগ দিয়েছে। ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

হানাদার বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন জেনারেল তারিক নামে জনৈক সেনানী। এটি অবশ্যই তাঁর ছদ্মনাম। পবে প্রকাশ পায় ইনি হলেন পাক নিয়মিত বাহিনীর মেঃ জেনারেল আকবর খাঁ। মেঃ জেনারেল শের খাঁ পরে এর স্থলাভিষিক্ত হন। নেতাজী সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর মহম্মদ জামান কিয়ানী, বুরহানউদ্দিন ও অন্যান্য পদস্থ মুসলিম সেনানীবৃন্দ হানাদারদের সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। (The leader of the raiders was a mysterious officer called "General Tariq,"Who was later indentified as none other than Maj. General Akbar Khan of the Pakistan Army. He was succeeded by Maj. General Sher Khan. They were ably assisted by Mahammed zaman Kiani, Burhanuddin and other erstwhile officers of the Indian National Army.)[1]

---

1. V.P. Menon - The Story of the Intregation of the Indian States. P-396

পাকবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে। অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং। তিনি মহারাজাকে আশ্বাস দেন, তাঁর জীবন পণ। যতক্ষণ সম্ভব তিনি হানাদার বাহিনীর গতি রোধ করবেন। আক্রমণকারীরা বারমুলার পথ ধরে এগিয়ে আসছে। মাত্র ১৫০ জন হিন্দু সৈন্য নিয়ে তিনি উরিতে (Uri) হানাদার বাহিনীর সম্মুখীন হন। দুদিন উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই হয়। রাজেন্দ্র সিং উরি সেতু ধ্বংস করলে শত্রুর অগ্রগতি সাময়িক রুদ্ধ হয়। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় কয়েক হাজার। অসম যুদ্ধে বি ঃ রাজেন্দ্র সিং ও তাঁর সৈন্যরা সকলেই নিহত হন। দুর্জয় সাহস ও অসীম বীরত্বের জন্য V.P.Menon তাঁদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন ঃ পারস্যের বিরুদ্ধে থার্মোপাইলের যুদ্ধে লিওনাইড ও তাঁর ৩০০ গ্রীক সৈন্যের ন্যায় ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং ও তাঁর সৈন্যরাও ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। এই বীর সৈনিককেই প্রথম মরণোত্তর "মহাবীর চক্র" উপাধি প্রদান করা হলে তা হত খুবই সঙ্গত। (But he and his colleagues will live in history like the gallant Leonidas and his 300 men who held the Persian invaders at thermopylae. It was but appropriate that when the Maha Vir Chakra decoration was instituted the first award should have been given (posthumously) to this heroic soldier.)[1]

শ্রীমেনন শ্রীনগর বিমান বন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রী মেহের চাঁদ মহাজনকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজার প্রাসাদে যান। শ্রীমেনন তাঁকে দিল্লীর সিদ্ধান্ত জানালে মহারাজা নিঃশর্তে ভারতে যোগদানে সম্মত হন। পাকবাহিনী রাজধানীর উপকণ্ঠে। মহারাজা ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা বিপন্ন। শ্রীমেনন তাকে অবিলম্বে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জম্মুতে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ২৬ অক্টোবর প্রত্যুষেই শ্রীনগর ত্যাগ করেন।

শ্রীনগর থেকে জম্মু—দীর্ঘ পথ। ১৭ ঘঃ একটানা যাত্রা শেষে মহারাজা ক্লান্ত, শ্রান্ত। শয়ন কক্ষে যাওয়ার পূর্বে তিনি ADC-কে বলেন ঃ যদি V.P. Menon দিল্লি থেকে ফিরে আসেন তবেই আমাকে জাগাবে। কারণ তাহলে বুঝব ভারত এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করবে। আর যদি ভোরের আগে তিনি না আসেন, তবে আর কোন আশা নেই। সেক্ষেত্রে ঘুমন্ত অবস্থায়ই আমার এই রিভলবার দিয়ে আমাকে হত্যা করবে। ('Wake me up only if V.P. Menon returns from Delhi', he said, 'because that will mean India has decided to come to my rescue. If he does not come before dawn, shoot me in my sleep with my service revolver, because if he hasn't arrived, it will mean all is lost.')[2]

1. V. P. Menon-The Story of the Integration of The Indian States, P-379
2. Collins and Lapierre - Freedom at Midnight, P-355

দিল্লি বিমান বন্দর থেকে মেনন Defence Committe-র মিটিং-এ যান। তিনি মাউন্টব্যাটেনকে জানান, মহারাজা ভারতে যোগদানে সম্মত। কাশ্মীরকে রক্ষা করতে হলে এখনই সাহায্য পাঠানো প্রয়োজন। মাউন্ট ব্যাটেন বলেন, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সেনা পাঠানো উচিত হবে না। তিনি আরও বলেন ঃ কাশ্মীরের জনসাধারণের বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই অন্তর্ভুক্তি হবে শর্তসাপেক্ষ। হানাদার বিতাড়ণ করে রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর গণভোটের মাধ্যমে বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। পণ্ডিত নেহেরু এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা বিনা প্রতিবাদে এই প্রস্তাবে সম্মত হন। (He further expressed the strong opinion that in view of the composition of the population, accession sould be conditional on the will of the people being ascertained by a plebiscite after the raiders had been driven out of the state and law and order had been restored. This was readily agreed to by Nehru and other ministers.)[1]

Defence committe-তে আলোচনা শেষ করেই মেহের চাঁদ মহাজনকে নিয়ে মেনন জম্মুতে মহারাজার প্রাসাদে যান। মহারাজা নিদ্রিত। মেনন তাকে দিল্লির সিদ্ধান্ত জানালে হরি সিং Instrument of Accession-এ স্বাক্ষর দিয়ে, পাক-আক্রমণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে গভর্ণর জেনারেলকে একখানি পত্রে দ্রুত সাহায্যের আবেদন জানান ঃ

"...আমার রাজ্যে এক গভীর সঙ্কট দেখা দিয়েছে, আমি আপনার মহামান্য সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করি।...আপনি অবহিত আছেন যে, জম্মু-কাশ্মীর ভারত অথবা পাকিস্তান কোন রাজ্যেই যোগদান করেনি। ভৌগোলিক দিক থেকে আমার রাজ্য উভয় রাষ্ট্রের সংলগ্ন। সোভিয়েট রাশিয়া ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গেও আমার রাজ্যের সীমান্ত রয়েছে। বিদেশ নীতি নির্ধারণে ভারত-পাকিস্তান এই বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারে না। সংযুক্তি অথবা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে কাশ্মীরের স্বাধীন সত্ত্বা ভারত-পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূল হবে কিনা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আমি কিঞ্চিৎ সময় নিতে চেয়েছিলাম।...বর্তমানে যে ঘোরতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভারত সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। স্বভাবতই আমার রাজ্য ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগ না দিলে তারা সাহায্য পাঠাতে পারে না। আমি যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি; এবং Instrument of Accession অনুমোদনের জন্য আপনার সরকারের নিকট পাঠাচ্ছি। (...that a grave emergency has arisen in my state and request the immediate assistance of your governemt. As your

1. V.P. Menon - The Story of the Integretion of the Indian states, P-381

exellency is aware, the state of Jammu and Kashmir has not acceded to either the dominion of India or Pakistan. Geographically my state is contiguous with both of them. Besides, my state has common boundary with the union of Soviet Socialist Republic and with China. In their external relations the dominions of India and Pakistan can not ignore this fact. I wanted to take time to decide to which dominion I should accede or whether it is not in the best interest of both the dominions and my state to stand independent, of course with friendly relations with both ....with the conditions obtaining at present in my state and the great emergency of the situation as it exists, I have no option but to ask for help from the Indian dominion. Naturally, they can not send the help asked for by me without my state acceding to the dominion of India. I have accordingly decided to do so and I attach the Instrument of Accession for acceptance by your Government.")[1]

হানাদার বাহিনী শ্রীনগর থেকে মাত্র ৩৫ কি. মি. দূরে বারমুলায় পৌঁছে গেছে। শ্রীনগর—কাশ্মীরের একমাত্র বিমান বন্দর। এই বিমান বন্দরটি যদি শত্রুপক্ষ দখল করতে পারে—তবে আর দিল্লী থেকে সৈন্য পাঠানো সম্ভব হবে না। কাশ্মীরের নিজস্ব সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্ব নেই। মুসলমান সৈন্যরা হিন্দু সৈন্যদের হত্যা করে পাকবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রের অভাবে শত্রু পক্ষের সংখ্যা ও অস্ত্রশক্তি সম্বন্ধে ভারত সরকারের কাছে কোন তথ্যই নেই। পরিস্থিতি খুবই গুরুতর। প্রায় শতাধিক সামরিক-অসামরিক বিমান সংগ্রহ করা হল। ২৭ অক্টোবর সকাল থেকেই তাদের যেতে হবে কাশ্মীরে সৈন্য, অস্ত্র ও রসদ নিয়ে।

প্রথম শিখ ব্যাটেলিয়নকে সর্বাগ্রে পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়। ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার লে. কর্নেল দেওয়ান রণজিৎ রাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়, শ্রীনগর বিমান বন্দরের উপর বারকয়েক টহল দিয়ে নিরাপদ মনে করলেই সে যেন অবতরণ করে। সকাল ১০-৩০ মি. শিখ বাহিনীর নিরাপদ অবতরণের বেতার সংকেত পেয়ে দিল্লী আশ্বস্ত হয়।

পাক হানাদার বাহিনী ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে বারমুলায়। সেখান থেকে তারা যদি শ্রীনগরের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করতে পারে তবে কাশ্মীর রক্ষা করা হবে দুঃসাধ্য। লে. কর্নেল রাই বারমুলায় তাঁদের বাধা দেবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শত্রুর সম্মুখীন হয়ে

1 A. S. Amand (former CJI), The Statesman, Dt. 2.3.2002

দেখেন সংখ্যায় তারা বহুগুণ শক্তিশালী। তাদের আছে হালকা ও মাঝারী ধরনের মেশিন গান ও মর্টার। কিন্তু তাঁর সৈন্য মাত্র ৩২৯ জন। এই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে বিশাল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার অর্থ হবে আত্মহত্যার শামিল। তাই তিনি পাট্টনে (Pattan শ্রীনগর থেকে ১৭ মা. দূরে) পশ্চাদপসরণ শুরু করেন। তিনি ভেবেছিলেন ইতিমধ্যে দিল্লি থেকে আসবে আরও সেনা এবং তাদের নিয়ে পাট্টনে তিনি শত্রুর মোকাবিলায় সক্ষম হবেন। কিন্তু পশ্চাদপসরণের সময় যুদ্ধে তিনি নিহত হন। সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি শত্রুর অগ্রগতি রোধ করতে পেরেছিলেন। এইজন্য তাকে মরণোত্তর "মহাবীরচক্র" উপাধি দেওয়া হয়।

কাশ্মীরে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনা যে শৌর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছে—যুদ্ধের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু মুসলিম সেনারা যদি ধর্ষণ, হত্যা ও লুণ্ঠনে মত্ত না হত, তবে শ্রীনগরের পতন হয়তো রোধ করা যেত না। প্রথমে মুজাফ্ফরবাদ, তারপর বারমুলা। শ্রীনগর মাত্র ৩০ মাঃ। লে. কর্নেল দেওয়ান রণজিৎ রাই নিহত হওয়ায় মুষ্টিমেয় ভারতীয় সেনা ছত্রভঙ্গ। শ্রীনগরের পথ বাধাহীন। কিন্তু পাকবাহিনী রাজধানীর পথে অগ্রসর না হয়ে আক্রমণ করে বারমুলার মিশনারী কনভেন্ট—Franciscan Missionaries of Mary. পাঠান সৈন্যরা তৃপ্ত করে ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের মজ্জাগত অতৃপ্ত বাসনা। কনভেন্ট লুঠ করে ধর্ষণ ও হত্যা করে নান ও হাসপাতালের রোগিণীদের। (...the Pathans in Barmula were giving vent to their ancient appetites for rape and pillage. They violated the nuns, massacred the patients in their little clinic, looted the convent chapel down to its' last brass-door-knob.)[1] ধূলিসাৎ হয় মহম্মদ আলি জিন্নার কাশ্মীর বিজয়ের স্বপ্ন।

পূর্বেই দেখেছি ৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে ও পরে পশ্চিম পাকিস্তানে দাঙ্গার পর জলস্রোতের ন্যায় হিন্দু-শিখ উদ্বাস্তু দিল্লিতে আসে। সদ্য আসা স্বজনহারা, সর্বহারা উদ্বাস্তুদের মনে রয়েছে হত্যা ও অত্যাচারের ভয়ংকর স্মৃতি। তদুপরি দিল্লির মুসলমানদের প্ররোচনামূলক বিবৃতি পরিস্থিতিকে করে অগ্নিগর্ভ। পণ্ডিত নেহেরু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের নিকট আত্মসমর্পণ করেন—তাঁর হাতে অর্পণ করেন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্ব। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন আর শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণর জেনারেল নন—তিনি হলেন কার্যত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রশাসক (Chief Executive)। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন নবলব্ধ ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। একান্ত অনুগত নেহেরুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন পূর্ণ সহযোগিতা। মহারাজা হরি সিং কর্তৃক ভারত-ভুক্তির প্রস্তাব

1. Collins and Lapierre - Freedom at Midnight, P-357

গ্রহণ করে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তাকে জানান ঃ আমার সরকার ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তি গ্রহণ করছে। আমার সরকারের নীতি হল সংযুক্তির বিষয়টি যদি বিতর্কিত হয়, তবে রাজ্যের জনগণের ইচ্ছানুসারেই তা নির্ধারিত হবে। এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হানাদার বিতাড়ন করে কাশ্মীরের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর জনগণের রায় নিয়েই সংযুক্তির প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। (...my Government has decided to accept the accession of Kashmir State to the dominion of India. In consistence with their policy that in the case of any state where the issue of accession has been the subject of dispute, the question of accession should be decided in accordance with the wishes of the people of the state, it is my Governments' wish that as soon as law and order have been restored in Kashmir and its' soil cleared of the invader the question of state's accession should be settled by a reference to the people.')[1] ক্ষমতা হস্তান্তর চুক্তি অথবা Instrument of Accession-এ জনগণের ইচ্ছা বা মতামতের কোন সংস্থান নেই। সংযুক্তির সঙ্গে গণভোট (ও পরবর্তীকালে সংবিধানের ৩৭০ ধারা) যুক্ত করে কাশ্মীর সমস্যাকে স্থায়ী ও আন্তর্জাতিক রূপ দিয়ে জটিল করা হয়েছে।

দেশভাগের পর জিন্নার ধারণা হয়েছিল, কাশ্মীর যখন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ—তখন এই দেশীয় রাজ্যটির পাকিস্তানে যোগদান নিশ্চিত। তিনি দুই সপ্তাহ কাশ্মীরে অবকাশ যাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মহারাজা হরি সিং আপত্তি জানান। ক্ষুব্ধ হন মহম্মদ আলি জিন্না; আহত হয় তাঁর আত্মাভিমান। পরিকল্পনা অনুযায়ী হত্যা-লুণ্ঠন-ধর্ষণে মত্ত না হয়ে পাকবাহিনী যদি শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হত তবে ২/৩ দিনের মধ্যে মহারাজা হরি সিংহের পরাজয় (সাময়িক হলেও) ছিল অনিবার্য। জিন্নার একান্ত সচিব খুরশীদ আনোয়ারকে গোপনে শ্রীনগর পাঠানো হয়। রাজধানীর পতন হলে বিজয়ী বীরের ন্যায় মহম্মদ আলি জিন্না সগর্বে কাশ্মীরে প্রবেশ করবেন। সেই আয়োজন করার জন্যই খুরশীদ আনোয়ার শ্রীনগরে অবস্থান করছিলেন। ভাগ্য প্রতিকূল। জিন্না লাহোরে বিজয় বার্তার জন্য অধৈর্য প্রতীক্ষায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী খুরশীদ আনোয়ারকে বন্দী করে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়। যে মুহূর্তে জিন্না জানতে পারেন যে, কাশ্মীর ভারতে যোগ দিয়েছে এবং শ্রীনগর ভারতীয় সেনার অধীন; তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সেনাধ্যক্ষ Gen. Gracey-কে অবিলম্বে কাশ্মীরে সেনা পাঠাবার নির্দেশ দেন। Supreme Commander Field Marshal Achinleck* এর

* Field Marshal Achinleck ছিলেন ভারত-পাকিস্তান, এই উভয় দেশেরই Supreme Commander

1 A. S. Anand (Former CJI) The Statesman - Dt. 3-3-2002

সম্মতি ব্যতীত সেনা অভিযানে gen. Gracey তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। ২৮ অক্টোবর Field Marshal অচিনলেক জিন্নাকে জানিয়ে দেন, কাশ্মীর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য। পাকসৈন্য কাশ্মীরে প্রবেশ করলে—পাকবাহিনীতে কর্মরত সকল ইংরেজ অফিসারদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এই হুঁশিয়ারীর তাৎপর্য বুঝতে জিন্নার বিলম্ব হয় নি। তিনি অতঃপর কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার জন্য লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ও পণ্ডিত নেহেরুকে লাহোরে আমন্ত্রণ জানান।

জিন্নার সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য ভারতের গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একান্ত আগ্রহী। কিন্তু প্রবল আপত্তি জানান সর্দার প্যাটেল। প্যাটেল বলেন, পাকিস্তান আক্রমণকারী; এই অবস্থায় লাহোর যাওয়ার অর্থ হবে তোষণ নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া। (Lord Mountbatten was eager that the invitation should be accepted and that he and Nehru should go to Lahore. But Sarder was strongly opposed to either of them making the visit. He said that as Pakistan was the aggressor in this case, it was not right to follow a policy of appeasement by running after Jinnah. Nehru was inclined to agree with Lord Mountbatten.)[1] আপত্তি ছিল স্বরাষ্ট্র সচিব ভি. পি. মেননেরও। বিরোধ যেহেতু নেহেরু ও প্যাটেলের মধ্যে—মধ্যস্থতা করতে হয় গান্ধীকে। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে, লর্ড মাউন্টব্যাটেন একাই যাবেন লাহেরে।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, গিলগিট কাশ্মীর রাজ্যের একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল। ৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে এই অঞ্চল ছিল ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। সেনাবাহিনীর নাম ছিল Gilgit Scouts. ১৫ আগস্টের পর কাশ্মীর স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যরূপে স্বীকৃত হবে। ইংরেজ সরকার তার পূর্বেই গিলগিট অঞ্চল হরি সিংকে অর্পণ করেন। গিলগিটের জন্য নিযুক্ত হয় নতুন গভর্নর। ৩০ জুলাই (১৯৪৭ সালে) কাশ্মীরের চীফ অব স্টাফ মেঃ জেঃ H. L. Scott* নতুন গভর্নরকে নিয়ে গিলগিট পৌঁছে দেখেন সকল ইংরেজ অফিসার পাকিস্তান যেতে ইচ্ছুক (opted for Pakistan)। গিলগিট scouts-এর সৈন্যরাও পাকিস্তান যেতে আগ্রহী। গিলগিটে মহারাজার এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য ছিল। তাঁদের অর্ধেক শিখ, অর্ধেক মুসলমান। ব্যাটালিয়নের সেনাপতি লে. কর্নেল মজীদ খাঁন। ৩১ অক্টোবর মধ্যরাত্রে গিলগিট স্কাউটের সৈন্যরা গভর্নরের বাসভবন অবরোধ করে। পরদিন সকালে তাকে গৃহবন্দী করে গঠিত হয় অস্থায়ী সরকার।

---

* ১৫ই আগস্টের পর ব্রিগে, রাজেন্দ্র সিং মে.জে. scott-এর স্থলাভিষিক্ত হন।

---

1. V. P. Menon-The Story of the Integration of the Indian States, P-385

গিলগিটে হরি সিংহের সেনাবাহিনীর মুসলিম অফিসার ও সৈন্যরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। অ-মুসলমান সৈন্যদের অধিকাংশকেই হত্যা করা হয়। মুষ্টিমেয় সৈন্য পালিয়ে গিয়ে স্কার্দুতে কাশ্মীর সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। ৪ নভেম্বর গিলগিট স্কাউটের ব্রিটিশ কমান্ডার মেজর ব্রাউন আনুষ্ঠানিকভাবে স্কাউট শিবিরে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে।* (At midnight of 31st Oct. the Governors' residence was surrounded by Gilgit Scouts. The next moning the Governor was put under arrest and a provisional Government was established by the rebels. The Muslim elements including officers in the state force garrison had deserted; the non-Muslim elements were largely liquidated. Those who survived escaped to the hills and then joined the state force garrison at Skardu. On 4 November, Major Brown, the British Commander of the Gilgit Scouts ceremonially hoisted the Pakistan Flag in the Scouts' lines.)[1]

১ নভেম্বর লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও লর্ড ইসমে (Lord Ismay) লাহোরে জিন্নার সঙ্গে বৈঠক করেন। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে গণভোটের প্রস্তাব করেন। জিন্নার দাবি—উভয় রাষ্ট্রের গভর্নর জেনারেলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হোক গণভোট। ব্যর্থ হয় প্রথম লাহোর বৈঠক। ২ নভেম্বর পণ্ডিত নেহেরু বেতার ভাষণে বলেন ঃ রাজ্যে আইনের শাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পর কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট নিতে তিনি প্রস্তুত। (He declared his readiness, when peace and the rule of law had been established, to have a referendum held under some such international auspices as that of the United Nations.)[2]

সর্দার প্যাটেল ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলদেব সিং ৩রা নভেম্বর শ্রীনগরে কাশ্মীর রণাঙ্গনের সেনাধ্যক্ষ ব্রিগে. এল. পি. সেনের সঙ্গে সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। জম্মু-কাশ্মীরের জন্য গঠিত নতুন ডিভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর জেনারেল কলাবন্ত

** লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতের গভর্নর জেনারেল ও সর্বাধিনায়ক (commander-in-chief). Field Mershal Achinleck ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশের Supreme Commander. ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক-অসামরিক বিভাগে কর্মরত ইংরেজ অফিসারগণ স্পষ্টতই মাউন্টব্যাটেন ও অচিনলেকের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁদের যোগসাজস ব্যতীত গিলগিট স্কাউটের ইংরেজ সেনা অফিসারগণ পাকিস্তানের জন্য option দিয়েছে, বিদ্রোহ করেছে ও স্কাউটের ব্রিটিশ কমান্ডার পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেছে—এরকম ভাবনা অবাস্তব।

1. Ibid, P-386
2. Ibid, P-387

সিংকে। তাকে অবিলম্বে বারমুলা পুনদর্খলের নির্দেশ দেওয়া হয়। বারমুলা হল রাজধানী শ্রীনগরের প্রবেশদ্বার। প্রবল যুদ্ধের পর ৮ নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করে। পাকসেনাদের বর্বর অত্যাচারে এই ক্ষুদ্র শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। লোকসংখ্যা ছিল ১৪,০০০। নির্বিচার হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের পর অবশিষ্ট আছে মাত্র ১০০০। মহিলা নেই একজনও। বিদেশী সাংবাদিকদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় মুসলিম সেনারা বারমুলায় লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা ও ধ্বংসের যে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে দিল্লিতে নাদিরশাহী বর্বরতা তুলনীয়। (when the Indian troons entered the city they found that it had been stripped by the tribesmen of it's wealth and women. Out of a normal population of 14000 only one thousand were left. The devastation by the raiders was indeed ghastly, reminiscent of Nadir Sah's sacking of Delhi. A number of foreign correspondents bore testimony to the arson and pillage, loot and rape which had been indulged in by the tribesmen in Barmula.)[1]

ভারতীয় বাহিনীর বিজয় রথ দুর্বার বেগে এগিয়ে চলে। অপ্রতিবোধ্য তার গতি। পাক বাহিনী ছত্রভঙ্গ বিধ্বস্ত। সব ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে! ১১ নভেম্বর ভারত বিনা যুদ্ধে দখল করে উরি (Uri) মেজর জেনারেল কলাবন্ত (Kalawant) ৬ মাস কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১ মে তিনি Chief of General staff নিযুক্ত হন। দিল্লিতে নতুন কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তিনি জম্মু-কাশ্মীরের জন্য দুটি সেনা ডিভিশন গঠন করেন। মেজর জেঃ কে. এস. থিমাইয়া শ্রীনগর ও মেজর জেনাঃ আত্মা সিং জম্মু ডিভিশনের GOC নিযুক্ত হন। থিমাইয়া লাদাখ থেকে হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করেন। পুঞ্চ দখলমুক্ত করেন আত্মা সিং। সামরিক ইতিহাসে প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ "জওয়ানদের যুদ্ধ" বা "Battle of the Jawans" নামে খ্যাত। অনেক সময় ইঞ্চি পরিমাণ জমি পুনর্দখল করতে সেনাদের মরণ-পণ লড়াই করতে হয়েছে। কিন্তু রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সাফল্য ব্যর্থ হয় রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অবিমৃষ্যকারিতা ও অপরিণামদর্শিতায়।

২১ নভেম্বর পণ্ডিত নেহেরু ভারতের পার্লামেন্টে কাশ্মীর সম্বন্ধে একটি বিবৃতি পেশ করেন। বিগত চার সপ্তাহের সামরিক অবস্থা পর্যালোচনা করে তিনি বলেন— কাশ্মীরের জনগণকে রাষ্ট্রসংঘের তদারকিতে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ দেওয়া হবে। (On 21 Nov.-Nehru made a statement in parliament. After a

---

1. Ibid, P-388

rapid review of the events of the previous four weeks, he reiterated his promise that the people of Kashmir would be given the chance to decide their future under the supervision of an impartial tribunal such as the U.N.O.)[1] ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে Joint Defence Council-এর বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি আসেন পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁ। নেহেরু-লিয়াকত আলোচনায় স্থির হয়—

(ক) যুদ্ধ বিরতি ও কাশ্মীর ছেড়ে আসার জন্য আজাদ কাশ্মীর সেনাবাহিনীকে রাজী করাতে পাকিস্তান সরকার যথাশক্তি চেষ্টা করবে।

(খ) অতঃপর রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপনায় গণভোটের জন্য উভয় সরকার (ভারত-পাকিস্তান) রাষ্ট্রসংঘের নিকট আবেদন করবে।

চুক্তিপত্রের কালি শুকোবার পূর্বেই লিয়াকত আলির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় জেহাদের আহ্বান। দিল্লি থেকে করাচী ফিরে গিয়ে তিনি দলে দলে কাশ্মীর অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য মুসলিম ভাইদের কাছে আবেদন জানান। তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা—পাকিস্তান কখনও কাশ্মীর ত্যাগ করবে না। (...that no sooner had Liaqat Ali returned to Karachi from Delhi than he encouraged more raiders to enter Kashmir and made speeches to the effect that Pakistan would never give up Kashmir.)[2] এই ঘটনায় ভারত সরকারের মনোভাব কিঞ্চিৎ কঠোর হয়। পাকিস্তানের এই দ্বি-চারিতা ও প্রকাশ্য বৈরিতায় নেহেরুর অবশ্য কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের প্রভাব তাঁর উপর খুবই ক্রিয়াশীল। নেহেরুর দুর্বলতা কোথায় তা জিন্না-লিয়াকত আলীর অজানা নয়। আলোচনার আড়ালেই তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। লিয়াকত আলি টেলিগ্রাফে লাহোরে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। Joint Defence Council- এর বৈঠকে যোগ দিতে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে সঙ্গে নিয়ে নেহেরু লাহের যান ৮ ডিসেম্বর।* When Liaquat Ali Khan telegraphed to Nehru urging the continuance of talks, Nehru at once responded and accompanied Lord Mountbatten to the meeting of the Joint Defence Council which was held at Lahore on 8 Dec.)[3] বৈঠকে লিয়াকত

* মুসলিম শাসন, দেশব্যাপী দাঙ্গার মাধ্যমে পাকিস্তান গঠনের ইতিহাস ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ২ মাসের মধ্যে কাশ্মীর আক্রমণ—এই পরিপ্রেক্ষিতেই পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বিচার্য। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি, কূটনৈতিক শিষ্টাচার; কোন নীরিখেই যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় লাহোর যাওয়া, এমনকি পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনাও অনুমোদন যোগ্য নয়।

1. Ibid, P-388
2. Ibid, P-389
3. Ibid, P-389-390

আলি শেখ আবদুল্লার অপসারণ ও একটি নিরপেক্ষ সরকার গঠনের দাবি জানান। শেখ সাহেব ছিলেন নেহেরুর ভাতৃপ্রতিম, বিশেষ প্রীতিভাজন। নেহেরু বলেন, আবদুল্লা গত ১৫ বছর ধরে কাশ্মীরে দায়িত্বশীন সরকার গঠনের জন্য আন্দোলন করেছে। কংগ্রেস অথবা পাকিস্তানে মুসলিম লীগের ন্যায় শেখ আবদুল্লা পরিচালিত জাতীয় সম্মেলন কাশ্মীরের প্রধান রাজনৈতিক দল। তিনি কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্থপতি। মহারাজার স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে তিনি কাশ্মীরে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করেছেন। আলোচনায় কোন মতৈক্য হয় না।

লাহোরে নেহেরু-লিয়াকত আলোচনা ব্যর্থ হলে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন গান্ধী-নেহেরুকে বলেন কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হল রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হওয়া। নেহেরু সম্মত হন। তীব্র আপত্তি জানান মন্ত্রীসভার সদস্যগণ। ১৯৪৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর ভারত সরকারিভাবে কাশ্মীরে গণভোটের জন্য আবেদন জানান। ৪৮ সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিযুক্ত কমিশন নয়াদিল্লী ও করাচী পরিদর্শন করে। উভয় সরকারই গণভোট সংক্রান্ত কমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ভারত সরকার মনে করে এই অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন। ভারত উদ্যোগী হয়ে সেনাধ্যক্ষ Sir Roy Bucher -কে নির্দেশ দেন যে, পাক সেনাধ্যক্ষ Sir Doglus Gracey-কে জানিয়ে দেওয়া হোক যে পাকিস্তান রাজী হলে ভারত যুদ্ধ বিরতি চায়। ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারী মধ্য রাত্রি হতে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। (...the Government of India saw no reason why hostilities should not cease at once,....They accordingly, on their own initiative, directed their commander-in-chief, Sir Roy Bucher to inform Sir Doglus Gracey, Commander-in-chief of Pakistan that the Indian troops would cease fire, provided, the commander-in-chief of Pakistan could give an assurance of immediate effective reciprocal action on his part, which he did. A cease fire was ordered by both Army Commanders to take effect from midnight of 1-Jan.-1949.)[1]

নেহেরু সরকারের এই সিদ্ধান্তে কাশ্মীর রণাঙ্গনে সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়। নেহেরু পূর্বাহ্নেই আপস আলোচনা বা যুদ্ধ বিরতিতে সেনাবাহিনীর বিরোধিতার সম্ভাবনা অনুমান করেছিলেন। তাই "দিল্লীর সদর দফতর থেকে সৈন্য, রসদ ইত্যাদি পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হয়, এবং এ সত্ত্বেও যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী হানাদারদের বিরুদ্ধে সাফল্য অব্যাহত রাখে, তখন সদর দফ্তর থেকে গতিপথ পরিবর্তনের অবিশ্বাস্য নির্দেশ আসে, যাতে পাকিস্তানের হানাদাররা পরাজয় থেকে অব্যাহতি পায়। ...বিজয়ের পরিবর্তে আসে

1. Ibid, P-393

অচলাবস্থা। এ সবের ব্যাখ্যা সীমাহীন ভাবে লজ্জাজনক।" লিখেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক শ্রীজয়ন্ত কুমার রায় (আনন্দবাজার পত্রিকা-২২-৬-১৯৯৯)।

কাশ্মীরের প্রায় অর্ধাংশ তখনও পাকিস্তানের অধিকারে। কিন্তু রণক্ষেত্রের সর্বত্রই ভারত পাল্টা আক্রমণ করে এগিয়ে চলেছে, সামরিক অবস্থা অনুকূলে; বলছেন শ্রী মেনন। (By this time, let me add, the initiative was definitely in our favour along the entire front.)[1] এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের নিকট গণভোটের আবেদন পাকিস্তান প্রথম করেনি—করেছে ভারত। যুদ্ধ বিরতির উদ্যোগ নিয়েছে ভারত, পাকিস্তান নয়। শত্রু যখন পলায়মান, জয় নিশ্চিত; তখন বিজয়ী শক্তি যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে, এরকম ঘটনা যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই পর্বত প্রমাণ ভ্রান্তি কি অজ্ঞতা প্রসূত?

খণ্ডিত ভারতের যোগ্যতম প্রথম স্বরাষ্ট্র সচিব V.P. Menon তাঁর The Story of The Integration of The Indian States নামক গ্রন্থে বলেছেন, ভারত বারংবার উঃ পঃ সীমান্ত দিয়ে বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। পাকিস্তান তার জন্মের ২ মাসের মধ্যে উঃ পঃ সীমান্ত পথেই আক্রমণ করেছে কাশ্মীর। মাতৃভূমির নিরাপত্তার জন্যই কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত করে সীমান্ত সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। তিনি জাতিকে সতর্ক করে বলেছেন ঃ আজ শ্রীনগর, আগামীকাল দিল্লি। যে জাতি তার ইতিহাস অথবা ভূগোল বিস্মৃত হয়, তার বিনাশ আসন্ন। (Srinagar today, Delhi tomorrow. A nation that forgets its history or geography does so at its' peril.)[2]

এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখেছি নৈরাশ্যবাদী, অহিংসা তত্ত্বে বিশ্বাসী জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম কিভাবে ভারতীয় জনমানসকে প্রভাবিত করেছে। এই অহিংসাকে সম্রাট অশোক রাজধর্মরূপে গ্রহণ করেন, উপেক্ষিত হয় সামরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা। বৈদেশিক আক্রমণ হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী। ঐতিহাসিক Will Durant তাই যথার্থই বলেছেন, হিন্দুরা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রহণ করে তাঁদের উদ্যম ও তেজকে নষ্ট করেছে, জাতিকে করেছে দুর্বল। এই জাতীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হুণ ও মুসলমান আক্রমণ করেছে ভারত। সহস্র বৎসরের পরাধীনতায় অহিংসার মোহজাল বোধকরি কিঞ্চিৎ শিথিল হয়। হিন্দু উপলব্ধি করে ক্ষাত্র-নীতির গুরুত্ব। আবির্ভাব ঘটে রানা প্রতাপ, শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিংহের। পতন হয় মোগল সাম্রাজ্যের। কিন্তু যুগ যুগ ধরে দাসত্বের নিগড়ে বদ্ধ শোষিত উৎপীড়িত যে জাতি, তার দুঃস্বপ্নের রজনীর কি এত শীঘ্র অবসান হয়?

---

1. Ibid, P-393
2. V. P. Menon—The Story of the Integration of The Indian States, P-394

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। শান্তি ও অহিংসার নব অবতার। এক লক্ষ্য তাঁর—হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। যে মুসলিম জাতি শত শত বৎসর ধরে ভারতে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে, রচনা করেছে পৈশাচিক বর্বর নৃশংতার নব নব অধ্যায়, তার সঙ্গে সম্প্রীতিকেই গান্ধী জাতীয় মুক্তির প্রথম শর্তরূপে ঘোষণা করেন। তাঁর হিন্দু-মুসলিম মিলনের শ্লোগান বাস্তবে নির্লজ্জ মুসলিম তোষণে রূপান্তরিত হল। গান্ধীর বশংবদ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে পণ্ডিত নেহেরু ছিলেন গান্ধীর সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু মুসলিম তোষণে তিনি ছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্য।

গান্ধী-নেহেরুর মুসলিম তোষণ নীতির পরিণাম, ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে ভারত বিভাগ। পাকিস্তানের দৃষ্টিতে কাশ্মীর যুদ্ধ হল পাকিস্তান আন্দোলনের অসমাপ্ত অধ্যায়ের অংশ বিশেষ। ৪ঠা নভেম্বর এক বেতার ভাষণে লিয়াকত আলি খাঁ বলেন ১৮৪৬ সালে যে কলঙ্কিত অমৃতসর চুক্তির বলে (গুলাব সিং) কাশ্মীরের অধিকার পেয়েছে তা "অবৈধ ও অনৈতিক।" (This was followed on 4 Nov. by a broadcast from Lahore by Liaqat Ali Khan. He laid stress on the immoral and illegal ownership" of Kashmir resulting from the "Infamous" Amritsar Treaty of 1846.)[1]

শেখ আবদুল্লাও অমৃতসর চুক্তির সমালোচনা করেছেন। কাশ্মীরে মুসলিম শক্তির পরাজয় হিন্দু শক্তির পুনরুত্থান মুসলমান মেনে নিতে পারেনি। হিন্দু মহারাজা হরি সিংহের বিরুদ্ধে শেখ আবদুল্লার আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কাশ্মীরে মুসলিম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। একই উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে পাকিস্তানি আক্রমণ।*

১৯৪৯ সাল। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর. ভারত যুক্তরাষ্ট্রের আইন মন্ত্রী ও সংবিধান খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান। কাশ্মীরের ওয়াজির-ই-আজম্ (প্রধানমন্ত্রী) শেখ আবদুল্লা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কাশ্মীরের জন্য বিশেষ রক্ষা কবচের অনুরোধ করলে—ডঃ আম্বেদকর তাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন ঃ আপনি চান, ভারত কাশ্মীরকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করুক ও ভারতের সর্বত্র কাশ্মীরিদের জন্য সমান অধিকার। অথচ কাশ্মীরে ভারত ও ভারতীয়দের অধিকার স্বীকারে আপনি অসম্মত। আমি ভারতের আইনমন্ত্রী। জাতির স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারি না। (You want India to

---

* অর্ধ শতাব্দী পরে কাশ্মীরের All Party Huryat Conference (মুসলিম জেহাদী গোষ্ঠীসমূহের রাজনৈতিক সংগঠন)-এর নেতা সৈয়দ আলী শা গিলানী বলেন ঃ জম্মু-কাশ্মীরে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও ইসলামিক রাজত্বের প্রতিষ্ঠায় APHC অঙ্গীকারবদ্ধ। (The APHC is committed to Propagating Islam and create an Islmic Society in Jammu and Kashmir - Hindustan Times Dt. 20. 6. 2001)

1. Ibid, P-387

defend Kashmir, give Kashmiris equal rights all over India, but you want to deny India and Indians all rights in Kashmir. I am a law Minister of India, I can not be a party to such a betrayal of the National interests.-The statesman-5.4.94) ওই বৎসরের ১৭ অক্টোবর মৌলানা হসরত মোহানী সংবিধান সভার বিতর্কে অংশ নিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে জম্মু-কাশ্মীরের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। তাঁর সতর্ক বাণী ঃ কোন বিশেষ ব্যবস্থা ভবিষ্যতে কাশ্মীরের পক্ষে (ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে) স্বাধীনতা অর্জনে সহায়ক হবে। (The grant of a special status would enable Kashmir to assume independence afterwards-The Statesman-15.4.1994) ভারতের আইনমন্ত্রী যা করতে সম্মত হন নি; ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে তাই করেছেন।

সকলের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে পণ্ডিত নেহেরুর নির্দেশে শেখ আবদুল্লার দাবি অনুযায়ী সংবিধানে বহু বিতর্কিত ৩৭০ ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়। আজ হিন্দু-রক্তে রঞ্জিত কাশ্মীর যে মূল জাতীয় স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্নতাবাদের লীলাভূমি তা নেহেরুর বিশেষ অবদান।*

কাশ্মীর যুদ্ধে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের ভূমিকা বিতর্কিত। পণ্ডিত নেহেরু ছিলেন মাউন্ট ব্যাটেনের একান্ত অনুগত। উভয়ের গোপন ষড়যন্ত্রে ভারতের উদ্যোগে কাশ্মীর যুদ্ধ বিরতি; ব্যর্থ হয় সহস্র জওয়ানের মহৎ আত্মবলিদান। কাশ্মীর তাই আজও রক্তাক্ত...।

কাশ্মীর যুদ্ধে নেহেরুর ভূমিকা ঃ

কাশ্মীর যুদ্ধের এই লজ্জাজনক পরিণতির জন্য কেহ কেহ ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী করেন। তাঁদের মতে সরলমতি নেহেরু ব্রিটিশ সরকারের চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। দেশভাগের পর ভারতের সেনাবাহিনী তিনটি আঞ্চলিক Command-এ বিভক্ত ছিল—Eastern, Western and Southern। স্থল-বিমান ও নৌ-শক্তিতে পাকিস্তান অপেক্ষা ভারত কয়েকগুণ শক্তিশালী। তা সত্ত্বেও কাশ্মীরে যুদ্ধ চলেছে প্রায় এক বৎসর দুই মাস। এবং তার পরও কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ ভূ খণ্ড পাকিস্তানের অধিকারে। অথচ সদ্য সমাপ্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, Blitzkrieg বা ঝটিকা আক্রমনে মহাশক্তিধর দেশের বিরুদ্ধেও অসাধারণ সাফল্য লাভ করা সম্ভব। তবে কাশ্মীর

---

* মুসলিম তোষণে নেহেরু ছিলেন অদ্বিতীয়। তোষণ নীতিকে বৈধতা দান ও খণ্ডিত ভারতের অবশ্য পালনীয় রাষ্ট্রীয় কর্তব্যরূপে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি রক্ষাকবচ স্বরূপ আমদানি করেন "ধর্মনিরপেক্ষতা" (যা সর্ব অর্থেই ধর্ম ও ঈশ্বর বিরোধী) নামে অভিনব এক তত্ত্ব। আমরা পূর্বেই দেখেছি জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা নীতিতে ভারত হয়েছে হীনবল; আর ধর্ম নিরপেক্ষতা ভারতকে করেছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধশূন্য বীর্যশুষ্ক কাপুরুষ।

রণাঙ্গনে এরূপ বিপর্যয়ের কারণ? সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা অথবা সরকারের যুদ্ধ-পরিচালন ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্য? বিষয়টি বিতর্কিত। কিন্তু সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি।

(ক) কাশ্মীরের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের আগ্রাসী পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভারত সরকারের অনবহিত থাকার কথা নয়। অথচ সরকারের অসামরিক ও সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ সংগ্রহ করেনি। আক্রমণের ৪৮ ঘণ্টা পরে পাক সেনাধ্যক্ষের মারফত ভারত সরকার সংবাদ পায় যে কাশ্মীর আক্রান্ত।

(খ) এর পরেও ভারত সরকার নিষ্ক্রিয় থাকে। মহারাজা হরি সিং সাহায্যের জন্য জরুরী আবেদন (SOS) পাঠালেও তা অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ, কাশ্মীর ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করা পর্যন্ত, ভারত সরকার আইনত সেখানে সৈন্য পাঠাতে পারে না। নিষ্ক্রিয়তার সমর্থনে হাস্যকর অজুহাত। আক্রান্ত দেশকে সাহায্য করার অধিকার আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতি সম্মত।

(গ) আক্রমণের ৫ দিন পর ভারত সরকার লেঃ কর্ণেল দেওয়ান রণজিৎ রাইয়ের নেতৃত্বে মাত্র এক ব্যাটেলিয়ন (প্রথম শিখ ব্যাটেলিয়ান) সৈন্য পাঠায়—সংখ্যায় মাত্র ৩২৯ জন; অস্ত্র শস্ত্র অতি সাধারণ। অথচ ক্ষুদ্র পাকিস্তানের বিশাল হানাদার বাহিনী ছিল উন্নতমানের আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত।

ইচ্ছে করলে এই সময়ের মধ্যে ভারত সরকার পর্যাপ্ত সমরোপকরণ সহ কয়েক ডিভিশন সৈন্য কাশ্মীরে মোতায়েন করতে পারত। সরকার যুদ্ধের কোন পর্যায়েই কাশ্মীর রণাঙ্গনে পর্যাপ্ত সৈন্য পাঠায়নি। যদি পাক-বাহিনী ধর্ষণ-হত্যা-লুণ্ঠনে কালক্ষেপ না করত তবে কাশ্মীরের পতন ছিল অনিবার্য।

কাশ্মীরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র Western Command-কে নিয়োজিত করা হয়। পাল্টা আক্রমণের (counter offensive) কোন পরিকল্পনা ছিল না। সে কারণেই পাঞ্জাব ও রাজস্থানে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হয়নি। বিমান বাহিনীকে নিয়োগ করা হয় শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের সাহায্য ও রসদ সরবরাহের কাজে; মূল পাক ভূ-খণ্ডে আক্রমণ থেকে বিরত রাখা হয়। নৌবাহিনীকেও ব্যবহার করা হয়নি। এ সকলই কিন্তু রণ-নীতির বিরোধী। শত্রুকে পাল্টা আঘাত করে যুদ্ধকে শত্রু-ভূমতে নিয়ে যাওয়া হল রণ-শাস্ত্রের প্রথম শর্ত। কাশ্মীরে যুদ্ধ হয়েছে আত্মরক্ষামূলক (Defensive)—তাও পরিকল্পিতভাবে ধীর গতিতে। অবশেষে নিশ্চিত জয়ের মুখে কাশ্মীর বিরোধকে পাঠানো হয় রাষ্ট্রসংঘে। অথচ সরকারের নির্দেশ পেলে ভারতের সামরিক বাহিনী ৩/৪ সপ্তাহের মধ্যে কাশ্মীর হানাদার মুক্ত করে দখল করতে পারত পাকিস্তানের বিরাট ভূ খণ্ড। রাষ্ট্রসংঘ নয়—শান্তি বৈঠক হত পাকিস্তানের রাজধানীতে।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর ভারতে কাশ্মীর সহ মোট ৫২৯টি দেশীয় রাজ্য ছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারত ভুক্তির দায়িত্ব নিয়েছিলেন সর্দার

প্যাটেল। কাশ্মীরের দায়িত্ব নেন স্বয়ং নেহেরু। নেহেরু ছিলেন উচ্চাভিলাষী। ভারতের প্রধান মন্ত্রিত্ব ছিল তাঁর স্বপ্ন। তার জন্য যে কোন মূল্য দিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। গান্ধীর স্নেহধন্য নেহেরু মাউন্ট ব্যাটেনের সমর্থনের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর শঙ্কা ছিল অন্তরায় হতে পারেন জিন্না। বিচক্ষণ নেহেরু জিন্নাকে তুষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই তিনি দ্বি-জাতি-তত্ত্ব স্বীকার করে সম্মত হন দেশ-বিভাগে। এই তত্ত্ব গ্রহণ না করলে নেহেরু ভারত-বিভাগ সমর্থন করতে পারেন না। জিন্নার দাবি ছিল বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীব। বাংলা ও পাঞ্জাবের অর্ধাংশ পেতে জিন্নার অসুবিধা হয়নি। সমস্যা সৃষ্টি করে কাশ্মীর। দুমাস ইতস্তত করে অবশেষে মহারাজা হরি সিং ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করেন। অবশ্য মাউন্টব্যাটেন তাকে বলেছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে পাকিস্তানেও যোগ দিতে পারেন। নেহেরুর সমর্থন ব্যতীত মাউন্টব্যাটেন তাকে এরূপ পরামর্শ দিতে পারেন না। অবস্থাগত প্রমাণে (Circumstantial evidence) একথা নিশ্চিত বলা যায় যে, জিন্নার সঙ্গে নেহেরুর গোপন সমঝোতা ছিল; এবং কাশ্মীরকে হানাদার মুক্ত করতে সামরিক অভিযানের পরিকল্পিত ব্যর্থতা সেই নিরীখেই বিচার্য। তবেই কাশ্মীরকে নিজের অধীন রাখা, সেনা পাঠাতে অকারণ বিলম্ব, মহারাজার ভারতে যোগদানের প্রস্তাব গ্রহণে টালবাহানা, যুদ্ধ চলাকালীন লাহোরে জিন্নার সঙ্গে নেহেরু-মাউন্টব্যাটেনের আলোচনা, যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহ বন্ধ করা এবং সর্বশেষ কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের অধিকারে রেখে মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা ইত্যাদি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সাধারণের বোধগম্য হয়। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি G.S.Bajpai কাশ্মীর বিরোধ রাষ্ট্রসংঘে পাঠানোর বিরুদ্ধে মত দিলে তৎক্ষণাত তাকে পদচ্যুত করে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের পূর্বেই যদি পাকিস্তান কাশ্মীর অধিকার করতে পারত তবে সমস্যা মিটে যেত। সেই জন্যই নিষ্ক্রিয়তা ও ধীরগতি যুদ্ধ (lowintensity)। তাতেও যখন পাকিস্তান চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখে তখন অন্তত একটা অংশ পাকিস্তানের অধিকারে থাক—তাহলে জিন্নাকে প্রদত্ত নেহেরুর প্রতিশ্রুতির মর্যাদা কিঞ্চিৎ রক্ষিত হয়। লক্ষণীয় '৬৫ ও '৭১ সালের যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানের এক বিরাট অংশ দখল করে; কিন্তু আক্রমণ করে না পাক্ অধিকৃত কাশ্মীর (Pok)। অপ্রিয় হলেও স্বীকার করতে হবে, দেশ বিভাগে নেহেরু ছিলেন জিন্নার প্রধান সহযোগী। তাই বোধ হয় গান্ধীবাদী প্রবীণ সমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন ঃ ভারত বিভাগের দোষী ব্যক্তি—Guilty man of India's partition.

মুসলিম আক্রমণ, শাসন ও রাজনীতির বৈশিষ্ট্য

জগতের ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলাম এক স্বতন্ত্র মহিমায় বিরাজমান। এই ধর্মে আধ্যাত্মিক ও এই নশ্বর জগৎ খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ইসলাম ধর্মের অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস তার সর্বব্যাপী সর্বাত্মক ঐক্য। ঐক্য অন্তরে বাহিরে।

ইসলাম ধর্ম সকল বিশ্বাসীদের (মুসলমান) মধ্যে সঞ্চারিত করে এই ঐক্যবোধ। তাই তাদের আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা, আদর্শ ও বিচার ধারায় দেখা যায় এক বিস্ময়কর ঐক্য বা সাদৃশ্য। (The religious law of the Muslims has had the effect of imparting to the very diverse individuals of whom the world is composed, a unity of thought, of feeling, of ideas, of Judgement—Renan.)[1]

সর্বশক্তিমান পরম কারুণিক আল্লাহ্‌র নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য ইসলাম ধর্মের সার তত্ত্ব। আল্লাহ্ হলেন এই বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত অধীশ্বর। নবাব-বাদশাহ্‌গণ এ মর্ত্যভূমে তার প্রতিনিধি মাত্র। তাঁদের একমাত্র কর্তব্য আল্লাহ্‌র বিধানকে সকলের উপর প্রয়োগ করা। ইসলামের বিধান অনুসারে প্রত্যেক বিশ্বাসীর (মুসলমান) প্রধান কর্তব্য হল আল্লাহ্‌র পথে কাজ করা; অর্থাৎ বিধর্মীদের দেশের (Dar-ul-Harb) বিরুদ্ধে "জেহাদ"* পরিচালনা করা যতক্ষণ না সেই দেশে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় (Dar-

---

* (ক) পবিত্র মাস অবসানে—যাঁর আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য দেবতাদের উপাসনা করে, তাদের যেখানে পাবে বধ করবে। কিন্তু তারা যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তবে তাদের মুক্তি দেবে।

(খ) অবিশ্বাসীদের বল—"তারা যদি অবিশ্বাস (মিথ্যা-পৌত্তলিক ধর্মের উপাসনা) থেকে বিরত হয়—তবে তাদের অতীত অপরাধ মার্জনা করা হবে। কিন্তু তারা যদি অবিশ্বাসকেই ধরে রাখে (পৌত্তলিক ধর্মের উপাসনা করে) —তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র দীন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

A. "And when the sacred months are passed, kill those who join other deities with God, wherever ye shall find them...But if they shall convert...then let them go their way.

B. "Say to the infidels. if they desist from their unbelief, what is now past shall be forgiven them. But if they return to it fight then against them till strife be at an end, and the religion be all of it God's"–Hughes–Encyclopaedia of Islam, Quoted from Sir J. N. Sarkar–History of Aurangzib Vol-III P-163

---

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings & Speeches, Vol-8, P-234

ul-Islam) এবং সকল অবিশ্বাসী কাফের জনগণ ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়। (Islamic theology, therefore tells the true believer that his highest duty is to make "exertion (Jihad) in the path of God" by waging war against infidel lands (Dar-ul-harb) till they become a part of the realm of Islam (Dar-ul-Islam) and their population are converted into true believers.)[1]

আল্লাহ্‌র এই কঠিন নির্দেশ আমীর-ফকির নির্বিশেষে সকল মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য। মুসলমান ধর্মপ্রাণ, ধর্মভীরু। তারা কি পারে আল্লাহ্‌র এই অলঙঘ্য বিধান লঙঘন করতে? বিশেষত এই নির্দেশ পালন করে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করলে তিনি প্রীত হন। মৃত্যুর পরে বেহেস্তে দেন মহাপুরস্কার। সুতরাং ইসলামের ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী "জেহাদ"—অর্থাৎ বিধর্মীদের হত্যা অথবা তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা প্রত্যেক মুসলমানেরই পবিত্র কর্তব্য; তিনি বাদশা অথবা সাধারণ মুসলমান, যাই হোন না কেন। ইসলাম শুধু আধ্যাত্মিক জগতেই সীমাবদ্ধ নয়—সে পরিব্যাপ্ত এই পার্থিব জগতেও। মুসলমানের ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ এবং দাম্পত্য জীবনও ইসলামের বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য। ধর্মের প্রচার ও প্রসার মুসলিম রাজনীতির প্রধান অঙ্গ। সকল মুসলমান আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ ঘোষণা করে গৌরব বোধ করে। বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিক, কবি-দার্শনিক, বাদশা-বান্দা, শ্রমিক-কৃষক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মুসলমানই ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী (?) মুসলিম চিন্তানায়ক ও কবি স্যার মহম্মদ ইকবালের কবিতায় তার-ই প্রতিফলন ঃ

মনোরম তব ধরণী তখনো আছিল যে এক আজব স্থান,
পাষাণ পাদপ পূজার দৃশ্যে অদ্ভুত ছিল দুনিয়াখান।
বলিতে পার কি ভুলেও কি কেহ নিত কোনদিন তোমার নাম?
মুসলমানেরি বাহুর বলেতে পুরিয়াছে তব মনস্কাম।
কিন্তু হে প্রভু, কে তোমার লাগি তুলেছে কৃপাণ দুর্নিবার?
কে রচেছে বল, নূতন করিয়া শৃঙ্খলাহীন এ সংসার?
খায়বার-দ্বার, তুমিই বল না, কার বাহুবলে পড়িল লুটি?
রোমক রাজের অজেয় নগরী কাহার বীর্যে পড়িল টুটি?
হাতে গড়া যত পাষাণ-দেবতা করিয়াছে কে গো ধূলিসাৎ?
সত্য-বিরোধী কাফের দলের করেছে কে বল শোণিতপাত?

1. Sir J. N. Sarkar—History of Aurangzib —Vol-III P-163

কে নিভাল বল, ইরানের সেই বহ্নিকুণ্ড অনির্বাণ?
নবীন করিয়া জাগালো আবার সেখানে প্রভুর প্রেমের গান?

—শিক্ওয়া (অভিযোগ) পৃ. ২২, ইকবালের কাব্য সঞ্চয়ন
মনিরউদ্দীন ইউসুফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

এ শুধু কাব্যের অতিশয়োক্তি নয়—নির্মম ঐতিহাসিক সত্য। বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবন বতুতার মন্তব্যে তাঁর অকপট স্বীকৃতি—আরবের তরবারির শক্তিতেই অন্য দেশ ও জাতির মধ্যে ইসলামের প্রচার ঘটেছে। (Other nations embraced Islam only when the Arabs used their swords against them.)[1]

তাই মুসলিম ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিদেশী সুলতান মামুদ ও তৈমুর লঙের সঙ্গে এদেশীয় ফিরোজ শা তুঘলক, আওরঙ্গজেব, দাক্ষিণাত্যের আহম্মদ শা ও আদিল শার কোন পার্থক্য নেই। তাদের লক্ষ্য যে এক ও অভিন্ন; ইসলামের জয়ধ্বজাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পার্থক্য নেই সে যুগের মহম্মদ ঘোরী—আহম্মদ শা আবদালির সঙ্গে এ যুগের কানপুরের মহম্মদ ঘোরী অথবা কলকাতার রাজাবাজারের আহম্মদ শার। তাঁরা হিন্দুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে আক্রমণ করেছিল হিন্দুস্থান; মেতে উঠেছিল হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডব নর্তনে। এ যুগেও মুসলমানের সকল আন্দোলন—সিপাহী বিদ্রোহ, ওয়াহাবি, খিলাফৎ ও নিরবচ্ছিন্ন হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গারও সেই একই লক্ষ্য—জেহাদ। হত্যা, ধর্ষণ, মন্দির ধ্বংস ও ইসলামে ধর্মান্তরকরণ করে দার-উল-হারব হিন্দুস্থানকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার ঐকান্তিক প্রয়াস। তবে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। মহম্মদ বিন্ কাশিম—নাদির শা-বাবরের সঙ্গে ছিল লক্ষ সৈন্য ও কামান-বন্দুক। এ যুগের নাদির-বাবরদের তা নেই। কিন্তু আল্লাহ্'র নির্দেশ পালনে সমান কৃতসংকল্প।

৭১২ খ্রিঃ মহম্মদ বিন্ কাশিমের ভারত আক্রমণে যে বীভৎস রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনা, ১৯৪৭ সালের দাঙ্গায় তার একটি পর্বের সাময়িক বিরতি। প্রায় ১২০০ বছর ধরে মুসলিম আক্রমণ, শাসন, রাজনীতি ও দাঙ্গার যে চিত্র পাওয়া যায় তা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও উল্লেখযোগ্য।

* নৃশংস নির্বিচার অকারণ হত্যা। নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে, একে বলা যায় Genocide বা গণহত্যা। নিষ্ঠুরতা আদিম বর্বরতাকেও লজ্জা দেয়। লক্ষ বিধর্মীকে হত্যা করেও কোন অনুশোচনা নেই, বরং আছে আনন্দের উল্লাস।

---

* ইসলামের বিধানে গো-হত্যা বা গো-মাংস ভক্ষণ অবশ্য পালনীয় নিয়ম নয়। কোন মুসলমান হজে গিয়ে মক্কা-মদিনায় আল্লাহ্র নামে গো-হত্যা করে না। কিন্তু ভারতে গো-হত্যা আবশ্যিক। কারণ গো-হত্যা বন্ধ করা যে হিন্দুর দাবি।

---

1. R. C. Majumder–The History And Culture of the Indian people–The Delhi Sultanate, P-627

* ব্যাপক হারে বলপূর্বক ধর্মান্তর। ধর্মান্তরের রীতি-নীতিও অভিনব। গরু হিন্দুর গো-মাতা। পবিত্র, পূজনীয়। হিন্দুকে ইসলাম দীক্ষা দিয়ে প্রথমেই তাকে বাধ্যতামূলক গো-মাংস খেতে দেওয়া হয়।* এর উদ্দেশ্য হল তার পরম্পরাগত বিশ্বাস, আবাল্য-লালিত বা সহজাত সংস্কার ও ধ্যান-ধারণাকে প্রথম আঘাতেই গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া; যাতে সে হিন্দুর ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি বিরূপ ও বিদ্বিষ্ট হয়।

* মন্দির ধ্বংস ও বিগ্রহচূর্ণ করা ইসলামিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিগ্রহ শুধু ভাঙা নয়—তাকে পদদলিত করে চরম লাঞ্ছনা দেওয়ায় আছে পরম তৃপ্তি। অতঃপর বিগ্রহের ভাঙা টুকরোগুলিকে বসানো হত মসজিদের সোপানে। এ কি উদ্দেশ্যহীন? মদগর্বী বিজয়ী বীরের নিছক খেয়াল? না হিন্দুর প্রতি এ হল সতর্কবাণী ঃ "হে নির্বোধ কাফের হিন্দুগণ, তোমরা কার উপাসনা কর? দেখ সে কত দুর্বল অসহায়...তার স্থান হয়েছে মসজিদের সোপানশ্রেণীতে। প্রতিদিন সহস্র বিশ্বাসী মুসলমান তাকে পদদলিত করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপাসনা করে। যদি বাঁচতে চাও আল্লাহ্‌র শরণ নাও।"

* নারীহরণ ও নারীত্বের অবমাননা মুসলমানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোটি কোটি অসহায় হিন্দু-নারী সহস্র বছর ধরে অপহৃতা ও ধর্ষিতা হয়েছে—পরে তাঁদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে ইসলাম ধর্মে।

ধ্বংস ও হত্যা, হিন্দুকে ধর্মে ও মর্মে আঘাত দেওয়ার যে গৌরবময় ঐতিহ্য মুসলমান সৃষ্টি করেছে, একবিংশ শতাব্দীর দ্বার-প্রান্তে এসেও মুসলমান তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে। মুসলিম চরিত্রের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য মুক্তবুদ্ধি মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টিতে সম্যক পরিস্ফুট ঃ

"একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্বহানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপর যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয় এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে।"[১]

---

*(Islamic law does not insist upon the slaughter of the cow for sacrificial purposes and no Musalman, when he goes to Haj, sacrifices the cow in Mecca or Medina.)[2] সুতরাং গো-হত্যা মুসলিমের ধর্মীয় কর্তব্য না হলেও বিধর্মীর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া মুসলিমের ধর্মীয় কর্তব্য। তাই হিন্দুস্থানে গো-হত্যা।

---

১. শরৎ রচনাবলী—(তৃতীয় খণ্ড) —"বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা"

2. Dr. B.R.Ambedkar–Writings and speeches, Vol-8, P-269

ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্র

ইসলাম ঃ দার্শনিকের দৃষ্টিতে জগতের দুটি রূপ ঃ অনিত্য ও নিত্য; ইহলোক ও অনন্ত লোক। ইহলোক নশ্বর, অনন্তলোক অবিনশ্বর। মানুষের ঐহিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য আছে অনেক সংগঠন—রাষ্ট্র তাদের মধ্যে প্রধান। অনন্তলোক বা আধ্যাত্মিক জগতের জন্য আছে ধর্ম। পৃথিবীর প্রধান-প্রধান ধর্মমতসমূহের লক্ষ্য হল মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ (spiritual development), জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি নয়। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযুক্ত নয়। শুধু অনন্তলোক নয়—ইহলোকের উপরও সে দাবি করে নিরঙ্কুশ একচ্ছত্র অধিকার।

গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের মতে রাষ্ট্র হল আদর্শ ও সুখী জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে সমাজবদ্ধ মানুষের শ্রেষ্ঠ সংগঠন। রোমান দার্শনিক সিসেরো (Cicero) বলেন—"রাষ্ট্র হল অধিকার সম্বন্ধে সচেতন এবং পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধাগ্রহণের জন্য ঐক্যবদ্ধ বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টি"। নাগরিকদের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। ধর্মের ভিত্তিতে সে নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করে না। ইহলোক যেমন রাষ্ট্রের, অনন্তলোক বা অধ্যাত্মজগৎ তেমনি চার্চ বা মন্দিরের বিষয়। চার্চ ও রাজার ক্ষমতার পৃথকীকরণ থেকেই ইউরোপে "সেক্যুলারিজম" (Secularism) মতবাদের উৎপত্তি। এর অর্থ ধর্মকে নির্বাসনে পাঠানো নয়। এর প্রকৃত তাৎপর্য হল রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের অনুশাসন মেনে শুধু মাত্র সেই ধর্মের অনুগামীদের স্বার্থেই পরিচালিত হবে না।

চার্চ নয় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজার ক্ষমতাই হবে চূড়ান্ত। মুসলিম রাষ্ট্র এই নিয়মের ব্যতিক্রম।

তত্ত্বগতভাবে মুসলিম রাষ্ট্র হল ধর্মীয় রাষ্ট্র। আল্লাহ্ হলেন এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম সম্রাট। বাদশাহ হলেন পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি মাত্র। ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারেই শাসকের প্রয়োজনীয়তা—তাঁর অস্তিত্বের সার্থকতা। ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাস মুসলিম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। স্বাভাবিক ভাবেই এরূপ রাষ্ট্রে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সহিষ্ণুতা ঘোরতর অপরাধ; পাপকে প্রশ্রয় দেওয়ার শামিল। (By the theory of its origin the Muslim state is a theocracy. It's ture king is God, and earthly rulers are merely His agents....the civil

authorities exist solely to spread and enforce the true faith. In such a state, infidelity is logically equivalent to treason...Therefore, the toleration of any sect outside the fold of orthodox Islam is no better than compounding with sin.)[1]

ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুসলমানের পবিত্র কর্তব্য হল আল্লাহর* পথে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ) করা যতক্ষণ পর্যন্ত না কাফেরদের দেশ (Dar-ul-Harb) ঐস্লামিক দেশে (Dar-ul-Islam) রূপান্তরিত হয়।

বিজিত দেশের সকল সৈন্যকেই মৃত্যু অথবা ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে হবে। তাদের স্ত্রী ও সন্তানগণ গণ্য হবে দাস-দাসীরূপে (Slave)। অসামরিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ইসলামের আইন বিশারদদের অভিমত হল যে, ইসলাম গ্রহণে অসম্মত হলে তাদের নির্বিচারে হত্যা করতে হবে।

---

* বিখ্যাত-দার্শনিক-পর্যটক কেসারলিং তাঁর Travel Diary of a Philosopher-এ লিখেছেন ঃ "ইসলাম হল আল্লাহ্র নিকট নিঃশর্ত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের ধর্ম। (কিন্তু অন্যান্য ধর্মের ভগবান বা ঈশ্বরের সঙ্গে) আল্লাহ্র রূপ কল্পনায় আছে গভীর পার্থক্য। আল্লাহ্ যেন কার্মুকধারী সর্ব-অস্ত্রে সুসজ্জিত এক রণ-দুর্মদ সেনাপতি। আমাদের নিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করার নিরঙ্কুশ অধিকার রয়েছে তাঁর। তাঁর নির্দেশে আমরা সর্বদাই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। ইসলামের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেও রয়েছে কঠোর শৃঙ্খলা। এঁদের নমাজ-পাঠের মধ্যেও এই শৃঙ্খলার ভাবটি বেশ প্রকট। সকলে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সারিবদ্ধ হয়ে নমাজ পড়ছে, অঙ্গ-ভঙ্গিও সকলের এক রকম। এর মধ্যে কিন্তু হিন্দুর সাধন-পদ্ধতির শান্ত সৌম্য ভাবটি নেই। এদের নমাজ পাঠ দেখে বরং মনে হয় যেন প্রুশিয়ার সম্রাট কাইজারকে সামরিক অভিবাদন জানিয়ে তাঁর সৈন্যরা মার্চ করে সারিবদ্ধ ভাবে ধীরে-ধীরে চলে যাচ্ছে। ইসলামের এই সামরিক বুনিয়াদ হল মুসলমানের সর্ব গুণাবলীর কারণ স্বরূপ। আবার ইহাই তার মূল দোষ-ত্রুটি—যেমন, অনগ্রসরতা, পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে না চলা ও নব নব আবিষ্কারে ব্যর্থতার কারণ। সৈন্যকে শুধু আদেশ পালন করতে হয়। অবশিষ্ট সকল দায়িত্ব (সর্বাধিনায়ক) আল্লাহর"। (As a widely travelled and profound modern philosopher writes : "Islam is a religion of absolute surrender and submissiveness to God but to a God of a certain character—a war-Lord who is entitled to do with us as he will and who bids us stand ever in line of battle against the foe...The ritual of this belief embodies the idea of discipline. When the true believers every day at fixed hours perform their prayers in serried rank in the mosque, all going through the same gestures at the same moment, this is not, as in Hinduism, done as a method of self-realization , but in the spirit in which the prussian soldier defiled before his Kaiser. This military basis of Islam explains all the essential virtues of the Musalman. It also explains his fundamental defects, his unprogressiveness, his incapacity to adapt himself, his lack of invention. The soldier has simply to obey orders. All the rest is the affair of Allah.)[2]

H. Keyserling's Travel Diary of a Philosopher

1. Sir Jadu Nath Sarkar–History of Aurangzib, Vol-III, P-163
2. Sir Jadu Nath Sarkar–History of Aurangzib, Vol-III, P-171

মুসলিম রাষ্ট্রের আদর্শ

সকল বিধর্মীকে ইসলামে ধর্মান্তর ও ইসলামের প্রতি সকলপ্রকার বিরোধিতাকে নির্মূল করাই হল মুসলিম রাষ্ট্রের প্রকৃত আদর্শ। বিধর্মীদের ওপর আরোপ করতে হবে কঠোর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ। বাদশার কোষাগার হতে তাদের উৎকোচ দিতে হবে—যাতে সত্য ধর্মের আলোকে তাদের আত্মোপলব্ধি ত্বরান্বিত হয়—এবং তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সুতরাং কাফেরদের সংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধি মুসলিম রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করবে। যদি দুই দল বিধর্মী নিজেদের মধ্যে লড়াই করে তবে আদর্শ মুসলিম সম্রাট বা নবাব তা সানন্দে উপভোগ করবে। কারণ যে পক্ষই নিহত হোক না—লাভ ইসলামের। যেমন পুণ্যস্নানে কার অগ্রাহিকার—এই নিয়ে যদি দুই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মরণপণ লড়াই বাধে তবে আকবরের ন্যায় অন্যান্য মুসলিম শাসকবৃন্দেরও উচিত হবে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার রাজকর্তব্য ত্যাগ করে যুযুধান দুই পক্ষকেই সাহায্য করা, যাতে পরস্পর লড়াই করে উভয় পক্ষই নির্মূল হয় এবং কাফেরদের সংখ্যা হ্রাস পায়। (The conversion of the entire population to islam and the extinction of every form of dissent, is the ideal of the Muslim state....Political and social disabilities must be imposed on him. ...The growth of the infidel population in number or wealth would, therefore, defeat the very end of the state. Hence, a true Islamic king is bound to look on Jubilantly when this infidel subjects cut each other's throats, for "whichever side may be slain, Islam is the gainer." If for instance, two rival orders of Hindu monks fought each other to the death for precedence in bathing in a holy tank, a Muslim king like Akbar was expected to abdicate his function of guardian of the public peace and assist them in mutually thinning the number of the infidels.)[1]

মুসলিম রাষ্ট্র মুসলমানদের জন্য; সে রাজ্যে অমুসলমানদের কোন অধিকার নেই। "অ-মুসলমান মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে না; সে হীন পরাজিত-শ্রেণীভুক্ত। সে হল জিম্মা (zimma), রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির শর্তাধীনে বাস করে। তাকে মেনে নিতে হয় বিবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ। জিজিয়া করের বিনিময়ে ইসলামের বিজয়ী সেনাপতি নিতান্ত অনিচ্ছায় তাকে দিয়েছে জীবন ও সম্পত্তির

1. Khuda Bakhsh M. S. of "Khandan-I-Timuria, P-322, where Akbar's action is justified on the principle, quoted from Sir J.N.Sarkar—History of Aurangzib, Vol-III, P-164-165

অধিকার।" (A non-muslim, therefore cannot be a citizen of the state; he is a member of a depressed class; ...He lives under a contract (zimma) with the state; for the life and property that are grudgingly spared to him by the commander of the Faithful, he must undergo political and social disabilities and pay a commutation-money (jaziya.)[1]

অ-মুসলমানকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, তার জাতি পরাজিত হয়েছে। তার মর্যাদা ক্রীতদাসের সমান। তার পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ হবে তদনুরূপ। অ-মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ—সুন্দর পোশাক, অশ্বারোহণ ও অস্ত্র বহন। শাসক জাতি মুসলমানের প্রতি অ-মুসলমানের আচরণ হবে বিনম্র ও সম্ভ্রমপূর্ণ। (...he must show by humility of dress and behaviour that he belongs to a subject class. No non-muslim (zimmi) can wear fine dresses, ride on horseback or carry arms; he must behave respectfully and submissively to every member of the dominant sect.)[2]

ইসলাম শুধু রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ জারী করেই নিশ্চিন্ত থাকে না। সে নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কি না সে দিকেও তার সতর্ক দৃষ্টি। এইজন্য নবাব-বাদশাদের দরবারে মৌলভী বা ইমামদের জন্য ছিল নির্দিষ্ট আসন। তারা বাদশাহর সঙ্গে যেতেন রণক্ষেত্রে (পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে)। শুধু ইমাম নন, মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যেতেন দরবারের ঐতিহাসিক; জেহাদের বিবরণ তারা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। ১৫৬৯ সাল। গুপ্তচর মারফত হোসেন খাঁ মিথ্যা সংবাদ পান যে শিবালিক পর্বতের উপর অবস্থিত হিন্দু মন্দিরের ইট সোনা ও রূপার তৈরি এবং মন্দিরে আছে বিপুল ধন-রত্ন। তিনি মন্দির আক্রমণ করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্-বাদাউনি (Al Badayuni) তাঁর বিবরণীতে এই যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। দাক্ষিণাত্যের নবাব আদিল শাহ। অতুল ঐশ্বর্যের লোভে আক্রমণ করেন হিন্দু রাজ্য বিজয়নগর (কর্ণাটক)। পাশবিক হত্যা ও বর্বর অত্যাচারের এই অভিযান সম্বন্ধে আদিল শা-র সভা ঐতিহাসিকের মন্তব্য—একটি মহতী সংকল্পের সার্থক রূপায়ণ। (...in 1569, when a noble named Husain Khan went on a private predatory expedition into the Sewalik mountains on "hearing that the bricks of the temples were of silver and gold, and conceiving a desire for this and all other unguarded treasures, of which he had heard a lying

1. Ibid, P-165
2. Ibid, P-165

report," the pious historian Al Badayuni calls it a religious war. When Muhammad Adil Shah sent his armies to attack the Hindus of the Karnataka, whose only fault was their wealth, his court historian designated this campaign of slaughter, rapine and outrage as the realization of a long cherished pious resolution.)[1]

ইসলাম সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ ধারণা মুসলিম রাষ্ট্রের স্বরূপ ও আদর্শ উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে ইসলামের ভাব-রূপ ঃ

"তারা (মুসলমান) একমাত্র আল্লাহ্য় বিশ্বাসী এবং মহম্মদ তার শেষ পয়গম্বর। এর বাইরে আর যা কিছু আছে তা শুধু মন্দ-ই নয়, তা তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করতে হবে। যে নর বা নারী আল্লাহ্য় বিশ্বাস করে না—তাদের করতে হবে হত্যা। যে বই (আল্লাহ্ ব্যতীত) অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞান দান করে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। (এই কারণেই) প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত পাঁচশো বছর ধরে বিশ্ব-ব্যাপী প্রবাহিত হয়েছে শোণিত-স্রোত। এই হল ইসলাম বা মহম্মদবাদ।" (They believe in one God (Allah) and Mohammad is his last prophet. Everything beyond that not only is bad but must be destroyed forthwith; at a moment's notice, every man or woman who does not exactly believe in that must be killed...Every book that teaches anything else must be burnt. From the Pacific to the Atlantic, for five hundred years blood ran all over the world. That is Mahammadenism.)[2]

এই হল ইসলামের মর্মবাণী। অ-মুসলমানদের নির্বিচার হত্যা ও ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লার শাসন—দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছে মুসলিম রাষ্ট্রের। মুসলিম রাষ্ট্র হল ইসলাম ধর্মের রাজনৈতিক সংগঠন। সুতরাং তত্ত্বে ও কার্যে ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের আদর্শ এক ও অভিন্ন। বর্তমান যুগেও এর কোন পরিবর্তন হয়নি। কোন মুসলিম রাষ্ট্রের নিজেকে ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষণা করা না করা অর্থহীন।* মুসলমান ধর্মপ্রাণ। কোরানের নির্দেশ সে লঙ্ঘন করবে কেন? তবে বাস্তব পরিস্থিতি অনুকূল নয়। ইসলামের গৌরব রবি অস্তমিত। আজ আর বিজয়োন্মত্ত মুসলিম বাহিনীর পদভরে মেদিনী কম্পিত হয় না। তদুপরি মুসলমান রাষ্ট্রগুলি অ-মুসলমান বিশ্বের উপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। তাই নীরবতাই বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

---

* দেশটি মুসলমান শাসিত-এই তার সত্য-পরিচয়

1. Sir J. N. Sarkar—History of Aurangzib, Vol-III, P-168
2. The complete works of Swami Vivekananda, Vol-IV, P-126

মুসলিম শাসনে হিন্দু ও হিন্দুমন্দির

হিন্দুর অবস্থা ঃ

ভারতবর্ষ মানব সভ্যতার জনয়িত্রী। পাশ্চাত্য মনীষী ও ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্স মুলার বলেছেন ঃ ভূ-মন্ডলে যদি এমন কোন দেশ থাকে, যে দেশটি প্রকৃতির অকৃপণ দানে শক্তি-সম্পদ ও সৌন্দর্যে নন্দনকাননতূল্য তবে তা হল ভারতবর্ষ। এই অবনী তলে যদি কোন দেশে মানব আত্মার চরম বিকাশ হয়ে থাকে তবে তা হল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ বিশ্বে অনন্য ও অদ্বিতীয়। মানব মনের যে কোন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করতে হলে— তা ভাষা, ধর্ম, পূরাণকাহিনি, দর্শন, আইন, রীতি-নীতি, প্রাচীন শিল্পকলা ও বিজ্ঞান, যাই হোক না কেন, যেতে হবে ভারতবর্ষে। কারণ, মানব ইতিহাসের সর্বাধিক মূল্যবান ও শিক্ষামূলক উপাদানসমূহ কেবলমাত্র এই ভারতবর্ষেই সংরক্ষিত আছে। (If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow in some parts a very paradise no earth—I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed...I should point to India...India occupies a place second to no other country. Whatever sphere of the human mind you may select for your special study, whether be it language or religion, or mythology or philosophy, whether sphere of the human mind you select for your special study, whether be it language or religion, or mythology or philosophy, whether it be laws or customs, primitive art or primitive science, everwhere, you have to go to India...because some of the most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India, and in India only.)[1]

মহান এই সভ্যতার ভিত্তি ছিল তপোবন। নগর সভ্যতার বিকাশের পর মন্দির হল সেই সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু। হিন্দুস্থানের মন্দির একদিকে যেমন ছিল সমাজের সকলের

1. F. Max Muller—India—What can it teach Us?, P-6. 13

মিলন ক্ষেত্র, তেমনি অন্যদিকে তা ছিল জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার পীঠস্থান। প্রায় সকল মন্দিরেই ছিল সুবৃহৎ গ্রন্থাগার। ইংরেজ কখনও কোন গ্রন্থ ধ্বংস করেনি* বরং প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করে গবেষণা করেছে। তাই ভারতবর্ষ ফিরে পেয়েছে তার হারিয়ে যাওয়া অতীতকে।

পক্ষান্তরে মুসলিম আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যই ছিল মন্দির ও তার সংলগ্ন গ্রন্থাগার। বখতিয়ার খলজি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০০০ আবাসিক ছাত্রকে হত্যা করে এবং সুবিশাল গ্রন্থরাজিকে তাঁর সেনাবাহিনীর রান্নার জ্বালানিরূপে ব্যবহার করে। উদ্দেশ্য অতি মহৎ। একটি জাতিকে সম্পূর্ণরূপে পদানত করতে হলে তার সঞ্জিবনী শক্তি শিক্ষা-সংস্কৃতিকে সর্বাগ্রে ধ্বংস করতে হবে। মধ্যযুগে—মুসলিম রাজত্বে ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতার অগ্রগতি স্তব্ধ হল। দেখা দিল বাহ্যিক অবক্ষয়। কিন্তু কেন? মুসলিম রাষ্ট্রের আদর্শের মধ্যেই তার কারণ নিহিত।

স্যার যদুনাথ সরকারের বিশ্লেষণে ঃ মুসলিম রাষ্ট্রে এক জাতি, এক ধর্ম ও এক সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকৃত। রাষ্ট্র হল একটি ধর্মীয় সংগঠন—যা ইসলামের সর্বোচ্চ সেনানায়কের নির্দেশে শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের (মুসলমান) দ্বারা পরিচালিত হবে। এই রাষ্ট্রে অবিশ্বাসীদের কোন স্থান নেই। ...মূল তত্ত্ব অনুযায়ী সকল অ-মুসলমান মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রু। রাষ্ট্রের স্বার্থেই তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও ক্ষমতা খর্ব করা প্রয়োজন। সর্বোত্তম আদর্শ হবে তাদের নিশ্চিহ্ন করা, যেমন হিন্দু, জরোসথ্রীয়ান ও খ্রিস্টানদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে (কখনও সম্পূর্ণ কখনও নামমাত্র সংখ্যক রেখে দেওয়া হয়েছে) আফগানিস্তান, পারস্য ও নিকট প্রাচ্যে। (The poison lay in the very core of Islamic theocracy. Under it there can be only one faith, one people and one all overriding authority. The State is a religious trust administered solely by His people (faithful) acting in obedience to the Commander of the Faithful, who was in theory, and very often in practice too, the supreme General of the Army of militant Islam. There could be no place for non-believers. ...Thus by the basic conception of the Muslim State all non-Muslims are its enemies, and it is in the interest of the state to curb their growth in number and power. The ideal aim was to exterminate them totally, as Hindus, Zoroastrians and Christian nationals have been liquidated (sometimes totally, sometimes leaving a negligible remnant behind), in Afganistan, Persia and the Near East.)[1]

* কিন্তু সাম্রাজ্যের স্বার্থে আর্য-দ্রাবিড় তত্ত্ব আবিষ্কার করে ইতিহাস বিকৃত করেছে।

1. R. C. Majumder—The History And Culture of The Indian People—The Delhi Sultanate, P-617-618

মুসলিম রাষ্ট্র (Dar-Ul-Islam) শুধুমাত্র মুসলমানের জন্যই। কোন অমুসলমান মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে না। তাদের জন্য রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ ঃ ইসলাম অথবা মৃত্যু। মুসলমান এই ধর্মীয় নির্দেশ কার্যকর করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। তা সত্ত্বেও হিন্দুস্থান যে হিন্দুশূন্য হয়নি তারও কারণ আছে। বিশাল এই দেশ—আয়তনে প্রায় মহাদেশতুল্য। সংখ্যায় বিরাট এক হিন্দু জাতি। তুলনায় মুসলমান ছিল নিতান্তই সংখ্যাল্প। তাদের পক্ষে হিন্দু-জাতিকে নির্মূল করা ছিল কার্যত অসম্ভব। মুসলিম শাসকদের পক্ষে এ এক গভীর সঙ্কট। ইসলাম ধর্মের বিখ্যাত তত্ত্ববিদ্—মালিক, সফি হানবল সকলেরই একই মত। অধিকৃত দেশে সামরিক অসামরিক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই হত্যা করতে হবে, যদি তারা ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে সম্মত না হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম ইমাম হানিফা। তাঁর অভিমত হল জিজিয়া করের বিনিময়ে বিধর্মীদের জীবনের অধিকার দেওয়া যেতে পারে। উদ্দেশ্য হল কাফেরদের একটা সুযোগ দেওয়া। তারা হয়তো মত পরিবর্তন করে স্বেচ্ছায় ইসলামকে বরণ করে নেবে। তাতে ইসলামেরই শক্তি বৃদ্ধি হবে। ভারতের মুসলিম শাসকগণ অগত্যা ইমাম হানিফার সিদ্ধান্তকেই মেনে নিলেন। (অনুমান অসঙ্গত হবে না, হানিফার সিদ্ধান্তও হয়তো বাস্তব পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল)। সুলতান আলাউদ্দিন খলজীকে কাজী এ সম্বন্ধে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা প্রণিধানযাগ্য। "ইসলামের বিধানে হিন্দু হল (Payer of tribute Kharaj Guzar) করদাতা। যখন তহশীলদার তাঁর নিকট রূপা দাবি করবে—তখন সে অতি বিনীত ভাবে দেবে সোনা। তহশীলদার যদি (কোন কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে) তার মুখে এক মুঠো ধুলা নিক্ষেপ করে, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেবে না—বরং বড় করে হাঁ করে সব ধুলাটিই খেয়ে নেবে। এই অমর্যাদাকর কাজের দ্বারা ইসলামের মহিমা, তার প্রতি জিম্মির (হিন্দুর) নিঃশর্ত আনুগত্য ও মিথ্যা ধর্মের অধঃপতন ও অসারত্বই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তারা ঘৃণ্য। হিন্দুকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত করা আবশ্যিক ধর্মীয় কর্তব্য। কারণ তাঁরা হল পয়গম্বরের জাতশত্রু। তাই হজরত মহম্মদ বলেছেন, তাদের হত্যা কর,* বন্দী কর, সম্পত্তি লুণ্ঠন কর, ইসলামে ধর্মান্তরিত কর।" (They are called payers of tribute, and when the revenue officer demands silver from them they should without question, and with all humility

---

* স্যার যদুনাথ সরকার বলেন ঃ 'যে ধর্ম তার অনুগামীদের শিক্ষা দেয় হত্যা ও লুণ্ঠনই হল ধর্মীয় কর্তব্য, পুণ্যের কাজ—সে ধর্ম মানবজাতির উন্নতির পরিপন্থী; বিশ্ব শান্তির পক্ষে বিপদ্জনক" (A religion whose followers are taught to regard robbery and murder as religious duty is incompatible with the progress of mankind or with the peace of the world.)[1]

---

1. Sir J.N.Sarkar, History of Aurangzib, Vol-III, P-169

and respect, tender gold. If the officer throws dirt in their mouths, they must without reluctance open their mouths wide to receive it...The due subordination of the Zimmi is exhibited in this humble payment, and by this throwing of dirt into their mouths. The glorification of Islam is a duty and contempt for religion is vain. God holds them in contempt...for he says, "Keep them in subjection." To keep the Hindus in abasement is sepecially a religious duty, because they are the most inveterate enemies of the prophet, and because the prophet has commanded us to slay them, plunder them, and make them captive, saying, "Convert them to Islam or kill them, and make them slaves, and spoil their wealth and property". No doctor but the great doctor (Hanifa), to whose school we belong, has assented to the imposition of Jizya on Hindus; doctors of other schools allow no other alternative but Death or Islam.)[1]

হিন্দুর নাগরিক অধিকার নেই। সে নির্যাতন ও দাসত্বের নিগড়ে বাঁধা। এই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা কত শোচনীয় হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ঐতিহাসিক লেন পুল (Lane Pool)-এর বিবরণ অনুযায়ী "হিন্দুদের জমির অর্ধেক ফসল রাজস্ব হিসেবে দিতে হত। গৃহপালিত সকল জীব-জন্তুর জন্য দিতে হত কর। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের উপর একই হারে কর ধার্য হত।...এই কর আদায়ের জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হত। প্রয়োজনে ২০ জন পর্যন্ত হিন্দুকে একই দড়িতে বেঁধে লাথি-ঘুসি মেরে আদায় করা হত বকেয়া রাজস্ব। হিন্দুর ঘরে সোনা-রূপা এমনকি পান-সুপারি পর্যন্ত পাওয়া যেত না। এমনই শোচনীয় ছিল তাদের অবস্থা। দুবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য নিঃস্ব, রিক্ত হিন্দু রাজকর্মচারীদের পত্নীদেরকেও মুসলমানের বাড়িতে দাসী-বৃত্তি করতে হত। হিন্দুরা তহশীলদারকে ভয় করত মারাত্মক "প্লেগ" রোগেরও অধিক" (The Hindu was taxed to the extent of half the produce of his land and had to pay duties on all his buffaloes, goats and other milch cattle. The taxes were to be levied equally on rich and poor...The new rules were strictly carried out, so that one revenue officer would string together 20 Hindu notables

---

1. Sir Dr. B.R. Ambedkar—Writings & Speeches, Vol-8, P-63
   Sir J. N. Sarkar—History of Aurangzib, Vol-III, P-166

and enforce payment by blows. No gold or silver not even the betelnut, so cheering and stimulative to pleasure was to be seen in a Hindu house, and the wives of the inpoverised native officials were reduced to taking service in Muslim families. Revenue officers came to be regarded as more deadly than the plague.)[1]

মুসলিম সুলতানগণ হিন্দুদের কি নিদারুণ শোষণ-নিপীড়ন করতেন, সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তার দষ্টান্ত। হিন্দুদের চরম নিপীড়ন ও যে ধনসম্পদ বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ ছড়ায় তা থেকে তাদের বঞ্চিত করার জন্য আলাউদ্দিন তার উপদেষ্টাদের নিয়ম-কানুন তৈরি করতে বলেন। জনৈক মুসলিম ঐতিহাসিক বলেন কোন হিন্দু মাথা উঁচু করার সাহস পেত না। তাদের ঘরে ছিল না সোনা বা রূপা, কর আদায়ের জন্য কিল-মুষ্টি, শেকল দিয়ে বাঁধা, গুদাম ঘর বা জেলে আটক রাখা প্রভৃতি সব রকম পদ্ধতি ব্যবহার করা হত। (The usual policy of the Sultans was clearly sketched by Ala-ud-din, who required his advisers to draw up "rules and regulations for grinding down the Hindus, and for depriving them of that wealth and property which fosters disaffection and rebellion." "No Hindu", says a Moslem historian, "could hold up his head, and in their houses no sign of gold or silver...Blows, confinement in the stocks, imprisonment and chains, were all employed to enforce payment.")[2] হিন্দুর নিষিদ্ধ ছিল অশ্বারোহণ, সঙ্গে অস্ত্র রাখা, মহার্ঘ পোশাক পরা ও সর্ব প্রকার বিলাসিতা (The Hindu was to be left unable to keep a horse to ride on, to carry arms, to wear fine cloths, or to enjoy any of the luxuries of life.)[3]

শেখ হামদানী রচিত Zakhirat-ul-Muluk গ্রন্থে বর্ণিত খলিফা ওমরের অ-মুসলমানদের সম্পর্কে ২০ দফা নির্দেশনামা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঃ

অ-মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ —

১। মুসলমান শাসিত দেশে নতুন মন্দির নির্মাণ।

২। অতি জীর্ণ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত কোন অট্টালিকার পুনর্নির্মাণ।

৩। মুসলিম যাত্রীদের মন্দিরে থাকতে বাধা দেওয়া যাবে না।

---

1. Dr. B. R. Ambedkar—Writings & Speeches, Vol-8, P-62
2. Will Durant-The Story of Civilisation, P-462
3. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol-8, P-62

৪। অ-মুসলমানের গৃহে তিনদিনের জন্য আশ্রিত কোন মুসলমান অতিথি প্রয়োজনে বেশি দিন থাকলেও তার অপরাধ হবে না।
৫। অ-মুসলমানদের গুপ্তচর পদে নিয়োগ এবং গুপ্তচরদের সাহায্য-সহযোগিতা।
৬। তাদের (অ-মুসলমান) মধ্যে কেহ যদি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়—তবে তাকে নিবারণ করা যাবে না।
৭। মুসলমানদের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।
৮। জিম্মীদের সমাবেশে কোন মুসলমান এলে তার প্রবেশাধিকার থাকবে।
৯। মুসলমানের ন্যায় পোশাক পরিধান।
১০। মুসলিম নাম ব্যবহার।
১১। নিষিদ্ধ তাদের অশ্বারোহণ।
১২। নিষিদ্ধ তীর-ধনুক ও তরবারি রাখা।
১৩। সিলমোহরাঙ্কিত আংটির ব্যবহার অথবা আঙুলে সিলমোহর আঁকা।
১৪। নিষিদ্ধ মদ্যপান ও বিক্রি।
১৫। যে পোশাক মুসলমান হতে তাদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে তা কখনও তারা ত্যাগ করবে না।
১৬। মুসলমানদের মধ্যে বহু দেবতা ও পৌত্তলিকতার রীতি-নীতি প্রচার।
১৭। মুসলিম বসতির কাছে গৃহনির্মাণ।
১৮। মুসলিম কবরখানার কাছে শবদেহ আনয়ন।
১৯। প্রিয়জনের মৃত্যুতে উচ্চস্বরে বিলাপ।
২০। মুসলিম ক্রীতদাস ক্রয়।

(Rulers should impose these conditions on the zimmis of their dominions and make their lives and their property dependent on their fulfilment. The twenty conditions are as follows :

1. In a country under the authority of a Muslim ruler, they are to build no new homes for images or idol temples.
2. They are not to rebuild any old buildings which have been destroyed.
3. Muslim travellers are not to be prevented from staying in idol temples.
4. No Muslim who stays in their houses will commit a sin if he is a guest for three days, if he should have occasion for the delay.

5. Infidels may not act as spies or give aid and comfort to them.
6. If any of their people show any inclination towards islam, they are not to be prevented from doing so.
7. Muslims are to be respected.
8. If the zimmis are gathered together in a meeting and Muslims appear, thev are to be allowed at the meeting.
9. They are not to dress like Muslims.
10. They are not to give each other Muslim names.
11. They are not to ride on horses with saddle and bridle.
12. They are not to possess swords and arrows.
13. They are not to wear signet rings and seals on their fingers.
14. They are not to sell and drink intoxicating liquour openly.
15. They must not abandon the clothing which they have had as a sign of their state of ignorance so that they may be distinguished from Muslims.
16. They are not to propagate the customs and usages of polytheists among Muslims
17. They are not to build their homes in the neighbourhood of those of Muslims.
18. They are not to bring their dead near the graveyards of Muslims.
19. They are not to mourn their dead with loud voices.
20. They are not to buy Muslim slaves.)[1]

শুধু তত্ত্ব নয়; মুসলিম ইতিহাস সাক্ষী—সকল মুসলিম বিজেতা ও শাসক ধর্মের এই নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। অবিশ্বাসী কাফেরদের প্রতি ইসলামের চিরন্তন বাণী ঃ ইসলাম অথবা মৃত্যু। সুলতান মামুদ নির্মমভাবে এই ধর্মীয় নির্দেশ পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে জিজিয়া করের বিনিময়ে প্রাণ ভিক্ষা দেওয়ায় এই নির্দেশ রূপায়ণে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য দেখা দিলে মুসলমান ঐতিহাসিক ও ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌গণ

1. R. C. Majumder—The History And Culture of The Indian People, The Delhi Sultanate, P-619

ক্ষুব্ধ হন। ১৪শ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক বারণী (Barani) Fatawa-i-Jahandari গ্রন্থে লিখেছেন ঃ হিন্দুস্থানে ব্রাহ্মণরাই পৌত্তলিকতার ধারক-বাহক। সুলতান আর একবার ভারত অভিযান করলে সে দেশে সকল ব্রাহ্মণ ও লাখ লাখ নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের হত্যা করে পৌত্তলিকতা নির্মূল করত। যতদিন না সমগ্র হিন্দুস্থান ইসলাম গ্রহণ করত— ততদিন তাঁর হিন্দু-নিধনকারী তরবারি কোষবদ্ধ হত না। (If Mahmud had gone to India once more, he would have brought under his sword all the Brahmans of Hind who, in that vast land are the cause of the continuance of the laws of infidelity and of the strength of idolators, he would have cut off the heads of two hundred or three hundred thousand Hindu chiefs. He would not have returned his "Hindu-slaughtering"sword to its scabbard until the whole of Hind had accepted Islam.)[1]

Afif, সেই যুগের আর একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। তাঁর রচনা থেকে জানা যায়, দিল্লির প্রজানুরঞ্জক সুলতান ফিরোজ তুঘলকের ওয়াজির (মন্ত্রী) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলছেন ঃ রাষ্ট্রে উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—(১) রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রজা (মুসলমান) সুরক্ষা, (২) কাফের নির্মূল করে রাজ্যের সম্প্রসারণ। অতঃপর তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি—আল্লাহ্‌র কৃপায় বিধর্মী বিনাশে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। (A perusal of the history of Afif, another great historian of the period, conveys the same lesson. He puts in the mouth of the wazir of Firuz Tughluq a long speech in which he frankly says that a State should have only two ends in view, namely (1) Prosperity of the kingdom and protection of the people etc. and (2) destruction of the infidels and expansion of the kingdom. Then he adds with equal candour "...through God's grace the destruction of the infidels has achieved remarkable success.)[2]

Tarikh-i-Wassaf-এ সাফল্যের বর্ণনা আছে। সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর গুজরাট অভিযান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক লিখেছেন ঃ অবিশ্বাসী কাফেরদের শাস্তিদান ও তাদের বিগ্রহ চূর্ণ করার জন্য ধর্মীয় উন্মাদনা শিরায় শিরায় প্রবাহিত....রাজ্যজয়ের প্রলোভন নয়, ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্যে তিনি (আলাউদ্দিন) সংগ্রহ করেন ১৪ হাজার অশ্বারোহী ও ২০

2. Ibid, P-621
1. Ibid, P-621-622

হাজার পদাতিক....সেই অপবিত্র রাজ্যে মুসলিম সৈন্য ইসলামের জন্য নির্মমভাবে নির্বিচারে কাফেরদের হত্যা করে—বিধর্মীদের রক্তস্রোত জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হয়।

তারা বন্দী করে ২০ হাজার সুন্দরী সভ্রান্ত হিন্দু নারী ও অসংখ্য শিশু।...মুসলিম বাহিনীর তাণ্ডবে দেশটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়, নিশ্চিহ্ন হয় অধিবাসীবৃন্দ। তারা লুণ্ঠন করে নগর, ধ্বংস করে মন্দির; পদদলিত ও চূর্ণ করে পবিত্র বিগ্রহ। সোমনাথের মূর্তি ছিল বৃহত্তম...সেই মূর্তি ভেঙে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দিল্লিতে—তা দিয়ে তৈরি হয় জামা মসজিদের প্রবেশ পথ* জনমানসে এই বিরাট জয় চির অম্লান হয়ে থাকবে। আল্লা-হো-আকবর। (Referring to Ala-ud-din Khalji's campaign in Gujrat, the author writes : "The vein of the zeal of religion beat high for the subjection of infidelity and destruction of idols. ... with a view to holy war, and not for the lust of conquest, he enlisted...about 14,000 cavalry and 20,000 infantry. The Mahammadan forces began to kill and slaughter, on the right and on the left unmercifully, throghout the impure land, for the sake of Islam, and blood flowed in torrents.

They took captive a great number of handsome and elegant maidens, amounting to 20,000 and children of both sexes, more than pen can enumerate...In short, the Mahammadan army brought the country to utter ruin, and destroyed the lives of the inhabitants, and plundered the cities,...so that many temples were deserted and the idols were broken and trodden under foot, the largest of which one was called Somnat. ....The fragments were conveyed to Delhi and the entrance of the Jami Masjid was paved with them, that people might remember and talk of this brilliant victory...Praise be to God, the Lord of the World.)[1]

মুসলিম পর্যটক ইবন বতুতা ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত ভ্রমণে আসেন। দিল্লির সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘলক। উদার ও বিদ্যোৎসাহী রূপে যিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সুলতানের প্রসাদে ঈদ উৎসবে বন্দিনী হিন্দু নারীর নারীত্বের চরম লাঞ্ছনা ইবন বতুতার রচনায় ঃ প্রবেশ করে সঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ। যুদ্ধে যে সকল হিন্দু নৃপতি পরাজিত হয়েছেন—তাদের কন্যারা ছিল প্রথম দলে। তারা পরিবেশন করেন সঙ্গীত ও নৃত্য।

* প্রতিদিন সহস্র বিশ্বাসী মুসলমান সেই দেবমূর্তি পায়ে মাড়িয়ে প্রবেশ করবে মসজিদে;প্রতিপন্ন হবে আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব।

1. Ibid, P-625-626

সুলতান আমীর ও আইজাদের (aizza) মধ্যে তাদের বিতরণ করেন। এরপর আসে অন্য একদল হিন্দু রমণী। তারাও যথারীতি নিজ নিজ শিল্পকলা প্রদর্শন করে। সুলতান আপন ভ্রাতা, আত্মীয় ও মালিক-পুত্রদের উপঢৌকন দেয় এই সকল হতভাগ্য বন্দিনীদের। (Referring to the Id-ceremony at Delhi, in the Sultan's Palace he says : Then enter the musicians, the first batch being the daughters of the infidel rajas—Hindus—captured in war that year. They sing and dance, and the Sultan gives them away to the amirs and aizza. Then come the other daughters of the infidels who sing and dance; and the Sultan gives them away to his brothers, his relations, his brothers-in-law and malik's sons.)[1]

মুসলমানের হিন্দু-বিদ্বেষ ও হিন্দু নির্যাতনের কাহিনি স্বনামধন্য বিদগ্ধ মুসলিম ঐতিহাসিকগণ যেভাবে গৌরবের সঙ্গে বর্ণনা করেছে—তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরাও মুসলিম আক্রমণকারীর উদ্দেশ্য ও ইসলাম ধর্মের ঘোষিত লক্ষ্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। শত শত বৎসর হিন্দুস্থানে বাস করেও হিন্দুর প্রতি মুসলমানের মনোভাবের সামান্যতম পরিবর্তন হয়নি। রমেশ চন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছেন—মুসলমানের ভারত অভিযানের ছয় শত বৎসর পরে—১৪শ শতাব্দীতে যদি প্রতিথযশা মুসলিম ঐতিহাসিক নিঃসঙ্কোচে (গৌরবের সঙ্গে) এরূপ অভিমত প্রকাশ করতে পারেন তবে কেন যে হিন্দু-মুসলিম ব্যবধান কোনদিনই হ্রাস পাবে না, তা সহজেই অনুমেয়। (If a learned historian and a distinguished Muslim felt no scruple in openly expressing such views in writing, in the 14th century A.D.i.e., six hundred years after the Muslims first settled in India, one can well understand why the gulf between the Hindus and the Muslims could never be bridged.)[2]

সকল মুসলিম আক্রমণকারী ও শাসকের লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। আর তা হল সীমাহীন নৃশংস বর্বর অত্যাচারে হিন্দু জাতির প্রতিরোধ চূর্ণ করে তাকে নির্মূল করা। এই উদ্দেশ্যেই হিন্দু ধর্ম ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা অথবা চূড়ান্ত হতমান করা হয় যাতে হিন্দু জাতিকে সংগঠিত করার উদ্যম ও শক্তি-সাহস তাদের না থাকে। ধর্মীয় সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রুদ্ধ করা হয়। নিষিদ্ধ হয় নতুন মন্দির নির্মাণ ও পুরাতন মন্দিরের সংস্কার। পরাজিত

1. Ibid, P-627
2. Ibid, P-621

নির্যাতিত, নেতৃত্বহীন হিন্দুজাতির শুধু দিনাতিপাত করা ভিন্ন অন্য কোন পথ ছিল না। এইরূপ চরম প্রতিকূল হিন্দু-বিদ্বেষী রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা অচিন্তনীয়। স্যার যদুনাথ সরকার তাই যথার্থই বলেছেন, "হিন্দুর সৃজনী চিন্তার অভাব এবং উচ্চবর্ণের সংকীর্ণতা মুসলিম রাজত্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক পরিণাম।" (The barrenness of the Hindu intellect and the meanness of spirit of the Hindu upper classes are the greatest condemnation of Muhammadan rule in India.)[1] এইজন্যেই ভারত ইতিহাসে মুসলিম শাসনকাল অন্ধকারময় মধ্যযুগ নামে খ্যাত। ইওরোপে নবজাগরণের আবির্ভাব বহু পূর্বে হলেও ভারতে তার সূচনা হয় মুসলিম রাজত্বের অবসানে।

এই ঘন তমসার বুকে কখনও কি যায়নি দেখা শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রলেখা? ছিল না কি কোন মুসলিম সম্রাট প্রজাবৎসল, মহানুভব? জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ধারণায় মুসলমান ও অ-মুসলমানের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। অমুসলমান মনে করে পৃথিবীর সকল মানুষই ভগবান বা ঈশ্বরের সন্তান। তাই সকল মানুষের মধ্যে রয়েছে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এ বিশ্ব-চরাচর আমার সৃষ্টি। "চেতন অথবা জড়" সকলের মধ্যেই আমি বিরাজ করি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" কিন্তু এরূপ ধারণা ইসলাম-বিরোধী। ইসলাম ধর্মের আল্লাহ্ শুধু মুসলমানের স্রষ্টা ও পিতা—সকল মানুষের নন। তিনি মুসলমানের রক্ষক ও বিধর্মী অ-মুসলমানের বিনাশকারক। তাদের হত্যা* ও ইসলামে ধর্মান্তরিত করে সারা পৃথিবীতে মুসলমানের প্রভুত্ব (দার-উল-ইসলাম) প্রতিষ্ঠাই তাঁর চরম লক্ষ্য। সুতরাং মুসলমান শাসকের দয়া-মায়া-প্রেম, প্রজাবাৎসল্য ও মহানুভবতা মুসলিম প্রজাদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। তত্ত্বগতভাবে কখনই তা বিধর্মী জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে না। কারণ, প্রথমত তারা রাষ্ট্রের প্রজা বা নাগরিক নন, দ্বিতীয়ত তা হবে ইসলাম ধর্ম বিরোধী, এবং কার্যক্ষেত্রেও তা কখনও হয়নি। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ফিরোজ শাহ্ তুঘলক; দিল্লির সুলতান। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন

---

* ইসলামিক ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অথবা বিদ্বান উদার প্রগতিশীল কোন মুসলমান আজ পর্যন্ত কোরানের নিষ্ঠুর অমানবিক বিধানসমূহের সমালোচনা বা বিরোধিতা করেনি। তারা Holocaust ও ফ্যাসীবাদের নিন্দায় মুখর; কিন্তু ভারতে হাজার বছরের মুসলিম শাসনে যে হাজারটি Holocaust হয়েছে সে সম্বন্ধে নীরব। তারা নিন্দা করে হিটলারের। কিন্তু নিন্দা করে না হিটলারের শতগুণ অত্যাচারী মহম্মদ বিন্ কাশিম, মামুদ, ফিরোজ শা তুঘলক, তৈমুর লঙ, নাদির শা, আহম্মদ শা আবদালীদের। পাকিস্তানে ইসলামের এই সকল বীর যোদ্ধারা "জাতীয় বীর" রূপে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত। চিন্তা বা ভাব জগতে পাকিস্তানের মুসলমানের সঙ্গে ভারতের মুসলমানের কোন পার্থক্য আছে কি?

---

1 Sir J. N. Sarkar—History of Aurangzib, Vol-III, P-171

বারাউনির মতে ফিরোজ শাহ্ ছিলেন দয়ালু ও প্রজাবৎসল। তাঁর রাজত্বে প্রজারা সুখে শান্তিতেই বাস করত। Will Durant বলেন—ফিরোজ শাহ্ বঙ্গদেশ আক্রমণ করে প্রতি হিন্দুর ছিন্ন মুণ্ডের জন্য নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১,৮০,০০০ হিন্দুর ছিন্নশিরের জন্য তাঁকে নগদ মূল্য দিতে হয়েছে। হিন্দু ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্য তিনি হানা দিতেন প্রতি গ্রামে। (Firoz Shah invaded Bengal, offered a reward for every Hindu Head, paid for 1,80,000 of them, raided Hindu villages for slaves -Durant-P-461).

সুশাসক বিদ্যোৎসাহী সুলতান সিকন্দর লোদীর কীর্তি ঃ

জনৈক মুসলিম ঐতিহাসিকের বিবরণীতে—

তিনি এত উদ্যমশীল মুসলমান ছিলেন যে বিধর্মী কাফেরদের সকল মন্দির ধ্বংস করেন; চিহ্নমাত্র রাখেননি। সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন বর্বর ধর্মের প্রধান কেন্দ্র মথুরা। হিন্দুদের প্রধান উপাসনা কেন্দ্রসমূহে নির্মাণ করেন মাদ্রাসা ও পান্থশালা। প্রস্তর নির্মিত দেবমূর্তি ভেঙে কসাইদের দিতেন বাটখারা রূপে ব্যবহারের জন্য। মথুরার হিন্দুদের চুলদাড়ি কাটা নিষিদ্ধ হয়। নিষিদ্ধ হয় তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। কোন হিন্দুর চুলদাড়ি কাটার ইচ্ছা হলেও তিনি প্রামাণিক পেতেন না। সুলতানের ইচ্ছা অনুযায়ী সর্বত্র প্রচলিত হয় ইসলামীয় রীতিনীতি। (He was so zealous a Musalman that he utterly destroyed diverse places of worship of the infidels, and left not a vestige remaining of them. He entirely ruined the shrines of Mathura, the mine of heathenism, and turned their principal Hindu places of worship into caravanserais and colleges. Their stone images were given to the butchers to serve them as meatweights, and all the Hindus in Mathura were strictly prohibited from shaving their heads and beards, and performing their ablutions. He thus put on an end to all the idolatrous rites of the infidels there; and no Hindu, if he wished to have his head or beard shaved, could get a barber to do it. Every city thus conformed as he desired to the customs of Islam.)[1]

মহম্মদ শা, দিল্লির সুলতান। তিনি আজম হুমায়ুন জাফর খাঁকে গুজরাটের সুবেদার নিযুক্ত করেন। সুলতান স্বহস্তে নিযুক্তিপত্রে তাঁর উপাধি লিখে দেন ঃ বিদ্বান, উদার,

1. R. C. Majumder—The History And Culture of the Indian People, The Delhi Sultanate, P-626

ন্যায়পরায়ণ সুবিচারক....ইসলাম ধর্মের রক্ষক ও কাফের-নিধনকারী...। (learned, jus generous,...the defender of Islam...the exterminator of Kufer– Khwajah Nizamuddin Ahmad—Vol-3-P-I-P-174-175.)

সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বে হিন্দু ঃ

বিশ্বের কোথাও বিজয়ী ও বিজিত জাতির মধ্যে মিলনের সেতুবন্ধন গড়ে ওঠেনি। তদুপরি. হিন্দুস্থানে মুসলমান হিন্দু জাতি ও তার ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতিকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সভ্য মানুষের অকল্পনীয় পৈশাচিক বর্বরতা ও নারকীয় অত্যাচার সংঘটিত করেছে। তার মর্মস্থল রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত।

এ সত্ত্বেও কেহ কেহ মনে করেন, মুসলিম আক্রমণের প্রারম্ভিক বিরূপতা দূর হতেই উভয় জাতি সুপ্রতিবেশীর ন্যায় শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁরা বাংলায় হুসেন শাহের রাজত্বের উল্লেখ করেন। তাঁদের দাবি—দয়ালু, উদার, প্রগতিশীল প্রজাবৎসল হুসেন শাহের রাজত্বে হিন্দুরা সুখে-শান্তিতেই বাস করত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যে সে যুগের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। "চৈতন্য মঙ্গলের" রচয়িতা জয়ানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপে হিন্দুর দুরবস্থা বর্ণনা করছেন ঃ নবাব ব্রাহ্মণদের ধরে আনে, নষ্ট করে তাদের জাতি (বর্ণ), কখনও বা করে হত্যা। যদি কোন গৃহ হতে শোনা যেত শঙ্খধ্বনি, তবে গৃহস্বামীর ধন সম্পদ বাজেয়াপ্ত হত, তার জাতি নষ্ট করা হত, হয়তো বিপন্ন হত তার জীবন। যারা উপবীত ধারণ করত বা ললাটে আঁকত চন্দন তিলক—তাদের বাড়ি লুঠ করে বেঁধে আনা হত। ভাঙা হত মন্দির, উপড়ে ফেলা হত পবিত্র তুলসী গাছ। নবদ্বীপবাসীরা সর্বদাই প্রাণভয়ে দিন যাপন করত। হিন্দুদের গঙ্গায় স্নান নিষিদ্ধ হয়—কাটা হয় শত শত অশ্বত্থ ও কাঁঠাল গাছ। ....এক ব্রাহ্মণ নবদ্বীপের রাজা হবে এই গুজব শুনে গৌড়ের নবাব নবদ্বীপ ধ্বংসের আদেশ দেন। (The king seizes the Brahmanas, pollute their caste, and even take their lives. If a conchshell is heard to blow in any house, its owner is made to forfeit his wealth, caste and even life. The king plunders the houses of those who wear sacred threads on the shoulder and put sacred marks on the forehead, and then bind them. He breaks the temples and uproots Tulasi plants, and the residents of Navadvipa are in perpetual fear of their lives. The bathing in the Ganga is prohibited and hundreds of sacred Asvattha and jack trees have been cut down....Misled by the false report that a Brahmana

was destined to be the king of Navadvipa...the king (of Gauda) ordered the destruction of Nadiya.)[1]

বিজয় গুপ্ত মধ্যযুগের এক বিখ্যাত কবি। হুসেন শাহের গুণমুগ্ধ। তাঁর কাব্যে মুসলমানের হিন্দু-পীড়নের কাহিনি ঃ হাসান-হুসেন দুই কাজী। হিন্দু-নির্যাতনে তাদের অপার আনন্দ। কোন ব্যক্তির মাথায় তুলসী পাতা দেখলে হাত-পা বেঁধে তাকে কাজীর কাছে আনা হত। সেখানে ধোলাই হত উত্তম-মধ্যম। কাজীর পেয়াদা ব্রাহ্মণের উপবীত ছিঁড়ে তার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিত। একদিন এক মোল্লা জঙ্গলে এক কুটিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সেখানে রাখাল বালকেরা ঘট পেতে মা মনসার পূজা করছিল। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে মোল্লা মা মনসার ঘট ভাঙতে যায়। কিন্তু রাখাল ছেলেদের বাধায় ব্যর্থ হয়। নালিশ জানায় কাজীর কাছে, কাজী বলে, কি! হারামজাদাদের এত সাহস, আমার গ্রামে হিন্দুর পূজা! যবন খাদ্য খাইয়ে ওদের জাতি নষ্ট করতে হবে। অতঃপর কাজী ভ্রাতৃদ্বয় মায়ের (হিন্দু নারী, কাজীর পিতা বলপূর্বক বিবাহ করে) নিষেধ অগ্রাহ্য করে একদল সশস্ত্র মুসলমান নিয়ে যায় ঘটনাস্থলে। ভাঙে মা মনসার পবিত্র ঘট—ফেলে দেয় পূজা উপাচার।

আর একজন সমসাময়িক কবি ঈশান নাগর (Isana Nagara)। হুসেন শাহের শাসনে হিন্দুর অবস্থা সম্বন্ধে তিনি লিখছেন ঃ হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করাই দুর্বৃত্ত মুসলমানদের প্রধান দৈনন্দিন কাজ। তাঁরা দেবতার মূর্তি ভাঙে, ছুঁড়ে ফেলে পূজার নৈবেদ্য। শ্রীমদ্‌ভাগবত ও অন্যান্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থ তারা আগুনে পোড়ায়; ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কেড়ে নেয় শঙ্খ ও বিল্বপত্র। ...কুকুরের ন্যায় তুলসী গাছে প্রস্রাব করে, মলত্যাগ করে মন্দিরে। পূজা-অর্চনায় রত হিন্দুর গায়ে মুখের জল ছিটিয়ে দেয়; নানাভাবে উত্যক্ত করে হিন্দু সাধুদের—মনে হয় যেন একদল উন্মাদকে পাগলা গারদ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। (The wicked mlechchhas pollute the religion of the Hindus every day. They break the images of the gods into pieces and throw away the articles of worship. They throw into fire Srimad Bhagavat and other holy scriptures, forcibly take away the conchshell and bell of the Brahmanas...They urinate like dogs on the sacred Tulasi plant, and deliberately pass faeces in the Hindu temples. They throw water from their mouths on the Hindus engaged in worship, and harass the Hindu saints as if they were so many lunatics let large.)[2] শুধু

---

1. Ibid, P-632
2. Ibid, P-633

নবাবের কর্মচারী নয় সাধারণ মুসলমানও ছিল তীব্র হিন্দু বিদ্বেষী; পৌত্তলিকতা নির্মূল করতে তারাও ছিল সমান আগ্রহী। নবাব যদি হয় উদার ও সমদর্শী, তবে মুসলমান কি হতে পারে হেন অত্যাচারী?

শ্রীচৈতন্যদেব। অল্প বয়সেই গৃহত্যাগী হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে তাকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক বলা যায়। বহু মানুষের সমবেত কণ্ঠে খোল করতাল সহযোগে হরিনাম সংকীর্তন বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য—মহাপ্রভুর বিশেষ অবদান। জাতি (বর্ণ) ভেদ প্রথা হিন্দুর ধর্ম ও জাতীয় ঐক্যকে ক্ষুণ্ণ করে। শ্রীচৈতন্যদেব এই কু প্রথার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁর কাছে উচ্চ-নীচ কোন ভেদাভেদ ছিল না। নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে তিনি এই সর্বনাশা প্রথা ভাঙার চেষ্টা করেছেন। জ্ঞান নয়—ভক্তিই ছিল তাঁর ধর্মীয় মতবাদের মূল তত্ত্ব। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম পূর্ব ভারতে ধর্মীয় আন্দোলনকে নবজীবন দান করে। একদিকে ইহার দ্বারা যেমন হিন্দুধর্মের সংস্কার হয়—অন্যদিকে স্তিমিত হয় ইসলামে ধর্মান্তর। "চৈতন্য চরিতামৃত" ও "চৈতন্য ভাগবত" মহাপ্রভুর দুইখানি শ্রেষ্ঠ জীবন চরিত। এই গ্রন্থদ্বয়ে হুসেন শাহের শাসনে মুসলিম ধর্মান্ধতা ও অত্যাচারের অনেক ঘটনার বিবরণ আছে। মহাপ্রভুই প্রথম নদীয়ায় প্রকাশ্য স্থানে সমবেত কণ্ঠে হরিনাম সংকীর্তনের প্রচলন করেন। মুসলিম রাজত্বে হিন্দুর এভাবে প্রকাশ্যে ধর্মাচরণে ক্ষুব্ধ হয় নবাবের কাজী। একদিন যখন মহাপ্রভুর ভক্তরা রাস্তা দিয়ে নাম সংকীর্তন করে যাচ্ছিল, কাজী তাদের ওপর হামলা করে—ভেঙে দেয় খোল করতাল। সকলকে হুঁশিয়ারি দেয় ভবিষ্যতে যারা প্রকাশ্যে হরিনাম করার দুঃসাহস দেখাবে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কীর্তন বন্ধ করতে তিনি রাস্তায় টহলদারির ব্যবস্থা করেন। ভয় পায় নবদ্বীপবাসী হিন্দুরা। কিন্তু ভয় পান না চৈতন্যদেব। তিনি কাজীকে সমুচিত শিক্ষা দিতে মনস্থির করেন। একদিন এক বিরাট সংকীর্তন দল নিয়ে তিনি নগর পরিক্রমায় বাহির হন। পথে যোগদান করে হাজার হাজার হিন্দু। সেই বিশাল শোভাযাত্রা কাজীর বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হলে ক্ষিপ্ত কাজী সকলকে ভয়ঙ্কর শাস্তির হুমকি দেয়। হিন্দুরা ভয় পায় না—কাজীকে দেয় পাল্টা হুঁশিয়ারি। বিশাল জনসমুদ্র দেখে কাজী ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। ক্রুদ্ধ জনতা কাজীর বাড়ি আক্রমণ করে। মহাপ্রভু কাজীকে ডেকে পাঠান। কাজী এসে মহাপ্রভুর আনুগত্য স্বীকার করলে বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটে। (The two great biographies of the great Vaishnava saint Chaitanya, namely "Chaitanya Charitamrita" and the "Chaitanya Bhagavata", contain many stories of the religious bigotry of the Muslims and the consequent persecution of the Hindus....He had introduced the system of public worship in the form of kirtan... This enraged the Muslim

qazi, and one day when Chaitanya's devotees were singing the name of God in the streets of Nadiya, he came out, struck blows upon every body on whom he could lay hands, broke the musical instruments, and threatened with dire punishment all the Hindus who would dare join a kirtan party in this way in his city of Nadiya. To prevent the recurrence of public kirtan, the qazi patrolled the streets of Nadiya with a party. The people of Nadiya got afraid, but Chaitanya decided to defy the qazi's orders and brought out a large kirtan party which was joined by thousands. The qazi was at first wild with anger and held out the threat...but terror seized him when his eyes fell upon the vast concourse of people in a menacing attitude. He fled, and his house was wrecked by the angry crowd.....Chaitanya sent for the qazi who was now in a more chastened mood, and the two had a cordial talk.)[1]

এই ঘটনার পর চৈতন্যদেবের প্রতি নবাবের মনোভাবের হয়তো কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়। কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তরা আশ্বস্ত হতে পারেন না। তারা মহাপ্রভুকে বলেন এই নবাব হুসেন শাহ্ বাংলা ও উড়িষ্যার অসংখ্য মন্দির ভেঙেছে। তাঁর বর্তমান মনোভাব যে কোন মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে পারে। গৌড় বা বাংলা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। তাদের আশঙ্কা অমূলক নয়। হুসেন শাহের হিন্দু-বিদ্বেষ কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। উড়িষ্যায় হিন্দু রাজ্যের অস্তিত্ব তাঁর পক্ষে অসহনীয়। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণর প্রস্তুতি শুরু করেন। শুধু উড়িষ্যা নয় বাংলার হিন্দুদেরও শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর হিন্দুকর্মচারীদের এই জেহাদ অভিযানে সহযাত্রী করতে চেয়েছিলেন। এক হিন্দু কর্মচারী সনাতন—তিনি আবার মহাপ্রভুর বিশিষ্ট ভক্ত। হুসেন শাহ্ উড়িষ্যা অভিযানে তাকে সঙ্গী হতে বললে তিনি নির্ভয়ে বলেছিলেন ঃ আপনি আমাদের দেব-দেবীর মূর্তি ও মন্দির ভাঙতে যাচ্ছেন—আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি না। (You are going to torment our gods (i.e. destroy the images and temples); I cannot go with you.)[2]

মুসলিম শাসনে ভারতের ধর্ম ও সভ্যতা বিপন্ন হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি রাজ্যে শুধু হিন্দু সভ্যতার অম্লান দীপশিখা ছিল অনির্বাণ। বিষয়টিকে সাধারণভাবে উপেক্ষা করা হয়। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন ঃ অতীত গৌরব

1. Ibid, P-633-634
2. Ibid, P-634

ও হিন্দু-সংস্কৃতির দীপালোক প্রজ্বলিত ছিল কয়েকটি হিন্দু শাসিত অঞ্চলে—বিশষত পূর্বে ক্ষুদ্র মিথিলা ও দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্যে। সুমহান বৈদিক সভ্যতাকে সংরক্ষিত রাখার জন্য বর্তমান হিন্দু ভারত এই সকল রাজ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ। (...the lamp of the past glory and culture of Brahmanical Hinduism was kept burning only in the Hindu principalities—particularly the tiny state of Mithila in the north and the kingdom of Vijaynagar in the south. Modern Hindu is indebted to these Hindu kingdoms for having preserved the continuity of Brahmanical culture and traditions, from the vedic age down-wards.)[1]

ভারতের অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা সুলতানি শাসনে (হুসেন শাহ্ ও নসরৎ শাহ্) বাংলায় হিন্দু ও তার ধর্ম-সংস্কৃতি নিরাপদ ছিল না। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস জীবন তার অভ্রান্ত প্রমাণ। বিশ্লেষণ করে রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন ঃ সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য ২৪ বৎসর ধরাধামে ছিলেন। এর মধ্যে তিনি এক বৎসরও বাংলায় ছিলেন না। ২০ বৎসর ছিলেন উড়িষ্যায়—তাঁর ভক্ত হিন্দু রাজার (প্রতাপরুদ্র) আশ্রয়ে...শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের কৃতিত্ব হিন্দু রাজ্য উড়িষ্যার প্রাপ্য। হুসেন শাহের বাংলার নয়। মুসলিম শাসনে হিন্দু ও হিন্দু সংস্কৃতির পর্যালোচনায় এই বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। (Of the twenty four years he remained in his mortal frame after he renounced the world and was initiated as a sanyasin, he hardly spent even a year in the dominion of Hussain Shah and his muslim successors, but lived for twenty years in the Hindu kingdom of Orissa. ...the chief credit for the rise and growth of Chaitanya's Vaishnavism must go to the Hindu kingdom of Orissa and not to the Muslim kingdom of Bengal. This is a very significant fact in the history of Hindu culture in India during the period under review.)[2]

জন্মস্থান নবদ্বীপ ও বাংলা ত্যাগ করে ধর্ম প্রচারে চৈতন্যদেব যে প্রায় সমগ্র সন্ন্যাস জীবন ওড়িষ্যায় অতিবাহিত করেছেন তার কারণ মুসলমানের অত্যাচার ও জীবনের নিরাপত্তা। মধ্যযুগের কবিকুল সে কাহিনি নিজ নিজ রচনায় সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ আবার হুসেন শাহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিজয় গুপ্ত হুসেন শাহ্‌কে মহাভারতের অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, তিনি ছিলেন আদর্শ

1. Ibid Preface, XXXI
2. Ibid Preface, XXXII

নৃপতি। তাঁর রাজত্বে প্রজারা পরম সুখে শান্তিতে বাস করত। আর একজন কবি মন্দির ভাঙার জন্য কুখ্যাত হুসেন শাহকে কলিযুগে কৃষ্ণের অবতার রূপে বর্ণনা করেছেন। (Vijay Gupta, describes Hussain Shah as an ideal king, whose subjects enjoy all the blessings of life, and compares him to the epic hero Arjuna. Another goes even further and describes the Muslim Sultan, notorious for breaking Hindu temples, as the incarnation of Krishna in the Kali age.)[1] এই সকল কবি ছিলেন নবাবের অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যপুষ্ট। তাই নবাবের কর্মচারী হয়েও সনাতনর মধ্যে অকপট সত্য-ভাষণে যে নির্ভীক তেজস্বিতা দেখা যায়—নবাবের কৃপাধন্য এই কবিদের মধ্যে তার একান্তই অভাব। এই নির্লজ্জ স্তাবকতার মূল কারণ ব্যাখ্যা করে রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন ঃ বাংলায় তিনশত বৎসরের দাসত্ব ও ধর্মীয় নির্যাতনে হিন্দুর আত্মসমর্পণ ও নৈতিক অধঃপতন যে সম্পূর্ণ হয়েছিল এ স্তাবকতা তারই সাক্ষ্য বহন করে। (All these merely indicate the degree of abject surrender and the depth of moral degradation of the Hindus of Bengal caused by three hundred years of political servitude and religious oppression.)[2]

এই দাসসুলভ হীন মনোভাব শুধু বাংলার মধ্যযুগের কবি নয় হিন্দু ইতিহাস লেখকদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক ইলিয়ট ও ডাউসন তার তীব্র নিন্দা করে বলেন, মুসলিম ঐতিহাসিকদর রচনা ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে খুবই ত্রূটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। "কিন্তু হিন্দু লেখকদের রচনায় অনুরূপ ক্রুটি খুবই বেদনাদায়ক। কারণ, আমরা সঙ্গত ভাবেই আশা করতে পারি যে, তাঁর (হিন্দু) রচনায় তাঁর পদানত জাতির আবেগ-অনুভূতি, আশঙ্কা, বিশ্বাস ও আশা-আকাঙক্ষার যথার্থ প্রতিফলন ঘটবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হল তিনি লেখেন প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী। অন্ধ স্তাবক, অনুগত ভৃত্যের ন্যায় মুসলিম প্রভুর অন্ধ অহমিকার স্তুতি করে তিনি সযত্নে রচনা করেন তাঁর প্রশস্তিবাচন। ...বিজয়ীর স্তব-গানে সে এতই অনুরক্ত যে তিনি দিব্যচক্ষে দর্শন করেন—ইসলামের আলোর দীপ্তিতে জগৎ উদ্‌ভাসিত।" (These deficiencies are more to be lamentd, where, as sometimes happens, Hindu is the author. From one of that nation we might have expected to have learnt what were the feelings, hopes, faiths, fears and yearnings of his subject race; but unfortunately, he rarely writes unless according to order

1. Ibid, P-635
2. Ibid, P-635

or dictation, and every pharase is studiously and servilely turned to flatter the vanity of an imperious Muhammadan patron....He is so far wedded to the set pharases and inflated language of his conquerors, that he speaks of the "light of Islam shedding its refulgence on the world.)[1]

এই হীন দাসসুলভ মানসিকতা থেকে হিন্দুদের একাংশ আজও মুক্ত নয়। তবে বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামিক সাম্রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থে হয়তো কখনও কোন মুসলিম বাদশা হিন্দুর প্রতি ছিলেন কিঞ্চিৎ সহনশীল। দেশে হিন্দুর বিপুল সংখ্যাধিক্য। শত শত বছর ধরে হিন্দুমেধ যজ্ঞ করেও এ জাতিকে নিশ্চিহ্ন নির্মূল করা যায়নি। ইতিমধ্যে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে জলপথে ইউরোপীয়ান বিশেষত পর্তুগীজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্ধ হয় আরব থেকে নতুন সৈন্যের আমদানি। তদুপরি হিন্দু কখনই পরাজয়কে চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়নি। শক্তি সঞ্চয় করে প্রতি আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে মুসলিম শাসকদের; মুসলমান যুদ্ধ বিদ্যায় যতটা পারদর্শী ছিল অন্য বিদ্যায় ততটা নয়। প্রশাসনিক কার্যে হিন্দু-কর্মচারীরাই ছিল প্রধান সহায়। এই পরিস্থিতিতে আকবরের ন্যায় দুই-একজন মুসলিম শাসক হয়তো ভেবেছেন যে, বিশাল এই দেশে হিন্দুর সহযোগিতা ব্যতীত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব অসম্ভব। তাই তাদের সহনশীলতা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। কিন্তু মুসলমান এই আদর্শ-চ্যুতি ও রাজ-কর্তব্যে অবহেলায় রুষ্ট হয়েছে। মুসলিম উলেমারা কোরানের আয়াত উদ্ধৃত করে আল্লার বিধান লঙঘন করার জন্য প্রকাশ্য সভায় সম্রাটকে করেছে তিরস্কার। (আহমদ শাহ্ আবদালিকে মৌলভীর উপদেশ ও তিরস্কার উল্লেখ্য)। এদের সমর্থনে ছিল সেনাবাহিনী; যাঁদের তরবারির জোরেই সম্রাটের রাজ্যপাট। ভীত শাসক মসনদ রক্ষার জন্য বিসর্জন দেয় রাজনৈতিক বিচক্ষণতা। ইসলামের বিধান অনুযায়ী কাফের দমনে হয় তৎপর। (But such indulgence of infidelity was by its nature precarious and exceptional. The Muslim world regarded it as a deplorable falling off from the orthodox ideal, and a wicked neglect of royal duty. The liberal king would be publicly reprimanded by some pious scholar for having bartered his soul away for gold; he would be called upon to return to the pure and unadulterated law of Islam. Quotations from the Holy Book would support the demand of the bigot and would find a ready response

1. Elliot & Dowson—The History-of-India As Told By It's Own Historians.(The Muhammadan Period) Preface XXI-ii

in the hearts of the Muslim soldiery on whose sword depends the king's power,—...for the stability of his own position he must throw political wisdom to the winds, and "chastise the infidels"according to the letter of the Law.)[1] সুতরাং বিধর্মী অ-মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি ও জাগতিক উন্নতি এমন কি তাদের অস্তিত্বও মুসলিম রাষ্ট্রের মূল আদর্শের বিরোধী। সম্রাট ঔরঙ্গ জেবের রাজত্ব মুসলিম রাষ্ট্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ঔরঙ্গজেব ও হিন্দু

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে ঔরঙ্গজেবকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয়। তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলমান —পরম ধার্মিক। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ও প্রশ্নাতীত আনুগত্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী তিনি রাজ্য শাসন করেছেন, কখনও বিচ্যুত হননি।

অ-মুসলমান মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক নন—জীবনের বিনিময়ে তাকে দিতে হয় জিজিয়া কর। "হজরৎ মহম্মদ প্রথম এই কর প্রচলন করেন। কোরানে বলা হয়েছে—যারা অবিশ্বাসী—সত্য ধর্ম (ইসলাম) অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিজিয়া দেয়।" (সুরা-৯/২৯) (It was first imposed by Muhammad, who bade his followers "fight those who do not profess the true faith, till they pay jazia with the hand in humility—Quran, IX-29.)[2]

এই কর দেওয়ার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। উলেমাগণ সম্রাটকে জানালেন যে ধর্মশাস্ত্র অনুসারে জিজিয়া কর প্রদানের নিয়ম হল—"এই কর প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজে হাজির হয়ে দিতে হবে। অন্য কারও মারফত পাঠালে তা গ্রহণ করা হবে না। তহ্শীলদার উঁচু আসনে বসে থাকবে। জিজিয়া কর প্রদানকারী ব্যক্তি পায়ে হেঁটে এসে তার সামনে দাঁড়াবে। তখন তহ্শীলদার জিম্মির উপর হাত রেখে চিৎকার করে বলবে—হে জিম্মি! জিজিয়া কর দাও।" (...the books on Muslim Canon Law. lay down that the proper method of collecting the "Jaziya" is for the zimmi to pay the tax personally; if he sends the money by the hand of an agent it is to be refused; the taxed person must come on foot and make the payment standing, while the receiver should be seated and after

1. Sir J. N. Sarkar—History of Aurangzib, Vol-III, P-173
2. Sir J. N. Sarkar—History of Aurangzib, Vol-III, P-176

placing his hand above that of the "Zimmi" should take the money and cry out, "O, zimmi! pay the commutation money.")[1] পদ্ধতিটি বড়ই বিচিত্র। এ শুধু আর্থিক পীড়ন নয়—প্রকাশ্যে চূড়ান্ত অপমান।

মুসলিম শাসনে হিন্দুদের উপর এই জিজিয়া কর সব সময়ই ধার্য হত। সম্রাট আকবর এই কর বিলোপ করেছিলেন। কোরানের বিধান অনুযায়ী ইসলামের প্রসার ও পৌত্তলিকতা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ঔরঙ্গজেবের এক আদেশে ১৬৭৯ খ্রিঃ ২রা এপ্রিল সাম্রাজ্যের সর্বত্র জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তিত হয়। হিন্দুরা এর প্রতিবাদে ঔরঙ্গজেবের প্রাসাদের কাছে সমবেত হয়। তারা কাতর প্রার্থনা জানায় কর প্রত্যাহারের জন্য। সম্রাট নির্বিকার। পরের শুক্রবার ঔরঙ্গজেব জামা মসজিদে নমাজ পড়তে যাবেন। কিন্তু লালকেল্লা থেকে জামা মসজিদ পর্যন্ত হিন্দু বিক্ষোভকারীদের বিশাল জমায়েত। সতর্কীকরণ সত্ত্বেও হিন্দুরা স্থান ত্যাগ করে না। ঔরঙ্গজেব একঘণ্টা অপেক্ষা করে হাতীর সাহায্যে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দিতে আদেশ দেন। বহাল রইল জিজিয়া কর।

জিজিয়া করের বিরুদ্ধে হিন্দুরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু সম্রাটের আদেশে বলপ্রয়োগ করে তা ভেঙে দেওয়া হয়। কর দিতে হবে বলে হিন্দু ব্যবসায়ীরা দাক্ষিণাত্যে মোগল শাসনাধীন অঞ্চলে যেত না। সামরিক বাহিনীর রসদের সরবরাহ ব্যাহত হয়। সেনাপতি সম্রাটকে অনুরোধ করেন তার এলাকায় কর প্রত্যাহার করার জন্য। উত্তরে ঔরঙ্গজেব বললেন, "সৈন্যরা উপবাসী থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে কি তিনি কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী বিধর্মীদের কাছ থেকে কর না নিয়ে তার আত্মাকে জাহান্নামে পাঠাবেন?" (Again when the enforced levy of this tax scared Hindu traders away from the Mughal territory in the Deccan and caused scarcity of grain in the camp of the imperial army, Aurangzib vetoed his general's proposal to suspend the "Jaziya" in that locality. His soldiers might starve, but should he jeopardize his soul by violating the Quranic precept to take "Jaziya" from the infidels?)[2] জিজিয়া করের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের উপর করের বোঝা চাপিয়ে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা (ধর্মান্তরের সাহায্যে) । সমসাময়িক পর্যটক মানুচির (Manucci) মন্তব্যে তার সমর্থন পাওয়া যায় ঃ "জিজিয়া কর দিতে অক্ষম হিন্দুরা তহশীলদারের লাঞ্ছনা-অপমানের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। ঔরঙ্গজেব সন্তোষ প্রকাশ করে বলছেন—এইভাবে পীড়ন ও জবরদস্তি করলেই হিন্দুরা বাধ্য হবে মুসলমান হতে।" (As the contemporaty

1. Ibid, P-176
2. Sir J. N. Sarkar—History of Aurangzib, Vol-III, P-179

observer Manucci noticed—"Many Hindus who were unable to pay turned Muhammadan, to obtain relief from the insults of the collectors.... Aurangzib rejoices that by such exaction these Hindus will be forced into embracing the Muhammadan faith.)[1]

শুধু জিজিয়া নয়—অন্যান্য করের ক্ষেত্রেও হিন্দুদের উপর বৈষম্য করা হত। ১৬৬৫ খ্রিঃ ১০ এপ্রিল জারি করা এক অধ্যাদেশ অনুযায়ী মুসলমান ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সকল মালের মূল্যের ২.৫% এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে ৫% মাশুল ধার্য করা হয়। ১৬৬৭ খ্রিঃ মে, ঔরঙ্গজেব মুসলমান ব্যবসায়ীদের মাশুল থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলেন—কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা বহাল রইল। হিন্দুদের ধর্মান্তরে উৎসাহিত করার জন্য নব মুসলমানদের (ধর্মান্তরিত)আর্থিক পুরস্কার ও সরকারি চাকুরি দেওয়া হত। চরম আর্থিক নিপীড়ন চালিয়ে ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টার কোন ক্রটি করেননি। সম্রাটের রাজস্ব বিভাগে অনেক মধ্যবিত্ত হিন্দু চাকরি করত। ঔরঙ্গজেব এই ব্যবস্থার পরিবর্তনে উদ্যোগী হলেন। ১৬৭১ খ্রিঃ এক ঘোষণায় বলা হল তহশীলদার (Rent Collectors) অবশ্যই হবে মুসলিম; তালুকদারদের নির্দেশ পাঠান হল যে তারা যেন তাদের অধীন সকল হিন্দু পেশকার ও হিসাবরক্ষকদের অবিলম্বে ছাঁটাই করে মুসলমান নিয়োগ করে।

হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার জন্য ঔরঙ্গজেব দুটি পন্থা নিয়েছিনেল—পীড়ন ও প্রলোভন। সদ্য ধর্মান্তরিত হয়েছে এমন হিন্দুদের হাতির পিঠে চড়িয়ে বাদ্য সহযোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমণ করত। ধর্মান্তরিত নব মুসলমানদের দেওয়া হত মাসোহারা।

১৬৯৫ খ্রিঃ মার্চ মাসে ঔরঙ্গজেবের আর এক ঘোষণায় রাজপুত ব্যতীত সকল হিন্দুদের হাতি, ঘোড়া, পাল্কিতে চড়া ও সঙ্গে অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ হল।*

ঔরঙ্গজেব ও হিন্দু মন্দির (সূত্র—যদুনাথ সরকার History of Aurangzib (vol-III, P-174 and 185-187) ঃ

পৌত্তলিকতা ইসলামের মূল আদর্শের বিপরীত। মুসলমানের পক্ষে মন্দির দর্শন করাও মহাপাপ। ইসলামের প্রধান শত্রু হিন্দুধর্ম ও তার মূর্তিপূজা পদ্ধতিকে হিন্দুস্থানের

* আওরঙ্গজেবের এই সকল কার্যকলাপ থেকে তাঁকে শুধুমাত্র একজন অত্যাচারী বাদশা বলে ভাবা যায় কি? কারণ, মুসলমান প্রজার উপর তিনি কোন অত্যাচার করেননি। হিন্দুদের উপর অত্যাচার, অকথ্য পীড়ন, মন্দির ধ্বংস, বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ এবং ধর্মান্তরে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নব ধর্মান্তরিতদের প্রতি আনুকুল্যের সাড়ম্বর প্রদর্শন—তাঁকে একজন অত্যাচারী বাদশার পরিবর্তে ইসলামে অনুপ্রাণিত সুশাসক রূপেই প্রতিষ্ঠিত করে।

1. Ibid, P-180

মাটি থেকে নির্মূল করার জন্য সম্রাট ঔরঙ্গজেব সব রকম ব্যবস্থাই নিয়েছিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে একটি নতুন সরকারি মন্ত্রক সৃষ্টি করেন। এই মন্ত্রকের অধীনে ছিল হাজার হাজার কর্মচারী। যাদের সরকারি পদবী ছিল সেন্সর (Muhatasib)। প্রত্যেক শহর ও মহাকুমা শহরের দায়িত্বে ছিল একজন করে Censor. হিন্দুমন্দির ও বিগ্রহ চূর্ণ করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। এদের সংখ্যা এত বিশাল ছিল কাজের সমন্বয় ও তদারকির জন্য একজন Director General (দারোগা) নিয়োগ করতে হয়। ঔরঙ্গজেব (তাঁর রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে) (১ এপ্রিল, ১৬৬৯) তারিখে "কাফের হিন্দুদের সকল মন্দির ও শিক্ষায়তন ধ্বংস এবং তাদের ধর্মীয় প্রচার, শিক্ষা ও পূজা-অর্চনা বন্ধের জন্য আদেশ জারি করেন"....in the 12th year of his reign (9th Apr, 1669) he issued a general order "to demolish all the schools and temples of the infidels and to put down their religious teachings and practices.)[1] প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ছিলেন তটস্থ। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা সম্রাটকে জানাতে পারছেন যে তাঁদের এলাকায় সমস্ত মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে ততক্ষণ তাঁদের স্বস্তি ছিল না। হিন্দুদের প্রধান মন্দিরগুলি ধ্বংস করার গুরু দায়িত্ব সম্রাট নিজেই গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে সোমনাথ মন্দির, মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ মন্দির ও বেনারসের বিশ্বনাথ মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে

ঔরঙ্গেজেব তখন গুজরাটের সুবেদার। 'চিন্তামন' গুজরাটের বিখ্যাত মন্দির। ঔরঙ্গজেব মন্দিরের মধ্যে গো-হত্যা করে মন্দিরকে অপবিত্র করেন। পরে মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করে নাম দেওয়া হয়—কুয়াত-অল-ইসলাম। শাজাহান অবশ্য মন্দিরটি হিন্দুদের ফিরিয়ে দেন। (The temple of Chintaman, built by Sitadas jeweller, was converted into a mosque named Quwat-ul-Islam by order of the Prince Aurangzib, in 1645. He slaughtered a cow in the temple.)[2]

"ঔরঙ্গাবাদ শহরের নিকট সাতারা গ্রাম ছিল আমার শিকার স্থল। এখানে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত মন্দিরে ছিল খান্ডেরাই-এর (Khande Rai) বিগ্রহ। আল্লাহ্‌র কৃপায় সেই মন্দির ও বিগ্রহ আমি ধূলিসাৎ করি। নিষিদ্ধ করি মন্দিরের নর্তকীদের অশালীন নৃত্য-গীত।"—বিদার বখতকে (Bidar Bakht) লেখা ঔরঙ্গজেবের পত্র।

---

1. Sir J.N. Sarkar—History of Aurangzib, Vol-III, P-174
2. Sir Jadu Nath Sarkar—History of Aurangzib, Vol-III, P-185

সিংহাসনে আরোহণের পর

"আমার রাজত্বের প্রথম দিকে সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করা হয়। বন্ধ হয় পুতুল পূজা। আমি জানি না সেখানকার বর্তমান অবস্থা কি। যদি মূর্তিপূজক হিন্দুরা পুনরায় পূজা-অর্চনা শুরু করে থাকে তবে মন্দিরটিকে এমন ভাবে গুঁড়িয়ে দাও যাতে তার চিহ্ন মাত্র না থাকে।" —এনায়েতউল্লাকে লেখা ঔরঙ্গজেবের পত্র। (The temple of Somnath was demolished early in my reign and idol worship (there) put down. It is not known what the state of things there is at present. If the idolators have again taken to the worship of images at the place, then destroy the temple in such a way that no trace of the building may be left.)[1]

১৬৬৫ খ্রিঃ ২০ নভেম্বর-এর আদেশ (ফারমান) নামায় তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে জানালেন ঃ সিংহাসনে আরোহণ করার পূর্বে আমার আদেশে গুজরাটের আমেদাবাদ ও অন্যান্য অঞ্চলের সকল মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। সেই সকল মন্দির পুনরায় সংস্কার করে বিগ্রহ পূজা শুরু হয়েছে। অবিলম্বে আমার পূর্বে আদেশ কার্যকর কর।"

১৬৬১ খ্রিঃ ১৯ ডিসেম্বর ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা কুচবিহার নগরে প্রবেশ করে। সৈয়দ মহম্মদ সাদিক নিযুক্ত হলেন প্রধান বিচারপতি। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল সকল মন্দির ভেঙ্গে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার জন্য। মীরজুমলা স্বয়ং কুঠার নিয়ে নারায়ণের মূর্তি খণ্ড-বিখণ্ড করে। রাজত্বের প্রথম দিকে ঔরঙ্গজেব এক আদেশ জারি করে স্থানীয় কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন—"ওড়িশার কটক হতে বাংলার মেদিনীপুর—এই সমগ্র এলাকার সকল মন্দির (পাকা এবং কাঁচা) ভেঙে দাও।" (19 Dec. 1661 Mir Jumla entered the city of Kuch Bihar, which had been evacuated by its king and people, and appointed Sayyid Md. Sadiqc to be chief judge, with directions to destroy all the Hindu temples and to erect mosques in their stead. The General himself with a battle axe broke the image of Narayan.

An order issued early in his reign has been preserved in which the local officers in every town and village of Orissa from Katak to Medinipur are called upon to pull down all temples, including even clay huts.)[2]

---

1. Sir J. N. Sarkar—History of Aurangzib, Vol-III, P-185
2. Sir Jadu Nath Sarkar—History of Aurangzib, Vol-III, P-186, 174

২০ নভেম্বর-১৬৬৫—"মহামহিম সম্রাটের গোচরে এসেছে যে, গুজরাটের অন্তর্গত মহলের অধিবাসীরা; যে সকল মন্দির সম্রাটের আদেশে পূর্বেই ধ্বংস করা হয়েছে—সেগুলি পুনরায় নির্মাণ করেছে...অতএব সম্রাটের আদেশ এই সকল মন্দিরকে অবিলম্বে ভেঙে দিতে হবে।"

৯ মে-১৬৬৯—দণ্ডধারী (Mace-bearer) আলি বাহাদুরকে পাঠান হয় মালারনার (Malarna) মন্দির ধ্বংসের কাজে।

২ সেপ্টেম্বর-১৬৬৯—দরবারে সংবাদ এসেছে. সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী তাঁর কর্মচারীরা বেনারসের বিখ্যাত বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করেছে।

মথুরার শ্রীকৃষ্ণ মন্দির (কেশব রাই মন্দির)

সে যুগের বিস্ময় (Wonder of the age) মথুরার জগদ্বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ মন্দির। দিল্লি আগ্রা রাজপথের পাশে অবস্থিত। বুন্দেলা রাজ বীর সিং দেব বুন্দেলা তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দিরটির সংস্কার করেন। গগনভেদী বিশাল এই মন্দিরের চূড়া আগ্রার প্রাসাদ থেকেও দেখা যেত। ঔরঙ্গজেব মথুরার হিন্দুদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফৌজদার Abdun Nabi-কে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মন্দির না ভাঙা পর্যন্ত মন তার অশান্ত বিক্ষুব্ধ। অবশেষে "১৬৭০ খ্রিঃ জানুয়ারী—পবিত্র রমজান মাসে ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ সম্রাট মন্দির ধ্বংসের আদেশ দেন। তাঁর কর্মচারীরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে মন্দির সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। সেখানেই নির্মাণ করেন প্রভূত অর্থব্যয়ে বিশাল এক মসজিদ। মহান ধর্ম ইসলামের জয় হোক। সর্বশক্তিমান আল্লার অসীম কৃপায় এই অসাধারণ বিস্ময়কর নির্মাণ কার্য (আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব) সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। সম্রাটের এই অটল বিশ্বাস ও মহৎ ভক্তি-নিষ্ঠার নিদর্শন দেখে নৃপতিমণ্ডলী রুদ্ধ বাক্। তারা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইল।

মন্দিরের মণি মাণিক্য খচিত সকল বিগ্রহ আগ্রায় নিয়ে আসা হল। তাদের স্থাপন করা হল জাহানারা মসজিদের সোপানশ্রেণীতে—যাতে বিশ্বাসীদের দ্বারা তা সর্বদা পদদলিত হয়। শুধু ধ্বংস নয়; ঔরঙ্গজেব মথুরার নতুন নামকরণ করেন "ইসলামাবাদ"। (January-1670. "In this month of Ramzan, the religious-minded Emperor ordered the demolition of the temple at Mathura known as the Dehra of Keshav Rai. His officers accomplished it in a short time. A grand mosque was built on its site at a vast expenditure. The temple had been built by Bir singh Dev Bundela at a cost of 33 lakhs of Rupees. Praised be the God of the great faith of islam that in the auspicious reign of this destroyer of infidelity and turbulence, such a marvellous

and (Seemingly) impossible feat was accomplished. On seeing this strength of the Emperor's faith and the grandeur of his devotion to God, the Rajahs felt suffocated and they stood in amazement like statues facing the walls. The idols large and small, set with costly Jewels, which had been set up in the temple, were brought to Agra and buried under the steps of the mosque of Jahanara, to be trodden upon continually."—Crookes N.W.P.P-112)[1]

(...send forth commands to destroy this temple altogether and to change the name of the city to "Islamabad")[2]

"তিনি সোরণের সীতারামজী মন্দির আংশিক ধ্বংস করেন। তাঁর কর্মচারীরা গোণ্ডায় দেবী পাটন মন্দির অপবিত্র করে; পুরোহিতদের হত্যা করে—চূর্ণ করে বিগ্রহ।

৭ই এপ্রিল-১৬৩০—"মালোয়া (Malwa) থেকে সংবাদ এসেছে—ওয়াজির খাঁ গদা বেগ নামে এক ক্রীতদাসকে ৪০০ সৈন্য দিয়ে পাঠিয়েছিল উজ্জয়িনী ও তার সংলগ্ন এলাকার সকল মন্দির ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু বিদ্রোহী জনতার হাতে গছা বেগ ও তার ১২১ জন সৈন্য নিহত হয়।"

"খান্ডেলার রাজপুতদের দমন ও মন্দির ধ্বংসের জন্য দরাব খানকে এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী দিয়ে পাঠানো হয়েছে। ১৬৭৯ খ্রিঃ ৮ মার্চ দরাব খান আক্রমণ করে। বিধ্বস্ত হয় খান্ডেলা, সানুলা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সকল মন্দির।"

২৫ মে-১৬৭৯—"খান-ই-জাহান বাহাদুর যোধপুরের সকল মন্দির ধ্বংস করে রাজধানীতে ফিরেছে। সঙ্গে এনেছে গাড়ি ভর্তি করে দেবতার বিগ্রহ। এই মূর্তিগুলো সোনা, রূপা, তামা ও পাথরের তৈরি। সম্রাটের আদেশে এই সকল মূর্তিকে জামা মসজিদ ও দরবারের চারিদিকের সোপানশ্রেণীতে বসানো হয়; যাতে সর্বদাই মুসলমানের দ্বারা পদদলিত হয়।"

জানুযায়ী-১৬৮০—"উদয়পুরের মহারানার প্রাসাদের সম্মুখে বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত মন্দির সে যুগের এক বিস্ময়। বিগ্রহ সহ মন্দিরটি চূর্ণ করা হয়। ২৪শে জানুয়ারী সম্রাট উদয়সাগর হ্রদ দর্শন করতে গেলেন। তিনি হ্রদের তীরে অবস্থিত তিনটি মন্দির ভাঙতে আদেশ দেন। ২৯শে জানুয়ারী হাসান আলি খাঁ জানায় যে উদয়পুর ও তার সংলগ্ন এলাকার ১৭২টি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। ২২শে ফেব্রুঃ সম্রাট চিতোর ভ্রমণে গেলে তাঁর আদেশে ৬৩টি মন্দির ভাঙা হয়।

1. Sir J. N. Sarkar—History of Aurangzib, Vol-III, P-187
2. Ibid, P-175

১০ আগস্ট-১৬৮০—আবু তোরাব দরবারে এসে জানায় যে অম্বর রাজ্যের ৬৬টি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর-১৬৮৭—গোলকুণ্ডা অধিকার করে সম্রাট আবদুর রহিম খানকে হায়দ্রাবাদ শহরে Censor নিযুক্ত করেন। তাকে আদেশ দেওয়া হয় সকল মন্দির ভেঙে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করতে হবে।

ঔরঙ্গজেব ইলোরা, ট্রিম্‌বেকশ্বর ও নরসিংপুরের মন্দির ধ্বংসের আদেশ দেন। কিন্তু বিষধর সাপ ও কাঁকড়াবিছের জন্য সে আদেশ বাস্তবায়িত হয়নি। পান্‌ধারপুর ও জেজুরীতে মন্দিরের বিগ্রহ দেবতাই ধ্বংস প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।

হামিদ-উদ্‌-দিন খানকে বিজাপুরের মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাফল্যের সঙ্গে সে কাজ সমাপ্ত করে ফিরে এলে সম্রাট তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১লা জানুয়ারী ১৭০৫—সম্রাট মহম্মদ খলিল ও খিদমত রাইকে এত্তেলা পাঠান। তাদের আদেশ দেওয়া হয়—"পান্‌ধারপুর মন্দিরে গো-হত্যা কর—তার পর ধ্বংস কর মন্দির।" তাঁর এ আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল।

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে অন্যান্য মন্দির

মুসলিম হানাদার বাহিনীর রক্তাক্ত বিজয় শকট যেসকল দেশের উপর দিয়ে গিয়েছে, সেখানেই সংঘটিত হয়েছে ধ্বংসের তাণ্ডব। আরবিয়া, ইরান, খোরাসান, ট্রান্সঅক্সানিয়া, সেইস্তান ও আফগানিস্তান। হাজার হাজার সূর্যমন্দির, বৌদ্ধ মঠ ও বিহার এবং মন্দির ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—চূর্ণ করা হয়েছে বিগ্রহ। সর্বশেষ ভারতবর্ষ। মুসলিম আক্রমণে সম্পূর্ণ ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৪০০০ মন্দির। সমগ্র ভারতে বোধহয় এমন একটি মন্দিরও খুঁজে পাওয়া যাবে না—যা মুসলমানের বর্বরতার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ওপর নির্মিত হয়েছে মসজিদ বা দরগা। কখনও মন্দিরকেই মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যেমন—অযোধ্যার শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দির অথবা দিল্লির কুতুব মিনার। মুসলমান পরম গর্বের সঙ্গে সে ইতিহাস উৎকীর্ণ করে রেখেছে মসজিদের দেওয়ালে।

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ—Epigraphia Indo-Moslemica নামে তার একটি আংশিক তালিকা ১৯০৭-০৮ সালে প্রকাশ করেছে। মুসলমান কর্তৃক মন্দির ধ্বংসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ঃ

(ক) ভারতে হাজার বছর ব্যাপী মুসলিম রাজত্বে মন্দির ধ্বংস অব্যাহত ছিল। কখনও বন্ধ হয়নি।

(খ) আসমুদ্র হিমাচল এই ধ্বংসলীলা চলেছে।

(গ) এই মহতী উদ্যোগে দিল্লির শাসক ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ—সকলেই অংশগ্রহণ করেছে। Epigraphia-Indo-Moslemica থেকে কয়েকটি মসজিদের (মন্দির ভেঙ্গে নির্মিত) তালিকা নীচে দেওয়া হল।[1] (They have been published by the Archaeological Survey of India in its Epigraphia Indica—Arabic and Persian supplement, an annual which appeared first in 1907-08 as Epigraphia Indo-Moslemica. The following few inscriptions have been selected in order to show that (1) destruction of Hindu temples continued throughout the period of Muslim domination; (2) it covered all parts of India—east, west, north and south; and (3) all Muslim dynasties, imperial and provincial participated in the "pious performance."[1]

কুতুব মিনার (কাওয়াত-অল-ইসলাম-মসজিদ)—দিল্লি

সুলতান মৈজুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীর সেবক কুতুবুদ্দিন আইবক ১১৯২ খ্রিঃ এই মসজিদ নির্মাণ করেন। ২৭টি মন্দির ভেঙ্গে তাদের উপকরণ দিয়ে (যার প্রতিটির জন্য ব্যয় হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা) তৈরি হয়েছে এই মসজিদ।

মানভির মসজিদ (রায়চূড়—কর্ণাটক)

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান! ইসলাম ধর্মের রক্ষক ফিরোজ শাহ্ বাহমনির রাজত্বকালে ১৪০৬ খ্রিঃ একটি মন্দিরকে রূপান্তরিত করে এই মসজিদ নির্মিত হয়।

জামা সমজিদ-মালান (গুজরাট)

গুজরাটের নবাব মামুদ শার (১) রাজত্বকালে ১৪৬২ খ্রিঃ খান-ই আজম উলুগ খাঁ নির্বিচারে হত্যা করে নির্মূল করে পৌত্তলিক কাফেরদের। ধূলিসাৎ করে তাদের সকল মন্দির। নির্মিত হয় মসজিদ। হিন্দুদের দেব-দেবীর মূর্তি দিয়ে তৈরি হয়েছে মসজিদের দেওয়াল ও ফটক (দরজা)।

জৌনপুরের হামাম দরওয়াজা মসজিদ—উঃ প্রদেশ

আল্লাহ্‌র কৃপায় কাফেরদের উপাসনাস্থল আজ মসজিদ—বিশ্বাসীদের প্রার্থনাগার। পরম দয়ালু আল্লাহ্ এই মসজিদ নির্মাতার জন্য বেহেস্তে তৈরি করেছেন সুরম্য প্রাসাদ।

1. ASI—Epigraphia-Indo-Moslemica
Quoted from Arun Shourie–Hindu Temples–What Happened To Them, P-13

সমসাময়িক ঐতিহাসিক ফসীহুদ-দিনের (Fashiud-din) বিবরণ অনুযায়ী আকবরের কর্মচারী দেওয়ান লছমন দাস মন্দির নির্মাণ করেন; এবং সম্রাট আকবরের রাজত্বেই ১৫৬৭ খ্রিঃ মন্দির ধ্বংস করে নির্মিত হয় মসজিদ।

জামা মসজিদ—খোদা (মহারাষ্ট্র)

হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্! হে মহম্মদ! মীর মহম্মদ জামান ১৫৮৬ খ্রিঃ স্বহস্তে ৩৩টি মন্দির ভেঙ্গে নির্মাণ করেছে এই মসজিদ।

গাচিনালা মসজিদ (Gachinala Masjid)—অন্ধ্রপ্রদেশ

মহম্মদ শা দিল্লির মুঘল সম্রাট। অন্ধ্রপ্রদেশের কুমামের হিন্দু মন্দির ছিল প্রসিদ্ধ। মহম্মদ আলি ছিলেন পরম ধার্মিক ন্যায়পরায়ণ মুসলমান। তিনি মন্দির ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করলেন দেবতার বিগ্রহ। তারপর ১৭২৯ খ্রিঃ সেই জায়গায় তৈরি করলেন গগনভেদী এক বিশাল মসজিদ।

মসজিদগাত্রে খোদিত লিপির ন্যায় সমসাময়িক মুসলিম সাহিত্যেও মন্দির ধ্বংসের বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। আমীর খসরু দিল্লিতে খল্জি বংশের শাসনকালে ছিলেন সভাকবি। তিনি শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন। কোন কোন মতে তিনি ভারতে হিন্দু-মুসলমান মিশ্র সংস্কৃতির পথিকৃৎ। তাঁর রচনায় তিনি মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক মন্দির-ধ্বংসের কাহিনি গৌরবের সঙ্গেই বর্ণনা করেছেন।[1]

ঝৈন (Jhain)

"পরদিন তিনি (জালালুদ্দিন খলজি) আবার মন্দিরে গেলেন। সৈন্যদের আদেশ দিলেন মন্দিরকে গুঁড়িয়ে দিতে। সৈন্যরা যখন লুণ্ঠনে মত্ত তখন তিনি মন্দিরে আগুন ধরিয়ে বিগ্রহ ভাঙতে নির্দেশ দিলেন। মন্দিরে ব্রহ্মার দু'টি মূর্তি ছিল—ব্রোঞ্জের তৈরি। যার এক একটির ওজন ছিল এক হাজার মণ। বিগ্রহের ভাঙা টুকরোগুলি সেনাপতি ও পদস্থ সভাসদদের বিতরণ করলেন। তাদের বলা হল দিল্লি ফিরে গিয়ে বিগ্রহের ভাঙা অংশগুলি মসজিদের দরওয়াজায় ফেলে দিতে (Miftah-ul-Futuh)

দেবগিরি

আলাউদ্দিন খলজি দেবগিরিতে অংখ্য মন্দির ভেঙে সেখানে নির্মাণ করেন মসজিদ।

1. Quoted from Arun Shourie–Hindu Temples What Happened To Them, P-16

সোমনাথ

উলুঘ খাঁ মন্দির ধ্বংস করে একটি ব্যতীত সকল মূর্তি চূর্ণ করে। বৃহত্তম সেই মূর্তিটি পাঠিয়ে দেয় দিল্লি দরবারে। অতঃপর কাফেরদের সেই শক্ত ঘাঁটি থেকে বিশ্বাসীদের সম্মিলিত কণ্ঠের আজান ধ্বনি মিশর ও ইরাক থেকেও শোনা যেত। (Tarikh-i-Alai)

রণথম্ভোর

রাজাকে হত্যা করে দুর্গ অধিকার করা হল। অধিকৃত হল ঝৈন (Jhain) ও একটি প্রাচীন মন্দির। পত্তন হল মুসলমানদের জন্য একটি নতুন শহর। অতঃপর ধূলিসাৎ করা হল ভৈরব দেব ও অন্যান্য মন্দির। (Ibid)

ব্রহ্মস্ত পুরী

(Brahmastapuri) আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতি মালিক কাফুর জানতে পারেন যে ব্রহ্মস্তপুরী মন্দিরে সুবর্ণনির্মিত একটি দেব-মূর্তি আছে। তিনি মন্দির ধ্বংস করতে কৃতসংকল্প হলেন। শত শত ব্রাহ্মণ ও ভক্ত নিহত হল; রক্তের স্রোত বয়ে গেল। শতখণ্ডে চূর্ণ করা হল লিঙ্গ মহাদেবের মূর্তি। (Ibid)

মুসলিম শাসনে হাজার বছর ধরে ভারতে যে অত্যাচার চলেছে, কোন মুসলমান তার জন্য সামান্যতম লজ্জিত বা অনুতপ্ত নয়। কারণ এ হল আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম। তাই সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের মুসলিম লেখকগণ সবিস্তারে সগৌরবে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে সম্প্রতি এই জাতীয় বই গ্রন্থাগার হতে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা চলছে। এই রকম একখানি বই "হিন্দুস্থান ইসলামি আহাদ মেঁ' (Hindusthan under Islamic Rule) বইখানিতে ১৭ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায় আছে। শিরোনাম—"হিন্দুস্থান কি মসজিদিন" (The Mosques of Hindusthan)। এই বইখানি আলিগর মুসলিম ইউনিভার্সিটি, জামিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়া (দিল্লি), সালার-জং-ইউনিভার্সিটি, হায়দ্রাবাদ ও ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগার হতে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে সম্ভবত অভ্যন্তরীণ দলাদলি অথবা মতপার্থক্যের জন্য এই গোপন পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ সফল হয়নি। নওদাঁ, পাটনার খুদাবক্স লাইব্রেরী ও Institute of Islamic Studies-এর (Delhi) লাইব্রেরিতে বইখানি এখনও পাওয়া যায়। বইখানির লেখক প্রখ্যাত ইসলামিক পণ্ডিত মৌলানা হাকিম সৈয়দ আবদুল হাই। ইনি ছিলেন Nadwatul Ulama of Lucknow-র (এদেশে ইসলামিক ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র) রেকটর। বইখানি আরবি, উর্দু ও ইংরেজী—এই তিন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকা লিখেছেন তাঁর পুত্র স্বনামধন্য Maulana Abul-Hassan Ali Nadwi। আলি মিঞা নামেই ইনি সুপরিচিত। ইনি Muslim Personal Law Board-এর চেয়ারম্যান (সম্প্রতি বন্দে মাতরম্ গানের বিরুদ্ধে "ফতেয়া" জারী করেছেন); Jammat-

e-Islami ও Raabta Alam-e-Islami-র সংগঠনটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই শেষোক্ত সংগঠনটির প্রধান কার্যালয় মক্কায়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হল বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মুসলিম সংগঠনগুলিকে অর্থসাহায্য করা।

ভূমিকায় আলি মিঞা লেখক ও বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইসলামের প্রভাবেই মুসলমান সত্যান্বেষী ও দেশপ্রেমিক। তাদের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি তাদের সত্য ইতিহাস রচনাই শিখিয়েছে। ...দেশবাসীকে এই মূল্যবান গ্রন্থখানি উপহার দিতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আশা করব আল্লাহ্ এই সেবা গ্রহণ করবেন এবং পণ্ডিত সমাজেও বইখানি যথোচিত সমাদর পাবে।" (Islam has imbued its followers with the quest for truth, with patriotism; he writes. Their nature, their culture has made Muslims the writers of true history....We are immensely pleased to present this valuable gift and historical treatment to our countrymen and hope that Allah will accept this act of service and scholars will also receive it with respect and approbation.")[1]

বইখানির আলোচ্য অধ্যায়ে (The Mosques of Hindusthan) দেশের কয়েকটি প্রধান প্রধান মসজিদের নির্মাণ-ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

কাওয়াত-আল-ইসলাম-মসজিদ

দিল্লির প্রথম মসজিদ হল কাওয়াত-অল-ইসলাম। পৃথ্বীরাজ চৌহান নির্মিত মন্দির ভেঙে হিজরি ৫৮৭ (১১৮৩ খ্রিঃ) কুতুবুদ্দিন আইবক এই মসজিদ তৈরি করেন।

অটলা মসজিদ (Atala Masjid)—জৌনপুর

সুলতান ইব্রাহিম সরকি হিন্দুমন্দির ভেঙে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদেই তিনি শুক্রবারের নামাজ পড়তেন।

কনৌজের মসজিদ

কনৌজ দুর্গের মধ্যে অবস্থিত মসজিদটি খুবই সুন্দর। পূর্বে এখানে ছিল মন্দির। হিজরি-৮০৯ (১৩৭৫ খ্রীঃ) সুলতান ইব্রাহিম সরকি এই মসজিদ নির্মাণ করেন।

জামা মসজিদ—এটোয়া

এটোয়ায় যমুনা নদীর তীরে একটি মন্দির ভেঙে নির্মিত হয় এই মসজিদ। মসজিদটি কনৌজের মসজিদের ধাঁচে তৈরি।

1. Ibid, P-5-8

আলমগীর মসজিদ

বেনারসে বিশ্বেশ্বর মন্দির হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। আলমগীর বাদশা বিশ্বেশ্বর মন্দির ভেঙ্গে সেই স্থানেই মন্দিরের পাথর ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে তৈরি করেন হিন্দুস্থানের এক প্রসিদ্ধ মসজিদ। মথুরায় গোবিন্দ দেব মন্দির (শ্রীকৃষ্ণ মন্দির) সুবিশাল অপূর্ব কারুকার্যখচিত। আওরঙ্গজেব সেই মন্দির ধ্বংস করে সেখানেই নির্মাণ করেন মসজিদ।

শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দির—বাবরি মসজিদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যায় সুপ্রাচীনকালে নির্মিত হয় সুবিশাল এই মন্দির। মোঘল সম্রাট বাবরের সেনাপতি মীর বাকি মন্দিরটি আংশিক ধ্বংস করে সেখানেই নির্মাণ করে একটি মসজিদ। বাবরের নামে মসজিদের নামকরণ করে। মসজিদের দেওয়ালে খোদিত ছিল মন্দিরের বহু চিহ্ন। বাবরি মসজিদের স্থলে একদা যে ছিল হিন্দু মন্দির তার সমর্থনে রয়েছে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্বাক্ষর।

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য

Hindusthan Islami Ahad Mein (ঐস্লামিক শাসনে হিন্দুস্থান) বইয়ের একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

"অযোধ্যায় হিন্দু-বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্রজীর জন্মস্থানে বাবর কর্তৃক এই মসজিদ নির্মিত হয়। জনশ্রুতি এই যে, রামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীর এইস্থানে একটি মন্দির ছিল। সেখানে তিনি বাস করতেন এবং স্বামীর জন্য রান্না করতেন। ঠিক এই স্থানেই বাবর মসজিদ নির্মাণ করেন হিজরী-৯৬৩" (The mosque was constructed by Babar at Ajodhya which Hindus call the birth place of Ramchanderji. There is a famous story about his wife sita. It is said that Sita had a temple here in which she lived and cooked food for her husband. On that very site Babar constructed this mosque in H.963...)[1] এই বইখানি আলিগড় মুসলিম বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এখন আর পাওয়া যায় না।

স্বনামধন্য মুসলিম ঐতিহাসিক সৈয়দ সাহাবুদ্দিন আবদুর রহমান। Babri Masjid—তাঁর একখানি বিখ্যাত বই। এই বই-এর ১৯ পৃঃ লিখছেন—"এরকম হতে পারে যে, বিশেষ কারণে মন্দির ধ্বংস করে তার নিকটেই নির্মিত হয়েছে মসজিদ। কিন্তু কোথাও মন্দিরের স্থলে মসজিদ নির্মিত হয়নি।"

1. Arun Shourie—Hindu Temples—What Happened To Them, P-8
Koenraad Elst—Ram Janmabhumi vs Babri Masjid, P-8

Joseph Tieffen Thaler—অস্ট্রিয়ান পর্যটক। দীর্ঘ পাঁচ বছর (১৭৬৬-৭১) তিনি অযোধ্যা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ভ্রমণ করেন। ১৭৮৬ সালে ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয় তাঁর ভ্রমণ কাহিনি—Description Historique et Geographique de i Inde. এই বইয়ে উল্লেখ আছে "...অন্যমতে মসজিদটি নির্মাণ করে বাবর। বাঁদিকে একটি "বেদী" আছে। এই স্থানে যে প্রাসাদ ছিল সেখানেই বিষ্ণুর অবতাররূপে রাম জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেব অথবা বাবর পৌত্তলিক ধর্মকে লুপ্ত করার উদ্দেশ্যে স্থানটিকে ধ্বংস করে। কিন্তু রামচন্দ্রেব পূজা-অর্চনা বন্ধ হয় না। প্রতি বছর রাম নবমীর দিনে এখানে অনুষ্ঠিত হয় ভারত বিখ্যাত রামনবমী মেলা।" (....others say that it had been built by Babar....on the left one can see a square box...The Hindus call it Bedi...here existed a house in which (vishnu) was born in the form of Rama...Subsequently Aurangzeb or Babar destroyed the place in order to prevent the heathens from practising their superstition. But they have continued to practise their religious ceremonies in both places, knowing this to have been the birthplace of Rama...On the 24th of the month of Chait [ie. the Ram Navami Festival], a great gathering of people takes place here to celebrate the birthday of Rama and this fair is famous all over India.)[1]

শেখ আজামত আলী কাকরোয়ই (১৮১১-১৮৯৩) অযোধ্যার নবাব এস. ওয়াজিদ আলির সমসাময়িক। ১৮৬৯ সালে তিনি রচনা করেন Tarkhe-i Abodh, কিন্তু কোন কারণবশত বইখানি প্রকাশিত হয়নি। লক্ষ্ণৌর Tagore Libraryতে বইয়ের একটি পাণ্ডুলিপি আছে। Dr. Zaki Kakorawi ১৯৮৬ সালে Fakhruddin Ali Ahmed Memorial Committee র সৌজন্যে বইখানি প্রকাশ করেন। বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গে বইখানিতে বলা হয়েছে—"ফৈজাবাদ-অযোধ্যায় সৈয়দ আশিখানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্মস্থান মন্দিরে তৈরি হয় বাবরি মসজিদ—হিজরী-৯২৩ (?)। হিন্দুরা স্থানটিকে বলত 'সীতা কা রসুই"। (The Babri mosque was built up in 923 (?) A. H. Under the patronage of Syyid Musa Ashiqan in the Jammasthan temples in Faizabad Avadh, which was a great place of worship and capital of Rama's father, Among the Hindus it was known as "Sita ki Rasoi".)[1]

1. Koenraad Elst—Ram Janmabhumi vs Babri Masjid, P-74
2. Harsh Narain—Hindu Temples—What Happened To Them, P-59

প্রত্নতাত্ত্বিক

১৯৭৫-৮০ সালে ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ B. Lal-এর নেতৃত্বে বর্তমান সৌধের চারিপাশে খনন কার্য চালায়। এলাহাবাদ মিউজিয়ামের ডিরেক্টর S.P.Gupta এই খননকার্যে অংশ নেয়। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, সৌধটি একাদশ শতকে নির্মিত হয়। মসজিদে পুরানো মন্দিরের ১৪টি কষ্টি-পাথরের স্তম্ভ রয়েছে। সেই স্তম্ভে ও দেওয়ালে খোদিত হিন্দুর দশ অবতার, পূর্ণ ঘট ও দেব-দেবীর চিত্রাবলী। সকলই হিন্দু মন্দির-স্থাপত্যের নিদর্শন। (In the construction of the Masid, 14 black sculptured pillars with Hindu-type images have been used....Dr. Gupta reports · "We have now rephotographed these pillars, examined the details of their carvings compared them with similar carvings on pillars used in other contemporary temples in Northern India. Our findings show that these belong to a Hindu temple of the 11th century, the period during which the Gahadval kings of Knauj were ruling at Ayodhya.)[1]

ঐতিহাসিক নিশিথ রঞ্জন রায় একটি প্রবন্ধ লেখেন ঃ—"রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ—ইতিহাসের দূরবীনে।" লেখকের বর্ণনায়—

"মসজিদের গায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে দু'টি লিপি। প্রথমটি মসজিদের ভিতরে। ...দ্বিতীয় লিপিটি উৎকীর্ণ রয়েছে মসজিদের বাইরের দেওয়ালে। লিপিটির পাদটীকায় উল্লেখ আছে, যে, একটি মন্দির ভেঙে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। ...এ তথ্যটি আমাদের সকলেরই জানা যে, মুসলিম শাসনকালে বহু মন্দির ভেঙে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। বাবরি মসজিদটি এমনি ধরনের একটি স্থাপত্য।"[2]

পোলান্ড বিজয়ের স্মারক চিহ্ন স্বরূপ ১৮১৪-১৫ সালে রাজধানী ওয়ারশ-তে রাশিয়া নির্মাণ করে এক বিশাল গীর্জা। প্রথম মহাযুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হলে পোলান্ড ফিরে পায় স্বাধীনতা। মত্ত উল্লাসে পোলিশ জনগণ ভেঙে দেয় দাসত্ব ও জাতীয় কলঙ্কের প্রতীক রাশিয়ান গীর্জা। বিষয়টির উল্লেখ করে বিশ্ব বিশ্রুত কীর্তি ঐতিহাসিক Arnold Toynbee বলেছেন—ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই রাশিয়ার গীর্জা নির্মাণ। ঔরঙ্গ জেবের মসজিদ (আলমগীর মসজিদ) না ভাঙার জন্য আমি ভারত সরকারের প্রশংসা করি। আমি দু'টি মন্দিরের সবিশেষ উল্লেখ করব— বেনারসের (বিশ্বনাথ) মন্দির ও মথুরার শ্রীকৃষ্ণ মন্দির। রুশদের ন্যায় ঔরঙ্গজেবও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই (মন্দির ভেঙে)

---

1. Koenraad Elst—Ram Janmabhumi vs Babri Masjid, P-57
2. গণশক্তি (সি. পি. আই. (এম) প. বঙ্গ কমিটির মুখপত্র) ৩১-১০-৯০

মসজিদ নির্মাণ করেন। সেই অপমানজনক উদ্দেশ্য হল এই সদম্ভ ঘোষণা ঃ হিন্দু ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র ভূমিতেও ইসলামিক রাষ্ট্রের অবিসম্বাদি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতঃপর টয়েনবী বলেছেন—আমি যন্ত্রণাকাতর বেদনাহত চিত্তে এ ব্যাপারে ভারতের সহনশীলতার প্রশংসা করি। ("The purpose for which the Russians had built it had been not religious, but political and the purpose had also been intentionally offensive. I do greatly praise the Indian government for not having pulled down Aurangzeb's mosques. I am thinking particularly of two that overlook the ghats at Benaras and of the one that crowns Krishna's Hill at Mathura. Aurangzeb's purpose in building those two mosques was the same intentionally offensive political purpose that moved the Russians to build the cathedral in Warsaw. Those two mosques were intended to signify that an Islamic government was reigning supreme even over Hinduism's holiest of holy places." He goes on to add later, "This particular example of Indian tolerance has moved me to admiration tempered by twinges of excruciation."—Azad Memorial Lecture, 1960, Delhi—quoted from Hindustan Times—5.7.2003) উল্লেখ্য, গির্জা ভাঙার জন্য টয়েনবী পোলিশ জনতার নিন্দা করেননি। বেনারস ও মথুরায় মন্দির-স্থলে মসজিদের অস্তিত্বে তিনি বেদনার্ত। পোলান্ডের জনগণ ধর্মে খ্রিস্টান। তবে তারা খ্রিস্টানদের উপাসনা স্থল গির্জা ভেঙেছে কেন? কারণ, রুশ-নির্মিত ওই গির্জা তাদের জাতীয় আত্মমর্যাদা ও স্বাভিমানে আঘাত দিয়েছে। অযোধ্যা-কাশী-মথুরায় মন্দির-মসজিদ বিতর্কও সেই নিরীখে বিচার্য।

সহস্র বৎসরের মুসলিম শাসনের ক্ষতচিহ্ন ভারতবর্ষের সর্বদেহে। কালের প্রভাবে অনেক চিহ্ন আজ লুপ্ত হয়ে গেছে; যেমন লুপ্ত হয়েছে শত সমৃদ্ধ নগরী। কিন্তু সহস্র ভগ্ন মন্দির আজও তার নীরব সাক্ষী।

পরিশিষ্ট—এক

গণহত্যা—পূর্ব পাকিস্তান

১৯৪৭ সালে দেশভাগের অনেক পূর্বেই পঃ পাকিস্তানে শুরু হয় হিন্দু-শিখ নিধন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ছিল তখন অপেক্ষাকৃত শান্ত। ঝড়ের পূর্বে যেমন প্রকৃতি। বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক সমর গুহ সেই অবস্থার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন ঃ হিন্দু আতঙ্কিত। সর্বগ্রাসী ভীতি তাকে এমন আচ্ছন্ন করেছে যে মুসলমান মাত্রেই তার প্রভু বা হুজুর। সে পরিত্যাগ করেছে তার চিরাচরিত পোশাক-পরিচ্ছদ, অভ্যাস ও রীতি নীতি, গ্রহণ করেছে মুসলিম পোশাক—লুঙ্গি ও পায়জামা। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ, এমন কি গান্ধী ও নেতাজীর ছবিও হিন্দুর ঘর থেকে অপসারিত। অ-মুসলমানের ঘরে শোভা পাচ্ছে মিঃ জিন্নার প্রতিকৃতি। পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন! নিষিদ্ধ হয়েছে "বন্দেমাতরম্" ও অন্যান্য দেশাত্মবোধক সংগীত। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে যে কোন রকম সম্পর্ক দেশদ্রোহিতা বলে গণ্য হয়। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতা সংক্রান্ত কোন আলোচনাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শাস্তির মেয়াদ ১০ বৎসর। (...In his terrorised mind, a non-Muslim today considers any Muslim as his master. Hindus have already began to abandon their traditional customs, habits and dresses. Lungi and Paijamas, common garments of East Bengal Muslims, are increasingly becoming common dresses of Hindus too....Portraits of Indian leaders, even of Gandhiji and Netaji, are disappearing from Hindu Houses, A portrait of Mr. Jinnah will be invariably found in every non-Muslim house. It is an essential sign-of their loyalty to Pakistan. "Bandemataram" and other national songs are prohibited in Pakistan. Association in any way with history of Indian national movement is looked upon as mark of disloyalty to Pakistan. Any talk about readjustment of sovereignty between India and Pakistan is punishable up to ten years.)[1]

---

1. Prof. Samar Guha–Non-Muslims Behind The Curtain of East Pakistan, P-30

পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁ (অন্তর্বর্তী সরকারে নেহেরুর অর্থমন্ত্রী) বলেন ঃ এই উপমহাদেশের মুসলমানের দীর্ঘদিনের আকাঙক্ষা যে ইসলামের শিক্ষা ও ঐতিহ্য অনুসারে তাদের জীবন বিকশিত হোক। সেই আশা-আকাঙক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা। আমরা পাকিস্তানিরা এজন্য বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না যে আমরা প্রায় সকলেই মুসলমান। আমেরিকা সফরে গিয়ে লিয়াকত আলি বলেন ঃ স্বাধীনতা লাভ করে উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরা দৃঢ়সংকল্প। স্বাধীন ভাবে তাঁরা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করবেন; উপাসনা করবেন আল্লার এবং অনুশীলন করবেন ইসলামিক জীবনচর্যার। (Pakistan was founded because the Muslims of this sub-continent wanted to build up their lives in accordance with the teachings and traditions of Islam. We, as Pakistanis, are not ashamed of the fact that we are overwhelmingly Muslims...Having achieved independence they (Muslims)are determined to pursue the aims...that they should be free to hold opinions, worship God in freedom and folow the Islamic way of life.)[1] একই অভিমত ব্যক্ত করেন পূঃ পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর ফিরোজ খাঁ নুনঃ—ইসলামিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রথম যে বইখানির আমরা শরণাপন্ন হব তা হল পবিত্র কোরান। (In order to establish an islamic Democracy, it is essential that we should know what it means and for this purpose the first book we should consult should be the holy Quran.)[2]

অধ্যাপক গুহ বলেন ইসলামের আদর্শই হল রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ অর্থাৎ ইসলামের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্যই পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা। শুধু মুসলমান নয়—সকলের প্রতি তা সমভাবে প্রযোজ্য। বিষয়টির ব্যাখ্যা করে লিয়াকত আলি বলেন ঃ মুসলমানের শুধুমাত্র স্বাধীন ধর্মাচরণের জন্য নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করেই রাষ্ট্র তার কর্তব্য শেষ করবে না। কারণ তা হবে পাকিস্তান দাবির আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করার শামিল। (The State is not to play the part of neutral observer wherein the Muslims may be merely free to profess and practise their religion, because such an attitude on the part of the state would be the very negation of the ideals which prompted the demand of Pakistan.)[3] এর সরল অর্থ মুসলমানের পক্ষ নিয়ে ইসলামের আদর্শ অনুসারে সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ার জন্য রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

---

1. Ibid, P-40
2. Ibid, P-41
3. Ibid, P-42

ইসলাম শুধুমাত্র ধর্মীয় "নীতিমালা" নয়। লিয়াকত আলি বলেন : সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক ক্রিয়া-কাণ্ডের জন্য ইসলাম নির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাও ইসলামিক অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। (Islam lays down specific directions for social behaviours. It pervades all aspect of our life. It relates to our system of Govt. and to our society with equal validity.)[1] পাক্-সংবিধান পরিষদের সদস্য ও Jamiat-ul-Ulema-e-Islam-এর সভাপতি মৌলানা সাবির আহ্‌মেদ ওসমানির মতে : ইসলামিক রাষ্ট্রের অর্থ হল যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামের মহান আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হবে। (...Islamic State means a state which is run on the exalted and excellent principles of Islam.)[2]

একথা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার, পাকিস্তান হল সর্ব অর্থেই মুসলিম জাতির জন্য একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র। ইসলামের আদর্শ তার ভিত্তিস্বরূপ। ইসলামের উদ্দেশ্য সাধনই হবে সে রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এমন যে রাষ্ট্র সেখানে অ-মুসলমানের স্থান কোথায়? অধ্যাপক সমর গুহের তাই বিস্মিত জিজ্ঞাসা : কিভাবে সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্রের আদর্শকে (তাঁদের নয় বলে) অস্বীকার করতে পারে? স্বৈরাচারী সর্বাত্মক রাষ্ট্রের কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র কি রাষ্ট্রীয় আদর্শের পাশাপাশি অন্য কোন আদর্শ বা তত্ত্বকে স্বীকার করে নেবে? স্বভাবতই অ-মুসলমানরা স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়েই ইসলামিক তত্ত্বকেই গ্রহণ করবে...কালক্রমে হয় নিশ্চিহ্ন হওয়া অথবা ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত অ-মুসলমানদের কোন গত্যন্তর নেই। (How then, the minorities can refuse to accept the Ideology of the State as not their own? Will any state, to speak the least of a totalitarian one, tolerate existence of a separate ideology side by side with the ideology of the State? Obviously the non-Muslim minorties of Pakistan, whether willingly or per force, are bound to accept Islamic Ideology as their own...the fate of the non-Muslims awaits either elimination from Pakistan or gradual absorption in it's body politic.)[3]

ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে অ-মুসলমানের কোন বৈধ অধিকার নেই। এমনকি নেই জীবনের নিরাপত্তা। ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী তাঁদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে—Either Islam or Death—ইসলাম অথবা মৃত্যু। অথচ আধুনিক রাষ্ট্রদর্শন

1. Ibid, P-42
2. Ibid, P-43
3. Ibid, P-45

অনুযায়ী সেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক। সমস্যা-সমাধানে "জিম্মি" (zimmie) শব্দটির পুনঃপ্রবর্তন হয়। "ইসলামিক রাষ্ট্রে বসবাসকারী অ-মুসলমানকে বলা হয় "জিম্মি"। "জিজিয়া" কর দিয়ে সে জীবনের সুরক্ষা ও কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। (A "Zimmie", according to Islamic history, is a non-Muslim in an Islamic State, who is entitled to get protection and limited benefit from state on payment of a certain Zizia tax.)[1] পাকিস্তানে "জিম্মি" এখন বহুল প্রচারিত। পাকিস্তান মুসলমি লীগ সরকারী ভাবেই হিন্দুর পক্ষে চরম অপমান স্বরূপ "জিম্মি" শব্দটি ব্যবহার করছে।

"পাকিস্তান-রাষ্ট্র" এই উপমহাদেশের মুসলমানদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। তাঁদের স্বপ্নের দেশ পাকিস্তানকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষণা এবং তদনুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন লোকচক্ষুর অন্তরালে হয়নি। পাক-রাষ্ট্র নেতারা তা করেছেন সগৌরবে, বিশ্ববাসীকে জানিয়ে। এদেশের বিচক্ষণ বিদগ্ধ প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের তা নিশ্চয়ই অবিদিত ছিল না। ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে দেশভাগ করেও তাঁরা লোক বিনিময়ের প্রস্তাব উপহাসের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের সুরক্ষার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

(ক) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি—২৫ নভেম্বর '৪৭

যে সকল অ-মুসলমান* জীবন ও সম্মান রক্ষার্থে পাকিস্তান হতে ভারতে চলে আসবে—কংগ্রেস তাঁদের সুরক্ষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। (The congress is bound to afford full protection to all those non-Muslims from Pakistan who have crossed the border and come over to India, or may do so to save their life and honour.)[2]

(খ) পণ্ডিত নেহেরু—১৫ আগস্ট -'৪৭

আমরা আজ সেই সকল ভাই-বোনদের কথাও স্মরণ করছি—রাজনৈতিক সীমানা বিন্যাস যাঁদের আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁরা সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার আনন্দে অংশ গ্রহণ করতে পারছেন না; তাঁরা আমাদের এবং সকল অবস্থায় তাঁরা আমাদেরই থাকবেন। তাঁদের সুখ-দুঃখের আমরা সম-অংশীদার। (We think also

* নির্যাতিত হিন্দুরাই পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে আসবে। কিন্তু "হিন্দু" এই শব্দটি ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসের ঐতিহ্য বিরোধী। এই শব্দ বর্জনে তাঁদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। তাই "হিন্দুর" পরিবর্তে "অ-মুসলমান" শব্দের ব্যবহার।

1. Ibid, P-46
2. N.C. Chatterjee–The East Bengal Tragedy–The Delhi Pact And Thereafter, P-5

of our brothers and sisters who have been cut off from us by the political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come, they are of us and will remain of us whatever may happen and we shall be sharers in their good and ill fortune alike.)[1]

(গ) সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল—১৫ আগস্ট, '৪৭

সীমানার ওপারে আমাদের যে ভাই বোনেরা রয়েছেন, তাঁরা যেন না ভাবেন যে আমরা তাদের ভুলে গেছি অথবা অবহেলা করছি। আমরা সাগ্রহে তাঁদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখছি। এই দৃঢ় আশা ও প্রত্যয় আমাদের আছে যে, অনতিবিলম্বেই মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্যে আমরা আবার ঐক্যবদ্ধ হব। (But let not our brethren across the border feel that they are neglected and forgotten. Their welfare will claim our vigilance and we shall follow with abiding interest their future in full hope and confidence that sooner than later we shall be united in common allegience to our country.)[2]

২৬ জুলাই — '৪৭ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সতর্কবাণী

পূঃ বঙ্গের হিন্দুদের প্রতি আমাদের যে মহান দায়িত্ব রয়েছে—পঃ বঙ্গের সরকার এবং জনগণকে তা অবশ্যই পালন করতে হবে। তাঁরা যদি তা না করেন তবে তা হবে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। (We have a great responsibility towards the Hindus in East Bengal and that must be discharged by the Govt. and people of this province. If they fail to do so, they will be guilty of the grossest betrayal.)[3] ডঃ শ্যামাপ্রসাদের আশঙ্কাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। পণ্ডিত নেহেরু ও কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি যে বাক্-বিন্যাসের অন্তরালে এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত—পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষী।

পঃ পাকিস্তানে হিন্দুমেধ যজ্ঞ (শিখরাও হিন্দু) '৪৭-সালের ফেব্রু-মার্চ শুরু হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তা চরম আকার ধারণ করে। এবারে পূঃ পাকিস্তানে শুরু হয় তার পুনরাবৃত্তি। বিশিষ্ট লেখক শ্রীদেবজ্যোতি রায়ের রচনা থেকে তা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হল ঃ

1. Ibid, P-5
2. N. C. Chatterjee–The East Bengal Tragedy–The Delhi Pact and Thereafter, P-5
3. Ibid, P-6

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলি সংবিধান পরিষদে একটি প্রস্তাব আনেন যাতে বলা হয় ঃ ইসলামে বর্ণিত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হবে। আবহাওয়া ধীরে-ধীরে উত্তপ্ত হয়। রাষ্ট্রীয় মদতে গুণ্ডাবাজ মুসলমানরা হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণ। এর সঙ্গে থাকে ধর্মান্তরকরণ।

১৯৪৯-এর আগস্ট থেকে ১৯৫০-এর ১৮-ই মার্চ পর্যন্ত হিন্দুদের উপর সংঘটিত পাশবিক অত্যাচার ও খুনের (One-sided diabolical killing and persecution of Hindus by Muslims.) তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ (সর্বশ্রী বসন্তকুমার দাস; গণেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, মুণীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, হারাণচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার এবং মনোরঞ্জন ধর)—প্রধানমন্ত্রী লিকায়ত আলির কাছে এক স্মারকলিপি দেন। তাঁরা এই স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন যে, ১৯৪৯-এর আগস্ট মাসে সিলেট জেলার বিয়ানি বাজার ও বরলেখা থানায় একতরফা ভাবে হিন্দু নিধন শুরু হয়। অবস্থা চরমে পৌঁছায় ’৫০-এ ফেব্রুয়ারীতে। ফেব্রুয়ারীর ৬ তারিখ রাতে এবং ৭ তারিখ বিকেলে রেডিও পাকিস্তান থেকে বারবার প্রচারিত একটি ঘোষণায় বলা হয়—“ভাইসব, আপনারা শুনেছেন পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে আমাদের মুসলমান ভাইদের উপর অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে। আপনারা কি প্রস্তুত হবেন না? আপনারা কি শক্তি সঞ্চয় করবেন না? ১০-ই ফেব্রুয়ারী সকালে চারজন মহিলার হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে এবং তাঁদের কাপড়ে লাল রঙ লাগিয়ে ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের চারিদিকে ঘোরানো হয়। বলা হয় যে, কোলকাতায় এদেরকে হিন্দু বানিয়ে এদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। বেলা ১১টার সময় সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীবৃন্দ অফিস ত্যাগ করে ভিক্টোরিয়া পার্কে সমবেত হয়ে সভা করে।* ওই সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুহত্যা এবং হিন্দুদের দোকান ও বাড়িঘর লুঠপাঠ শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে অগ্নিসংযোগ ও নারীধর্ষণ। ট্রেন ও স্টিমারে করে যে সব হিন্দুরা ঢাকায় আসছিলেন, স্টেশনে তাদেরকে খুন করা হয়। প্রায় ৭ ঘণ্টা ধরে একতরফা ধ্বংসলীলা চলার পরে মিলিটারী নামে। দেশের সর্বত্রই অনুরূপ ঘটনা ঘটে। স্মারকলিপিতে ঢাকা ছাড়াও সিলেট, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, চিটাগাং, নোয়াখালি, ত্রিপুরা জেলায় সংগঠিত পাশবিক অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া হয় এবং এর প্রতিকার ও প্রতিবিধানের জন্য ২২-দফা পরামর্শ দেন পূর্বোক্ত নেতৃবৃন্দ। লিয়াকত আলী সাহেব স্মারকলিপিটি গ্রহণ করে

---

* সচিবালয়ের সকল কর্মচারী যখন কাজ ফেলে মিছিলে যোগদান করার জন্য বেরিয়ে এলেন, তখন ওই বাড়িতেই পূঃ বঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব তাঁর প্রতিপক্ষ পঃ বঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব শ্রীসুকুমার সেনের সঙ্গে উভয় বাংলার দাঙ্গা বন্ধ করার পন্থা-পদ্ধতি উদ্‌ভাবনের জন্য বৈঠক করছিলেন। এ কাজ দুর্বল হিন্দুদের পক্ষেই সম্ভব।

হিন্দুদের কৃতার্থ করেন মাত্র। (শ্রীদেবজ্যোতি রায়—কেন উদ্বাস্তু হতে হল—পৃঃ ৩৩-৩৪)

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ও পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা

ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ছিলেন ভারতের তফসিলী ও দলিত সম্প্রদায়ের দুই শ্রদ্ধেয় নেতা। উভয় নেতাই রাজনীতিতে মুসলিম লীগের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছিলেন। ডঃ আম্বেদকর ছিলেন দূরদ্রষ্টা, বিদগ্ধ। বিশ্বরাজনীতি, মুসলমানের ধর্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর ব্যুৎপত্তি ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। দলিত-মুসলিম ঐক্য শ্লোগানে তিনি বিভ্রান্ত হননি। পক্ষান্তরে দলিত-মুসলিম ঐক্যের প্রধান প্রবক্তা যোগেন মন্ডলের সঙ্গে মুসলিম লীগের ছিল নিবিড়তম সম্পর্ক। তিনি আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করতেন যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই দলিতদের ঘোরতর শত্রু। তাই এদের বিরুদ্ধে দলিত-মুসলিম-মিলনের মধ্যেই রয়েছে দলিতদের মুক্তির নিশ্চিত সম্ভাবনা। বস্তুত এই বিশ্বাস-ই ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি স্বরূপ। দলিতরাও ধর্ম ও জাতিতে হিন্দু এবং অ-মুসলমান মাত্রে মুসলমানের নিকট ঘৃণ্য ও বধ্য—এই সহজ সরল সত্যকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। পাকিস্তান আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক যোগেন মন্ডল মুসলিম লীগের সদস্য পদ গ্রহণ করে পাকিস্তানকেই স্বদেশ রূপে গ্রহণ করেন। দেশ ভাগের পর '৪৭-সালের ৮-ই আগস্ট তিনি দিল্লি থেকে করাচী পৌঁছান।

'৪৭ সালের ১০-ই আগস্ট পাকিস্তানের সংবিধান সভার অধিবেশন বসে। সভার সদস্য সংখ্যা ৬৯। মুসলমান—৫০, হিন্দু—১৭ ও শিখ—১। হিন্দুদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী কিরণ শংকর রায়,* ভীমসেন সাচার, বীরেন্দ্র কুমার দত্ত, শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ। শিখ সদস্যদ্বয় ছিলেন অনুপস্থিত। সভার প্রারম্ভেই লিয়াকত আলির প্রস্তাব ও খাজা নাজিমুদ্দিনের সমর্থনে যোগেন মণ্ডল সর্বসম্মতিতে সভার অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। সমবেত সদস্যদের করতালির মধ্যে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। (At the outset, Mr. Liaquat Ali Khan

---

* লোক বিনিময়ের বাস্তব সম্মত ও সঙ্গত প্রস্তাব কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করে। গান্ধীর সকলেই "ভারতীয়" এই তত্ত্বকে স্বীকার করে খণ্ডিত ভারতের গণপরিষদে দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা ভারত ভাগকারী মুসলিম লীগের ২৬ জন সদস্যকে স্থান দেওয়া হয়! পাক-গণপরিষদে যে ১৭ জন হিন্দু নির্বাচিত হন, তার মধ্যে সর্বশ্রী কিরণ শংকর রায় ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি। পরবর্তী কালে এই বিচক্ষণ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ভারতে চলে আসেন। ভারতীয় গণপরিষদের মুসলিম লীগ সদস্যদের কিন্তু পাকিস্তান যেতে হয়নি। ভীমসেন সাচার পরে ভারতের একাধিক অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের পদ অলঙ্কৃত করেন। নেতৃত্বহীন সাধারণ হিন্দুরা ছিল দ্বিধাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত। তারাই হন "জেহাদের" বলি। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে অবাস্তব শূন্যগর্ভ মেকি আদর্শ একটা জাতির জীবনে কত বিপর্যয়কর হতে পারে।

proposed and Khwaja Nazimuddin seconded that Mr. J.N.Mondal be the Chairman of the Constituent Assembly pending election of the president. The suggestion was unanimously accepted and amid applause, Mr. Mondal took the chair.)[1]

যোগেনবাবু তাঁর ভাষণে বলেন ঃ আজ ইতিহাসের এই স্মরণীয় মুহূর্তে আমি পাকিস্তানের স্রষ্টা ও স্থপতি কায়েদ আজম জিন্নার প্রশংসা করি মুক্তকণ্ঠে (প্রবল হর্ষধ্বনি) ; তাঁর প্রতি জ্ঞাপন করছি গভীর কৃতজ্ঞতা।...একথা বলা বাহুল্য যে মিঃ জিন্না বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র নায়ক। ...নবজাত রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা এক শুভ সংকেত যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজনকে সভার অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র হল ন্যায়সঙ্গত দাবির জন্য ভারতের মুসলমানদের অবিরাম নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের সার্থক ফলশ্রুতি। (Referring to Mr. Jinnah, Mr. Mondal said :"I must express on this momentous occasion my gratitude to and admiration of Qaid-e-Azam Mohammed Ali Jinnah (Cheers), the great architect and creator of the sate of Pakistan...It is needless for me to reiterate that Mr. Jinnah is the greatest statesman and one of the greatest men of the world to-day....The election of temporary chairman from the members of the minority community augurs very well for the state. The creation of Pakistan today is the result of the persistent and legitimate demands of a minority community; namely the Muslims of India.")[2]

পূর্ব পাকিস্তানের এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর পাকিস্তান সরকারের আইন ও শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করে মর্মাহত হন। হয়তো অতীতের ভ্রান্ত রাজনীতির জন্য হয় অনুশোচনা। পাকিস্তান সম্বন্ধে তাঁর ঘটে মোহ মুক্তি। পঃ পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার পথে তিনি কলকাতা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন—সেখান থেকেই পাঠিয়ে দেন পদত্যাগ পত্র।* এই সুদীর্ঘ পত্রখানির গুরুত্ব বিবেচনা করে—নির্বাচিত অংশ সংক্ষেপে নিচে উদ্ধৃত হল ঃ

* পরবর্তীকালে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্র (উঃ ২৪ পরগনা, পঃ বঙ্গ) থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন।

1 The Statesman, 11-8-47
2 Ibid

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়,

পূর্ব বাংলার অনগ্রসর হিন্দু জনগণের উন্নতি সাধন আমার জীবন সাধনা। উদ্দেশ্য সাধনের ব্যর্থতায় আমি চরম হতাশাগ্রস্ত। তাই গভীর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনার মন্ত্রী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করছি। ভারত-পাক উপমহাদেশের ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে যে সকল কারণ আমাকে পদত্যাগে প্রণোদিত করেছে—তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সঙ্গত বলে আমি মনে করি।

....১৯৪৬ সালের মার্চে সাধারণ নির্বাচনের পর সুরাবর্দির নেতৃত্বে বাংলায় লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সে মন্ত্রীসভায় আমাকেও নেওয়া হয়েছিল। ওই বৎসরই ১৬-ই আগস্ট মুসলিম লীগ Direct Action Day-রূপে পালন করে। আপনি অবগত আছেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) কার্যত নির্বিচার হিন্দু-হত্যায় পর্যবসিত হয়। হিন্দুরা মন্ত্রীসভা থেকে আমার পদত্যাগ দাবি করে। আমি জীবন বিপন্ন বোধ করি। হত্যার হুমকি দিয়ে লেখা অনেক চিঠি আমি প্রতিদিন পেতাম। কিন্তু আমি অবিচলিত। জীবন বিপন্ন করেও আমাদের মুখপত্র 'জাগরণের" মাধ্যমে আমি তফশিলী সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন রাখি—তারা যেন কংগ্রেস-লীগ* রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে নিজেদের দূরে রাখেন। এ কথা আমি সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ না করে পারি না যে, সেদিন ক্রুদ্ধ হিন্দু-জনতার হাত থেকে প্রতিবেশী উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই আমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন। কলকাতার পর নোয়াখালিতে অনুষ্ঠিত হয় অনুরূপ দাঙ্গা। নিহত হয় অগণিত হিন্দু। শত শত হিন্দুকে করা হয় ধর্মান্তরিত। অপহৃতা ও ধর্ষিতা হন বহু হিন্দু নারী। দাঙ্গার পরই আমি ত্রিপুরা ও ফেনীর দাঙ্গা-পীড়িত এলাকা পরিদর্শন করি। হিন্দুদের উপর যে ভয়ংকর নির্যাতন হয়েছে তাতে আমি শোকাহত। তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের সঙ্গে আমার সহযোগিতার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন ছিল। কলকাতায় হিন্দু-নিধনের পরই সুরাবর্দি মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আনা হয় অনাস্থা প্রস্তাব। বাংলার বিধান সভায় তখন কংগ্রেস সমর্থক ৪ জন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও ৪ জন তফশিলী বিধায়ক ছিলেন। আমার একান্ত চেষ্টায় তারা অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। অন্যথায় মন্ত্রীসভার পরাজয় ছিল অনিবার্য।...

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাকে দ্বি-খণ্ডিত করার প্রস্তাবের আমি ছিলাম ঘোরতর বিরোধী। বাংলা-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে শুধু যে সকলের কাছ থেকে প্রবল বাধা পেয়েছি তাই নয়; শুনতে হয়েছে অকথ্য গালি গালাজ এবং

---

* কংগ্রেস কখনই রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগের হিন্দু-বিদ্বেষী রাজনীতির বিরোধিতা করেনি। কলকাতা দাঙ্গার সময় নেহেরু মন্ত্রীসভার গঠন নিয়ে আলোচনা করছিলেন জিন্নার সঙ্গে। এই দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব ছিল নীরব দর্শক।

সহ্য করতে হয়েছে চূড়ান্ত অপমান। অনুতাপ-অনুশোচনার সঙ্গে সেই দিনগুলির কথা স্মরণে আসে যখন এই উপমহাদেশের ৩২ কোটি হিন্দু আমার বিরুদ্ধে ছিল এবং আমাকে চিহ্নিত করেছিল হিন্দু ও হিন্দুধর্মের শত্রুরূপে। ...ঢাকায় নয়দিন অবস্থান কালে আমি ঢাকা ও তার সন্নিহিত দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করি।...ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা চট্টগ্রাম রেলপথে শত-শত হিন্দু-হত্যায় আমি মর্মাহত। ...বরিশালে পৌঁছে দাঙ্গার যে চিত্র আমি পেয়েছি তা আমাকে স্তম্ভিত করেছে। আমি বুঝতে পারি না যে জেলা সদর থেকে মাত্র ৬ মাইল দূরে কাশীপুর, মাধবপাশা ও লাকুটিয়ায় এরকম ভয়াবহ দাঙ্গা কিভাবে হতে পারে। মাধবপাশা জমিদার বাড়িতেই ২০০ হিন্দুকে হত্যা করা হয়। আহতের সংখ্যা ৪০। মুলাদিতে দেখেছি নরকের বীভৎসতা। মুলাদি বন্দরেই (পাট-গুদামে) হত্যা করা হয় ৩০০ হিন্দুকে। ...পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করে হিন্দু-যুবতীদের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ন্যায় উপঢৌকন দেওয়া হয় হত্যা-কাণ্ডের নায়কদের।....

মার্চের শেষদিকে শুরু হয় হিন্দুদের দেশান্তর-যাত্রা, ব্যাপকভাবে। মনে হল যেন অনতিবিলম্বেই সকল হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে যাবে। ভারতে সৃষ্টি হয় তীব্র প্রতিক্রিয়া—ওঠে রণ-হুংকার। পরিস্থিতি খুবই সঙ্কটজনক। একটা জাতীয় বিপর্যয় যেন অবশ্যম্ভাবী। অনিবার্য দুর্যোগ এড়াতে স্বাক্ষরিত হল দিল্লিচুক্তি।

দিল্লিচুক্তির ৬ মাস পরেও পাকিস্তানে ও বিদেশে হিন্দু-বিদ্বেষী ও ভারতে বিরোধী প্রচার অব্যাহত। সমগ্র পাকিস্তানে "কাশ্মীর দিবস" পালন সেই সাক্ষ্যই বহন করে। ভারতে বসবাসকারী মুসলমানের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানের শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন—পাঞ্জাবের (পাক) রাজ্যপালের এই সাম্প্রতিক বিবৃতিতে ভারতের প্রতি পাকিস্তানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

পূর্ববাংলার অবস্থা আজ কিরূপ? ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষ হিন্দু দেশত্যাগ করেছে। ...স্বদেশে হিন্দুরা আজ "রাষ্ট্রহীন"—প্রবাসী। তাঁদের একমাত্র অপরাধ—ধর্মে তাঁরা হিন্দু। আমার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, পাকিস্তানে হিন্দুদের কোন স্থান নেই। তাঁদের ভবিষ্যৎ গাঢ় তমসায় আচ্ছন্ন—হয় ধর্মান্তর অথবা অস্তিত্ব লোপ।...

পাকিস্তানের সামগ্রিক অবস্থা—হিন্দুদের প্রতি চরম নৃশংসতার কথা বাদ দিলেও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কম বিষাদ-তিক্ত ও ইঙ্গিতবহ নয়। সংসদীয় দলের নেতা ও প্রধান মন্ত্রী রূপে আপনি গত ৮-ই সেপ্টেম্বর আমাকে এক বিবৃতি দিতে বাধ্য করেছিলেন। আপনি জানেন অসত্য এবং তার চেয়েও ঘৃণ্য অর্ধসত্যের উপর ভিত্তি করে কোন বিবৃতি দানে আমি সম্মত ছিলাম না। ...এই ভণ্ডামী ও অসত্যের গুরুভার অসহনীয়। বিবেকের দংশনে আমি জর্জরিত। তাই মন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আপনার হাতে তা অর্পণ করছি। আশা করি, বিলম্ব না করে আপনি

তা গ্রহণ করবেন। আপনি অবশ্য এই শূন্যপদ এমন ভাবে পূরণ করবেন যা আপনার ইসলামিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনে হবে সহায়ক ও সঙ্গতিপূর্ণ।

৮ আগস্ট, ১৯৫০ ইতি বিনীত —

জে. এন. মন্ডল

My Dear Prime Minister,

It is with a heavy heart and sense of utter frustration at the failure of my life-long mission to uplift the backward Hindu masses of East Bengal that I feel compelled to tender resignation of my membership of your cabinet. It is proper that I should set forth in detail the reasons which have prompted me to take this decision at this important juncture of the history of Indo-Pakistan Sub-continent.

After the general election held in March 1946, Mr. H.S. Suhrawardy became the leader of the league Parliamentary party and formed the League Ministry in April, 1946...I was included in Mr. Suhrawardy's Cabinet. The 16th Day of August of that year was observed in Calcutta as "The Direct Action-day" by the Muslim league. It resulted, as you know, in a holocaust. Hindus demanded my resignation from the League Ministry. My life was in peril. I began to receive threatening letters almost every day. But I remained steadfast to my policy. Moreover, I issued an appeal through our journal "Jagaran" to the Scheduled caste people to keep themselves aloof from the bloody fued between the Congress and the Muslim League even at the risk of my life. I cannot but gratefully acknowledge the fact that I was saved from the wrath of infuriated Hindu mobs by my caste Hindu neighbours. The Calcutta carnage was followed by the 'Noakhali Riot' in Oct-46. There, Hindus including Scheduled Castes were killed and hundreds were converted to Islam. Hindu women were raped and abducted...Immediately after these happenings, I visited Tipperah and Feni and saw some riot affcted areas. The terrible sufferings of Hindus overwhelmed me with grief, but still I continued the policy of co-operation with the Muslim

League. Immediately after the massive Calcutta killing, a no confidence motion was moved against the Suhrawardy Ministry. It was only due to my efforts that the support of four Anglo-Indian Members and of four Scheduled Caste members of the Assembly who had hitherto been with the Congress could be secured, but for which the Ministry would have been defeated.....

It may also be mentioned in this connection that I was opposed to the partition of Bengal. In launching a campaign in this regard I had to face not only tremendous resistance from all quarters but also uspeakable abuse, insult and dishonour, With great regret, I recollect those days when 32 crores of Hindus of this Indo-Pakistan Sub-Continent turned their back against me and dubbed me as the enemy of Hindu and Hinduism.....

During my nine days' stay at Dacca, I visited most of the riot affected areas of the city and suburbs....The news of the killing of hundreds of innocent Hindus in trains, on railway lines between Dacca and Narayanganj, and Dacca and Chittagong gave me the rudest shock...I reached Barisal town and was astounded to know the happenings in Barisal...I was simply puzzled to find the havoc wrought by the Muslim rioters even at places like Kashipur, Madhabpasha and Lakutia which were within a radius of six miles from the District town...At the Madhabpasha Zaminder's house about 200 people were killed and 40 injured. A place, called Muladi, witnessed a dreadful hell. At Muladi Bandar alone, the number killed would total more than three hundred,...I got the information there that after the whole-sale killing of all adult males, all the young girls were distributed among the ringleaders of the miscreants...

The large scale exodus of Hindus from Bengal (East) commenced in the latter part of March. It appeared that within a short time all the Hindus would migrate to India. A war cry was raised in India. The situation became extremely critical. A national calamity appeared to be inevitable, The apprehended disaster however, was avoided by

the Delhi Agreement...But during this period of six months after the Agreement...communal propaganda and anti India propaganda by Pakistan both at home and abroad are continuing in full swing. The observance of Kashmir Day by the Muslim League all over Pakistan is an eloquent proof of communal anti-Indian propaganda by Pakistan. The recent speech of the Governor of Punjab (Pak) saying that Pakistan needed a strong Army for the security of Indian Muslims has betrayed the real attitude of Pakistan towards India.

What is today the condition in East-Bengal? About fifty lakhs of Hindus have left since the partition of the country...I shall not be unjustified in stating that Hindus of Pakistan have to all intents and purposes been rendered "Stateless" in their own houses...After anxious and prolonged struggle I have come to the conclusion that Pakistan is no place for Hindus to live in and that their future is darkened by the ominous shadow of conversion or liquidation...

Leaving aside the overall picture of Pakistan and the callous and cruel injustice done to others, my own personal experience is no less sad, bitter and revealing. You used your position as the prime Minister and leader of the Parliamentary party to ask me to issue a statement, which I did on the 8th Sept. last. You know that I was not willing to make a statement containing untruths and half truths, which were worse than untruths...But I can no longer afford to carry this load of false pretensions and untruth on my conscience and have decided to offer my resignations as your Minister, which I am hereby placing in your hands and which, I hope, you will accept without delay. You are of course at liberty to dispense with that office or dispose of it in such a manner as may suit adequately and effectively the objectives of your Islamic state.[1]

Yours Sincerely

8th Oct-1950 J.N.Mondal

1. শ্রীসুব্রত সাধন রক্ষিত—দলিত নেতা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল পদত্যাগ করেছিলেন কেন?

১৯৫০ সালের বিধ্বংসী দাঙ্গার (একতরফা) পর পূঃ পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর নর-নারী লাঞ্ছিত উৎপীড়িত ও সর্বস্বান্ত হয়ে পঃ বাংলায় আশ্রয় নেয়। তখন এ বঙ্গে আন্দোলন আরম্ভ হল যে যত সংখ্যক হিন্দু পূর্ববঙ্গ হতে বিতাড়িত হয়েছে, সেই সংখ্যক মুসলমানকে পূর্ববঙ্গে পাঠিয়ে হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক; যেমন হয়েছে পাঞ্জাবে। 'ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু গান্ধীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন যে ইহা ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত-রাষ্ট্রে (secular state of India) অসম্ভব! প্রধানমন্ত্রী, বিধান চন্দ্র রায়কে (পঃ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী) নির্দেশ দিলেন, পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের পঃ বঙ্গে আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে"। "ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে "যে দুইখানি চিঠিতে নেহেরু এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা চিরকাল মহাত্মা-গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর দুরপনেয় কলঙ্ক ও নিষ্ঠুরতার চরম নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে।"[1]

১৯৫০ সালের পরেও পরিকল্পনামাফিক ৩/৪ বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় হিন্দু হত্যা। চরম নৃশংস অত্যাচার ও নির্যাতনে সর্বস্ব হারিয়ে অগণিত হিন্দু এসেছে (এখনও বিরাম নেই) হিন্দুস্থানে। কিন্তু বাঙালী হিন্দু উদ্বাস্তুর পুরর্বাসনে অনুসৃত কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি লক্ষণীয়। সত্যিকারের পুনর্বাসন তাদের হয়নি। দণ্ডকারণ্য আন্দামান হতে আরম্ভ করে ভারতের সর্বত্র বাঙালী হিন্দু উদ্বাস্তুরা কুকুর-বিড়ালের ন্যায় বিতাড়িত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের সে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। রমেশ চন্দ্র মজুমতদার যথার্থই বলেছেন—"মহাত্মা গান্ধীর জাতীয় আদর্শ ও পণ্ডিত নেহেরুর ভাবোচ্ছ্বাসের যূপকাষ্ঠে যে কোটি কোটি বাঙালীর বলিদান হয়েছে, বাঙালী যদি কখনও মনুষ্যপদবাচ্য হয় তবে ইহার জবাবদিহি চাহিবে"।[2] এ অভিযোগের যৌক্তিকতা স্বীকার করেও বলতে হয় এ ব্যাপারে বাঙালীর দায়িত্বও কম নয়। পঃ পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে হিন্দু-শিখ পাঞ্জাবে এসে পুর্নবাসনে নিজেরাই বাস্তবোচির্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তারা নেহেরু সরকারের করুণা প্রার্থনা করেনি। সরকার বাধ্য হয়েছে উদ্বাস্তুদের সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে। পাঞ্জাব আজ সাম্প্রদায়িক সমস্যা হতে মুক্ত। আর বাঙালী হিন্দু? গান্ধীর হিন্দু-মুসলিম মিলনের নেশায় বিভোর। পূর্ব পাকিস্তানে সর্বস্বান্ত হয়ে এ বঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে কলকাতার ফুটপথ, ধুবুলিয়া অথবা রানাঘাট ক্যাম্পে। তারা যদি পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করত—তবে উদ্বাস্তু সমস্যার হত স্থায়ী ও বাঞ্ছিত সমাধান। মিলনের নেশা বাঙালী হিন্দুর এখনও কাটেনি—বরং বেড়েছে। তাই এ বঙ্গ থেকেও পুনরায় বিতাড়ন হয়তো অনিবার্য। দৃষ্টান্ত হিন্দু-শূন্য কাশ্মীর।

1. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস —৪ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮-৪৩৯
2. ঐ, পৃঃ ৪৩৮

পাকিস্তান বিশেষত পূঃ পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতি পণ্ডিত নেহেরু ও কংগ্রেসের বহু-শ্রুত, বহুল প্রচারিত প্রতিশ্রুতির কথা সর্বজনবিদিত। উপরিউক্ত চিঠি ও নেহেরু-লিয়াকত চুক্তিতে তার স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত। পূঃ পাকিস্তানে মুসলমান রাষ্ট্রীয় মদতে এত বড় হিন্দু-মেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করল—তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও ভারত সরকারের কোন নিন্দা বা প্রতিবাদ নেই। বরং পণ্ডিত নেহেরু পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলিকে আলোচনার জন্য দিল্লি আসার আমন্ত্রণ জানান। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে হিন্দু-হত্যাকারী লিয়াকত আলি রাষ্ট্রীয় অতিথিরূপে সাত দিন ছিলেন দিল্লিতে। সম্পাদিত হয় দিল্লিচুক্তি। হিন্দু-বিদ্বেষের যে ঐতিহ্য ভারত বিভাগকারী পণ্ডিত নেহেরু সৃষ্টি করেছেন—নেহেরু-লিয়াকত আলি চুক্তি (দিল্লি চুক্তি) তাতে এক নবতম সংযোজন। বাক্‌চাতুর্যে পূর্ণ. অন্তঃসারশূন্য এই চুক্তির দ়টি অংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চুক্তির মুখবন্ধে বলা হয় ঃ

ভারত ও পাকিস্তান সরকার নিজ নিজ দেশে ধর্মমত নির্বিশেষে সংখ্যালঘুদের সমান নাগরিক অধিকার প্রদানে সম্মত। উভয় সরকারই সংখ্যালঘুদের ধন-মান-জীবন ও সাংস্কৃতিক অধিকারের পূর্ণ-নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করতে বিবিসম্মতভাবে দায়বদ্ধ। (The Government of India and Pakistan solemnly agree that each shall ensure to the minorities throughout its territory complete equality of citizenship, irrespective of religion; a full sense of security in respect of life, culture, property and personal honour.)[1]

ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র—ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান। উদ্দেশ্য ও আদর্শ স্বতন্ত্র। কিন্তু চুক্তির বয়ান অনুযায়ী ভারত পাকিস্তান সমপর্যায়ভুক্ত হল। পূর্ব পাকিস্তানে যে ভয়াবহ হিন্দু-নিধনের পটভূমিকায় এই চুক্তি সম্পাদিত হয়, চুক্তির কোথাও তার আভাষমাত্র নেই। এর তাৎপর্য হল পূর্ব পাকিস্তানে যদি হিন্দু নিগৃহীত—ভারতে মুসলমানেরও একই অবস্থা। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ব পাকিস্তানের দাঙ্গার কোন প্রতিক্রিয়া এ বঙ্গে হয়নি। কূটনীতির বিচারে এই চুক্তি ভারতের এক বিরাট পরাজয়।*

---

* এই প্রথম বা শেষ নয়। দেশ ভাগের পর থেকে ১৯৭২ সালের বহু-প্রশংসিত সিমলাচুক্তি পর্যন্ত যত ভারত-পাক চুক্তি হয়েছে—সকল ক্ষেত্রেই শক্তিশালী বিজয়ী ভারতের শোচনীয় পরাজয় হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে র পর সম্পাদিত শান্তি চুক্তির সংক্ষিপ্ত উল্লেখে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে।

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হয়। ১৯১৯ সালের ৭ই মে ভার্সাই চুক্তির মূল শর্তগুলি প্রকাশিত হয়। চুক্তি রচনায় জার্মানির সঙ্গে কোন আলোচনা হয়নি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী—সেনাবাহিনীর সংখ্যা ১০০০০০-র বেশি হবে না। নিষিদ্ধ হয় ট্যাঙ্ক ও বিমানের ব্যবহার। নিষিদ্ধ হয় General Staff. নির্মাণ করা যাবে না ১০০০০ টনের অধিক যুদ্ধ জাহাজ। (It restrained the Army to 1,00,000 long-term volunteers and prohibited it from having

---

1. শ্রীদেবজ্যোতি রায়—কেন উদ্বাস্তু হতে হল, পৃ. ১১৮

চুক্তির C-7-নং ধারায় বলা হয়ঃ যদি কোন সংবাদপত্র, বেতার, ব্যক্তি বা সংগঠন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দুরভিসন্ধিমূলক কোন মতবাদ বা সংবাদ প্রচার করে তবে তা বন্ধের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; অপরাধীর বিরুদ্ধে নিতে হবে কঠোর ব্যবস্থা। (Take prompt and effective steps to prevent the dissemintion of news and mischievous opinion calculated to rouse communal passion by press or radio or by any individual or organisation. Those guilty of such activity shall be rigorously dealt with.)[1] এই ধারাটির প্রকৃত উদ্দেশ্য হল পূঃ পাকিস্তানে হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গার সংবাদ যেন ভারতের সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয়। অধ্যাপক সমর গুহ যথার্থই বলেছেন ঃ দিল্লী চুক্তি ও অন্তঃরাষ্ট্র সংবাদ মাধ্যমে চুক্তি পূঃ পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে প্রকৃত চিত্র দেশবাসদের অগোচরে রাখতে সফল হয়। (Delhi Pact together with inter-dominion press agreement has been able to keep the true picture of non-Muslims of Eastern Pakistan under cover.)[2]

Durga das (Rupa & Co.) প্রণীত—India from Curzon to Nehru and After—থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীদেবজ্যোতি রায় লিখেছেন ঃ

"অন্তত ৪ জন বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রী সেদিন নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। এঁরা হলেন সর্দার প্যাটেল, ডঃ আম্বেদকর, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও

---

planes or tanks. The General Staff was also out-lawed. The Navy was reduced to little more than a token force and forbidden to build submarines or vessels over 10000 tons.)[3] ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানীর এক বিরাট ভূ-খণ্ড কেড়ে নেওয়া হয়। জার্মান শিল্প ও কারখানায় দেখা দেয় কাঁচামালের সঙ্কট। জার্মানীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এক বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ। ১৯১৯-১৯২২ সালের মধ্যে জার্মানীকে পরিশোধ করতে হবে ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চুক্তির শর্ত পূরণ করতে শূন্য হয় জার্মান অর্থভাণ্ডার; ভেঙ্গে পড়ে সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামো।

১৯৪৫ সালের মে মাসে জার্মানী আত্মসমর্পণ করলে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধ চলাকালীন ইয়াল্টা ও পটাসডাম সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক মার্শাল স্ট্যালিন ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেন যে, জার্মানীর সামরিক ও আর্থিক শক্তির বুনিয়াদকেই ভেঙ্গে দিতে হবে। সকল অর্থেই জার্মানী হতে একটি Shepherd nation (মেষপালন যাঁদের জীবিকা)। তুলে আনতে হবে তার সকল শিল্প-কারখানা (Machinery plant)। জার্মানীর উপর ধার্য হবে বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ। স্ট্যালিন জার্মান General Staff (Military High Command) -এর সকলকে হত্যার প্রস্তাব করেন। চার্চিল রুজভেল্টের আপত্তিতে সে প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। যুদ্ধের পর শান্তি চুক্তিতে এই সমুদয় শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়—জার্মানীর সঙ্গে কোন আলোচনা না করে।

---

1. শ্রীদেবজ্যোতি রায়—কেন উদ্বাস্তু হতে হল? পৃঃ ১২০
2. Prof. Samar Guha—Non-Muslims Behind The Curtain of East Pakistan, P-31
3. William L Shirer—The Rise And Fall Of The Third Reich, P-82

ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী। প্যাটেল শেষ পর্যন্ত নেহেরুকে সমর্থন করেছিলেন। ডঃ আম্বেদকর নীরব ছিলেন এবং ডঃ মুখার্জী ও শ্রীনিয়োগী মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন।.....

নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তির উপরে ভারতের পার্লামেন্টে দীর্ঘ আলোচনা হয় ১৯৫০-এর আগস্ট মাসে। পণ্ডিত নেহেরু সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। সেদিন বিরোধী দলনেতা ডঃ মুখার্জী উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের জন্য তিনটি পথ দেখিয়েছিলেন—

১-ভারত ও পাকিস্তানের পুনর্মিলন

২-সংখ্যালঘু বিনিময়

৩-ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা পুনর্নির্ধারণ।

জবাবী ভাষণে পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন যে, ১ ও ৩ নং পথে অগ্রসর হওয়ার অর্থ যুদ্ধ করা। আমরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই। ২-নং পথে যাওয়ার অন্তরায় দুটো

(ক) অর্থের অভাব এবং

(খ) এ পথ ভারতের ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

(It is completely opposed to our political, economic, social and spiritual ideals. If you want to have an exchange of population, then you must change the whole basis of not only this government but of all that we have stood for this thirty odd years and during the movement for freedom in this country.)—Jawaharlal Nehru's speeches (1949-1953) Govt. of India publication.)

পণ্ডিত নেহেরুর এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ মানবিক ভাষণ সেদিন পূর্ববঙ্গে আটকে পড়া প্রায় দেড়কোটি সংখ্যালঘুকে এমন একটি নরকে নিক্ষেপ করেছিল যেখানকার নিত্য সঙ্গী হচ্ছে "হত্যা, লুণ্ঠন আর নারীধর্ষণ"। এর বিকল্প ছিল ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া। আমরা যারা এসব সহ্য করতে পারিনি বা পারছি না তারাই এখানে চলে এসেছি এবং এখনও আসছি। ওখানকার শেষ হিন্দু ও বৌদ্ধটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই চলে আসা অব্যাহত থাকবে।"[1]

সমকালে ও পরবর্তীকালে দিল্লি-চুক্তির তীব্র সমালোচনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞ এন. সি. চ্যাটার্জী এই চুক্তি ও নেহেরুর ভূমিকা সম্বন্ধে যে পর্যালোচনা করেছেন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বাস্তব পরিস্থিতি, সমসাময়িক ও বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিকায় তা খুবই মূল্যবান। নিচে তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল ঃ

ভারতের কতিপয় নেতা সাম্প্রদায়িকতার আতঙ্কে ভুগছেন। অন্ধ তাঁরা। অন্ধ চোখে দূরবীন লাগিয়েছেন বলেই তাঁরা যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলা করতে

1. শ্রীদেবজ্যোতি রায়—কেন উদ্বাস্তু হতে হল, পৃ. ৩৬

ব্যর্থ হয়েছেন। প্রশ্ন হল—প্রকৃত সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কে সাহায্য করছে? এর্নাকুলামে পণ্ডিত নেহেরু ভারত-পাক চুক্তির বিরোধীদের সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়েছেন। যাঁরা প্রকৃত ঘটনা জানেন, তাঁরা "বিরাট জয় হয়েছে" নেতৃবৃন্দের এই আত্মতুষ্টিতে কৌতুক বোধ করবেন। এই সকল আত্মসন্তুষ্ট নেতৃবৃন্দের অভিযোগ যে বিরোধীরা সাফল্যকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে চাইছে।

সত্য ঘটনা হল এই চুক্তি ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এক বিরাট জয়। যে শক্তি ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের বিতাড়নে বদ্ধ পরিকর, এই চুক্তিতে তারাই জয়ী হয়েছে। পণ্ডিত নেহেরু বলেছেন তাঁর কর্তব্য হবে সমালোচকদের বিরোধিতা করা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সর্বদা ও সর্বত্র সংগ্রাম করা। পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ এখনও দ্বি-জাতি তত্ত্বের মহিমা প্রচার করে রাজনীতিতে তার যথাযথ প্রয়োগ করছে। আমাদের সবিনয় জিজ্ঞাসা—পণ্ডিত নেহেরু কি এই মুসলিম লীগের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আগ্রহী? আমাদের জিজ্ঞাসা—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সময় থেকে মুসলিম লীগকে তোষণ করে সাম্প্রদায়িকতাকে কে প্রশ্রয় দিয়েছে?

বাংলার বর্তমান সমস্যা সাম্প্রদায়িক নয়, রাজনৈতিক। যে সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করে ভারতের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সংহতিকে ধ্বংস করেছে, তার নিকট জাতীয় নেতৃত্বের দুর্ভাগ্যজনক আত্মসমর্পণের এ হল প্রত্যক্ষ ও অনিবার্য ফলশ্রুতি। সেই শক্তি পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের বিতাড়ন করে সমধর্মাবলম্বীদের (মুসলমান)— নিয়ে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা করছে। মহম্মদ আলি জিন্না বলেছেন, সমজাতীয় চরিত্রের ওপর পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করবে। মুসলিম লীগ অ-মুসলমানদের বিতরণ করে সেই ঘোষিত লক্ষ্যই সাধন করছে। এই নীতিরই নিদারুণ পরিণতি— লক্ষ মানুষের দেশান্তর, রক্তপাত, নারীর লাঞ্ছনা ও কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনাশ।

পাক-ভারত চুক্তির উদ্যোক্তা ও প্রবক্তারা যেন স্মরণ রাখেন, কোটি কোটি স্বদেশবাসী সঙ্গত কারণেই বিশ্বাস করে যে, এই চুক্তি কার্যত সেই প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উৎসাহিত ও সাহায্য করবে যাঁরা শুধু ভারত ভাগ করেই ক্ষান্ত হয়নি—দেশব্যাপী রক্ত—বন্যা বইয়ে দিয়ে ভারতে সৃষ্টি করেছ ঘোরতর অরাজকতা। ত্রিবান্দ্রম ভাষণে প্রধান মন্ত্রী ভারতের ঐক্যবিরোধী বিভেদকামী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে সতর্ক করেছেন। যাঁরা ভারত ভাগ করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনে একান্তই আগ্রহী, যে পাকিস্তানের ভিত্তি হল হিন্দু ও তাঁর সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি সীমাহীন বিদ্বেষ, তাঁদের মুখে ভারত-ঐক্যের কথা নিতান্তই অশোভন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভাগ কি এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে?

পণ্ডিত নেহেরু তাঁর অনবদ্য আত্মজীবনীতে মুসলিম লীগকে বলেছেন, "গোঁড়া, আগ্রাসী ও জাতীয়তা-বিরোধী"। অথচ আশ্চর্য, তিনি ও তাঁর সহকারীবৃন্দ এই প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তা-বিরোধী মুসলিম লীগের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন। জনসম্মোহনী বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ ও জাতীয় ঐক্যের শ্লোগানে জনমানসে চমক সৃষ্টি করা যায়। (কিন্তু) যুদ্ধ বিরোধী আবেগপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা আমরা যেন কাপুরুষতাকে আড়াল করার চেষ্টা না করি। কাশ্মীরে কি যুদ্ধ হয়নি? আগ্রাসী পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভারত কি রক্তশূন্য হয়নি?

আমরা সকলেই শান্তিকামী—শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু সে শান্তি হবে অবশ্যই সম্মানজনক। এই মর্যাদার সঙ্গে শান্তি কি সম্ভব যদি আমরা ভুলে যাই, কোন সংগঠন যদি বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী হয় তবে তা হল মুসলিম লীগ। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, ইতিহাসের চরম সঙ্কট মুহূর্তে আমাদের নেতৃবৃন্দ ঘৃণ্য-বিদ্বেষ ও সংঘবদ্ধ হিংসায় মদতপুষ্ট মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেননি।

শান্তিপূর্ণ ভারত গঠন ও ভারতকে দুর্বল করার যে কোন অশুভ প্রয়াসকে প্রতিহত করতে হবে—এ বিষয়ে পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করি। কিন্তু প্রশ্ন হল (হিন্দু) বিদ্বেষ যাদের শক্তিমত্তার মূল ভিত্তি এবং যাঁরা এই অমানবিক বর্বরতার জন্য দায়ী, তাঁদের সঙ্গে সন্ধি ও চুক্তি করে কি শক্তিশালী ভারত গঠন সম্ভব? আর্থিক বিপর্যয়ে পাকিস্তান যখন বিপন্ন—এই চুক্তি তাকে সেই ঘোর সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছে। সঙ্কট মুহূর্তে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দ্বিধা-দুর্বলতা ও মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবল অনীহাই ভারতকে দুর্বল করবে। যাঁরা প্রকৃতই কামনা করে যে, হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে, নির্যাতিত মানুষের পরিত্রাতারূপে শক্তিশালী নবভারতের আবির্ভাব হোক—তাঁরা এই তোষণ নীতির ঘোরতর বিরোধী। তাঁরাই ভারতের ঐক্য ও সংহতির ধারক। এই চুক্তিতে পাকিস্তানেরই জয় হয়েছে। পাকিস্তান যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। দক্ষ রাজনীতিবিদ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। চুক্তিতে তিনি ভারতকে পাকিস্তানের সমপর্যায়ে নামিয়ে আনতে সফল হয়েছেন। দিল্লি চুক্তির সাহায্যে তিনি তাঁর দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন করে ভারতের বিরুদ্ধে যথারীতি অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। পরিতাপের বিষয় হল চরম অপমানেও আমাদের নেতৃবৃন্দ হিন্দু ও ভারত-বিরোধী অশুভ আগ্রাসী শক্তিকে সর্বত্র দূরে থাক্ কোথাও প্রতিরোধের চেষ্টা পর্যন্ত করেননি। বরং তাঁরা মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন ও গাঢ় আলিঙ্গন করে নিজেদের ধন্য মনে করেন। যদিও দুষ্কর্মের জন্য তাঁদের নেই কোন অনুশোচনা। তাঁরা (ভারতীয় নেতৃবৃন্দ) ভারতমাতার একনিষ্ঠ সেবকদের পাঠিয়েছে কারাগারে। যাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে—যখন ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর নিকট স্বাধীনতা ছিল স্বপ্নাতীত।

গভীর পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয় যে, পণ্ডিত নেহেরু ও তাঁর সহকর্মীদের ভূমিকা প্রতিক্রিয়াশীল, উগ্র, ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতাকেই* শক্তিশালী করবে। যদি তিনি যথার্থই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী হন তবে তাকে কার্যক্রম ও নীতির পরিবর্তন করতে হবে। তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী—হিন্দু অথবা খ্রীস্টান, তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ অর্থহীন। যাঁরা পূর্ব-নির্ধারিত সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী সংখ্যালঘু নির্যাতন করছে, পণ্ডিত নেহেরুর উচিত হবে দৃঢ়হস্তে তাঁদের মোকাবিলা করা। লক্ষ্য রাখতে হবে, আমাদের চিন্তা যেন এমন খাতে প্রবাহিত না হয় যা বিপর্যয়কে আমন্ত্রণ জানাবে। রাষ্ট্রীয় অর্থে মিথ্যা প্রচার ও স্তাবকদের সুললিত ভাষণের দ্বারা সত্যকে আড়াল করা যায় না। (Communalism is the spectre which is haunting some of the leaders of India. They, however put the telescope on the blind eye and fail to detect or resist communalism in its proper setting. The question is —who is helping the real communalists? In his Ernakulam speech Pandit Nehru condemned the critics of Indo-Pakistan Agreement as communalists. People who know the real state of facts would stand amazed at the complacency of the leaders who have worked themselves up to the feeling that they have scored a great victory. They are making accusations that their critics want to convert their victory into defeat.

The truth is that Pakistan has scored a victory over India. The forces which wanted to weed out the non-Muslim minority in an Islamic state have triumphed. Pandit Nehru has announced that it would be his duty to oppose his critics. On the issue of communalism he would fight his utmost any body anywhere and every where. May we ask Pandit Nehru whether he will figth the leaders of Pakistan who are still maintaining the Muslim League as the dominant force in that state and have been preaching and practising the two-nation theory? Since the communal Award who was appeasing the League and fostering communalism?

The present problem in Bengal is not communal but it is political. It is a direct sequel to the unfortunate surrender to the communal

* বিগত ৬০ বৎসরে নেহেরু ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারীদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও প্রশ্রয়ে খণ্ডিত ভারতে মুসলিম লীগ ও মুসলিম স্বাম্প্রদায়িকতা বহুগুণ শক্তিশালী হয়েছে।

forces which disrupted India and which divided Bengal and the Punjab. Those forces have been attempting to make a communal State homogeneous by the slow and steady purge of its non-Muslim elements. Muhammad Ali Jinnah had said that the success of the Pakistan state would depend on its' homogeneity. The leaders of the League were making their state homogeneous by forcing out non-Muslims. The result has been mass migration after misery and insult and blood-shed and loss of crores in properties left behind.

The sponsors of the Indo-Pakistan Agreement should remember that millions of their fellow country men honestly feel that in its actual working it would help the reactionary communal forces which have not only partitioned India but have caused so much misery and blood-shed and chaos. The Prime Minister of India in his speech in Trivandrum has stressed the unity of India and warned the nation against fissiparous and separatist tendencies, Homage to the unity of India comes with ill grace from those who are responsible for the vivisection of India and who have accepted Pakistan which is nothing but a communal State based on the hatred of Hindus and their culture. Has the communal partition of India solved any of the communal problems in India and Pakistan?

In his excellent Auto-biography Pandit Nehru had acidly condemned the Muslim League as "aggressive, anti-national and narrowminded". Yet he and his associates yielded to the anti-national and reactionary move on the part of the League. Eloquent speeches may be delivered and the public mind may be electrified by discourses on the unity of India. Let us not cover up our cowardice by declaiming war. Has there been no war in Kasmir? Did not the Pakistan army attack and invade Indian territory? Was not India bled white to fight Pakistan and to resist its aggression by military operations?

We ar all anxious for peace. But we want peace with honour. Can there be peace with honour, if we forget that if any organisation

was really responsible for "fissiparous and separatist tendencies" that was the League? It is our great regret that our leaders in the critical hour of the history of India did not resist the communalism of the League reinforced by organised outbreak of hatred and violence.

We agree with Pandit Nehru that India must be made strong and we should resist all attempts to make India week, But the question is —Will India be strong if she enters into Pacts and Treaties with those who were really responsible for these inhuman tragedies and who thrive on the exploitation of hatred. While Pakistan was tottering economically, the Indo-Pakistan Agreement came to its rescue. What will break India and what will make India weak is the weekness or vacillation on the part of her leaders in moments of crisis and their reluctance to fight the communalism of the League. Those who are opposed to the continuance of such a policy really want a strong and powerful India capable of protecting tortured humanity. They are really upholders of India's unity and integrity. The Pact was a victory for Pakistan. The government of Pakistan got what it wanted. An astute statesman, the prime Minister of Pakistan, succeeded in bringing down India on the same level with Pakistan. With the Delhi Treaty in his pocket he has rehabiliated his State and has been carrying on propaganda against India. It is our regret that in the hour of national humiliation our leaders did not fight to their utmost anywhere or everywhere, the dark and dismal forces of aggressive, anti Indian and anti-Hindu communalism but surrendered to their strategy. They shook hands with the leaders of the League and cordially embraced them although there had been no recantation on their part for their past misdeeds. At the same time they consigned to the prisons tried servants of the nation, some of whom had fought for India's liberation from British bondage long before the present rulers of India dreamt of India's independence.

We must say with regret that it is the action of Pandit Nehru and his associates which would result in strengthening reactionary

or fanatical communalism. If he genuinely wants to fight communalism, he should reverse his policy. He need not fight his old colleagues, Hindu or Christian. But he should fight those who have followed a predetermined pattern of minority-baiting simply on communal grounds. The thoughts of men should not be allowed to flow into the channels which may lead to disaster. Truth can not be glossed over by propaganda carried on with the resources of the State and well-advertised speeched of a handful of supporters.)[1]

গত ৬০ বৎসরে পাকিস্তান তিনবার ভারত আক্রমণ করেছে। মুসলিম জেহাদী গোষ্ঠীর সাহায্যে কাশ্মীরকে করেছে হিন্দুশূন্য। কিন্তু গান্ধী-নেহেরুর উত্তরসুরীরা ঐতিহ্যে অবিচল। তাদের মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান প্রীতি কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি। তাই আজও পূর্ববঙ্গে র অবশিষ্ট হতভাগ্য হিন্দুরা 'ইসলামিক জেহাদের" সহজ শিকার। বিপন্ন তাদের জীবন ও ধন মান।

1. The East Bengal Tragedy—The Delhi Pact And Thereafter—Forward by N. C. Chatterjee

পরিশিষ্ট–২

জিন্না বিতর্ক ও বর্তমান ভারতে মুসলমান

মানব সভ্যতার পীঠস্থান এই ভারতবর্ষ। সভ্যতার লীলাভূমি। ১০,০০০ বৎসর অথবা আরও প্রাচীনতর এই সভ্যতা। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পর ভারত হয় ক্ষাত্র-শূন্য; বিভক্ত হয়েছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজ্যে। এই সামরিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে যীশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের পূর্ব হতেই ভারত-ভূমিতে শুরু হয় বিদেশী হানাদারদের আক্রমণ। গ্রীক-শক-হুণের ব্যর্থ অভিযানের পর এল মুসলমান-৮ম শতাব্দীতে। ইরান-ইরাক-মিশরে তারা খুব সহজেই ওই দেশগুলির প্রাচীন সভ্যতাকে সমূলে ধ্বংস করে ওড়াতে পেরেছিল ইসলামের জয় পতাকা। কিন্তু প্রবল বাধা পেল ভারতবর্ষে এসে। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতি হিমালয় পর্বতের ন্যায়ই বিদেশী মুসলিম আক্রমণকারীদের নিকট দুরতিক্রম্য বাধা হয়ে দাড়াল। মুসলমান এদেশে প্রায় ১০০০ বৎসর রাজত্ব করেছে; কিন্তু হিন্দু জাতি ও তার ধর্ম-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে পারেনি। মুসলিম শাসন ছিল অনেকটা প্রাচীন গ্রিসের City State (নগর রাষ্ট্র) -এর ন্যায়। প্রধানত নগর বা শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দুরা সাময়িক পরাজয়কে কখনও চূড়ান্ত বলে মেনে নেয় নি। শক্তি অর্জন করে পুনরায় বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ ভারত ভাগ করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি পেশ করে। মাত্র ৭ বৎসরের মধ্যে ভারত বিভক্ত হল; জন্ম হল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-—পাকিস্তান। বিশাল ভারতের ১/৩ অংশ থেকে "ভারতবর্ষ" নামটি চিরতরে লুপ্ত হল; নিশ্চিহ্ন হল গৌরবময় ভারত সভ্যতা। ভারত বিভাগের জন্য ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি হল দিল্লীতে গভর্নর জেনারেলের সুরম্য প্রাসাদে। স্বাক্ষর করেন কংগ্রেসের পক্ষে পণ্ডিত নেহেরু, মুসলিম লীগের পক্ষে মহম্মদ আলি জিন্না ও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে গর্ভনর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন। চুক্তি হল হাসি মুখে উষ্ণ করমর্দন করে। আর তখন হিন্দু রক্তে প্লাবিত জিন্নার পঃ পাকিস্তানে লক্ষ ধর্ষিতা হিন্দু নারীর করুণ আর্তনাদ। লক্ষ লক্ষ হিন্দু-শিখকে পৈশাচিক বর্বরতার সঙ্গে হত্যা করা হল...। প্রায় ১$^{১}/_{২}$ কোটি হিন্দু-শিখ সর্বস্বান্ত হয়ে এল খণ্ডিত ভারতে। ভারত বিভাগ বিশ্বের এক ভয়ংকর

বিপর্যয়...। এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা সমালোচনার শেষ নেই; লেখা হয়েছে ছোট বড় অনেক বই। কিন্তু কোথাও সত্য-অন্বেষণের কোন প্রয়াস নেই। নেই আত্মসমীক্ষা।

এর কারণ হল ভারতে গান্ধীর আগমনের পর থেকে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ প্রায় রুদ্ধ হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইতিহাস রচনার নীতি নির্দেশিকা নির্দ্ধারণ করে দেন। জাতীয় কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ইতিহাস লেখা হয়, তাতে "মুসলিম শাসকরা হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে"—এই অভিযোগ নস্যাৎ করে দাবি করা হয় যে ধর্ম বিষয়ে মুসলিম শাসকরা ছিলেন খুবই সহনশীল। একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক "সুলতান মামুদ ও আওরঙ্গ জেবকে উগ্র ধর্মান্ধতার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন"। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা লালা লাজপত রায় লিখলেন—"ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনকে বিদেশী শাসন বলা যায় না।" (...that the Muslim rule in India was not a foreign rule.)[1] বিদগ্ধ পণ্ডিত, স্বনাম ধন্য ঐতিহাসিকগণ নিষ্ঠার সঙ্গে এই নির্দেশিকাকেই শিরোধার্য করেছেন। বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এদেশের স্কুল-কলেজের পাঠ্য ইতিহাসে পড়ানো হয়—রাজনৈতিক নেতা ও বিদ্বজ্জনেরা তাঁদের ভাষণে বলেন, ২০০ বৎসরের বিদেশী অধীনতার পর আমরা স্বাধীন হয়েছি। প্রশ্ন—২০০ বৎসের পূর্বে আমরা কি স্বাধীন ছিলাম? ইংরেজ বিদেশী—মুসলমান কি স্বদেশী? সকল বিভ্রান্তির মূল উৎস এখানে।

২০০৫ সালে এল, কে, আদবানী পাকিস্তান সফরে গিয়ে জিন্নাকে বলেছিলেন Secular. সেই থেকেই বর্তমান জিন্না বিতর্কের সৃষ্টি। Secularism—এই পদটির উৎপত্তি মধ্যযুগের ইউরোপে। উদ্দেশ্য হল চার্চ ও রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন। রাষ্ট্র যেমন চার্চের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করবে না—রাষ্ট্রের বিষয়ে তেমনি চার্চের কোন ভূমিকা থাকবে না। এদেশে মার্কসবাদীরা Secularism বলতে ঈশ্বর বিরোধিতা ও ধর্মদ্রোহীতা বোঝেন। Secular ইউরোপ-আমেরিকা কিন্তু ঈশ্বর বা ধর্মকে অস্বীকার করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলারে লেখা থাকে In God we Trust. প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্যদের মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হয় ঈশ্বরের নামে। ইংল্যান্ড ক্যাথলিক নয়, প্রোটেস্টান্ট। সে দেশে চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। রাজা হলেন চার্চের প্রধান। রাজবংশের কেহ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কোনও পুরুষ বা নারীকে বিবাহ করলে সিংহাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ ব্যারিস্টার জিন্না বিলেতী আদব-কায়দা, ধ্যান-ধারণা ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন। ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি তিনি খুব একটা পালন করতেন না। রাজনৈতিক ভাষ্যকার ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ বলেন—জিন্নার রাজনৈতিক জীবনকে

---

1. R.C. Majumder—History and Culture of the Indian People (The Mughal Empire—Preface-XIII)

দুইভাগে ভাগ করা যায়। চার দশকের পূর্বে ও পরে। প্রথম ভাগে তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী ও সেক্যুলার। কিন্তু ১৯৩৭-এর পর তাঁর ধারণা হল এদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতা অনুশীলনের পথ সুগম নয়।...("There are two Jinnahs—one of the Pre-1940's period and quite another subsequently"—says political scientist Imtiaz Ahmad. Earlier he was imbued with the spirit of nationalism and he was secular; but after 1937, he developed a notion there are practical difficulties to the practice of Secularism"—The Times of India-23.8.2009.) অবশেষে ১৯৪০ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন, হিন্দু-মুসলমান দু'টি স্বতন্ত্র জাতি। তারা এক সাথে শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করতে পারে না। তিনি মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান দাবী করেন।

এদেশে দেশ-বিভাগ সংক্রান্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল জিন্না-নেহেরু-প্যাটেল। অন্যদিকে খণ্ডিত স্বাধীনতার সকল কৃতিত্ব দেওয়া হয় গান্ধীকে। নেহেরু-প্যাটেল ছিলেন গান্ধীর একান্ত অনুগত। গান্ধী ছিলেন কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক। ভারত--বিভাগ প্রসঙ্গে তাঁর ভূমিকাই তো প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিৎ।* নেহেরু ও কংগ্রেসের বিশাল মাপের নেতৃবৃন্দ ছিলেন গান্ধীর আবিষ্কার। গান্ধীর আলোকে আলোকিত। বিদ্রূপ করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এফ, কে, নরিম্যান এদের বলতেন spring doll.

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, গান্ধীর "অহিংসা" জিন্নার "হিংসার" (Cult of violence) নিকট পরাজিত হয়। জিন্না ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় Direct Action, তারপর নোয়াখালি ও ভারতব্যাপী হিংসাত্মক (হিন্দুর বিরুদ্ধে) আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ ভাগ করে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনে সক্ষম হন। দেশ ভাগের বহু পূর্বেই (ফেব্রুঃ-মার্চ ১৯৪৭) পঃ পাকিস্তানে হিন্দু-মেধ যজ্ঞ শুরু হয়; আগস্ট মাসে তা চরম আকার ধারণ করে। তাঁর পূর্ণ সম্মতি ব্যতীত এরূপ গণহত্যা সম্ভব ছিল না। এই প্রেক্ষিতেই ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট পাকিস্তানের National Assembly-তে

* কংগ্রেস দলে তাঁর নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপনের কাহিনীটি বড়ই বিচিত্র। ১৯২৯ সাল। মতিলাল নেহেরু কংগ্রেস সভাপতি। ওই বছরই নতুন সভাপতি নির্বাচন। প্রার্থী দুজন। সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহেরু। প্রার্থীপদে প্যাটেলকে সমর্থন করে ৫টি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি; নেহেরুকে সমর্থন করে ৩টি, কংগ্রেস সংবিধান অনুযায়ী সর্দার প্যাটেলের নির্বাচন নিশ্চিত। কিন্তু বাদ সাধেন মতিলাল নেহেরু স্বয়ং। ১৯২৭ সাল থেকে তিনি পুত্রের জন্য গান্ধীর নিকট তদ্বির শুরু করেন...। শেষে গান্ধীর ইচ্ছায় কংগ্রেস সভাপতি পদে অভিষিক্ত হলেন জওহরলাল। রাজা যেন যুবরাজের হাতে রাজদণ্ড অর্পণ করলেন। (King Passing the sceptre of the throne to his logical successor.)[1] মতিলাল নেহেরু যে ঐতিহ্য স্থাপন করেন, পুত্র জওহরলাল সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করেই গণতান্ত্রিক ভারতে প্রতিষ্ঠা করেন পরিবার তন্ত্র। ১৯৩৭ সালেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। তবে নাটকীয় ঘটনা ঘটে ১৯৪৬ সালে। গান্ধী আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কয়েকটি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সভাপতি পদে সর্দার প্যাটেলের নাম প্রস্তাব করে। কিন্তু নেহেরুর

1. Raj Mohan Gandhi—Patel : A Life (Review—The Telegraph-2-2-91)

তাঁর বহু চর্চিত সেক্যুলার ভাষণ—সকল সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আশ্বাস বিচার্য। এ হল রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রথা মাফিক আনুষ্ঠানিক অভিভাষণ। অভিজিৎ ভট্টচার্য্য (Alumnus of the National Defence College of India and a member of the International Institute for Strategic Studies—London) পাঞ্জাবের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী Dr. Kripal Singh-কে উদ্ধৃত করে বলেন—Lord Mountbatten-এর নির্দেশে এবং Lord Ismay-র পরামর্শেই জিন্না ওই ভাষণ দিয়েছিলেন। (According to the Punjabi Scholar. Dr. Kripal Singh, Jinnah was advised to make

নামে কোন প্রস্তাব জমা পড়ে না। নিরুপায় গান্ধী নেহেরুকে বলেন ঃ কোন প্রদেশ কংগ্রেস তোমার নাম সুপারিশ করেনি। জওহরলাল মৌন...। গান্ধী প্যাটেলকে কৃপালনীর লেখা বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিতে বলেন। ("no P.C.C. has put forward your name." The Mahatma said to Nehru, Jawaharla reponded with complete silence"...Gandhi asked Patel to sign the statement that Kripalani had prepared.)[1]

নেহেরু ছিলেন গান্ধীর বিশেষ স্নেহভাজন; প্যাটেল ছিলেন কংগ্রেস দলের প্রিয়তম নেতা, সুদক্ষ সংগঠক এবং প্রশাসক। তবু গান্ধীর সমর্থন নেহেরুর প্রতি কেন? প্রথম কারণ হতে পারে নেহেরুর তারুণ্য; তাঁর সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা। সুভাষচন্দ্রও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তরুণ ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ মৌলানা আজাদের ভাষায় ঃ মুসলিম তরুণদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা। এ ব্যাখ্যা যুক্তিপূর্ণ মনে হয়। মুসলমানের কল্যাণ* চিন্তা ছিল গান্ধীর ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু ইহাই কি প্রকৃত কারণ? মনে হয় না। কারণ গান্ধীর বাহিরের রূপ সরল অনাড়ম্বর হলেও অন্তরে তিনি ছিলেন কর্তৃত্ব পরায়ণ, একনায়ক। সংগঠনে নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল তাঁর মনোগত বাসনা। তিনি কংগ্রেস দলের কোন পদাধিকারী ছিলেন না। কিন্তু দলকে তিনি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বা বিভাজন নয়; সকল ক্ষমতাই ছিল তাঁর হাতে কেন্দ্রীভূত। যখনই তিনি যুক্তির কাছে হেরে যেতেন, তখনই Inner Light (বিবেকবাণী/অর্ন্তদৃষ্টি), মৌনব্রত, আ-মৃত্যু অনশন অথবা অন্য কোন চরম পন্থার হুমকি দিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষকে স্ব-মতে আনতে বাধ্য করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাব শিষ্য সুভাষবসু ছিলেন বিরল, বর্ণোজ্জ্বল এক ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব। কিংবদন্তীর নায়করূপে ভারতবাসীর হৃদয় সিংহাসনে তিনি চিরকালের জন্য অধিষ্ঠিত। নেতৃত্বে তাঁর ছিল সহজাত স্বাভাবিক অধিকার। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন গান্ধী তা সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি সুভাষকে মনে করতেন তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ। ১৯৩৮ সালে সুভাষ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। পরের বৎসর ১৯৩৯ সালে গান্ধী-নেহেরু-ওয়ার্কিং কমিটির তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও, তিনি গান্ধীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রমাদ গুণলেন গান্ধী—তিনি সুভাষকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। সুভাষের জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা জওহরলালের ছিল না। তাই চিন্তা ও মননে বিপরীত ধর্মী হয়েও গান্ধী-নেহেরু যে অভিন্ন হৃদয় ছিলেন, তার কারণ সুভাষ। দলে তাঁর নিরঙ্কুশ কতৃত্ব অটুট রাখতে গান্ধী ছিলেন বদ্ধ পরিকর। অন্যকেহ সভাপতি হলে তাঁর ক্ষমতা কাল ক্রমে খর্ব হতে পারে। কংগ্রেস দলে নেহেরুর সীমিত প্রভাব সম্বন্ধে গান্ধী অবহিত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে শঙ্কার কোন কারণ নেই। তাই তিনি বলেন ঃ নেহেরু সভাপতি হলেও আমি ভাবতে পারব যে, আমিই সভাপতি। (His being in the chair is as good as my being in it.)[2]

1. Ibid
2. Ibid

* গান্ধীর পিতা ছিলেন গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের জনৈক মুসলিম জমিদারের কর্মচারী। গান্ধী নিজেও আইন ব্যবসায় সাফল্য না পেয়ে একটি মুসলিম কোম্পানীর হয়ে দঃ আফ্রিকা গিয়েছিলেন। আজন্ম মুসলিম সাহচর্য তাঁর প্রবাদ প্রতিম মুসলিম প্রীতির কারণ হতে পারে।

that Statement by Lord Ismay, who in turn acted at the behest of Mountbatten—The Statesman-29.8.2009.) ইসলাম সেক্যুলারিজিমের ঘোরতর বিরোধী। ইসলামে বিশ্বাসী কোন মুসলমান সেক্যুলার নন।

ভারত বিভাগের পর ছয় দশক অতিক্রান্ত। কিন্তু আজও বিষয়টি জনচেতনাকে আলোড়িত করে। যে কারণে দেশ বিভক্ত হয় তা আজও প্রবলভাবে বিদ্যমান। আগামী দিনে প্রবলতর হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত সমধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল—ভারত বিভাগ দাবির বিরুদ্ধে কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল কিনা।

১৯৪৬ সালের আগস্ট। বম্বে শহরের বাইরে মুসলিম লীগ সদস্যদের কাছে জিন্না "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের" তাৎপর্যের মূল্যায়ন করছেন। কংগ্রেস যদি যুদ্ধ চায়, তিনি ঘোষণা করেন, তবে ভারতের মুসলমান নির্দ্বিধায় সে প্রস্তাব গ্রহণ করবে। (In a tent outside Bombay in Aug 1946, he had evaluated for his followers in the Moslem League the meaning of Direct Action Day. If Congress wanted war, he declared, then India's Moslems would accept their offer unhesitatingly..."We shall have India divided," he vowed, or "we shall have India destroyed".)[1] ভারতে বসবাসকারী সকল মুসলমানের অবিসম্বাদী নেতারূপেই জিন্নার এই রণহুঙ্কার। কিন্তু আশ্চর্য! কংগ্রেস রুদ্ধকণ্ঠ। গান্ধী-নেহেরুর কল্পলোকে যে জাতীয়তাবাদী (?)* মুসলমানের বাস—তাদের কেহই জিন্নার স্পর্ধা ও

* কংগ্রেস এইরকম প্রচার করত (এখনও করে) যে এদেশের সকল মুসলমানই মুসলিম লীগ ও জিন্নার সমর্থক নয়। তাদের একটা বিরাট অংশ দেশ প্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী। স্প্যান-ইসলামিষ্ট ও মহম্মদ আলির পক্ষ নিয়ে গান্ধী যখন খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন—তখন এই তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানের স্বরূপ প্রকাশ পায় নি। কিন্তু খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হতেই জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মুখোশটি খসে পড়ে। (Most of the so-called Muslim Nationalist leaders—who were really Pan-Islamists masquerading under this disguise—now appeared in their true colour.)[2] রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে সহমত হয়ে ডঃ আম্বেদকর বলেন—Communal ও Nationalist মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই কঠিন। বস্তুত অধিকাংশ কংগ্রেসীদের বিশ্বাস যে উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলমান হল সাম্প্রদায়িক মুসলমানের দূরবর্তী ঘাঁটি। (It is difficult to see any real difference between the communal Muslims who form the Muslim League and the Nationilist Muslims...Indeed many Congressmen are alleged to hold the view that there is no difference between the two and that the Nationalist Muslim inside the Congress are only an outpost of the Communal Muslims.)[3]

1. Collins & Lapierre–Freedom at Midnight, P-29
2. R.C.Majumder–History of the Freedom Movement In India, Vol.III, P-450
3. B. R. Ambedkar–Writings and speeches, Vol.8, P-408

ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদ করেনি! কিন্তু মূল প্রশ্ন হল, গান্ধী-নেহেরু-কংগ্রেসের এই নীরবতা কেন? বিষয়টি খুবই গুরুতর। অন্যদেশের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টির বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়। আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক আব্রাহাম লিঙ্কন কিভাবে দক্ষিণী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করেছিলেন; পূর্বে তা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—আমাদের প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। জনগণের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সিংহলী, ধর্মে বৌদ্ধ। সংখ্যালঘু তামিলভাষীরা ধর্মে হিন্দু; আছে কিছু মুসলমানও। দেশভাগ করে স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে তামিলরা গত শতাব্দীর ছয়-এর দশক থেকে হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু করে। চার দশকের রক্তাক্ত সংগ্রামে উভয় পক্ষে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়। সিংহলী জনগণ ও দেশপ্রেমী নেতৃত্ব দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অবশেষে ২০০৯ সালের প্রথমার্ধে তামিলদের প্রধান সংগঠন LTTE-র সুপ্রীমো প্রভাকরণ নিহত হয়। সম্পূর্ণ পরাজিত হয় LTTE। রক্ষিত হয় শ্রীলঙ্কার অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব।

১৯৪৭ সালে অখণ্ড ভারতে হিন্দু ছিল ২৫ কোটি, মুসলমান ৯ কোটি; অন্যান্য ১$^{১}/_{২}$ কোটি। মাত্র ৯ কোটি মুসলমান দাবি করে পাকিস্তান; এবং দেশ ব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্টি করে প্রায় বলপূর্বক সে দাবি আদায় করে। ২৫ কোটি ভারতবাসীর বিরুদ্ধে ৯ কোটি বিদেশী মুসলমান রণহুংকার দেয়। কংগ্রেসের বীরকেশরী* বাক্যবাগীশ নেতৃবৃন্দের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়ার সাহস পর্যন্ত হয় না। অথচ দিল্লীর লালকেল্লা হতে এদের নামে সকাল-সন্ধ্যায় হয় তোপধ্বনি। স্তাবকের দল রচনা করেন কত বিচিত্র যশোগাথা। যারা বিদ্বজ্জন রূপে সরকারি স্বীকৃতি পেয়ে ভূষিত হন কত না খেতাবে। কমলবনে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় এরাই বিধ্বস্ত করেন ভারতের চিন্তা জগতকে।

ভারত বিভাগের জন্য কে দায়ী—এ প্রশ্ন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। একি সঙ্গে বিচার্য হল—মুসলমানের দাবির বিরুদ্ধে ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় গান্ধী নেহেরু-কংগ্রেস কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ১৯২০-২১ সালের "খিলাফত" আন্দোলন থেকে ১৯৪৬ সালের "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" নামে মুসলমানের সশস্ত্র দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা ও জিন্নার কাছে নতজানু হয়ে সানুনয় প্রার্থনা ছাড়া গান্ধী ও কংগ্রেস আর কিছুই করে নি। তাই ক্ষুদ্র সিংহল যা পারে—বিশাল ভারতবর্ষ তা পারে নি।

মুসলমানের পাকিস্তান দাবির বিরুদ্ধে একমাত্র হিন্দু মহাসভাই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছে। সভাপতি বীর সাভারকর কানপুরে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে ঘোষণা করেন—"মুসলমানের কর্তব্য হল জাতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রে তাদেরও থাকবে প্রতিনিধি। অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ন্যায় তাদেরও অধিকার

* দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধই সাহস-শৌর্য-বীর্যের উৎস। এ দুটির অভাবে মানুষ হয় ভীরু কাপুরুষ।

ও কর্তব্য আছে। কিন্তু পাকিস্তান দাবি করে তারা যে ঔদ্ধত্য ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে, তা বরদাস্ত করা হবে না। (..."The Moslem's duty", he said "was allegiance to the nation. Their rights and responsibilities were the same as those of other minorities, and they would be similarly represented on a democratic basis at the centre. But the outrageous and treacherous demand for Pakistan would not be tolerated.)[1] হিন্দু মহাসভা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির* নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে—ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সম্মানজনক শর্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের চুক্তি করার জন্য। কমিটি মিঃ জিন্নার সঙ্গেও আলোচনা করে। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কারণ জিন্না ও ব্রিটেন, উভয়েই জানে হিন্দু মহাসভার প্রভাব সীমিত। হিন্দুর বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গান্ধী ও কংগ্রেসের সমর্থক; মুসলমানের দাবির প্রতি যাদের রয়েছে সহানুভূতি ও গোপন সমর্থন! গান্ধী ভক্তরা বিদ্রুপ করে বলেন, হিন্দুরা হিন্দুমহাসভা নয় গান্ধী ও কংগ্রেসকেই সমর্থন করেছে। কথাটি সত্য। গান্ধী হিন্দুদের জাতীয়তাবোধ ও সংহতিকে ধ্বংস করেছেন। হিন্দু-মুসলিম মিলন মন্ত্রে হিন্দুদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন। আবার নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, গান্ধী ও কংগ্রেসকে সমর্থন করার জন্য হিন্দুকেই চরম মূল্য দিতে হয়েছে। তাঁর জন্মভূমি বিভক্ত হয়েছে; সংগঠিত হয়েছে মানব ইতিহাসের সর্বাধিক বিধ্বংসী গণহত্যা। হিন্দুর সেই মোহাবেশের ঘোর এখনও কাটেনি। তাই ২০ কোটি মুসলমানের দ্বারা পুনরায় ভারত বিভাগের নিশ্চিত আশঙ্কা...

ইসলামিক পণ্ডিত ও কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ রফিক জাকারিয়া—তাঁর The Man who divided India বইতে দেশভাগের জন্য জিন্নাকেই দায়ী করেছেন। খ্যাতনামা মুসলিম ঐতিহাসিক Sayeda Saiyidain Hameed উপরোক্ত বইয়ের (Hindustan Times–6-1-2002) সমীক্ষায় বলেছেন ঃ শক্তিশালী ভারতীয় জাতি, যার সভ্যতা হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন; কোন এক ব্যক্তি যতই ক্ষমতাবান হোন না কেন, তাঁর একারপক্ষে এই জাতির ঐক্য ধ্বংস করা সম্ভব নয়। (Zakaria's book suggest that it was Jinnah and only Jinnah, who brought about the partition. This is much too simplistic a view. No man could have been powerful enough to

---

* মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের একাংশ স্বাধীন বঙ্গদেশের প্রস্তাব করে। সে স্বাধীন বঙ্গদেশ হত মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ। দাঙ্গাবাজ মুসলমানদের অত্যাচারে কোটি কোটি বিপন্ন হিন্দুকে উদ্বাস্তু হয়ে আসতে হত খণ্ডিত ভারতে। কিন্তু কোথায় তাদের স্থান হত? বিচক্ষণ দূরদর্শী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বাংলা বিভাগের দাবি করেন। খণ্ডিত হয় বঙ্গদেশ। তাই ওপারের নির্যাতিত হিন্দুরা আশ্রয় পায় পশ্চিমবঙ্গে।

---

1. R.C.Majumder–History of the Freedom Movement In India, Vol.III, P-563

break a nation like India, which had taken thousand of years to evolve a civilisation of it's own. বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিক আয়েষা জালালও অনুরূপ অভিমত পোষণ করে বলেন—ভারতীয় জনমানসে জিন্নাকে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে, দেশ ভাগ ও রক্তপাতের জন্য একমাত্র জিন্নাই দায়ী। ফলে ভারতীয়রা কদাচিৎ প্রশ্ন করে যে, দেশের ঐক্য ও সংহতির জন্য নিবেদিত জাতীয় আদর্শকে একজন ব্যক্তি কিভাবে ধ্বংস করতে পারে। (Consequently, Indians have rarely asked how a nationalist ideology committed to the unity of the country came to be so effectively sabotaged by one individual—The Sunday Times of India—23.8.2009)

তবে কেন ভারত বিভক্ত হল? ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ১৯০৬ সালে আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ আয়োজিত সম্মেলনে—নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে; (মৌলালা আবুল কালাম আজাদও সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন–Azad—India wins freedom—P-117) হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে হিংসা ও বিভেদের* বীজ রোপিত হইয়াছিল—ভারত বিভাগ তারই সার্থক ফলশ্রুতি। তবে ভারত বিভাগে গান্ধীর অবদান কি? তিনি সেই "বীজ"টিকে সযত্নে পরিচর্যা করে অতি দ্রুত তাকে এক ভয়ংকর মহামহীরুহে পরিণত করেছিলেন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমান দিকে দিকে সগর্বে এই বার্তা পৌঁছে দিল যে তারা একটি স্বতন্ত্র জাতি। ১৯২০ সালে তিলকের মৃত্যু হলে গান্ধী হলেন কংগ্রেস ও ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অবিসম্বাদী নেতা। তিনি আবার সারাভারত খিলাফত কমিটির সভাপতি। মাতৃভূমির স্বরাজ অপেক্ষা মুসলমানের খিলাফত আন্দোলনের সাফল্যকে তিনি অগ্রাধিকার দিলেন। মৌলানা আজাদ ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভারতব্যাপী খিলাফত আন্দোলনকে সংগঠিত করেন। যার পরিসমাপ্তি ঘটে কেরালার মালাবার অঞ্চলে নির্বিচার হিন্দু নিধনে ও ভারত ব্যাপী মুসলমানের হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গায়। মুসলমান যে ভারতীয় না, তারা এক স্বতন্ত্র জাতি; এই তত্ত্ব গান্ধী খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর পরিচালনায় খিলাফত আন্দোলনে যে হাজার হাজার হিন্দু নিহত হয়, হাজার হাজার হিন্দু নারী হয় ধর্ষিতা—লক্ষ লক্ষ হিন্দু গৃহ হতে হয় বিতাড়িত-—তাঁর জন্য গান্ধীর বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। কিন্তু হিন্দু-হত্যাকারী মুসলমানদের জন্য রয়েছে সমবেদনা। হিংসাত্মক ভাষণের জন্য আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেফতার করা হলে—

* ...মনে হতে পারে ১৯০৬ সালের পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী মুসলমানের সঙ্গে অ-মুসলমানের কখনও মিলন হতে পারে না। পর ধর্মের প্রতি হিংসা-দ্বেষ মুসলমানের স্বভাব-ধর্ম।

-গান্ধী তাদের মুক্তির জন্য ভাইসরয়ের নিকট আবেদন করেন। এই অহিংসার অবতার গান্ধীই কিন্তু ভগৎ সিং-এর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা রহিত করার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করতে অস্বীকৃত হন। গান্ধী পরিচালিত খিলাফত আন্দোলনের পর মুসলমানের পাকিস্তান আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে। গান্ধীর নিঃশর্ত ও প্রত্যক্ষ সমর্থনে মুসলমান রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের আশ্রয় নেয়। তাদের দাবির বহর ক্রমশ বেড়েই চলে—পরিণামে ভারত বিভাগ।

দ্বি-জাতি তত্ত্ব

মুসলমান যে স্বতন্ত্র জাতি—একথা হিন্দু প্রথম বলেনি—বলেছে মুসলমান। এ জন্য সাধারণভাবে আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ ও মহম্মদ আলি জিন্নাকে দায়ী করা হয়। কিন্তু তারা এ তত্ত্ব পেলেন কোথায়? এর উৎস কোথায়? মুসলমানের ধর্ম শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য নয়—তাদের জীবনচর্যা (দাম্পত্য জীবনও) রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি-—সব কিছুই ধর্মের কঠিন অনুশাসনে বাঁধা। ইসলাম ধর্মের আকর গ্রন্থ কোরান মনুষ্য জাতিকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী। যারা আল্লা ও মহম্মদকে স্বীকার করে, তারা বিশ্বাসী (মুসলমান); যারা তা করে না তারা হল অবিশ্বাসী—কাফের (অ-মুসলমান)। মুসলমানের প্রতি আল্লার নির্দেশ—

যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করেনা...এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিজিয়া দেয়। (কোরান—৯/২৯)। দ্বি-জাতি তত্ত্ব ইসলামের সৃষ্টি। আধুনিক যুগে সৈয়দ আহ্‌মেদ ও জিন্না তাকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় উপস্থাপনা করেছেন মাত্র।

ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান মুসলমানের দাবি। কেন মুসলমান পাকিস্তান দাবি করে? কারণ ইসলাম ধর্মের বিধান অনুসারে পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত—দার-উল-ইসলাম (মুসলিম শাসিত দেশ) ও দার-উল-হারব (কাফের—অ-মুসলমান শাসিত দেশ) ১৭৫৭ সালে ইংরেজের হাতে সিরাজের পরাজয়ে* ভারতে মুসলিম রাজত্বের অবসান হয়। ভারত হয় দার-উল-হারব। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী মুসলমানের পবিত্র কর্তব্য হল দার-উল-হারবকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। তাই পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ বলেছেন—ইসলামের জন্যই এই রাষ্ট্রের (পাকিস্তান) সৃষ্টি। এই ইসলাম ধর্মই দেশের সামরিক বাহিনীর সহজাত শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। (This country was created for Islam...This religion gives the army it's inner strength and it's potential—The Statesman—7.8.2001.

---

* এই পরাজয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ। নতুবা ইউরোপীয় নবজারণের আলোকরশ্মি মুসলিম শাসনের ঘন তমসার আবরণ ভেদ করে এদেশে পৌঁছাত না। অভ্যুদয় হত না আধুনিক ঐক্যবদ্ধ ভারতের।

মহম্মদ আলি জিন্নাও বলেছেন—"বহু শতাব্দী পূর্বে যেদিন প্রথম হিন্দু ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়—সেদিনই পাকিস্তানের জন্ম হয়। (Pakistan was born the day when the first Hindu was converted to Islam centuries ago)[1] বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিক আজিজ আহ্‌মেদ বলেন—মুসলিম ভারতের নেতৃত্বে জিন্নার সাফল্যের গোপন কথাটি হল—জিন্না (মুসলমানদের) পরিচালনা করেন নি—মুসলিম জনতার সহমতই জিন্নাকে পরিচালনা করে। ("The secret of the success of Jinnah's leadership of Muslim India" says Aziz Ahmad, a noted Muslim writer,...he did not lead but was led by the Muslim concensus...")[2] দেশ বিভাগ ও মুসলিম রাষ্ট্র গঠনে মুসলিম জনতার অগ্রণী ভূমিকা* সম্বন্ধে এদেশের দিক্‌পাল ঐতিহাসিকদের নীরবতা বিস্ময়কর...।

মুসলমানের দাবি মেনে দেশ বিভাগ হলেও গান্ধীর ভূমিকা অবশ্যই বিচার্য। গান্ধী প্রকাশ্যেই বলেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান যদি দেশ বিভাগ দাবি করে—তবে তা মেনে নিতে হবে। ১৯৪৪ সালের ১৭ জুলাই গান্ধী মি জিন্নাকে Brother সম্বোধন করে চিঠি লিখে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেন। গান্ধী লিখেছেন—"আমাকে ইসলাম ও ভারতের মুসলমানদের শত্রু মনে কর না। আমি সর্বদাই তোমার ও মানবজাতির সেবক ও বন্ধু। আমাকে হতাশ কর না। (...Do not regard me as an enemy of Islam or Indian Muslims. I have always been a servant** and friend to you and Mankind. Do not disappoint me)[3] গান্ধী জিন্নার বাড়ি গিয়ে

---

* (ক) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে পৃথিবীতে ৪টি দেশ বিভক্ত হয়। জার্মানী, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও ভারতবর্ষ। প্রথমোক্ত তিনটি দেশের নামকরণ হয়েছে এইভাবে—পূর্ব ও পঃ জার্মানী, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম। কোন পক্ষই কিন্তু মাতৃভূমির নামে কোন পরিবর্তন করেনি। কারণ, তারা সকলেই তো জার্মান, কোরিয়ান ও ভিয়েতনামী। এক জাতি এক সংস্কৃতি। কিন্তু খণ্ডিত ভারতের একটি বিশাল অঞ্চল থেকে ভারত নামটি লুপ্ত হয়ে গেল। সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হল ১০০০০ বৎসরের সভ্যতা সংস্কৃতির গৌরবময় ইতিহাস। কেন এমন হল? কারণ যারা ভারত ভাগ করেছে—তারা নিজেদের ভারতীয় মনে করে না। দ্বিতীয়ত, প্রথমোক্ত তিনটি দেশে জনগণ অবিলম্বে পুনর্মিলন দাবি করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারণে তা বিলম্বিত হয়েছে। আজ জার্মানী ও ভিয়েতনাম ঐক্যবদ্ধ; কোরিয়াতেও ঐক্য আলোচনা চলেছে। এদেশে হিন্দু অখণ্ড ভারত গঠনে এখনও একান্ত আগ্রহী। বিরোধী মুসলমান। তারা ভুলেও ভারত-পাক পুনর্মিলন চায় না। কারণ তারা ভারতীয় নয়। জনসংঘ ও হিন্দু মহাসভা এ দাবি করত। ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলি তাকে সাম্প্রদায়িক বলে নিন্দা করে।

** গান্ধী জিন্নাকে Quaid-e-Azam (Great leader) বলে সম্বোধন করতেন। জিন্না তাকে সম্বোধন করতেন Mr. Gandhi বলে –Tragic Story of Partition-P-152

---

1. H.V. Seshadri—The Tragic story of Partition, P-113
   (Quoted from—Aziz Ahmed—Studies—P-276)
2. Ibid, P-113
3. H.V.Seshadri–The Tragic Story of Partition, P-152

৯ সেপ্টেম্বর—২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭ দিন জিন্নার সঙ্গে তাঁর পাকিস্তান দাবি নিয়ে আলোচনা করেন। ভারত-বিভাগ নাটকের অন্তিম পর্ব। ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ জুন। দিল্লীতে AICC-র অধিবেশনে গান্ধী দেশ-বিভাগ প্রস্তাব গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে ৪০ মিঃ বক্তব্য রাখেন। ১৫৭-২৯ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করে। তখন নেহেরু-প্যাটেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দেবার জন্য গান্ধী—আমরণ অনশন* শুরু করেন। এই অনশন তিনি দেশ-বিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কেন করেন নি...?

ভারতের মুক্তি সংগ্রামে গান্ধীর অবদান কতটুকু তা গবেষণার বিষয়...। তবে তাঁর আন্তরিক ও অক্লান্ত প্রয়াসের ফলেই যে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়েছে—সে সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রকৃত পক্ষে জিন্না নয়, পাকিস্তানের স্রষ্টা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী...।

মাতৃভূমি খন্ডিত হল। কিন্তু ইসলামের যে বীজ থেকে পাকিস্তানের সৃষ্টি—তাকে সমূলে উৎপাটিত না করে এদেশেই সযত্নে রেখে দেওয়া হল। হিন্দু-মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র

(খ) ইসলামের ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ এদেশের রাষ্ট্রনেতা ও প্রথিতযশা বুদ্ধি জীবীরা এরকম প্রচার করে থাকেন যে, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে বৈরীতা—তার জন্য দায়ী উভয় দেশের সরকার। পাকিস্তানের আমজনতা ভারত বিরোধী নয়—বরং তারা ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। এ প্রসঙ্গে আনন্দবাজারের সাংবাদিক সেমন্তী ঘোষের বিশেষ প্রতিবেদন "পাকিস্তানকে যদি পাকিস্তানের দিক থেকে দেখি—" (আ: বা: ১৬-১২-২০০৮) উল্লেখ্য ঃ

"২০০৮-এর রক্তপাতের (পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মুসলিম তাণ্ডবে নিহত—৪৪১, আহত—১৪৭৮) এই মহালীলায় আমেরিকা ও পশ্চি মি শক্তিগুলি নতুন সংযোজন হলেও ভারত কিন্তু নতুন নয়। গত ষাট বছর ধরেই পাকিস্তানে জঙ্গি -গোয়েন্দা-সেনাবাহিনী নেটওয়ার্ক-এর 'রেজঁ দ্য'-এ বা অস্তিত্বের কারণই ভারতঃ 'কাট, কাট অ্যান্ড কাট ইন্ডিয়া টিল ইট ব্লিডস' এই দর্শন। যে ভাবে সব প্রশাসনিক সামাজিক ব্যর্থতাকে ভারত-বিরোধী জিগিরে পরিবর্তিত করে ইসলামাবাদ তার গদি সামাল দিয়েছে, বিশ্বভুবনে অমন দৃষ্টান্ত কমই আছে। আমেরিকাও ঠান্ডা যুদ্ধে র নেশায় মহোৎসাহে তাল মিলিয়েছে। আমেরিকার পশ্চাদ্‌পসরণের ফলেই আজ এই রক্তলীলার তীব্রতা। সেই তীব্রতার আঁচ এসে পড়েছে ভারতেও। অর্থাৎ ভারতের ওপর আক্রমণ 'তীব্র' হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ হয় নি। আমেরিকা-ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের মিত্রতা দিয়েই তাই ভারতের প্রতি পাক জঙ্গি মনোভাব ব্যাখ্যা করা যায় না। দিল্লী সংসদ হামলা, যা সফল হলে মুম্বাই-এর থেকেও বীভৎস রূপ নিতে পারত, সে-ও তো ছিল লস্কর-এ-তৈবা'রই পরিকল্পনা। আসলে, ষাট বছর অবিরল মস্তিষ্কধৌতির ফলে পাকিস্তানের সমাজও পালটেছে। ২০০৮-এ পাকিস্তানে জঙ্গিদের প্রতি বিতৃষ্ণা তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। তাই আজ ভারতের সমস্যার প্রেক্ষিতে ইসলামাবাদ যদি জঙ্গিদের দমন করতে চায়, সেই ইসলামাবাদকে সামরিক বাহিনীর ক্রোধদণ্ডের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, নাগরিকরাই সরকারকে ছুড়ে ফেলে দেবেন।"

পাক সামরিক বাহিনী না হয় বিগত ৬০ বৎসর পাক জনগণের "মস্তিষ্ক ধৌত" করেছে। কিন্তু তার পূর্বে কে বা কোন শক্তি মুসলমানের "মস্তিষ্ক ধৌত" করে তাকে ভারত ও হিন্দু বিদ্বেষী করেছে? পৃথিবীর কোন দেশের সরকার বা সামরিক বাহিনী "মস্তিষ্ক ধৌত" করে স্বদেশীয় জনগণের মধ্যে অন্যদেশের জনগণের প্রতি বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করতে পারে না;যদি না তা সহজাতভাবে বিদ্যমান থাকে। ধর্মীয় কারণেই হিন্দু ও হিন্দুস্থানের প্রতি মুসলমানের রয়েছে সহজাত বিদ্বেষ। সে কারণেই ভারত বিভাগ। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বৈরীতার মূল উৎসও তাই।

---

* এই অনশন ছিল সম্ভবত নাথুরামের নিকট চরমতম ও সহনাতীত প্ররোচনা।

জাতি। তারা এক সঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করতে পারে না। তাই ভারত বিভক্ত হয়। কিন্তু হয় না লোক বিনিময়। মুসলমান আরণ্যক হিংস্রতার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে হত্যা করে। কোটি কোটি স্বজন হারা, সর্বহারা হিন্দু-শিখ চলে আসে খন্ডিত ভারতে। পঃ পাকিস্তান হয় হিন্দু শূন্য। পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) হিন্দুদেরও অনুরূপ অবস্থা হয়। এদেশের বিদ্বজ্জনেরা গান্ধী-হত্যার* জন্য নাথুরামের নিন্দায় ধিক্কারে মুক্ত কণ্ঠ। গান্ধীর জন্য তাদের নয়ন জলে আশ্রুর সাগর সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোটি হিন্দুর সীমাহীন দুর্দশার জন্য তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ, বাক্য হারা; শুকিয়ে যায় অশ্রুর উৎস। গান্ধীর অপরাধ সীমাহীন—ক্ষমার অযোগ্য...গান্ধী ও তাঁর একান্ত অনুগত বশংবদ-নেহেরু,** উভয়েরই মুসলিম প্রীতি ও তোষণ ছিল প্রবাদ প্রতিম। এই মুসলিম প্রীতি ও তোষণ জিন্নার পাকিস্তান দাবি অর্জনের পক্ষে সহায়ক হয়। যশোবন্ত সিংহ তাঁর বইতে লিখেছেন—"জিন্না ও নেহেরু, দুজনেই মুসলিমদের জন্য বিশেষ মর্যাদা চাইতেন...একটা সময় অবিভক্ত ভারতের দুই বিশিষ্ট নেতা মুসলিমদের মুখপাত্র হওয়ার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা করতেন।" এ অভিমত যথার্থ বলেই মনে হয়। দেশবিভাগের পূর্বে ও পরে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে নেহেরুর ভূমিকা তার প্রমাণ। হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের পরিকল্পিত ব্যাপক আক্রমণেও তিনি নীরব নির্বিকার। কিন্তু হিন্দুর সামান্য প্রতিক্রিয়াতেই তিনি হতেন উদ্বিগ্ন চঞ্চল। হিন্দু নয়, মুসলমানের সুরক্ষাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। মুসলমানকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যই তিনি ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে দেশ ভাগ করেও "ধর্মনিরপেক্ষতা" নামে এক সর্বনাশা মুসলিম তোষণ নীতি গ্রহণ করেন। ভারত বিভাগ নাটকের শেষ অঙ্কে নেহেরুই ছিলেন অগ্রনী ভূমিকায়। সুতরাং দেশ বিভাগের জন্য তিনিও গান্ধীর ন্যায় সমানভাবে দায়ী। যশোবন্ত সিংহ তাঁর Jinnah–India–Pakistan–Independence বইতে লিখেছেন "আমরা তাঁর ভুল মূল্যায়ণ করেছি—কারণ আমাদের একটি দানব তৈরী করার প্রয়োজন ছিল। বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক মর্মান্তিক ঘটনা হল ভারত বিভাগ"। (I think we have misunderstood him, because we needed to create a demon. We needed a demon because in the 20th century the most telling event in the subcontinent

---

* গান্ধী বেঁচে থাকলে হিন্দু ও ভারতের আরও যে কত বিপর্যয় হত...

** পিতার দৌলত, গান্ধীর অনুগ্রহ, কপটতা, শাঠ্য ও ষড়যন্ত্র ছিল রাজনীতিতে জওহরলাল নেহেরুর মূলধন। তার রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্বন্ধে কংগ্রেসের official history-তে লেখা হয়েছে—তিনি মার্কসবাদ ও কম্যুনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে ভারতে এলেন। (Jawaharlal came in India full of Communist and Marxian ideas)[1] কম্যুনিষ্টরা তত্ত্বগতভাবেই হিন্দু-বিদ্বেষী হয়। নেহেরুও ছিলেন ঘোরতর হিন্দু বিদ্বেষী। স্তুতিবাদ ও সরকারি প্রচার যন্ত্রের কল্যাণে এই নেহেরু হলেন নব ভারতের রূপকার। নেহেরু ছিলেন ক্ষমতালোভী, নীতি বোধ শূন্য ও পরনারী

---

1. R. C. Majumder–History of the Freedom Movement in India, Vol III, P-460

was the partition)। জিন্না (প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ না করলেও) মুসলমান, ভারতীয় নয়—ইসলামে বিশ্বাসী। ধর্মীয় বিধান অনুসারে তিনি দেশ বিভাগ করে "পাকিস্তান" দাবি করবেন—এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু যারা জন্মে ও ধর্মে হিন্দু হয়েও মুসলমানের দাবিকে প্রকারান্তরে সর্বপ্রকারে সমর্থন করেন তাদের দায়িত্ব? দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণ্যতম অপরাধ লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতেই—এদেশের ইতিহাস ও প্রচার মাধ্যমে জিন্নাকে দানবরূপে চিত্রিত করা হয়।

কেন্দ্রে তখন নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস-মুসলিম লীগের কোয়ালিশন সরকার। Lord Wavell ইংরেজ বড়লাট। ফেব্রু—মার্চ-১৯৪৭। পাঞ্জাবে (পঃ পাঞ্জাব) ভয়াবহ হিন্দু শিখ বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়। সরকারি হিসেবে মৃত—২০৪৯; আহত—১০০০।

আসক্ত। V. K. Krishnamenon তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—The P.M. (Nehru) is the Keptman of Lady Mount batten.[1] ভারতের প্রধান মন্ত্রীত্ব ছিল তাঁহার স্বপ্ন। কিন্তু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নেতাজী সুভাষ।

(ক) মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর এখন সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত যে, ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট ফরমোজার তাইহোকু বিমান বন্দরে কোন বিমান দুর্ঘটনাই হয় নাই। মিত্র বাহিনীকে বিভ্রান্ত করে রাশিয়ায় যাওয়ার জন্যই স্বয়ং নেতাজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী এরূপ প্রচার করা হয়। নেতাজীর প্রতি স্ট্যালিনের কোন বৈরীতা ছিল না, সুতরাং নেতাজীর যদি স্ট্যালিনের কারাগারেই মৃত্যু হয়, তবে তা হয়েছে নেহেরুর অনুরোধেই। প্রতিদানে নেহেরু জোট-নিরপেক্ষ (?) ভারতকে রাশিয়ার দোসর (second fiddle) করেছেন।

(খ) নেতাজীর পর এবার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী—পার্লামেন্টে নেহেরুর প্রধান প্রতিপক্ষ। নেহেরুর বিশেষ স্নেহভাজন শেখ আবদুল্লার কারাগারে কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদের রহস্যজনক মৃত্যুর জন্য নেহেরুকে অভিযুক্ত করা হয়।

স্বাধীনতার ৬০ বঃ পরও ভারত আজ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ। কেন? কম্যুনিষ্ট নেহেরু রাশিয়ার অনুকরণে এদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রণয়ন করেছিলেন। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে। এদেশে কেন সফল হবে?

(ঘ) কাশ্মীর রক্তাক্ত। কাশ্মীর উপত্যকা হিন্দুশূন্য। কাশ্মীরের অর্দ্ধাংশ আজ যে পাকিস্তান ও চীনের অধিকারে;তা নেহেরুর এক বিশেষ অবদান।

(ঙ) কম্যুনিষ্ট নেহেরু কম্যুনিষ্ট চীনের সঙ্গে "হিন্দী-চীনি ভাই ভাই" শ্লোগানে ছিলেন মাতোয়ারা। চীন ১৯৬২ সালে তার জবাব দেয় ভারত আক্রমণ করে। প্রায় লক্ষাধিক বঃ কি.মি. ভারত ভূ-খণ্ড চীনের দখলে। সাম্যবাদী চীন এখন ভারতকে খন্ড খন্ড করে ভারতকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ভারতের শত্রুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

(চ) চীন ও পাকিস্তান ভারতের চিরবৈরী। কিন্তু প্রধান শত্রু কম্যুনিস্ট চীন। চীনের তুলনায় ভারত সামরিক প্রস্তুতিতে অনেক পেছনে। কেন? শান্তি কামী নেহেরু প্রধান মন্ত্রী হয়েই Army-কে disband করতে চেয়েছিলেন। বন্ধ করেছিলেন অস্ত্র কারখানায় অস্ত্র উৎপাদন। প্রতিরক্ষার জন্য বরাদ্দ হত G.D.P'র মাত্র এক শতাংশ।

ইংরেজ সামরিক ইতিহাস বিশেষজ্ঞ Basil Liddell Hart বলেছেন—তুমি যদি শান্তি চাও—তবে যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন কর। (If you want peace, understand war) একই কথা বলেছেন Will Durant। জাতি অবশ্যই হবে শান্তি কামী—কিন্তু সে কামানের বারুদও শুষ্ক রাখবে। (A nation must love peace–but keep its' powder dry) এদেশের শ্লোগান সর্বস্ব দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ক্লীব স্থবির রাজনৈতিক নেতৃত্ব রাষ্ট্রনীতির এই মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধ নিতান্তই অজ্ঞ। পন্ডিত নেহেরু এই ধারার প্রবর্তক। সেই ট্রাডিশন এখনও চলেছে।

এই হল নবভারতের রূপকার, বিশ্ব শান্তির ঋত্বিক ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অবিনশ্বর কীর্তি।

---

1. M.O.Mathai—Reminiscences of the Nehru Age, P-188

বিচলিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারত বিভাগের পূর্বেই পাঞ্জাব প্রদেশকে মুসলিম ও অ-মুসলিম অধ্যুষিত এই দুই অংশে ভাগ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। (The working committee of the Congress took a realistic view and passed the following resolution, foreshadowing the partition of India on 8 Mar 1947 : ..."therefore it is necessary to find a way which amounts to the least compulsion. This would necessitate division of the Punjab into two provinces so that the predominantly Muslim part may be seperated from the predominantly Non-Muslim part."[1]

ইংরেজ ঐতিহাসিক Leonard Mosley বলেন ঃ এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য খুবই পরিস্কার ঃ কংগ্রেস যদি একটি প্রদেশকে ভাগ করতে সম্মত হয়—তবে তো আর সামগ্রিকভাবে দেশ বিভাগের বিরোধিতা করতে পারে না। (The significance of such a decision was surely obvious : that if Congress was willing to accept partition of a province, then it could not claim any longer to be against the partition of the country.)[2]

রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাই সঙ্গত ভাবেই বলেন ঃ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, দেশ বিভাগের জন্য প্রধানত দায়ী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। (There is thus no doubt that the Indian National Congress must be held mainly responsible for the ultimate partition of India.)[3] এই কলঙ্ক-গাথা গোপন রাখার জন্যই কি জিন্নাকে দায়ী করা হয়?

জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিচারিতার এখানেই শেষ নয়। ১৯৪৭ সালের ১২ জুন দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারত বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৪-১৫ জুন A.I.C.C.র অধিবেশনে তা গৃহীত হয়। কিন্তু তার বহু পূর্বেই '৪৭ সালের ৩ জুন দিল্লীত All-India Radio-তে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক ঘোষণায় — লর্ড মাউন্টব্যাটেন, নেহেরু ও জিন্না ভারত বিভাগের প্রস্তাব করেন।

মাউন্টব্যাটেন বলেন ঃ ঐক্যমতে পৌঁছানো অসম্ভব...পীড়ন বা বলপ্রয়োগের প্রশ্নই আসে না। (...It has been impossible to obtain agreement...But there can be no question of coercing...The only alternative to coercion is partition.)[4]

---

1. R. C. Majumder–History of The Freedom Movement In India–Vol. III, P-656
2. Leonard Masley–The Last Days of The British Raj, P-106-107
3. R. C. Majumder–History of The Freedom Movement In India–Vol-III, P-656
4. Leonard Mosley—The Last Days of the British Raj, P-148

নেহেরু বলেন, আমি খুব আনন্দের সঙ্গে এই প্রস্তাবের পক্ষে সুপারিশ করছি না। যদিও আমি নিঃসন্দেহ, ইহাই সর্বোত্তম পথ। (It is with no joy in my heart that I commend these proposal, he said, though I have no doubt in my mind that it is the best course.)[1]* জিন্না তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" শ্লোগান দিয়ে শেষ করেন।

১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে করাচীতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে একটি নতুন শ্লোগান গৃহীত হল। ভাগ কর ও দেশ ছাড় (Divide and Quit)। "পাকিস্তান" দাবি আদায়ের জন্য গঠিত হয় Committee of Action. কিন্তু নব-নিযুক্ত ভাইসরয় Lord Wavel ছিলেন দেশ বিভাগের ঘোরতর বিরোধী। ১৯৪৪ সালের ১৭ ফেব্রুঃ কেন্দ্রীয় আইনসভায় (Central Legislature) তাঁর প্রথম ভাষণে বলেন ঃ ভূগোলকে পরিবর্তন করা যায় না। অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক, অর্থনৈতিক সমস্যা ও প্রতিরক্ষার দিক থেকে ভারত হল একটি অবিভাজ্য অখন্ড সত্ত্বা। দু'টি সম্প্রদায় এমনকি দুটি জাতিও ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য সত্বেও এক সঙ্গে বাস করতে পারে। ইতিহাসে তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ("You can not alter geography. From the point of view of defence, of many internal and external economic problems, India is a natural unit. That two communities and even twc nations can make arrangements to live together in spite of differing cultures or religions, history provides many examples.)[2] মুসলিম লীগের মুখপত্রে এর প্রতিক্রিয়ায় লেখা হল, "ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বকে উপেক্ষা করে শুধু মাত্র ভু-গোলকেই সব কিছুর উৎস ও ভিত্তি রূপে গ্রহণ করার এই প্রয়াসের মধ্যে Lord Wavell-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দৈন্যই প্রকাশ পায়।" (This drawing in of geography, without reference to history and psychology, is a poor compliment to Lord Wavel's gift of statesmanship.)[3]

* (ক) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারত বিভাগ প্রস্তাব গ্রহণের বহু পূর্বেই—নেহেরু এই প্রস্তাব সমর্থন করে AIR-এ ভাষন দেন। রাষ্ট্র পরিচালনায়ও নেহেরু এই নীতি অনুসরণ করতেন। ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে র ব্যাপারে মন্ত্রী সভার কোন বৈঠক হয় নি। সিদ্ধান্ত নেহেরু ও তাঁর বিশ্বস্ত পারিষদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেননের। (নীরদ চন্দ্র চৌধুরী—আমার দেশ আমার শতক)

(খ) নেহেরু তনয়া ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালে নির্বাচনে পরাজিত হয়ে "জরুরী অবস্থা" জারী করেন। কিন্তু বিষয়টি "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, PAC এমন কি Inner Cabinet-ও আলোচিত হয় নি। লিখেছেন ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র—In the Name of Democracy.

1. Ibid, P-148
2. R. C. Majumder–History of The Freedom Movement In India, Vol-III, P-564
3. Ibid, P-564

এ মন্তব্য খুবই যুক্তিপূর্ণ। ইতিহাসেই একটি জাতির ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় নিহিত থাকে। ধর্ম-সংস্কৃতিই হল সকল জাতির ঐক্য সংহতির মূল আধার। ইতিহাসকে বাদ দিলে অন্য সব কিছুই গৌণ, মৌল নয়। জাতীয় জীবনের মূল সত্ত্বায় তার বিশেষ প্রভাব নেই। গান্ধীবাদ ও তদ্দারা প্রভাবিত এদেশের বিদ্বজ্জনেরা সচেতনভাবেই ইতিহাসকে অস্বীকার করে আঁকড়ে ধরে ভূগোলকে। রচনা করে ইতিহাস বিরোধী অভিনব নতুন তত্ত্ব। তাঁরা প্রচার করেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যই হল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্বরূপ। রূঢ় বাস্তবকে অস্বীকার করে পরিকল্পিত ভাবে এই কল্পনা বিলাসের পক্ষে জনমত সংগঠন করে। (...those Leaders were always guided by a false notion of Indian nationality based on Hindu-Muslim unity, and persuaded the people to ignore the reality and cherish this ideal.)[1]

সত্য হতে নির্বাসিত, অসত্যের পূজারী এই বিদ্বজ্জন ও নেতৃবৃন্দ মুসলমানের ভারত-বিভাগ দাবির বিরুদ্ধে বাগাড়ম্বর ও অসার বাগ্‌জাল ব্যতীত কোন প্রতিরোধের কথা কল্পনাও করতে পারেনি। শুধু তাই নয়; তারা বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল। এর বিপরীতটি ঘটেছে শ্রীলংকায়। সেখানে জাতীয় নেতৃত্ব তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করে দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করেছে। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাই যথার্থই বলেছেন ঃ সুদীর্ঘ ইতিহাসের আলোকে হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত-সম্পর্ক সম্বন্ধে (হিন্দুদের) অজ্ঞ রাখা হয়। স্বার্থান্বেষী মহল থেকে এই অজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই অজ্ঞতাই পরিনামে দেশ বিভাগের জন্য প্রধানত দায়ী। (...ignorance of the actual relation between the Hindus and the Muslims through the course of History,–an ignorance deliberately encouraged by some,–may ultimately be found to have been the most important single factor which led to the partition of India.)[2]

গান্ধীর হিন্দু-মুসলিম-মিলন তত্ত্ব শুধু যে ইতিহাসের বিচারে অসত্য তাই নয়; গান্ধীবাদীদের স্ব-বিরোধিতা ও দ্বি-চারিতাও লক্ষণীয়। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন সর্দার প্যাটেলকে বলেন—একবার ভাবুন তো, মুসলমানদের যদি চিরদিনের জন্য তাদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তবে কি অপার শান্তি...(Think of the peace if the Muslims could be banished once and for all to their own country)[3] ক্লান্ত, বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ

1. Ibid, P-662
2. R. C. Majumder–The History & Culture of the Indian People (The Delhi Sultanate), Preface–XXIX
3. Leonard Mosley–The Last Deys of the British Raj, P-110

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ—বিশেষ করে সর্দার প্যাটেলের দৃঢ় সিদ্ধান্ত ছিল যে মুসলমানদের হাত থেকে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি পেতে হবে। (...particularly the weariness of many congress leaders and Sardar Patel's determination to be rid of the Muslims once and for all...)[1]

'৪৭ সালের ৭ আগস্ট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সরকারি ডাকোটা বিমানে জিন্না করাচী পৌঁছান। পরের দিন সর্দার প্যাটেল বলেন—"ভারতের রাষ্ট্রদেহ হতে বিষ ঝেড়ে ফেলা হল। (The poison has been removed from the body of India.)[2]

এ সকল কথার নির্গলিতার্থ হল—মুসলমান সকল অশান্তির মূল। সেই মুসলমানের হাত থেকে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই দেশ বিভাগে কংগ্রেসের সম্মতি। তবে কেন লোক বিনিময় হল না? তাহলে প্রায় অর্ধকোটি হিন্দুকে মুসলমানের হাতে প্রাণ দিতে হত না; লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারী-দগ্ধ হত না মুসলমানের কামানলে। কোটি কোটি হিন্দু শিখকে সর্বস্ব হারিয়ে আশ্রয় নিতে হত না খণ্ডিত ভারতে।

দ্বিতীয়তঃ কেন সাড়ে তিন কোটি মুসলমানকে খণ্ডিত ভারতে রেখে দেওয়া হল? এই মুসলমানদের জন্যই কাশ্মীর উপত্যকা আজ হিন্দুশূন্য। তিন লক্ষ হিন্দু আজ স্বদেশে উদ্বাস্তু; এবং কাশ্মীর সহ ভারতের অনেক অঞ্চল আজ "অঘোষিত পাকিস্তান।" গান্ধী-নেহেরু-কংগ্রেস একবার মাত্র ভারত বিভাগ করেই তৃপ্ত হতে পারেন নি; খণ্ডিত ভারতকে আরও বহুবার বিভক্ত করার সুব্যবস্থা করেছেন...।

শুধু গান্ধী-নেহেরু-কংগ্রেস নয়—কম্যুনিস্টরাও দেশ-বিভাগের জন্য সমভাবে দায়ী। তারা পাকিস্তান দাবি প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিল।

বর্তমান ভারতে মুসলমান

অকপট সত্য ভাষণ, মুসলমানের একটি বিশেষ গুণ। ভাষার ভিত্তিতে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়—তামিল, তেলেগু, মারাঠী, বিহারী, বাঙালী ইত্যাদি। পরিচয় জানতে চাইলে হিন্দু প্রথমে বলবে বাঙালী, মারাঠী ইত্যাদি। তারপর বলবে হিন্দু বা ভারতীয়। কিন্তু মুসলমান—তার বাস পাঞ্জাব অথবা কেরালা যেখানেই হোক না কেন, নির্দ্বিধায় সে নিজেকে "মুসলমান" বলে পরিচয় দেবে। এ তার একইসঙ্গে ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয়। অর্থাৎ বিশ্বের সকল মুসলমান এক জাতি—মুসলমান। সে বিশ্বাস করে, আল্লাহ

1. Ibid, P-114
2. Ibid, P-248

এই বিশ্ব-জাহানের মালিক। (Sovereignty of Allah over the entire World) মুসলমান আল্লার সেবক। তাই সারা পৃথিবীই মুসলমানের। সেই লক্ষ্য পূরণেই দেশ ভাগ করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। স্যার মহম্মদ ইকবাল বলেছেন—"আমি মুসলমানের ইতিহাস পড়ে শিখেছি—সংকটের সময় মুসলমান ইসলামকে নয়—বরং ইসলামই মুসলমানদের রক্ষা করেছে। (One lesson I have learnt from the history of Muslims, Iqbal said at the end of that speech. At critical moments in their history, it is Islam that has saved Muslims and no–Vice Versa.)[1] ভারতেও তাই হয়েছে। ইসলামে মুসলমানের জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। মুসলমান পাকিস্তান রাষ্ট্রও পেল—আবার ভবিষ্যতে পুনরায় ভারত ভাগ করার জন্য ৩১/২ কোটি মুসলমান এদেশে রেখে দিল। অর্থাৎ ইসলামের "বীজ"টি রয়েই গেল। "ধর্ম নিরক্ষেতার" নামে সেই "বীজটির" সযত্ন পরিচর্যা শুরু হল। এখন সে তরুবর। যখন মহীরূহে পরিণত হবে—তখন কি হবে? পুনরায় ভারত বিভাগ? সাধারণ বুদ্ধি ও যুক্তি তো তাই বলে। দেশ বিভাগের পর এদেশে মুসলমান ছিল ৩১/২ কোটি। ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার তাদের "পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের" বাইরে রেখেছেন। চারটি সাদি, অবাধ প্রজনন ও জলস্রোতের ন্যায় মুসলিম অনুপ্রবেশের কল্যানে মুসলমান এখন ২০ কোটি। সরকার অবশ্য তথ্য গোপন করে বলে ১৫ কোটি।* এই মুসলমান ইতিমধ্যেই পঃ বাংলা, আসাম, ত্রিপুরায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পথে। বিহার, উঃ প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং আরও অনেক রাজ্যের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৪৭ সালে এদেশে মুসলমান ছিল ৯ কোটি। সেই ৯ কোটি মুসলমান যদি দেশ ভাগ করতে পারে; তবে ২০ কোটি কেন পারবে না?

---

* ১৯৯০ সালে পাকিস্তানের "হিসাব অনুযায়ী ভারতে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১৫ কোটি। পাকিস্তানের Defence Journal, জানু-ফেব্রু ১৯৯০, Jehad Syndrome শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী ধর্মযুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের মিত্র হল সে দেশের কয়েক কোটি মুসলমান। তেমনি আঞ্চলিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সহায় ভারতের ১৫ কোটি মুসলমান। (The Jan-Feb, 1990 issue of the Defence Journal of Pakistan under "Jehad Syndrome" says in a global role vis-a-vis the U.S.S.R. our allies are the millions of Muslims, in the U.S.S.R. Similarly in the regional role Vis-a-vis India, our allies are 150 millions Indian Muslims–our greatest asset is the Muslims to destablise these two countries–writes Wing Commander, Amar Jutshi– The Statesman-18.07.90

১৯৯০ সালে ১৫ কোটি; আজও (২০০৯ সাল) ১৫ কোটি! আলিগড়ের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বলেছেন—যদিও মুসলমানের সংখ্যা ২০ শতাংশ—কিন্তু সরকারি অফিসে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ২ শতাংশ (2% Muslims in Govt. jobs, even as the minority community makes up 20% of the total propulation. Hindustan Times – 16.7.2004.

হিন্দুকে কি ১৯৪৭ সালের ন্যায় রক্ত দিয়ে এই মিথ্যা প্রচারের মূল্য দিতে হবে?

---

1 V. S. Naipaul–Among the Believers–P-155

রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—"খিলাফত" প্রশ্নটি মুসলমানের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ—এই স্বীকৃতি দিয়ে গান্ধী তো প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি। তারা ভারতে বাস করে—কিন্তু ভারতের নয়। (By his own admission that the Khilaphat question was a vital one for Indian Muslims, Gandhi himself admitted in a way that they formed a seperate nation. They were in India but not of India.)[1]

আল্লার বিধানে বিশ্বের সকল মুসলমান (বাসভূমি যে দেশেই হোক না কেন) এক জাতিত্বের* বন্ধনে আবদ্ধ। সে যদি অ-মুসলমান দেশে বাস করে, তার আনুগত্য ও সহানুভূতি থাকে বাইরের কোন মুসলমান দেশের প্রতি। তাই ১৯২০-২১ সালে বিপন্ন তুরস্কার জন্য এদেশে মুসলমানের খিলাফত আন্দোলন। হাজার হাজার মাইল দূরের

---

* জাতি (Nation)—পার্লামেন্ট, বিচারালয় বা সংবাদপত্রের সম্পাদকের দপ্তরে গঠিত হয় না। ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস জাতি গঠনের মৌল উপাদান। স্বামীজী জাতি গঠনে ধর্মকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ Lord Bryce জাতি বা Nation-এর যে সর্বসম্মত সংজ্ঞা দিয়েছেন—জিন্নার ব্যাখ্যা তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এদেশে সত্যের পূজারী সত্যাশ্রয়ী গান্ধীর শ্রেষ্ঠ অবদান হল সত্যের অপমৃত্যু। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই হতভাগ্য দেশে এখন ইতিহাসের বিকৃতি ও অসত্যের বিজয়বৈজয়ন্ত!....মুসলমান ভুলেও নিজেকে ভারতীয় বলে না—স্বীকার করে না ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে। তবু গান্ধী-নেহেরুর মন্ত্র-শিষ্যদের "হিন্দু-মুসলমান নিয়ে এক ভারতীয় জাতি"—এই সর্বনাশা মিথ্যা প্রচারের বিরাম নেই। তাদের দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমান দুটি জাতি নয়—সম্প্রদায় মাত্র। তবে তো প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমান এক একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়। তবে OIC (Organisation of Islamic Countries) কেন? কেন Islamic Summit–মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন। ১৯৪৭ সালে, হিন্দু ও মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি—এই দ্বি-জাতি তত্ত্ব স্বীকার করেই কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট জোট ভারত বিভাগে মুসলমানকে সমর্থন করেছে। এখন জাতি কিভাবে সম্প্রদায় হল? একি ইন্দ্রজাল? কয়েকটি সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত হয় জাতি। মুসলিম জাতিকে মুসলিম সম্প্রদায় বলা হয় কোন যুক্তিতে? যুক্তি অবশ্য ওদের আছে। তা হল দেশভাগের পর যে সাড়ে তিন কোটি মুসলমানকে এদেশে রেখে দেওয়া হল, (বর্তমানে ২০ কোটি) হিন্দুর ন্যায় এদেশে তাদেরও সম অধিকার আছে, এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। যাতে মুসলমান পুনরায় এ দেশকে ভাগ করতে পারে।

"গাছের খাওয়া ও তলায় কুড়ানো" দুটি একসাথে হয় না। একটাকে বেছে নিতে হবে। দুই ভাইয়ের যৌথ পরিবার। ছোট ভাই প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ বুঝে নিয়ে পৃথক হলে, বড় ভাইয়ের সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার থাকে না। এদেশের ভুয়োদর্শী রাষ্ট্রনেতাগণ ও দিগ্‌গজ পণ্ডিতমণ্ডলী এই সাধারণ সত্যটি কেন বুঝতে চান না? অবিভক্ত ভারতে মুসলমান ছিল ২৩ শতাংশ, তারা জমি নিয়েছে ৩০ শতাংশ;এরপর খণ্ডিত ভারতে তাদের কোন অধিকার থাকতে পারে না।

(ক) কোন অ-মুসলমান দেশে মুসলমান কখনই মূল জাতি স্রোতে (national mainstream) মিশে যায় না। ভারতের ২০ কোটি মুসলমানের ক্ষেত্রেও এ কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। তারা বাস করে ভারতে, কিন্তু ভারতের নয়।

সপ্তদশ শতাব্দী। আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাহজাদা সুজা বিশ্বস্ত সহচরদের নিয়ে পালিয়ে যান ব্রহ্মদেশের দুর্গম আরাকান অঞ্চলে। বিগত চারশ বছরে সেখানে গড়ে ওঠে নতুন নতুন মুসলিম বসতি। যেখানেই মুসলমান, সেখানেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান দাবি। কিন্তু মায়নামারের মানুষ—সকলেই দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী। আরাকানের মুসলমান— "রোহিঙ্গা" মুসলমান নামে পরিচিত। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে দাবিতে তারা হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু করে। মায়নামারের সরকার বলবূর্বক প্রায় ৬০,০০০ মুসলমানকে পুশ ব্যাক করে বাংলাদেশে। নিশ্চিত হল দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব।

---

1. R.C.Majumder–History of The Freedom Movement In India, Vol.III, P-50

তুরস্কের প্রতি যদি তার হেন আনুগত্য—তবে তত্ত্বগতভাবেই ভারত উপমহাদেশেরই অন্তর্গত, স্বপ্নের দেশ পাকিস্তানের প্রতি তার থাকবে স্বতঃস্ফূত সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও আনুগত্য। তাই সুযোগ পেলেই মুসলিম মহল্লায় ওড়ে পাকিস্তানের পতাকা। শ্লোগান ওঠে পাকিস্তান জিন্দাবাদ। ভারত মুর্দাবাদ।

কাশ্মীরে আজাদির মিছিলে (পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তি) লক্ষ মুসলমান—সরকারি কর্মচারী, ডাক্তার, নার্স, চাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ব্যবসায়ী, আইনজীবী পাক পতাকা হাতে মিছিল করে যায়—রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষকের অফিসে স্মারকলিপি পেশ করতে। সেই উন্মত্ত জনতা শ্লোগান দেয়—"জিয়ে জিয়ে পাকিস্তান, তেরি জান, মেরি জান পাকিস্তান পাকিস্তান। তেরি মন্ডি, মেরি মন্ডি—রাওয়াল পিন্ডি রাওয়াল পিন্ডি"—The Times of India. 19.8.2008

লক্ষ কণ্ঠে কাশ্মীরের মুসলমান শ্লোগান দেয় "আমরা পাকিস্তানি, পাকিস্তান আমাদের, ইসলাম ধর্ম আমাদের এক সূত্রে গ্রথিত করেছে।" (We are Pakistani and Pakistan is us because we are tied with the country through Islam. (The Times of India–24.8.2008.)

প্রকাশ্যে দেশদ্রোহিতা! অন্যদেশ হলে এদের স্থান হত কারাগারে। কিন্তু এ যে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত! ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর সকল মুসলমানকে এক সূত্রে আবদ্ধ করেছে। কাশ্মীরের মুসলমান যখন দাবি করে, "আমরা পাকিস্তানি, পাকিস্তান আমাদের"—তখন তা কি ভারতে বসবাসকারী ২০ কোটি মুসলমানের মনের কথা নয়? ধর্ম নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং (পঃ পাঞ্জাব থেকে এপারে পালিয়ে এসেছেন) ফতোয়া জারি করেছেন, দেশের সম্পদ ভান্ডারের উপর সংখ্যালঘুদের থাকবে অগ্রাধিকার...। এদেশকে কে দেবে সুরক্ষা? এই অভিশপ্ত "ধর্মনিরপেক্ষতা"র অবসান না হলে—আগামী কয়েক শতাব্দী পর ইতিহাস বইতে লেখা হবে— একদা এই অঞ্চলে "ভারতবর্ষ" নামে একটি দেশ ছিল।

(খ) প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা। জনগণকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। (১) সংখ্যা গরিষ্ঠ সিংহলী ধর্মে বৌদ্ধ। সংখ্যালঘু তামিল ধর্মে হিন্দু। আছে মুসলমানও। সিংহলীদের প্রধান দল হল শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি। দেশের নামেই দলের নামকরণ। তামিলদের দল হল LTTE, TULF প্রভৃতি। নামে কোন ধর্মীয় পরিচয় নেই। কিন্তু সে দেশের মুসলমান নিজেদের না বলে সিংহলী না তামিল। তারা স্বতন্ত্র দল গঠন করেছে—Ceylone Muslim Congress.

(গ) প্রতিবেশী নেপাল। মুসলমান সংখ্যালঘু। "মুসলিম কমিশন" ও "কোটার" দাবিতে তাদের দল The United Muslim National Struggle Committee গত ১৫ মার্চ কাঠমান্ডু বন্ধের ডাক দেয়। (...Nepal's minority Muslim Community is on the war path, announcing a series of bandhs....The United Muslim National Struggle Committee has called a Kathmandu Valley Bandh on sunday (15th March)–The Times of India, 14.3.2009

মুসলমানের এই ধর্মীয় পরিচয়ের জন্যই ভারত বিভক্ত হয় এবং পুনরায় বিভক্ত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা।

সমর নীতি ও বিদেশ নীতির অন্তরায় মুসলমান

পাকিস্তানের সঙ্গে এ পর্যন্ত ভারতের তিনটি বড় রকমের যুদ্ধ হয়েছে—১৯৪৭, ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে। প্রতিবারেই আক্রমণকারী পাকিস্তান পরাজিত হয়েছে। জয়ী হয়েছে ভারত। কিন্তু শান্তি চুক্তিতে লাভবান হয় পাকিস্তান। কেন?

১৯৪৭ সালের কাশ্মীর যুদ্ধ। কাশ্মীরের প্রায় অর্ধাংশ তখনও পাকিস্তানের অধিকারে। কিন্তু রণক্ষেত্রের সর্বত্রই ভারত পাল্টা আক্রমণ করে এগিয়ে চলেছে। সামরিক অবস্থা ভারতের অনুকূলে। বলেছেন ভি. পি. মেনন, খন্ডিত ভারতের প্রথম যোগ্যতম স্বরাষ্ট্র সচিব। (By this time, let me add, the initiative was definitely in our favour along the entire front.)[1] এই পরিস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রী নেহেরু রাষ্ট্রপুঞ্জের তদারকিতে গণভোটের জন্য যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেন। পরবর্তী ইতিহাস সকলেরই জানা।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ। আক্রান্ত ভারত প্রবল প্রতি আক্রমণে অধিকার করে বিশাল পাক ভূ-খন্ড। ভারতের সাঁজোয়া বাহিনী এগিয়ে চলেছে রাওয়ালপিন্ডি অভিমুখে। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে পাকিস্তান। তখন সোবিয়েত রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী কোসিগিন পাকিস্তানের ত্রাণ-কর্তার ভূমিকায়। ভারত যুদ্ধ বিরতি করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ হয় পাকিস্তানে—শান্তি চুক্তি হয় কোসিগিনের মধ্যস্থতায় রাশিয়ার তাসখন্দে। নিঃশর্তে ভারত অধিকৃত পাক-ভূ-খন্ড ফিরিয়ে দেয়। তাস খন্দেই রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয় প্রধান মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর।* কোন তদন্তই হয় না।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ ও সিমলা চুক্তি। এই সিমলা চুক্তির সাফল্য নিয়ে সরকারি প্রচার মাধ্যম দেশ ব্যাপী এক অভুতপূর্ব আবেগ-উন্মাদনার পরিমন্ডল তৈরী করেছিল। ভাবখানা যেন এই ভারত বিশ্ব জয় করেছে!... বিশ্বে বিজিত ও বিজয়ীদেশের মধ্যে আত্মসমর্পণ চুক্তি, পরবর্তী শান্তি চুক্তি কিভাবে সম্পাদিত হয়—তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা "সিমলা চুক্তি" পর্যালোচনায় সহায়ক হবে।

---

* CIA's Eye on South Asia-র লেখক অনুজ ধর "তথ্য জানার অধিকার" আইন অনুযায়ী — ভারত সরকারের নিকট প্রয়াত শাস্ত্রীর মৃত্যু সংক্রান্ত খবর জানতে চাইলে—PMO জানিয়েছে; এই তথ্য প্রকাশ করলে বৈদেশিক সম্পর্ক ক্ষুন্ন হতে পারে—দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে। শাস্ত্রীর স্ত্রী শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রীর অভিযোগ—তার স্বামীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। সরকারও স্বীকার করেছে, রাশিয়ায় প্রয়াত প্রধান মন্ত্রীর কোন Post-Mortem করা হয় নি। (Incidentally, the PMO has cited exemption from disclosure on the plea that it could harm foreign relations, cause disruption in the country...Lalita Sastri, his wife had alleged that her husband was poisoned. ...In response to the RTI plea, the govt. admitted that no post-mortem was conducted in the U.S.S.R.–The Times of India–11.7.2009 লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ছেলে দাবি করেছেন, যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টির তদন্ত করুক কেন্দ্র।

---

1. V. P. Menon–The Story of the Integration of the Indian States–P. 393

প্রথম মহাযুদ্ধ

· ফ্রান্সের কম্পেন অরণ্য। মাটি থেকে তিন ফুট উঁচুতে গ্রানাইট পাথরের একখানি বিরাট ফলক। তাতে বড় বড় হরফে লেখা ঃ এইখানে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর স্বাধীন জাতি গোষ্ঠীর দ্বারা পরাজিত অত্যাচারী মদগবী জার্মান সাম্রাজ্যের পতন হয়। (Here on the eleventh of November, 1918, succumbed the criminal pride of the Germal Empire–vanquished by the free peoples which it tried to enslave).[1] প্রথম মহাযুদ্ধে অ্যাংলো-ফ্রান্স বাহিনী জার্মানীকে পরাস্ত করে। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক স্বরূপ রেলের কামরা ও ফলক সযত্নে রক্ষিত। আত্মসমর্পণ চুক্তির দুই একটি ধারা সম্বন্ধে জার্মান প্রতিনিধি দল মৃদু আপত্তি জানায়। ফরাসী সর্বাধিনায়ক মার্শাল ফচের তীক্ষ্ণ জবাব, কোন আলোচনা নয়—হয় স্বাক্ষর করুন অথবা চলে যান। অতঃপর নিরূপায় জার্মান প্রতিনিধি স্বাক্ষর করেন আত্মসমর্পন চুক্তিতে। এর পর ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানীর উপর, যে কঠিন শর্ত চাপানো হয়েছিল—সে সম্বন্ধে জার্মানীর সঙ্গে কোন আলোচনাই করা হয় নি। (The terms of the Versailles Treaty, laid down by the Allies without negotiation with Germany...)[2]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

১৯৪০ সাল। মাত্র কয়েকদিনের যুদ্ধেই জার্মানীর কাছে ফরাসী বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। ১৬ জুন রাজধানী প্যারিসের পতন হয়। প্রধান মন্ত্রী রেনাউড পদত্যাগ করেন। মার্শাল পেতেঁ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েই স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে হিটলারের নিকট আত্মসমর্পনের প্রস্তাব দেন। হিটলার এরই অপেক্ষায় ছিলেন। পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নিতে কম্পেন অরণ্যে রেলের সেই কামরাতেই আত্মসমর্পন চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা হয়। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর ফরাসী মার্শাল ফচ যে চেয়ারে বসেছিলেন, সেই আসনে আজ হিটলার উপবিষ্ট। নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট পর এল জেনারেল চার্লাস হান্ট জিগারের নেতৃত্বে ফরাসী প্রতিনিধি দল। জার্মান ফিল্ড মার্শাল কাইটেল যুদ্ধ বিরতির শর্তগুলি পড়ে শোনান। চার্লস হান্টজিগার বলেন, শর্তগুলি খুব কঠিন ও নিষ্ঠুর। ...জেঃ জডল (Jodl) বলেন, ফ্রান্সকে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি পত্র যেমন আছে—তাতেই স্বাক্ষর করতে হবে—অথবা ফিরে যেতে হবে।...ফরাসী প্রতিনিধি দল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার জন্য সময় চান...পরের দিন। ফিল্ড মার্শাল কাইটেল সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ চরম হুঁশিয়ারি দেন। এক ঘণ্টার মধ্যে ফ্রান্সকে প্রস্তাব গ্রহণ অথবা বর্জন করতে হবে।

1. William L Shirer–The Rise and Fall of the Third Reich, P-891
2. Ibid, P-81

৬-৫০ মিঃ হান্টজিগার ও কাইটেল চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। (Keitel had read the preamble of the armistice terms to the French...Huntziger told the Germans at once, that they were "hard and merciless"...Gen. Jodl told, "The French would have to take the armistice document or leave it as it was... (Next day) Finally, at 6.30 P.M. Keitel issued an ultimatum. The French must accept or reject the German armistice terms within an hour... At 6.50 p.m. on June 22-1940 Huntziger and Keitel signed the armistice treaty)[1]

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান শোচনীয় ভাবে পরাজিত বিধ্বস্ত। তার পূর্ব খন্ড (পূর্ব পাকিস্তান) বাংলাদেশ নাম নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত। পঃ রনাঙ্গনে প্রায় ৫০০০ বঃ কিঃ মিঃ ভূখন্ড ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাক বাহিনীর কমান্ডার লেঃ জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি ৯৩,০০০ সৈন্য সহ ভারতের সেনাধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল জ্যাকবের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

এই যুদ্ধে ভারতের অন্তত ১০০০ সৈন্য নিহত হয়। ব্যয় হয় হাজার কোটি টাকা। মার্কিন সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ১ কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে ৮০% হিন্দু ১৫% মুসলমান, অন্যান্য ৫%। পাকিস্তানি সেনা পূর্ব পাকিস্তানে যে অত্যাচার করে—সে বিষয়ে তদন্ত করার জন্য পাক সরকার প্রধান বিচারপতি হামদুর রহমানের নেতৃত্বে এক কমিশন গঠন করে। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়—পাক সেনা ৩০,০০০,০০ মানুষকে হত্যা করে—ধর্ষন করে ২,০০,০০০ নরীকে। হতভাগ্যদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল হিন্দু। সেনাবাহিনীর নির্দেশে হিন্দুদের সকল বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে হলুদ রঙ-এর চিহ্ন একে দেওয়া হয়। লেঃ কর্নেল আজিজ আহমদ খাঁ (সাক্ষী) নং ২৭৬) কমিশনকে বলেন ঃ জেঃ নিয়াজী ঠাকুর গাঁও ও বোগরায় আমার শিবির পরিদর্শনে আসেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—আমরা কত হিন্দুকে হত্যা করেছি। মে মাসে লিখিত ভাবে সকল হিন্দুকে হত্যা করতে আদেশ দেওয়া হয়। (...Gen. visited my unit at Thakargaon and Bogra. He asked us how many Hindus we had killed. In May, there was and order in writing to kill Hindus...)[2]

এই নিয়াজী ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কি রকম ছিল তার শর্তাবলী?

1. Ibid, P-892 - 894
2. Thatagata Ray–A Suppressed Cahpter in History, P-305-306

INSTRUMENT OF SURRENDER

The Pakistan Eastern Command agree to surrender all Pakistan Armed Forces in Bangla Desh to Lt. Gen. JAGJIT SINGH AURORA General Officer Commanding in Chief of the Indian and Bangladesh Forces in the Eastern Theatre...

Lt. Gen. JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention* and guarantees the safety and well being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrenders. ...by the forces under the command of Lt. Gen. JAGJIT SINGH AURORA

Sd. Jagjit Singh Aurora	*Sd.* Amin Abdullah Khan Niazi
Lt. Gen.	*Lt. Gen.*
GOC - Eastern Theatre	Commander, Eastern Command (Pakistan)
16 Dec-1971	16 Dec 1971

Source : Eastern Command Celebrates
VIJAY DIWAS - 2008
The Times of India - 16.12.2008

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানী ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের আত্মসমর্পনের রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর আত্মসমর্পনের চিত্রটি কিরূপ ছিল?

জার্মানীর রেইমস্-এ একটি ছোট লাল রঙের স্কুল বাড়ী; মিত্র শক্তির সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইজেন হাওয়ারের সদর দপ্তর। ১৯৪৫ সালের ৭ই মে সকাল ২-৪১মি (আগের দিন রাত্রি) জার্মানী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে। দলিলে মিত্র শক্তির পক্ষে সাক্ষর দেন Gen. Bedell Smith. সাক্ষী হিসাবে সহি করেন রাশিয়ার পক্ষে Gen. Ivan Susloparov ও (দ্যগল পন্থী) ফ্রান্সের পক্ষে Francois Sevez. জার্মানীর পক্ষে সাক্ষর দেন Admiral Friedeburg ও Gen. Jodl.

* জেনেভা চুক্তিতে নিরস্ত্র অসামরিক জনগণের হত্যাকারীদের জন্য মার্জনার কোন ধারা নেই।

Jodl কিছু বলার জন্য অনুমতি চাইলে তা মঞ্জুর করা হয়।

তিনি বলেন, ভাল মন্দ যাই হোক না কেন, এই সাক্ষর দানের সাথেই জার্মান জনগন ও সশস্ত্র বাহিনীকে মিত্রশক্তির হাতে অর্পণ করা হল...। এই মুহূর্তে আমি শুধু এই আশাই করতে পারি যে, বিজয়ী পক্ষ তাদের সাথে উদার ব্যবহার করবেন।

মিত্র পক্ষ নীরব...।

(In a little red School house at Reims, where Eisenhower had made his headquarters, Germany surrendered unconditionally at 2.41 on the morning of May 7, 1945. The Capitulation was signed for the Allies by General Walter Bedell Smith, with General Ivan Susloparov affixing his signature as witness for Russia and General Francois Sevez for France. Admiral Friedeburg and General Jodl signed for Germany.

Jodl asked permission to say a word and it was granted.

"With this signature the German people and the German armed Forces are, for better or worse, delivered into the hands of the victors...In this hour I can only express the hope that the victor will treat them with generosity."

There was no response from the Allied side.)[1]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান ও জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য দুটি পৃথক ট্রিবুনাল—ন্যুরেমবার্গ ও টৌকিও ট্রিবুনাল গঠিত হয়। জেনারেল ও ফিল্ড-মার্শালদের ন্যায় উচ্চ পদস্থ সেনাপতিদেরও প্রানদন্ড দেওয়া হয়। পাক-সরকার নিযুক্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী লেঃ জেঃ নিয়াজী—ও তাঁর সেনারা বাংলাদেশে গণহত্যার অপরাধে অপরাধী। তবে আত্মসমর্পন চুক্তিতে তাদের জন্য যথোচিত সম্মান, মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল কেন?

যুদ্ধ বিরতির পর তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশবাসীকে আশ্বাস দেন, এবার আর কোন আংশিক চুক্তি নয়, চুক্তি যদি হয় তবে তা হবে সম্পূর্ণ পাক ভারত সমস্যা নিয়েই। এবং তার লক্ষ্য হবে স্থায়ী ও সুষ্ঠু সমাধান। কিন্তু বাস্তবে কি হল?

১৯৭২ সালের এপ্রিলে পাক প্রধান মন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলি কন্যা বেনজির ভুট্টোকে* নিয়ে এলেন ভারতে। এ দেশে সাজ সাজ রব। ইন্দিরা গান্ধী তাকে জানান রাজকীয় অভ্যর্থনা। যেন কোন বিদেশী রাষ্ট্র নায়ক ভারত সফরে এসেছেন। জনাব ভুট্টো

* চীনের সহায়তায় পরমানু বিজ্ঞানী কাদের খানের গোপনে আনবিক বোমা তৈরীর প্রস্তাবওএই বেনজির ভুট্টোই মঞ্জুর করেন।

1. William L Shirer- The Rise and Fall of the Third Reich, P-1352

প্রচন্ড চাপের মুখে। যদি তিনি অধিকৃত ভূ-খন্ড মুক্ত করে ৯৩,০০০ পাকিস্তানী যুদ্ধ বন্দীকে দেশে ফিরিয়ে নিতে না পারেন, তবে তার পরিনাম হতে পারে ভয়ংকর। হতে পারে গণবিদ্রোহ। বিদ্রোহ করতে পারে সেনাবাহিনী। পেশায় আইনজীবী ও কুশলী অভিনেতা ভুট্টো, গ্রীক ট্রাজেডির ভাগ্য হত নায়কের ন্যায় ইন্দিরা গান্ধীকে বলেন ঃ "স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, পাকিস্তান কখনই ভারতের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। কাশ্মীর নিয়ে আমরা যুদ্ধ চাই না। বিশ্বাস করুন, আমরা, আন্তরিক ভাবেই ভারতের সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক কামনা করি। কিন্তু একথা চুক্তিতে লেখা থাকবে না।"

ইন্দিরা গান্ধী কি অভিভূত হয়েছিলেন? তিনি কি ভুলে গিয়েছিলেন যে এই জুলফিকার আলি ভুট্টোই ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর জেহাদের হুংকার দিয়েছিলেন? চুক্তির পক্ষে জনমত সংগঠনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের বিদেশ দপ্তর থেকে প্রচার করা হয়—প্রধান মন্ত্রী ভুট্টো এবং পাকিস্তান আন্তরিকভাবেই শান্তিকামী। তাঁর সদিচ্ছায় অবিশ্বাস করা উচিৎ হবে না।

৩ জুলাই ১৯৭২, সাক্ষরিত হল বিখ্যাত (?) সিমলা চুক্তি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী—

(ক) পঃ পাকিস্তানে অধিকৃত ৫০০০ বঃ কিঃ মিঃ ভূখন্ড ভারতকে ছেড়ে দিতে হবে।

(খ) ৯৩,০০০ বন্দী পাক সৈন্যকে সসম্মানে ফেরৎ পাঠাতে হবে।

ভারত কি পেল? একটি শূন্য গর্ভ আশ্বাস— "অতঃপর সিমলা-চুক্তির কাঠামোর মধ্যে ভারত-পাক সমস্যার সমাধান করতে হবে।" পৃথিবীর ইতিহাসে সিমলা চুক্তি অভিনব, নজীর-বিহীন। ভারতীয় নেতৃত্বের চরম নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতায় পাকিস্তানের শোচনীয় সামরিক বিপর্যয় রূপান্তরিত হল কূটনৈতিক বিজয়ে। যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত একটি দেশ এই প্রথম তার সকল দাবি আদায় করে নিল। আর বিজয়ী দেশ পেল অসাড় এক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। অথচ বিপরীতটি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। ইন্দিরা গান্ধী যদি একখানি সাদা কাগজ দিয়ে ভুট্টোকে বলতেন সই করুন—শর্ত পরে জানিয়ে দেব। ভুট্টো তিনবার ইন্দিরাকে "আম্মা" বলে সেলাম করে তাতেই সই করে দিতেন। যুদ্ধবাজ পাকিস্তানের রণসাধ চিরতরে মিটে যেত। কাশ্মীর সমস্যার হত স্থায়ী সমাধান। কিন্তু হল বিপরীত। পাকিস্তান পুরোপুরি দখল করে নিল উত্তরাংশের গিলগিট, লুনজা ও লাদাখের বাল্টিস্থান অঞ্চল। গিলগিট থেকে ২০০০ বঃ কিঃ মিঃ উপহার দিল বন্ধু রাষ্ট্র চীনকে। ভারত সরকার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পর্যন্ত জানায় নি। কিন্তু কেন এমন হয়? ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের স্বদেশ হল পাকিস্তান। তারা মনে করে পাকিস্তান তাদের অভিভাবক ও রক্ষক। গান্ধী-কংগ্রেস-নেহেরুর মুসলিম তোষণের ঐতিহ্য; তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান দু' টুকরো হয়ে

"স্বাধীন বাংলাদেশের"* আবির্ভাব হলে ভারতের মুসলমান শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের মুসলমান অপেক্ষাও এদেশের মুসলমান যেন অধিক শোকাতুর। ভারতের উপর হয় তারা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ...। কংগ্রেস রাজনীতি মুসলিম কেন্দ্রিক; সেই মুসলমানকে তুষ্ট করতেই রণক্ষেত্রে জয় শান্তি চুক্তিতে পরিণত হয় লজ্জাজনক পরাজয়ে...।

২৬/১১ (২০০৮) মুম্বাইয়ে জেহাদী আক্রমণের পর স্বদেশে বিদেশে এরকম ধারনা হয়েছিল; ভারত হয়তো পাকিস্তানে Surgical Strike (নির্দিষ্ট সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে অতর্কিতে বিমান হানা) করতে পারে। কিন্তু বিদেশ মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী পাকিস্তানকে আশ্বস্ত করে বলেন—যুদ্ধ কোন সমাধান নয়। সংবাদ মাধ্যমকে দিয়ে প্রচার করানো হল—পাকিস্তানও আনবিক শক্তিধর। পারমানবিক সংঘর্ষ হতে পারে; অতএব আক্রমণ নয়। প্রকৃত কারণ তো অন্য। আয়তনে পাকিস্তান অপেক্ষা ভারত তিনগুণ বড়। এই বিশাল আয়তনকে বলা হয় Strategic depth—যা পাকিস্তানের নেই। পাকিস্তান যদি ভারতের কোন বড় শহরে বোমা ফেলে—ভারতের অবশ্যই বিস্তর ক্ষয় ক্ষতি হবে। কিন্তু ভারতের পাল্টা আক্রমণে তো পাকিস্তানের চিহ্ন মাত্র থাকবে না। সুতরাং পাক আনব বোমা নয়, অন্তরায় ভারতের মুসলমান। স্বপ্নের স্বদেশ পাকিস্তানের বিপর্যয়ে মুসলমান যে রুষ্ট হবে...।

ইজরায়েল পৃথিবীর অন্যতম ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। ১৯৪৮ সালের ৫ই মে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাব ক্রমে (এই প্রস্তাবে সোভিয়েত রাশিয়াও ভোট দেয়) ইহুদিদের আদি বাসভূমিতে ইহুদির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র ইজরায়েলের প্রতিষ্ঠা হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য ইজরায়েলকে ভারতও স্বীকৃতি দেয়। নেহেরু ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু বাধা দেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।**...ভারতের নীতি ক্রমশঃ আরব ঘেঁষা হয়। ইহা জোট নিরপেক্ষ নীতির বিরোধী; প্রতিটি বিষয়েরই বিচার করতে হবে গুন ও যোগ্যতা অনুসারে। (Nehru was in favour...The man who stood in the way was Moulana Azad. In course of time India's Policy gradually tilted towards the Arabs...but it went against one of the elements in nonalignment, namely, "Judging every issue on merits.")[1]

ইজরায়েল বয়সে নবীন, আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও—কৃষি, শিল্প, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, উচ্চ প্রযুক্তি ও উন্নততর সমরাস্ত্র নির্মাণে শীর্ষস্থানীয়। ভারতকে সকল বিষয়ে সাহায্য

* পাকিস্তান ভেঙ্গে "স্বাধীন মুসলিম বাংলাদেশের" সৃষ্টি সামরিক দিক থেকে ভারতের পক্ষে শুভ হয় নি। পূর্বে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ছিল বিশাল ভারত। উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য পাকিস্তান ভারতের উপর ছিল সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এখন সে নির্ভরশীলতা নেই—বরং সংকট বেড়েছে ভারতের। তার দুই পাশে দুটি শত্রুদেশ—পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।

** আবুল কালাম আজাদ। জন্ম মক্কায়। শিক্ষা বাড়ীতেই। কোরান ও ইসলামি ধর্মশাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করে মৌলানা/মৌলবী উপাধি লাভ করেন। তিনি ইংরেজী জানতেন না। তাঁর বই India Wins Freedom উর্দুতে লেখা।

1. M.O. Mathai–Reminiscences of the Nehru Age, P-163

সহযোগিতা করার জন্য একান্ত আগ্রহী। অন্তরায় মুসলমান। তারা ইজরায়েলের চিরবৈরী। তাই আন্তর্জাতিক মঞ্চে ইজরায়েল বিরোধিতায় ভারত অগ্রণী ভূমিকায়।

জেহাদী তোষণ

এদেশে "ধর্মনিরপেক্ষতার" সারমর্ম হল নগ্ন মুসলিম তোষণ। ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় মুসলমান আজ এক বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত। দেশের স্বার্থে নীতি-নির্দ্ধারণের পথে প্রধান অন্তরায় এই মুসলমান। মুসলমান রুষ্ট হবে— "তাই একদেশ এক আইন" হবে না; সংবিধানের বিচ্ছিন্নতাবাদী ৩৭০ ধারা বাতিল করা যাবে না। মুসলমানরা রুষ্ট হবে তাই পার্লামেন্টে জাতীয় সঙ্গীত বন্দেমাতরম্ নিষিদ্ধ। মুসলমান রুষ্ট হবে— "তাই কোটি কোটি বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের এদেশ থেকে বিতাড়ণ করা হবে না। ইসলামের বিধান অনুযায়ী "জেহাদ" মুসলমানের অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য। তাই মুসলিম তোষণ আজ "জেহাদী তোষণে" পরিণত। ধর্মনিরপেক্ষ নীতির ছত্রছায়ায় ভারত আজ ইসলামি জেহাদীদের নিরাপদ স্বর্গ। ২০০৬ সালের ১২ই জুলাই সন্ধ্যায় মুম্বই রেল ষ্টেশনে তিনটি বিস্ফোরণ ঘটে। নিহত হয় ২০০, আহত ৬০০। বিস্ফোরণের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার প্রতিক্রিয়া আনন্দবাজার পত্রিকার (১৫-৭-২০০৬) বিবরণে—"সন্ত্রাসে পাক মদত প্রশ্নে ভারত কতটা সরব হবে তা নিয়ে একেবারেই দ্বিধাবিভক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। নেতারা জানেন পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তুলে সুর চড়ালে মুসলিম ভোটের আশা পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হবে।* মন্ত্রীসভার বৈঠকে তীব্র পাক বিরোধিতার প্রশ্নটি তুলে সরব হয়েছেন অর্জুন সিং ও এ. আর. আন্তুলের মত বর্ষীয়ান নেতারা........ অর্জুন সিং বলেন, আসলে হিন্দুরাই মুসলমান সেজে এসব করাচ্ছে।"**

ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ হুমায়ুন কবীর। আজাদ ছিলেন সারা ভারত খিলাফত কমিটির সম্পাদক। কংগ্রেস যে Secular, মুসলমানের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতেই সম্ভবত তাকে কংগ্রেস সভাপতি করা হয়। ইংরেজী না জানা সত্বেও তাকে যে বিংশ শতাব্দীর স্বাধীন ভারতে শিক্ষা মন্ত্রী করা হয় তাও সম্ভবত ঐ একই কারনে।

ভারত সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, মৌলানা আজাদ ও হাকিম আজমল খাঁ কেরালার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মালাবার অঞ্চলে হিংসাত্মক ভাষণ দেওয়ার পরই মোপলারা জেহাদ ঘোষনা করে। নিহত হয় হাজার হিন্দু...(The following passage occurs in a confidential report of the I.B. Govt. of India : The Moplah rebellion broke out in August after Khilaphat agitators, including Abul Kalam Azad and Hekim Ajmal Khan had been making violent speeches in that area.)[1]

---

* এদেশের ধর্মনিরপেক্ষচক্র নেতৃত্ব দিবা-রাত্রি তারস্বরে ঘোষণা করে, মুসলমানরাও "ভারতীয়"। তবে ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তানকে জেহাদী হানার জন্য অভিযুক্ত করলে মুসলমান কেন ক্রুদ্ধ হবে— মুসলমান ভোট হারাবার এই ভীতি কেন? এদেশের মুসলমান বাস করে ভারতে কিন্তু ভারতের নয়। তাদের আনুগত্য ভারত নয়, পাকিস্তানের প্রতি— কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এই আশঙ্কা কি তারই অকাট্য প্রমাণ নয়?

** ১৯৪৭ সালে পঃ পাকিস্তান থেকে ধর্ষিতা গর্ভবতী ৭৫,০০০ হিন্দু নারীকে এদেশে আনা হয়। তাদের মধ্যে ৫০,০০০-এর গর্ভপাত করানো সম্ভব হয়। অবশিষ্টদের অনেকেই সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। হিন্দু মায়ের সন্তান— হিন্দু

---

1. R.C. Majumder–History of the Freedom Movement in India, Vol-III, P-690

২৬/১১/২০০৮-এ মুম্বাইতে ভয়ংকর জেহাদী হানার পরেও কংগ্রেস সরকারের একই লজ্জাজনক ভূমিকা। ইসলামিক সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য জেহাদী আবদুল নাসের মাদানী (সম্প্রতি তার বিবি সুফিয়া মাদানীকে লস্কর-ই তইবার সঙ্গে যোগাযোগ ও জেহাদী হানার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়)। তার মুক্তির জন্য তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কুমারী জয়ললিতার নিকট ব্যক্তিগতভাবে তদ্বির করেন কেরালার দুই প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী— এ. কে. এ্যান্টনী (বর্তমানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী) ও ওমান চণ্ডী। গত বৎসর কেন্দ্রের কংগ্রেস তাকে প্যারোলে মুক্তি দেয়।

আফজল গুরু ঃ

"ইসলামের ধর্মযোদ্ধাদের জেহাদ হিন্দুস্তানের হিন্দুর বিরুদ্ধে। জেহাদ ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। তারা আক্রমণ করে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র পার্লামেন্ট। নিরাপত্তারক্ষীরা প্রাণ দিয়ে সেই হামলা প্রতিরোধ করে; রক্ষা পায় বহু সাংসদ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। পুলিশ আটক করে কতিপয় মুসলমানকে। প্রমাণের অভাবে (সম্ভবত রাজনৈতিক চাপে) অভিযুক্তদের অনেকেই বেকসুর খালাস পায়। দু'জনের জেল ও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে আফজলগুরুকে। সে দণ্ডাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বহাল রেখেছে। ২০-শে অক্টোবর (২০০৬) তার ফাঁসির দিন ধার্য হয়। এবারে আসরে অবতীর্ন হয় ধর্মনিরপেক্ষ চক্র। আফজলের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কাশ্মীর উপত্যকার (ভারতীয়) মুসলমান একদিনের বন্‌ধ পালন করে। আফজলের ফাঁসি হলে উপত্যকায় (কাশ্মীর) নতুন করে আগুন জ্বলতে পারে। এই অবস্থায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবী আজাদও ফাঁসির আদেশ রদ করার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ জানিয়েছেন। .... সি. পি. আই (এম)-এর জম্মু-কাশ্মীর শাখার সম্পাদক ইউসুফ তারিগামি কিছুদিন আগেই ফাঁসি রদের দাবি জানিয়ে বলেছেন, রাজ্যে যখন পরিস্থিতি ক্রমশঃ শান্তির দিকে এগোচ্ছে তখন ফাঁসি না হওয়াই ভাল। তার এই বক্তব্যকে সমর্থন করেন দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা সীতারাম ইয়েচুরি (আঃ বাঃ—৪-১-২০০৬)

আফজল গুরু ইসলামের এক মহান ধর্মযোদ্ধা। তিনি স্বীকার করেন না ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে। তাই তার হয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট 'ক্ষমা প্রদর্শনের আর্জি পেশ করে তার স্ত্রী। রাষ্ট্রপতি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন- ৬ই অক্টোবর (২০০৬)। ভারত ইতিহাসে এই দিনটি কলঙ্কতম দিনরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। মনে রাখতে হবে আফজলের অপরাধ কোন ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়— সে অপরাধ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রপতি

নামকরণ হয়েছে। হাজার বৎসরের মুসলিম শাসনে কোটি কোটি হিন্দু নারী মুসলমানের অদম্য লালসার শিকার হয়েছে। তখন গর্ভপাতের হয়তো এত সুযোগ সুবিধা ছিল না। হতভাগিনীদের বিরাট অংশই সন্তানের জন্ম দিয়েছে। হিন্দু নামেই তাদের পরিচিতি। কিন্তু শরীরে যে মুসলিম পিতার রক্ত। আর মুসলিম রক্তে হিন্দু বিদ্বেষ সহজাত। এই সকল নেতার ধমনীতে কি পুরুষানুক্রমে সেই রক্ত প্রবাহিত......... ?

যে রাষ্ট্রের প্রধান। তবে অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার ও ধর্মনিরপেক্ষ জোটের রাজনৈতিক চাপেই রাষ্ট্রপতি এই ন্যাক্কারজনক কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন।"[১]

উঃ প্রদেশের দেওবন্দ। ভারতে ইসলামি ধর্মচর্চার পীঠস্থান। গত ৩-১১-২০০৯ তারিখে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় ভারতে মুসলিম জাতির বৃহত্তম সংগঠন জামাত-উলেমা-ই-হিন্দের ত্রিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন। উপস্থিত ছিল সারা ভারত থেকে আগত ১০,০০০ মৌলবী। এই সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই জাতীয় সংগীত "বন্দেমাতরম"-এর বিরুদ্ধে পুনরায় ঘোষণা করা হয় জেহাদ। সেই একই মঞ্চে দাড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম মৌলবীদের সম্ভাষণ করে বলেন—"ইসলামকে আমরা বিদেশী ধর্ম বলে মনে করি না। আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা এদেশের সম্মানীয় নাগরিক। এই দেশ আপনাদের পূর্বপুরুষদের, আপনাদেরও এই দেশ জন্মভূমি ও কর্মভূমি। (We cannot view Islam as an alien faith, our Muslim brothers are honoured citizens of India. This is the land of your forefathers, this is the land of your birth, and this is where you will live and work. (The Statesman ও আনন্দবাজার, ৪-১১-২০০৯) মুসলমানদের প্রীতি লাভের জন্য এই একই মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেন— "হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও জেহাদী সন্ত্রাসকে সমান কঠোরতার সঙ্গে মোকাবিলা করা হবে। (Explaining the govt's perception of terrorism he made it clear that communalism of the Hindutva brand would be opposed as intensly as the threat for Jihadi Terrorists. (The Times of India, 4-11-2009) গান্ধী-নেহেরুর বংশধর ইসলামের দাসানুদাস পণ্ডিত শ্রী চিদাম্বরম বোধ হয় জানেন না যে, জগতের ধর্ম সমূহের মধ্যে হিন্দু ধর্ম সর্বাধিক উদার, পরধর্মে শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বজনীন। এই ধর্মে সাম্প্রদায়িকতা বা মৌলবাদের কোন স্থান নেই। অপরদিকে বিধর্মীর বিরদ্ধে জেহাদ ইসলামের অলঙ্ঘ বিধান, মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য।

এদেশের ধর্মনিরপেক্ষ চক্র জেহাদী তোষণেই সন্তুষ্ট নয়— তারা এবার জেহাদীদের ভরতে সাদর আমন্ত্র জানাবার এক প্রকল্প ঘোষণা করেছে। ধর্মের নির্দেশে কাশ্মীর থেকে মুসলমান যুবকরা প্রথমে যায় পাক অধিকৃত কাশ্মীরে (POK); তারাপর পাকিস্তানে। সেখানে তাদের "জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধে" সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর নাম "করাচী প্রজেক্ট"। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোপাল কৃষ্ণ পিল্লাই জানিয়েছেন— "করাচী প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য হল, এদেশের (ভারত) যুবকদের মগজ ধোলাই করা। তাদের চোরাপথে করাচী নিয়ে গিয়ে জেহাদি প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর ভারতে ফেরত পাঠানো হয়। এর পর পাকিস্তানে বসে এই ভারতীয় যুবকদের দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধেই নাশকতামূলক

১। নিত্যরঞ্জন দাস—সংকটের আবর্তে ভারত, পৃঃ ১৮০-১৮১

কাজ করায় লস্কর এবং আই-এস-আই কর্তারা"— আনন্দ বাজার— ১৬-০২-২০১০। কিন্তু কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় পাকিস্তান থেকে ভারতে জেহাদী অনুপ্রবেশ সম্ভবত কিঞ্চিৎ হ্রাস পেয়েছে। এই জন্যই জেহাদের পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ কাশ্মীর থেকে নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে সোচ্চার। তারা প্রচার করে, যে সকল কাশ্মীরী যুবকরা পাকিস্তান গিয়েছিল তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে—তারা আশাহত। এখন কাশ্মীরে ফিরতে চায়। সমর্থন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন—"ভারত থেকে যারা পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে গিয়েছে; তারা যদি ফিরে আসতে চায়, তবে তারা স্বাগত। কাশ্মীর তো প্রকৃতপক্ষে ভারত ভূখণ্ড।" এই সকল যুবকদের ভারতে প্রত্যাবর্তনে, সরকার সর্বপ্রকারে সহায়তা করবে। (The idea that any Indian who had crossed over to POK and wishes to return to India is certainly welcome." ......Asserting that "POK is actually an Indian Territory", the home minister said the government "should facilitate the return" of those who had gone across the line of control....... The Statesman, 12-2-2010.)

ইসলামি জেহাদে ভারতে ৭০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে ১১,০০০ সেনাকে। ৫,০০০,০০ মানুষ (কাশ্মীরের হিন্দু) স্বদেশে উদ্বাস্তু হয়ে ত্রাণশিবিরে বাস করছে; ২৪,৫০০ ভাড়াটে জেহাদী এসেছে দেশের রক্ত চুষে নিতে— লিখেছেন Ajit Doval, former Director, I.B.–Hindustan Times– 11-9-2007.

সেই ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেহাদীদের আমন্ত্রণ জানাবার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে;তা অভিনব সন্দেহ নাই। পরিকল্পিত আত্মসমর্পণের পর তাদের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পুনর্বাসনের জন্য বিশাল অংকের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। অতঃপর যথাসময়ে "করাচী প্রজেক্টের" নির্ঘন্ট অনুযায়ী তাদের জেহাদী আগ্রাসনে ভারত হবে রক্তাক্ত। ভারতের অধিকারে থাকা কাশ্মীরেই ভারত সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সেখানে ১৫ই আগষ্ট বা ২৬ জানুয়ারী উত্তোলন করা হয় না জাতীয় পতাকা। সেক্ষেত্রে "পাক-অধিকৃত-কাশ্মীর তো প্রকৃতপক্ষে ভারত-ভূখণ্ড"— আইন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর-এই উক্তি মূঢ়তার এক চরম নিদর্শন বলে গণ্য হবে।

সমাধান কোন পথে?

এই হল ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মধুর সম্পর্ক। একদিকে ইসলামের উদ্যত তরবারি, অন্যদিকে তার সহযোগী ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের সহায়ক ভূমিকা। ইসলামের যুপকাষ্ঠে হিন্দুকে বলিদানের মহা আয়োজন প্রস্তুত। হিন্দুর কর্তব্য কি হবে। দেশ ভাগ করে গান্ধী নেহেরুর মুসলিম তোষণ চরিতার্থ হয় নি।

খণ্ডিত ভারতকে পুনরায় খণ্ডিত করার উদ্দেশ্যেই হিন্দু-বিদ্বেষী এই অশুভ চক্র এদেশে আমদানি করেছে "ধর্মনিরপেক্ষতা" নামক এক মূর্তিমান অভিশাপকে। এই অভিশপ্ত ধর্মনিরপেক্ষতার সুবাদেই ভারত আজ ইসলামি জেহাদের লীলাভূমি—পাকিস্তানের রণহুঙ্কার, মুসলমানের কণ্ঠে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" শ্লোগান। এই ধর্মনিরপেক্ষতার বলি কাশ্মীরের তিন লক্ষ হিন্দু। এই ধর্মনিরপেক্ষতা হিন্দু জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। গণভোট নিলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বিপুল ভোটাধিক্যে বাতিল হবে।* গান্ধী নেহেরুর আমদানি করা এই পাপের বোঝা হিন্দু আর কতদিন বয়ে বেড়াবে এবং কেন? জনমানসে এরূপ একটি ধারণা প্রচলিত যে, মুসলিম ভোটের জন্যই কংগ্রেস সহ ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি হিন্দু স্বার্থের বিরুদ্ধে-মুসলমানদের তোয়াজ করে। কিন্তু এর পরিণতি কি হতে পারে?

(ক) জনসংখ্যা বিশারদের আশঙ্কা, ২০৬০ সালের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বর্তমান ৫৫ কোটি (১৯৯০ সাল) হিন্দুকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। হিন্দু-মুসলমানের জন্মহার তুলনামূলক বিচার করে বলা যেতে পারে যে, একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ভারত হবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামি রাষ্ট্র (The Statesman-18.7.90)। তখন মুসলমান হবে ভারতের উজির-এ আজম। বিনা যুদ্ধে দখল হবে ভারত।**

---

* বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক অরুণ ঘোষ সংকলিত "দ্য মোমেন্টস অব বেঙ্গল পার্টিশন ঃ সিলেকসনস ফ্রম দ্য অমৃতবাজার পত্রিকা" বইয়ের ভূমিকা থেকে জানা যায়— ২৩শে মার্চ ১৯৪৭ থেকে ১৫-ই এপ্রিল ১৯৪৭ পর্যন্ত অমৃতবাজার পত্রিকা একটি মত সমীক্ষা করে। বিষয় ঃ আপনি কি বাংলার হিন্দুদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র চান? দুই দফায় ৬ লক্ষেরও বেশি পাঠক উত্তর দেন। তাঁদের শতকরা ৯৯জন হিন্দু। এবং শতকরা ৯৮ জনেরও বেশী বলেন, হ্যাঁ, চাই (আনন্দবাজার পত্রিকা- ২৫-১-২০১০, কলকাতার কড়চা)

তখনো কিন্তু পঃ পাকিস্তানে মুসলমানের "হিন্দু-মেধ" যজ্ঞ ও পূর্ব পাকিস্তানে "গণহত্যা" সংঘটিত হয়নি। হিন্দু দেখেনি জলস্রোতের ন্যায় উদ্বাস্তু স্রোতে ভারতের মাঠ ময়দান রাজপথ প্লাবিত। তারপর ৬০ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে তিনটি। "ধর্মনিরপেক্ষ" নীতির ছত্রছায়ার মুসলিম আগ্রাসনে সমগ্র ভারত রক্তাক্ত-ভীত-সন্ত্রস্ত। আজ যদি গণভোট নেওয়া হয় "ধর্মনিরপেক্ষ ভারত" অথবা "হিন্দুরাষ্ট্র", তবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, ভারতের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ "হিন্দুরাষ্ট্র"-এর পক্ষেই ভোট দেবে।

দাবি করা হয় ভারতবর্ষে গণতন্ত্র দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ পর্যন্ত জাতীয় কোন বিষয়েই জনমত সমীক্ষা করা হয়নি। হিন্দুর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি (ক) অযোধ্যার শ্রীরামমন্দির, (খ) এক দেশ এক আইন ও (গ) সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল। প্রথমটির সঙ্গে সমগ্র হিন্দু জাতির আবেগ-অনুভূতি যুক্ত থাকলেও অবশিষ্ট দুটি দেশ ও জাতির মূল স্বার্থের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মনিরপেক্ষ চক্রের বিচারে এই তিনটি দাবিই বিতর্কিত। গণভোট হলে কিন্তু বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা পক্ষেই মতদান করবে।

** মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি র হার

১৯৬১—২০০১ এই ৪০ বৎসরে

ভারতের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি র হার	১৩৪.২%
মুসলিম মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি র হার	১৯৪.৪%

(খ) অথবা তার পূর্বেই ভারতের যে অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে— সেখানেই তারা "পাকিস্তান" দাবিতে সোচ্চার হবে।

দাবি আদায়ের জন্য ১৯৪৬ সালের ন্যায় শুরু করবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) কে তাদের প্রতিরোধ করবে? শতবর্ষ ধরে "ধর্মনিরপেক্ষতার" বীজমন্ত্র জপ করে হিন্দু আজ বীর্য শুষ্ক নপুংসক। তিন লক্ষ হিন্দুকে বিতাড়িত করে কাশ্মীর আজ কার্যত পাকিস্তান। মুসলমানের পরবর্তী লক্ষ আসাম-পঃ বাংলা সহ পূর্ব ভারত। ১৯৪৭ ও ১৯৫০ সালের ন্যায় পুনরায় হিন্দুমেধ যজ্ঞ— ভারতের রাজপথে স্বজনহারা সর্বহারা উদ্বাস্তুদের মিছিল........।

মুসলমান নিজেদের ভারতীয় বলে স্বীকার করে না। স্বীকার করে না ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে। তাঁদের পূর্ণ ও নিঃশর্ত আনুগত্য পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের প্রতি। এর নিগূঢ়ার্থ হল মুসলমান সর্ব অর্থেই বিদেশী। বিষয়টি খিলাফত অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত এক বিশাল বিদেশী জাতি গোষ্ঠীর বাস দেশের মূল স্বার্থ ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজনক। অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়। পৃথিবীর কোন দেশই এইরকম বিদেশী জাতী গোষ্ঠীকে স্বদেশে আশ্রয় দেয় না। তবে ভারত দেবে কেন? হিন্দুস্তান হিন্দুর মাতৃভূমি-বাসভূমি; ধরমশালা নয়। সমস্যার সমাধানে— অবিলম্বে মুসলমানদের বহু বিবাহ প্রথা রদ করে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মুসলিম অনুপ্রবেশ কঠোর হস্তে বন্ধ করে ২ কোটি বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠাতে (Push Back) হবে। দৃষ্টান্ত মায়নামার। ক্ষুদ্র মায়নামার যা পারে— বৃহৎ শক্তি ভারত তা পারবে না কেন? অতঃপর সকল মুসলমানকেই তাদের স্বদেশ পাকিস্তান-বাংলাদেশে পাঠাতে হবে। যতদিন তা সম্ভব না হয়— তারা এদেশে বাস করবে বিদেশী (alien) হিসেবে। বিদেশীদের ভোটাধিকার থাকে না। এই ভাবে যদি মুসলিম ভোট "ব্যাংক"-কে নিষ্ক্রিয় করা যায় তবেই পুনরায় ভারত ভাগের চক্রান্ত ব্যর্থ করা যাবে।

এদেশের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী ১৯৪৭ সালের দেশভাগের কারণ বিচার-বিশ্লেষণে নিমগ্ন। কিন্তু পর্দার অন্তরালে যে পুনরায় ভারত বিভাগের গোপন ষড়যন্ত্র শনৈঃ শনৈঃ বাস্তবায়িত হতে চলেছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন.......।

পঃ বঙ্গে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি র হার ১২৯.৬%

পঃ বঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি র হার ১৮৯.৪%

সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সারা ভারতে মুসলিম রমণীদের গড় সন্তান সংখ্যা-৫.৭; পঃ বঙ্গে-৬

হিন্দুদের ক্ষেত্রে ভারতীয় গড়-৪.৩

এবং পঃ বঙ্গে—৩.৭

লিখেছেন ঃ অভিরূপ সরকার, অর্থনীতির অধ্যাপক, , কলকাতা, আনন্দবাজার ২-৩-২০১০

পরিশিষ্ট—তিন

HOLOCAUST

Holocaust ! সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের শব্দ-ভাণ্ডারে এরকম শব্দ বোধ হয় দ্বিতীয়টি নেই, যা শ্রবণমাত্রই ধমনীর শোণিতপ্রবাহ সহসা স্তব্ধ হয়—শীতল, অবশ হয় দেহ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নায়ক জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা হিটলারের অমর কীর্তি এই Holocaust.

হিটলার বিশ্বাস করতেন জার্মানদের দেহে আর্যরক্ত প্রবাহিত। এই আর্যরক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্যই তিনি আয়োজন করেন ইহুদি মারণযজ্ঞের। তৈরি করেন ব্যাপক ও নিখুঁত এক পরিকল্পনা। ১৯৩৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর প্রণীত হয় কুখ্যাত "ন্যুরেমবার্গ আইন"। এই আইনে কেড়ে নেওয়া হয় জার্মানীতে পুরুষানুক্রমে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের নাগরিক অধিকার; জার্মানদের সঙ্গে ইহুদিদের বিবাহ হয় নিষিদ্ধ । চাকুরি-শিক্ষা-সংস্কৃতির জগৎ থেকে তাঁরা হলেন বহিষ্কৃত। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স, রেস্টুরেন্ট, ঔষধের দোকান—সর্বত্র সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হল JEWS ARE NOT WELCOME, JEWS ARE NOT ADMITTED. ইহুদিদের স্থান হল ডাচাউ, অস্টউইচ প্রভৃতি Concentration Camp-এ। লাখ লাখ ইহুদি, নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে বন্দী শিবিরে নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। অত্যাচার, অনাহার-অর্ধাহারে রোগাক্রান্ত, জীর্ণ শীর্ণ দেহ;অবশেষে তাদের পাঠানো হত মৃত্যুর গহ্বরে—গ্যাস চেম্বারে। এইভাবে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করে হিটলার জার্মানীকে ইহুদিমুক্ত করে প্রতিষ্ঠা করেন বিশুদ্ধ আর্যরক্তের শ্রেষ্ঠত্ব।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে ভারতবর্ষেও ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ব স্থাপনের সর্বপ্রকার চেষ্টা হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, একটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন নির্মূল করতে হলে আইনী ব্যবস্থার মাধ্যমে তার জীবন ও ধন-সম্পত্তি সহ সকলপ্রকার নাগরিক অধিকার কেড়ে নিতে হয়; গুঁড়িয়ে দিতে হয় তার মনোবল ও প্রতিরোধের ইচ্ছাকে—এরকম শিক্ষা হিটলার পেলেন কোথা থেকে? মানব জাতির ইতিহাসে ভারতবর্ষ ব্যতীত এরকম ঘটনার তো কোন নজীর নেই। ইউরোপে ইহুদি-নিধনের কাল বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। গণতন্ত্রের যুগ। বেতার ও সংবাদপত্রের আশীর্বাদে স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সম্বন্ধে সচেতন সংঘটিত বিশ্ব জনমত। তা সত্ত্বেও ৬০ লক্ষ হতভাগ্য ইহুদিকে প্রাণ দিতে হয়েছে হিটলারের গ্যাস চেম্বারে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন শুরু ৭১২ খ্রিঃ দেশের পঃ প্রান্তে।

সেখান থেকে তা সম্প্রসারিত হয় সারা ভারতে। ছিল না বেতার ও সংবাদপত্র বা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। বিশ্ব দূরে থাক—দেশের এক রাজ্যের সংবাদ অন্য রাজ্য জানতে পারত না। আর জানলেও কিছু করার ছিল না। হিন্দু রাষ্ট্রের প্রজা বা নাগরিক নন। ইসলাম ধর্মের বিধানে তার সামনে ছিল দুটি পথ—স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অথবা মৃত্যু। Either Islam or Death.এই বিধানের ব্যাখ্যা করে ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কাজী বলেন ঃ "স্বয়ং আল্লা তাদের ঘৃণা করেন।" তাঁর নির্দেশ, "তাদের পরাধীন করে রাখবে"। হিন্দুদের চরম অত্যাচার ও দুর্দশার মধ্যে রাখা মুসলমানের বিশেষ ধর্মীয় কর্তব্য। কারণ তারা হল মহম্মদ ও ইসলামের ঘোরতর শত্রু। সুতরাং ধর্মকে রক্ষা করতে হলে শত্রুর বিনাশ চাই। মুসলমান সেই চেষ্টা করেছে প্রবল উৎসাহ উদ্যমে সর্বশক্তি দিয়ে। সারা ভারতব্যাপী চলেছে হিন্দুহত্যার মহোৎসব। হ্যাঁ, হিন্দুহত্যাকে তারা পুণ্যের কাজ, উৎসব বলেই মনে করত। দাক্ষিণাত্যের এক মুসলিম সুলতান আহম্মদ শা; আক্রমণ করেন বিজয়নগর রাজ্য। রাজা দেব রায় পরাজিত হলে সুলতান নির্বিচারে গণহত্যার আদেশ দেন। নিহতের সংখ্যা ২০০০০ পূর্ণ হলেই সুলতান উৎসবের জন্য তিন দিনের জন্য যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতেন। কাফের হত্যার জন্য সাহসী সৈনিদের দেওয়া হত পুরস্কার; পান-ভোজন ও রণক্লান্ত সৈন্যদের চিত্তবিনোদনের জন্য থাকত ঢালাও ব্যবস্থা।

এ মহৎ কাজে পুণ্য আছে। পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাস। পুণ্য অর্জনের জন্য সকল মুসলমান-ই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দিরে আশ্রয়প্রার্থী ৫০ হাজার ভীত অসহায় হিন্দু নর-নারীকে হত্যা করেছে। এক লক্ষ শৃঙ্খলিত বন্দীকে একদিনে হত্যা করেছে মুসলিম জাতির আর এক মহান বীর তৈমুর লঙ। ফিরোজ শা তুঘলক উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদে পাঁচ-লক্ষ হিন্দু-রক্তে করেছে তর্পণ। আহম্মদ শা-আবদালি এত হিন্দু হত্যা করেছিলেন যে যমুনার জল হয়েছিল রক্তবর্ণ। দাক্ষিণাত্যে বিজয় নগর অধিপতি রামরাজা যুদ্ধে পরাজিত হলে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর ব্যাপক হিন্দুহত্যার রক্তে রাঙা হয়েছিল সকল নদীর জল (all the Streams were coloured with the blood)। মুসলমান হাজার বছর ধরে ভারতভূমিতে হিন্দুরক্তের প্লাবন সৃষ্টি করেছে—তারপর সেই রক্তে খেলেছে হোলি। দিল্লির শাহেন শা, কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের নবাব অথবা সাধারণ মুসলমান সকলেই এই হত্যা-লীলায় সাগ্রহে সমান ভাবে অংশ নিয়েছে। হিন্দুর রাজ্য আক্রমণ অথবা হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা; হত্যায় কখনও বিরতি ঘটেনি। Will Durant তাই বলেন, "মুসলমানের ভারত বিজয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা রক্তাক্ত অধ্যায়" (Mohammadan Conquest of India is probably the bloodiest story in history)। শুধু রক্তাক্ত-ই নয়; এত বর্বর, পৈশাচিক, নিষ্ঠুর অধ্যায় মানব-ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। আর এ সকলই হয়েছে ধর্মের নামে।

ইহুদি নিধনে সমগ্র জার্মান জাতির সমর্থন ছিল না। বিরূপ প্রতিক্রিয়া যাতে না হয় তার জন্য পরিকল্পনা রূপায়ণে হিটলার অবলম্বন করেছিলেন গোপনীয়তা। পক্ষান্তরে হিন্দুহত্যায় গোটা মুসলিম জাতির ছিল নিঃশর্ত স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। আর যেহেতু "ধর্মযুদ্ধে"

হিন্দুহত্যা হল আল্লার পথে সংগ্রাম তাই গোপনীয়তার কোন প্রশ্নই ছিল না। হিটলারের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে ইহুদিদের অনেকে ইংলন্ড, আমেরিকা বা অন্যত্র পালাতে পেরেছিল; কিন্তু হিন্দুরা কোথায় পালাবে? মাত্র ১০ বছরেরও কম সময়ে হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যা করেছিলেন। তবে অভিশপ্ত হাজার বছরে কত কোটি হিন্দু নিহত হয়েছে? সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও একটা যুক্তি গ্রাহ্য অনুমান করা যায়। সুপ্রাচীন দেশ এই ভারতবর্ষ; মানবসভ্যতার জনয়িত্রী। ১৯৪৭ সালে তাদের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫ কোটি। ২৫ কোটি হিন্দু—১০ কোটি মুসলমান ও অন্যান্য। বিশ্বের প্রাচীনতম দেশ, হিন্দুদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে মাত্র ২৫ কোটি হিন্দু! ১২০০ বছর পূর্বে মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে ভারত কি তবে জনশূন্য ছিল? কিন্তু বাস্তব সত্যকে তো অস্বীকার করা যায় না। তবে কী সে রহস্য? মুসলিম ঐতিহাসিক ফরিস্তার বিবরণে হয়তো তা উদঘাটিত হতে পারে। ১৮৯৯ সালে "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকায় স্বামিজীর এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়—...."যখন মুসলমানেরা প্রথম এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন প্রাচীনতম মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল, এখন আমরা বিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছি।" "When the Mohammedans first came, we are said—I think on the authority of Ferista, the oldest Mohammedan historian—to have been six hundred millions of Hindus. Now we are about two hundred millions"—The complete works of Swami Vivekananda—Vol-5-Page-233. ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে এই সংখ্যাটিই স্বাভাবিক। এর থেকে অনুমান করা যায়, হত্যার আয়োজন কিরূপ ছিল; কত কোটি হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হয়েছে তা হল Tip of the iceberg; অতল জলধি হতে উত্থিত হত্যা ও ধ্বংসের কালান্তক পর্বতের শীর্ষ বিন্দুমাত্র।

বিজয়নগর ধ্বংসের মর্মান্তিক কাহিনি বর্ণনায় Will Durant মন্তব্য করেছেন। ...."পাঁচ মাস পরে তারা যখন চলে গেল—তখন একদা সমৃদ্ধশালী বিজয়নগর সম্পূর্ণ ধ্বংস; যেন এক বিধ্বংসী প্রলয়ংকর ভূমিকম্প বিজয়নগরকে গ্রাস করেছে, কোন কিছুর চিহ্নমাত্র রাখে নাই। এ ধ্বংসকার্য ছিল নির্মম নৃশংস, পূর্ণ—ভয়ঙ্কর মুসলিম বিজয়ের বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত। হাজার বছর পূর্বে যা আরম্ভ হয়েছিল আজ তা পূর্ণ হল"(When at last they retired, Vijaynagore was as completely ruined as if an earthquake had visited it and had left not a stone upon a stone. It was a destruction ferocious and absolute, typifying that terrible Moslem conquest of India which had begun a thousand years before, and was now complete)[1] হত্যায় মুসলমানের অপার আনন্দ। বিধর্মী হত্যায়—

1. Will Durant—The Story of Civilization, P-459

সে হয় উল্লসিত; তার ঘৃণা-বিদ্বেষ হয় পরিতৃপ্ত। তাই হত্যায় ছিল নানা বৈচিত্র্য। যেমন, সদ্যকর্তিত-কাফেরদের রক্তাক্ত মুণ্ড দিয়ে স্তম্ভ বা Tower তৈরি করে সেই দৃশ্য সানন্দে উপভোগ করা।* মহম্মদ বিন্ তুঘলক—সুলেখক, গুণী ও বিদ্বোৎসাহী। কিন্তু হত্যা ও বর্বরতায় তিনি তাঁর পূর্বসুরীদেরও হার মানিয়েছেন। এত হিন্দুহত্যা তিনি করেছেন যে, জনৈক মুসলিম ঐতিহাসিকের বর্ণনায়—"তাঁর প্রাসাদ ও দরবারের সামনে সব সময়ই থাকত পর্বতপ্রমাণ মৃতদেহের স্তূপ। দিবা রাত্র হত্যায় জল্লাদেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ত, সেই মৃতদেহ সরিয়ে নেবার দায়িত্বে নিযুক্ত ডোমদেরও হত ক্লান্তিবোধ। (Mahammed Bin-Tughlakh....surpassed all his predicessors in bloodshed and brutality...He killed so many Hindus that in the words of a Moslem historian, "there was constantly in front of his royal pavilion and his civil court a mound of dead bodies and a heap of corpses, while the sweepers and executioners were wearied out by their work of dragging")[1]

ইউরোপে Holocaust হয়েছে একটি; ভারতবর্ষে হাজারটি; সর্বশেষ ৪৭ সালে পঃ পাকিস্তানে। হিটলার ইহুদিদের গ্যাস চেম্বারে হত্যা করেছে। কিন্তু পরিকল্পিত ও ব্যাপকভাবে, নারী লাঞ্ছনা, উপাসনালয়ের অমর্যাদা, লুণ্ঠন বা অগ্নিসংযোগের কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। কিন্তু এদেশে মুসলমান সর্বগ্রাসী সর্বাত্মক ধ্বংসের তাণ্ডব নর্তনে মত্ত হয়েছিল; হত্যা, নারী ধর্ষণ, নারী অপরহরণ, ধর্মান্তর, মন্দির ধ্বংস, বিগ্রহের অমর্যাদা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ। হিটলারের ইহুদি-নিধন ছিল তার সীমাহীন ক্ষমতার সীমাহীন দম্ভ, অপব্যবহার ও বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ। ছিল না ধর্মের অনুমোদন। পক্ষান্তরে ভারতে এই দানবীয় হত্যাকাণ্ড, পৈশাচিক অত্যাচার হয়েছে শান্তি-সম্প্রীতির বার্তাবহ পবিত্র ইসলাম ধর্মের নামে। সে কাহিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন মুসলিম বিজেতা ও শাসকবৃন্দ তাঁদের আত্মজীবনীতে। প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিক পরম উল্লাসে বর্ণনা করেছেন সে গৌরবের কাহিনি। যদিও ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে তবু দু-একটি দৃষ্টান্তে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে। ঈশ্বরের অভিশাপ, মূর্তিমান বিভীষিকা সুলতান মামুদ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক Minhaj as-Siraj লিখেছেন ঃ এক সহস্র মন্দির ভেঙে মামুদ জগৎবিখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল সোমানাথ মন্দির ধ্বংস। মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিচারে মামুদ ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট (Moslem historians ranked him as the greatest monarch of his time, and one of the

---

* তৈমুরলঙ ও সম্রাট বাবরের ছিল এটি এক বিশেষ শখ।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন হিন্দুদের জীবন্ত দেহের চামড়া ছাড়িয়ে নিতেন—তারপর সেই চামড়ার খোলের মধ্যে খড়ভর্তি করে ঝুলিয়ে রাখতেন রাজধানী দিল্লির প্রাচীরে।

---

1. Will Durant—The Story of Civilization, P-461

greatest sovereigns of any age—Durant-p-460) হিন্দুস্থানে কাফেরদের বিরুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর সাফল্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে Hassan Nizami বলেন ঃ "তিনি তাঁর কৃপাণের দ্বারা হিন্দুস্থান থেকে অবিশ্বাস (ইসলাম ধর্মে) ও অনাচারের পাপ নির্মূল করেন। মুক্ত করেন সমগ্র দেশকে বহু-দেবত্ববাদ ও মূর্তি পূজার অপবিত্রতা থেকে। তাঁর অমিত বিক্রম, দুর্জয় সাহস ও রাজকীয় শৌর্যের রুদ্র তেজে ধ্বংস হয় সকল মন্দির। (He purged by his sword the land of Hind from the filth of infidelity and vice, freed the whole of that country from the thorn of God-plurality and the impurity of idol-worship and by his royal vigour and intrepidity left not one temple standing —Dr. Ambedkar-Vol-8 P-56) কুতুবুদ্দিন আইবক, ধর্মান্ধ—ভয়ঙ্কর ও নির্দয়। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তাঁর প্রশংসায় বলেন—"তার ছিল লক্ষ গুণ—তিনি লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছেন।" (Kutub-ud Din Aibak was a normal specimen of his kind—fanatical, ferocious, and merciless, his gifts, as the Mahammadan historian tells us, "were bestowed by hundreds of thousands, and his slaughters likewise were by hundreds of thousands —Durant —P-461) কোন নাৎসী ঐতিহাসিক ইহুদি-নিধনের জন্য হিটলারের প্রশংসা করেননি। মুসলমান-অ-মুসলমানের মানসিকতায় কি দুরতিক্রম্য পার্থক্য!

বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ তাঁর ভ্রমণ-কাহিনিতে ৯৫টি বৌদ্ধ কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন—যেখানে ছিল বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধদের বসতি। প্রধান প্রধান বৌদ্ধ কেন্দ্রে ৫০ থেকে ৫০০ পর্যন্ত বৌদ্ধমঠ ছিল। আজ তার কটি অবশিষ্ট আছে? বিলীন হয়েছে কালের গহ্বরে? না। লুপ্ত হয়েছে মুসলিম আক্রমণে। বিজয়নগর ধ্বংসের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Robert Swell বলেন ঃ 'বিশ্বের ইতিহাসে আর কোন বিরাট নগরকে এভাবে ধ্বংস করা হয়নি...এই ধ্বংস এত ব্যাপক হয়েছিল যে তার আর পুনরুত্থান হয়নি; সেই ধ্বংসস্তূপে আর গড়ে ওঠেনি জনবসতি (Never perhaps in the history of the world has such havoc been wrought...It never recovered, but remained for ever a scene of desolation and ruins—Swell—A Forgotten Empire—P-208) মুসমিল আক্রমণে এই ভাবেই হারিয়ে গেছে শত-শত জনপদ। ভারতব্যাপী বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ থেকে তাদের কয়েকটির পরিচয় পাওয়া গেছে মাত্র। যেমন "কপিসি—Kapisi, লম্পাকা—Lampaka, নগর হারা—Nagarhara, পুস্কলাবতী—Puskalavati, উদভাণ্ডপুর—Udbhandapur, তক্ষশিলা—Takshsila, আলোর —Alor, ব্রাহ্মণাবাদ—Brahmanabad, দেবল—Debal, নন্দন—Nandana, আগ্রোহ—Agroha, বিরাটনগর—Viratnagar, অহিচ্ছত্র—Ahichchatra,

শ্রাবস্তী—Sravasti, সারনাথ—Sarnath, বৈশালী—Vaishali, বিক্রমশীলা—Vikramshila, নালন্দা—Nalanda, কর্ণসুবর্ণ—Karnasubarna, পুন্ড্রবর্ধন—Pundrabardhana, সোমপুর—Somapura, জাজনগর—Jajanagar, ধান্যকটক—Dhanyakatak, বিজয়পুরী—Vijaypuri, বিজয়নগর—Vijaynagar. মাটির নিচে এইসব নগরীর ধ্বংসাবশেষ; উপরে রয়েছে মসজিদ, দরগা, সমাধি অথবা হিন্দুধর্মের উপর আল্লার বিজয়ের বার্তাঘোষক অন্য কোন মুসলিম স্মারক।"[1]

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খনন কার্য চালিয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিল। সর্বত্র একই কাহিনি। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এই খনন কার্য প্রায় বন্ধ এবং কোন তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশিত হয় না। ধর্ম নিরপেক্ষতার যাদুমন্ত্র অথবা ভয়ে বর্তমান প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকরা—নগরী কিভাবে কাদের দ্বারা ধ্বংস হয়, সেখানের জনগণের ধর্ম ও জাতি কি ছিল, তা বিচার করেন না। তাঁদের বিচার্য বিষয় হল নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে জনগণের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ, তাদের বেশ ভূষা, জীবনধারণ পদ্ধতি ইত্যাদি। (....since the dawn of independence, Indian archaelogists functioning under the spell or from fear of Secularism, record or report only the ethnographical stratifications and cultural sequences.)[2] কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। সম্প্রতি The Hindustan Times (Dt 4.4. 2000) পত্রিকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য সম্বন্ধে এক চাঞ্চল্যকর নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত হল ঃ

নব নব প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার বিকৃত মার্কসবাদী ইতিহাসকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। মার্কসবাদী ভীত সন্ত্রস্ত। আত্মরক্ষায় তারা মরীয়া। দীর্ঘকাল যাবৎ তারা প্রচার করে আসছে যে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেই অতীতে হিন্দু মন্দির সকল ধ্বংস হয়েছিল। অথচ "মহামতি" আকবরের ফতেপুর সিক্রিতে খনন কার্য চালিয়ে পাওয়া গেছে রাশি রাশি জৈন-দেব-মূর্তি। জৈন সম্প্রদায়ের অহিংসা-নীতিতে নিষ্ঠা প্রবাদপ্রতিম। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ফতেপুর সিক্রিতে প্রাপ্ত দেব-মূর্তি মধ্যযুগে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উপর এক নতুন আলোকপাত। শেষরক্ষার জন্য মার্কসবাদীরা তাই আসরে অবতীর্ণ।

ফতেপুর সিক্রি এক ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ ও পর্যটন কেন্দ্র। তাই সেখানে প্রাচীন জনবসতির সন্ধানে খননকার্যের বৈধতা নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলেছে। সত্য যাতে প্রকাশ না পায় তার জন্য এ এক অভিনব কৌশল (Frightened by the growing avalance of archaeological evidence which threatens to pulverise Marxist historiography, the desperation of leftist academics to salvage their

1. Sita Ram Goel—Hindu Temples : What Happened to Them, P-80
2. Ibid, P-81

rendition of the past is entirely understandable, Decades of labour expended in effacing references to the destruction of Hindu temples, shifting the focus instead to sectarian Hindu conflict is now in jeopardy....in the heart of Akbar's Fatehpur Sikri, a mounting debris of jain statues is being unearthed. Given the Jain Community's impeccable non-militant credentials and Akbar's reputation as the best face of Indian Islam, this casts and entirely new light on inter-community relations in medieval India. ....Marxists (therefore) have rushed into defend their carefully sanitised version of the past.

They have questioned the legitimacy of the excavations on the ground that as Fatehpur Sikri is a famous monument and tourist site, there was no justification for reopening the site to discover an old settlement.)[1]

মার্কসবাদীদের আর একটি অভিনব তত্ত্ব এই যে, ব্রাহ্মণদের অত্যাচারেই বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষ হতে লুপ্ত হয়েছে। এই তত্ত্ব দুরভিসন্ধিমূলক ও সত্যের অপলাপ। ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে ভারতীয় ধর্ম অথবা সনাতন ধর্মেরই অঙ্গ বিশেষ বলে মনে করতেন। বৌদ্ধ দর্শন তো উপনিষদের নব সংস্করণ। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একটি বিরাট অংশ ছিল ব্রাহ্মণ। জৈনদের অনেক দার্শনিকও ছিলেন ব্রাহ্মণ। ঐতিহাসিক V.A. Smith ভারত ভূ-খণ্ড হতে বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তির জন্য মুসলিম আক্রমণকেই দায়ী করেন। বিহার ও উত্তর প্রদেশের এক বিরাট অংশ জুড়ে ছিল বৌদ্ধদের বসতি। ১১৯৩ খ্রিঃ কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি বখ্‌তিয়ার তনয় মহম্মদ খলজী বিহার দুর্গ অধিকার করে। পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিহারে তখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য। মুসলিম ঐতিহাসিকের বর্ণনায় মহম্মদ খলজীর বিহার জয়—"অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল মুণ্ডিত-মস্তক ব্রাহ্মণ। তাদের সকলকেই হত্যা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। একটি বিখ্যাত গ্রন্থাগারকে (নালন্দা) সম্পূর্ণ ভাবে ভস্মীভূত করা হয়। আজও বেনারসের নিকট সারনাথে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহারের ভস্মরাশি মুসলিম মূর্তিভঙ্গকারীদের উন্মত্ততার মূক সাক্ষী। শুধু বৌদ্ধ মঠ নয়—মুসলিম আক্রমণ ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার স্মারক চিহ্নসমূহকে এমন ধ্বংস করেছে যে, পুনরুদ্ধার আর সম্ভব হয়নি। এই আক্রমনের ফলে উত্তর ভারতে সংগঠিত ধর্মরূপে বৌদ্ধ ধর্ম হয়েছে বিপন্ন। যারা এই ব্যাপক হত্যার হাত থেকে বেঁচেছিল তারা পালিয়ে যায় দক্ষিণ ভারত, তিব্বত ও নেপালে। এইভাবে ১২০০ খ্রিঃ ভারত হতে বৌদ্ধ ধর্ম লুপ্ত হয়। (The overthrow of the

"Brahmins Weren't icnoclasts"
1. The Hindustan Times—Dt 4.4. 2000

rulers of the eastern kingdoms was effected with astounding facility by Qutb-ud-din's general, Muhammad Khelji; the son of Bakhtyar. (He) seized the fort of Bihar in 1193. The muslim historian...states that majority of the inhabitants—were 'shaven-headed Brahmins, who were all put to the sword. He evidently means Buddhist monks. ...A great library was scattered. The ashes of the Buddhist sanctuaries at Sarnath near Benaras still bear witness to the rage of the image-breakers. Many noble mounments of the ancient civilization of India were irretrievably wrecked in the course of the early Muslim invasions. Those invasions were fatal to the existence of Buddhism as an organised religion in northern India, ...The monks who escaped massacre fled, and were scattered over Nepal, Tibet and the South. After AD 1200 the traces of Buddhism in India are faint and obscure.)[1]

হাজার বছর ধরে একটা দেশ ও জাতির ওপর অকল্পনীয় সর্ববিধ অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে। ঐতিহাসিক সত্য নিরূপণের জন্যই তার পূর্ণ বিবরণ প্রয়োজন। অথচ ভারত সরকার, ইতিহাস লেখকগণ এ সম্বন্ধে আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব। শত শত বছর ধরে হিন্দু-মারণ যজ্ঞে কত কোটি হিন্দু নিহত হয়েছে—কত কোটি হিন্দুকে আরবের দাস বাজারে (Slave Market) বিক্রয় করা হয়েছে; কত হিন্দু নারী মুসলমানের যৌন লালসার হাত থেকে নারীত্বের মর্যাদা রক্ষায় "জহরব্রত" অথবা অন্য উপায়ে আত্মহত্যা করেছে—ভারত সরকার সে তথ্য সংগ্রহে নিতান্তই অনাগ্রহী। যদিচ মুসলিম, হিন্দু ও ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকের লেখায় তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সংরক্ষিত আছে মোগল ও তার পূর্ববর্তী আমলের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জাতীয় মহাফেজখানায়। অন্যদিকে ২০০ বছরের ইংরেজ শাসনে অত্যাচার ও শোষণের চিত্রাঙ্কনে বর্তমানকালের ইতিহাস লেখকগণ খুব তৎপর। তারা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বর্বরতার নিদর্শন স্বরূপ পাঞ্জাবের "জালিয়ানওয়ালাবাগের" হত্যাকাণ্ড ও নীলকরদের অত্যাচারের উল্লেখ করেন। কিন্তু মুসলিম শাসনের অত্যাচারের সঙ্গে এর কি কোন তুলনা হয়? হ্যাঁ অত্যাচার অবশ্যই হয়েছে। তবে মুসলিম শাসনের তুলনায় তা "সিন্ধুতে বিন্দু সম।"* শোষণ? মুসলমান ভারতের রস নিঙড়ে নিয়েছিল, ইংরেজ পেয়েছিল ছিবড়ে। তখনও "কাঁচা সোনা"

* জালিওয়ালা বাগের নিরস্ত্র অহিংস জনতার ওপর জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে ১৫০০ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করা হয়। সরকারি হিসেবে নিহতের সংখ্যা-৩৭৯, আহত হয়-১২০০। অন্যমতে মৃতের সংখ্যা ৫০০ হতে ১০০০। R. C. Majumder—History of the Freedom Movement In India, Vol-III, P-22-23

1. V. A. Smith—The Oxford History of India, P-235-236

পেট্রোলের আবিষ্কার হয়নি। আরবদের ছিল না বিত্ত-বৈভবের জৌলুস। সাম্রাজ্যের সম্পদেই তাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি। এ প্রসঙ্গে মহম্মদের জীবনীকার D.S. Margoliouth -এর মন্তব্য ঃ মক্কা নগরের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়েছিল, তা সত্ত্বেও মক্কা হয়েছিল লাভবান। প্রথমে পৃথিবীর অন্যদেশ হতে লুণ্ঠনের অংশ, তারপর পুণ্যার্থীদের দান। (The Commerce of Mecca was ruined, but the city was the gainer—at first by a fair share in the plunder of the world, presently by a concourse of visitiors....Margoliouth-Mahammed-P-393) মহম্মদ ও ইসলামিক ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ W.Muir বলেন বিজিত দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করেই আরববাসীদের জীবিকা ও বিলাস-ব্যসনের ব্যয়-নির্বাহ হত (The Arabs lived on the fat of the conquered provinces—W. Muir-Caliphate-quoted from Sir, J.N.Sarkar—History of Aurangzib Vol-3-P-169.) ভারতবর্ষ ব্যতীত আরব বা ইসলামের কোন সাম্রাজ্য ছিল না। মুসলমান ভারতে বেপরোয়া লুণ্ঠন করেছে। খনি গর্ভ শূন্য করে নিয়েছে সোনা, রূপা, হীরা, বহুমূল্য, রত্নরাজি, লোহা, ইস্পাত, তামা, স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পদ। স্যার যদুনাথ সরকারের হিসাব অনুযায়ী ১৭৩৮ সালে নাদির শাহ্ ভারত থেকে যে সম্পদ নিয়ে যান, তৎকালীন বাজার মূল্যে তার পরিমাণ ১৭ কোটি টাকা। আহম্মদ শা আবদালি ১৭৬১ সালে ১২ কোটি টাকা মূল্যের লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে যান আফগানিস্তানে। শুধু বিদেশী আক্রমাণকারী-ই নয়, এদেশের মুসলিম শাসকও আফগানিস্তান. পারস্য, তুরস্ক ও অন্যান্য আরব দেশে পাঠাতেন প্রচুর অর্থ ও সম্পদ। সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনের বীভৎস ইতিহাসকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার জন্যেই কি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের অত্যাচারে প্রতি এই মাত্রাহীন গুরুত্ব? সম্ভবত এই উদ্দেশ্যেই বর্তমানে এদেশে ইতিহাস রচনায় অনুসৃত হয় Marxian Methodology এবং Thematic Process.

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ—আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক—সর্ব বিষয়ে। পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশ হলে বিষয়টিকে জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করত। ক্ষুদ্র ইজরায়েল। ইহুদিদের জাতীয়* রাষ্ট্র। বহু শতাব্দী পূর্বে তারা স্বদেশ (বর্তমান ইজরায়েল) থেকে হয়েছিল বিতাড়িত। ঝরাপাতা অথবা ধূলিকণার ন্যায় প্রায় তারা ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর সর্বত্র। একমাত্র ভারত ব্যতীত সকল দেশেই হয়েছে নির্যাতিত। সেই নির্যাতন Holocaust-এর আকারে দেখা দেয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীতে। ইহুদি জাতি বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান সাধনা ও প্রযুক্তি বিদ্যায় শীর্ষস্থানে। ইহুদিদের প্রবল জাতীয়তাবোধ, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

---

* বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যসংখ্যা প্রায় ১৮০টি। লক্ষাধিক মানুষ নিয়ে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশটিরও আছে একটি জাতীয় রাষ্ট্র। কিন্তু পথিবীর প্রাচীনতম জাতি হিন্দুর কোন রাষ্ট্র নেই। পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুই রাষ্ট্রহীন জাতি।

ইউরোপ-আমেরিকা ও ইজরায়েলে তৈরি হয়েছে বহু সরকারি ও বেসরকারী সংগঠন। তারা তৈরি করেছে Holocaust-এর পূর্ণ বিবরণ;হত্যাকারী নাৎসীদের খোঁজে তোলপাড় করেছে সারা পৃথিবী। আত্মপরিচয় গোপন করে লুকিয়ে থাকা নাৎসী অপরাধীদের ধরে বিচার করেছে দেশ-বিদেশের আদালতে। তাদের অন্বেষার আজও শেষ হয়নি।

হিটলার সুসভ্য জার্মান-জাতির দূরপনেয় কলঙ্ক, লজ্জাজনক ব্যতিক্রম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনুতপ্ত জার্মান জাতি ও জার্মান সরকার শতবার ক্ষমা চেয়েছে ইহুদি জাতি ও ইজরায়েল সরকারের কাছে। Holocaust-এ নিহত ইহুদিদের জন্য তৈরি করেছে রাজধানী বার্লিনে এক স্মারক স্তম্ভ। ধৃত-নাৎসীদের বিচার করে দিয়েছে দণ্ড। দৃষ্টান্ত আরও আছে। পোপ জন পল—দ্বিতীয়, খ্রীস্টান জগতের ধর্মগুরু। বিগত দু'হাজার বছরে খ্রিস্টান জনগণ শান্তি-প্রেম ও মানবাধিকারের বিরুদ্ধে যে পাপ করেছে তার জন্য পোপ ঈশ্বরের মার্জনা ভিক্ষা করেছেন—গত ১২ মার্চ (Pope John Paul II will use the first Sunday of Lent, which falls on March-12, to seek devine forgineness for all wrongs committed by Christians throughout the past 2000 years of Christianity, This long list includes "sins against love, peace, the rights of people"...The Hindusthan times-12-3-2000)। জাপান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের সেনাবাহিনী অধিকৃত কোরিয়া ও চীনের নানকিং প্রদেশে অসামরিক জনগণের ওপর অত্যাচার করে। যুদ্ধোত্তর জাপানের সরকার এর জন্য কোরিয়া ও চীনের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে। কিন্তু চীন-কোরিয়ার দাবি জাপানকে প্রাকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। এ হল মানুষের ধর্ম। মানুষ অন্যায় করে, তার বিরুদ্ধে হয় প্রতিবাদ। আবার অন্যায়কারী ভুল বুঝতে পেরে হয় অনুতপ্ত।

মুসলমান ও ভারত এর ব্যতিক্রম। খ্রীস্টানদের অপরাধের জন্য পোপ ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। মুসলমান ভারতে যা করেছে তা পরমকারুণিক সর্বশক্তিমান আল্লার নির্দেশে। সুতরাং সে কার কাছে মার্জনা চাইবে? এই কারণেই আজও পর্যন্ত বিদগ্ধ, উদার, প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে নিবেদিত প্রাণ কোন মুসলমান কোরানের সমালোচনা করেননি; বীভৎস বর্বর অতীতের জন্য অনুতাপ বা দুঃখ প্রকাশ করেননি।

মুসলমানের ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু হিন্দু নীরব কেন? বিশ্বের সর্বত্র অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে যে নিন্দায় ধিক্কারে মুখর, ভারত-ইতিহাসের মুসলিম শাসনের অধ্যায় সম্বন্ধে সে কেন রুদ্ধকণ্ঠ ভাষাহারা? একি দার্শনিক-ঔদাসীন্য, নির্বেদ বৈরাগ্য অথবা গূঢ় উদ্দেশ্য প্রণোদিত? ইতিহাস কল্পনার বিলাসিতা নয়; ইতিহাস অলীক আদর্শ ও ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাস করে না। সে সত্যের (facts) উপাসক, সত্যান্বেষী। আশা করা যায় বর্তমান যুগের ইতিহাস-গবেষক সেই সত্য উদঘাটনে ব্রতী হবেন। এ সত্যের দাবি—এ দাবি মানবতার।

— সমাপ্ত —

BIBLIOGRAPHY

1. Khwajah Nizamuddin Ahmad
   1. **The Tabaqat-I-Akbari Vol-1**
      –Asiatic Society 1973
   2. **The Tabaqat-I-Akbari Vol-III**
      –Royal Asiatic Society 1939
2. K. K. Aziz — **The Murder of History**
   –Renaissance Publishing House. New Delhi
3. Major Davy — **Timur (Taimur Lang)**
   Institute's (Political & Military of the Emperor Timur) Originally Written in the Turkish language by Timur : Translated into English by Major Davy
4. Ayesha Jalal — **Self and Sovereignty**
   –Routledge. London-New York
5. Akbar S. Ahmad — **Discovering Islam**
   –Vistar Publication, New Delhi
6. Rafiq Zakaria — **Muhammad And The Quran**
7. Musir-ul-Haq — **Islam In Secular India**
   –Indain Institute of Advanced Study, Simla
8. J. N. Sarkar
   1. **History of Aurangzib Vol-III**
      –Orient Longman Ltd.
   2. **Fall of The Mughal Empire Vol-II**
      –M. C. Sarkar and Sons Pvt. Ltd. Calcutta 1966
   3. **House of Shivaji**
      –Orient Longman Ltd.
9. H. C. Roychowdhury — **Political Histroy of Ancient India**
   –Oxford
10. R. C. Majumder — **History Of The Freedom Movement In India Vol-I+III**
    –Firma K. L. Pvt. Ltd, Calcutta 1971, 1977
11. R. C. Majumder (Gen. Editor) — **The History And Culture of The Indian People**
    1. **Delhi Sultanate**
    2. **The Mughal Empire**
    Bharatiya Bidya Bhavan
12. R. C. Majumder — **Reading In Polititcal History of India**
    B. R. Publication Corporation
13. R. C. Majumder, H. C. Roychowdhury, K. K. Dutta — **An Advanced History of India**
14. Dr. B. R. Ambedkar — **Writings and Speeches Vol-8**
    –Education Deptt.
    Govt. of Maharashtra 1990

15. Iswari Prasad — **History of Mediaevel India**

16. V. S. Naipaul
1. **Beyonf Belief** –Penguine Books
2. **Among The Believers (An Islamic Journey)**–Andre Deutsch

17. F. Maxmuller — **India–What can it Teach us?** –Penguine Books

18. D. S. Margoliouth — **Mahammed And The Rise of Islam** –Voice of India New Delhi

19. Will Durant — **The Story of Civilization**

20. A. S. Beveridge — **Babur Nama**

21. Robert Sewell — **A Forgotten Empire**

22. Leonard Mosley — **The Last Days of the British Raj** –Jaico Publishing, Bombay

23. H. M. Elliot & Dowsen — **The History of India As Told By Its Own Historians** –Kitab Mahal Pvt. Ltd.

24. Vincent A. Smith — **The Oxford History of India**

25. William L. Shirer — **The Rise And Fall of The Third Reich**

26. Collins and Lapierre — **Freedom at Midninght** –Vikash Publishing Pvt. Ltd.

27. Koenraad Elst — **–Ramjanma Vhoomi Vs Babri Masjid** –Voice of India N. Delhi

28. V. P. Menon
1. **The Integration of The Indian States**
2. **The Transfer of Power In India** –Orient Longman

29. Brigitte Gabriel — **They Must Be Stopped** St. Martin's Press– New York

30. Dr. Md. Mushin Khan — **Sahih Al Bukhare** –Kitab Bhavan, N. Delhi

31. M. O. Mathai — **–Reminiscences of The Nehru Age**

32. Pt. Jawahar Lal Nehru — **Glimpses of World History** –Oxford University Press, 1998

33. Arun Shourie and others — **Hindu Temples What happened To Them** –Voice of India New Delhi 1990

34. Tathagata Roy — **A Suppressed Chapter In History** –Books Well, N. Delhi

35. H.V. Seshadri — **The Tragic Story of Partition** –Jagarana Prakashana, Bangalore 1984

36. Prof. Samar Guha — **Non-Muslims Behind The Curtain of East Pakistan**

37. N. C. Chatterjee	**The East Bengal Tragedy** **The Delhi Pact And Thereafter** (Forward by N. C. Chatterjee)
38. Bhawani Sen (Secy. C. P. I. Bengal Committee)	**Muktir Pathe Bangla** Published by Kanai Roy on behalf of the CPI, Bengal Committee
39. Chandmal Chopra	**The Calcutta Quran Petition** –Voice of India New Delhi 1987
40. Aurobinda Ghose	**The Koran and The Kafir** –Published in U.S.A.
41. The Complete Works of Swami Vivekananda-Part-IV	Advaita Ashram Publication
42. নীরদ চন্দ্র চৌধুরী	**আমার দেশ আমার শতক** —মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লি. কলিকাতা ১৯৯৬
43. ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী	**ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ঃ এবার ঘরে ফেরার পালা** –Save India Mission, Calcutta
44. তপনকুমার ঘোষ নিত্যরঞ্জন দাস	**ধর্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামি জেহাদ** —তুহিনা প্রকাশনী
45. পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু	**ভারত সন্ধানে** **(The Discovery of India)** আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৯৯১
46. রমেশ চন্দ্র মজুমদার	**বাংলা দেশের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)** —জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলিকাতা ১৯৮২
47. সখা রাম গণেশ দেউস্কর	**শিবাজির দীক্ষা** স্বস্তিকা প্রকাশন
48. দেবজ্যোতি রায়	**কেন উদ্বাস্তু হতে হল** —বিবেকানন্দ সাহিত্য মন্দির
49. কুরআন শারীফ	অনুবাদ—মাওলানা মোবারক করীম জওহর, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা ১৯৭৪
50. শরত রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড)	**জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ,** শরৎ সমিতি
51.	**দেশ (সাপ্তাহিক)** ২১-২-৯৮ / ৭-৩-৯৮ / ২১-৩-৯৮ আনন্দ পাবলিশার্স

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ১২০.০০
এক নজরে ইসলাম ৩০.০০

তপন কুমার ঘোষ
ও নিত্যরঞ্জন দাস

ধর্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা
ও ইসলামি জেহাদ ৬০.০০

নিত্যরঞ্জন দাস

সংকটের আবর্তে ভারত ১২০.০০
কাশ্মীর—নেহেরু—অমরনাথ ১০.০০
ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ ১০.০০

ডাঃ রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
—একটি অকপট জীবনী ১০০.০০

তপনকুমার ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের ভাগ্যে
কি আছে? ৪.০০
নীলকণ্ঠ মূকনায়ক
(ডঃ আম্বেদকর) ৬.০০

রাণাপ্রতাপ রায়

Don't say we
didn't warn you
Great Thinkers
on Islam ৬০.০০

শিবপ্রসাদ রায়

দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই ৫.০০
রক্তে যদি আগুন ধরে ৪.০০
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী
হইতে সাবধান ৬.০০

শান্তনু সিংহ

নোয়াখালি নোয়াখালি ৮.০০

ডঃ কৃষ্ণকান্ত সরকার

বৈদিক তথা হিন্দু ধর্মের ভূমিকা ৫.০০
ঋকবেদ মন্ত্রে মা সরস্বতী
ও অন্যান্য দেবদেবী ৫.০০

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

নিঃশব্দ সন্ত্রাস ১০.০০